কথা কল্পনা কাহিনী

(সপ্তম স্তবক)

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

সপ্তম স্তবকের প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৫

সম্পাদনা

মণীশ চক্রবর্তী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩ হইতে
এস. এম. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০০৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

চিত্র-শিল্পী : চিত্র-পরিচালক : লেখক : সাহিত্যরসিক

শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু

সূচীপত্র

চিত্ত ও চিত্র

অলৌকিক

প্রসন্ন মধুর

এই গল্প-গ্রন্থমালার প্রথম স্তবকে তেত্রিশটি, দ্বিতীয় স্তবকে আটত্রিশটি, তৃতীয় স্তবকে সাঁইত্রিশটি, চতুর্থ স্তবকে পঁয়ত্রিশটি, পঞ্চম স্তবকে চৌত্রিশটি, এবং ষষ্ঠ স্তবকে পঁয়ত্রিশটি বিভিন্ন রসের গল্প সংকলিত হয়েছে। প্রথম স্তবক ২২৲, দ্বিতীয় স্তবক ২০৲, তৃতীয় স্তবক ২২৲ চতুর্থ স্তবক ২৪৲ পঞ্চম স্তবক ২৪৲ ও ষষ্ঠ স্তবক ২৫৲।

কথা কল্পনা কাহিনী

বৈরাগ্যের ফলাফল

অনন্ত তার জ্যাঠামশাইকে প্রায় দেবতার মতো ভক্তি করত। কিংবা হয়ত আরও বেশী। মানে দেবতা বলতে ওর যে কটা নাম জানা আছে—যাদের পুজো হয় বাড়িতে বা পাড়ায় চাঁদা তুলে—দু-একটা তীর্থে গিয়ে যাঁদের দর্শন করেছে ছোটবেলায় মা-বাবার সঙ্গে—তাঁদের কতটা ভক্তি করে তা কোনদিন ভেবে দেখে নি। ইস্কুল কলেজের পরীক্ষার আগে যে সরস্বতী পুজোটা পড়ত সেদিন মা সরস্বতীকে পাস করার আর্জি জানাত, আর সাধারণভাবে পরীক্ষা দেওয়ার পর মা কালীকে ডাকত—তাকে কতটা ভক্তি বলী যায়কে জানে। আলাদাভাবে ভগবানের কথা কখনও ভাবে নি—নইলে বলা চলত, ভগবানের মতো ভক্তি করে। এর মধ্যে যে তথ্যটা বেশ উল্লেখযোগ্য, এই জ্যাঠামশাইকে সে কখনও দেখে নি।

ছবিও তেমন নেই। তাঁর খুব ছোটবেলার একটা ফটো আছে, তাকেই সে নিজের ঘরে একটা তাকে রেখেছে—নতুনভাবে বাঁধিয়ে নিয়ে, যাতে দাঁড় করিয়ে রাখা যায়—বিশেষ বিশেষ দিনে তাতে মালা দেয়, আপিস যাবার সময় প্রণাম ক'রে যায়। একটি মাত্র দরখাস্ত দিয়ে, একটি মাত্র ইন্টারভিউতে তার চাকরি হয়েছে—এও, ওর বিশ্বাস, জ্যাঠামশাইয়ের জন্যেই, কারণ দরখাস্ত পাঠাবার আগে খামখানা ছবির নিচের দিকে ঠেকিয়ে নিয়েছিল (ছবিতে পা নেই, বুক পর্যন্ত)—ইন্টারভিউতে যাবার আগে প্রণাম ক'রে গিছল। মাকেও করেছিল তবে মা জ্যাঠামশাইয়ের জ্যোতির কাছে ম্লান হয়ে গিছলেন।

এ হেন ভক্তির কারণ—জ্যাঠামশাই সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন।

না, সাধারণভাবে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া যাকে বলে, অন্য কোন জীবিকার উপায় করতে না পেরে অথবা তীব্র বৈরাগ্যে, তা নয়। এঁর সন্ন্যাস নেওয়ার একটু বিশেষত্ব ছিল।

সেকালের প্রেসিডেন্সী কলেজের গ্র্যাজুয়েট, ভাল সরকারী চাকরি পেয়েছিলেন, অসংখ্য সুন্দরী মেয়ের বাবা হাজার হাজার টাকা নিয়ে টানাটানি করেছিল, কিন্তু তিনি কারও কোন প্রস্তাবেই টলেন নি—কৌশলে মেয়ে এনে

দেখানোতেও না—মা-বাবার অনুনয়েও না। ধীরভাবে অপেক্ষা করেছিলেন ছোট দুই ভাইয়ের চাকরি-বাকরি পাবার বা অন্য কোন আয়ের ব্যবস্থা হওয়ার। তারপর নিজে উদ্যোগী হয়ে তাদের বিয়ে দিয়ে থিতু ক'রে অকস্মাৎই একদিন একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করেছিলেন। বুদ্ধ ও চৈতন্যের মতোই —গভীর রাত্রে, সব কিছু ফেলে শুধু মার নামে একটা চিঠি লিখে রেখে। তাতে শুধু অনুনয় করা ছিল মা যেন মনে মনে তাঁকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

এরপর খোঁজখবরের কোন ত্রুটি রাখা হয় নি। অবশ্য এঁদের পক্ষে যতটা সম্ভব। দুই ভাই-ই নব বিবাহিত, নতুন সংসার ও নতুন চাকরির মধ্যে গৃহত্যাগী দাদার খবরের জন্যে কিছু পৃথিবী তোলপাড় করা সম্ভব নয়। আর সাধ্যই বা কতটুকু। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতেই অনেক ব্যয় হয়ে গিয়েছিল।

সে আজ বহুকালের কথা।

অনন্ত তখন জন্মায় নি—বলাই বাহুল্য। সে বাবার প্রথম সন্তানও নয়। আগে দাদা, তারপর এক দিদি—তারপর ও। বি-কম পাস করেছে, স্টেনোগ্রাফী শিখেছে, বড় আপিসে কাজ পেয়েছে—সুতরাং সময় বড় কম কাটে নি এর মধ্যে।

কিন্তু বিয়ে সে করে নি এখনও। সে প্রশ্ন ওঠেও নি। সবে দাদা বিয়ে করেছেন। দিদির বিয়ে এখনও হয় নি। এর মধ্যে ওর কথা কে ভাববে? তবে মা যে ভাবছেন না তা নয়। যে রকম জ্যাঠার ওপর ভক্তি—এ ছেলে না আবার সন্ন্যাসী হয়ে যায়। সে ভয় তো ছিলই।

ভক্তি কি খুব অহেতুক?

অনন্ত ভাবে। যেন নিজেকে বিচার করে।

অমন ভাল চাকরি পেয়েছিল। বিদ্বান বুদ্ধিমান—ভাইদের সংসার দাঁড় করিয়ে দিয়ে যে অমন নিঃশব্দে চলে গেল—তার বৈরাগ্যের তীব্রতা অনুভব ক'রেই এত ভক্তি ওর।

লোকে বিবেকানন্দের কথা বলে। তার চেয়ে ওর জ্যাঠামশাইয়ের শক্তি

কম কিসে? অল্প বয়সে সব আবেগই তীব্র হয়। বিবেকানন্দ সেই বয়সেই অমন গুরুর দেখা পেয়েছিলেন। আর ওর জ্যাঠামশাই—প্রকাশ চাটুজ্যে—কাউকেই পান নি, কোন সূত্রও ছিল না। বই-টই পড়ে যেটুকু হয়। সেই-ভাবেই বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে, তাকে গোপনে একা লালন করেছেন। তিনি কম কিসে।

আজকাল চাকরিতে অনেক সুখ। তার মধ্যে একটা হ'ল এক বছর অন্তর বিদেশ যাবার গাড়িভাড়া পাওয়া।

প্রথম সুযোগ আসতেই অনন্ত বেরিয়ে পড়ল। মাকে বলল, 'হরিদ্বার, দেরাদুন, মুসৌরী যাবে। আসলে গেল সোজা ঋষিকেশ।'

বহু পুঁথিতে পড়েছে, শুনেওছে অনেকের কাছে ঋষিকেশ থেকেই ঋষি বা সন্ন্যাসীদের নাকি ঘাঁটি শুরু। কিন্তু পৌঁছে দেখল এই বাস-আড্ডা, চায়ের দোকান, হোটেল, ভিখিরীর ভিড়ের মধ্যে সাধু খোঁজা অসম্ভব। এত সময় নেই। কী মনে ক'রে—প্রবোধবাবুর বইতে দেবপ্রয়াগের নাম শোনা ছিল—ঝোঁকের মাথায় পরের বাসেই দেবপ্রয়াগ রওনা দিল।

দেবপ্রয়াগে পৌঁছেও একটু আশাভঙ্গ হল বৈকি। এও তো শহরের মতো, এর মধ্যে কোথায় সে সাধু-জ্যাঠাকে খুঁজবে?

অবশ্য আর উপায়ও ছিল না, অন্য কোথাও যাবার। কারণ তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। অগত্যা হোটেলের খোঁজ করতে হ'ল। পেল যা—গঙ্গার ধারে একটা ধর্মশালা। মোটামুটি পরিষ্কার, একটা চারপাইও ছিল। তখন আর শরীর বইছে না, সুতরাং সেখানেই আড্ডা গাড়তে হ'ল। খিদেও পেয়েছে খুব, মুখ-হাত ধুয়ে কাপড়-জামা বদলে আগেই বেরিয়ে পড়ল একটা চলন-সই হোটেল বা ঢাবা খুঁজতে। চৌকীদার বলে দিল ডানদিকে একটু উঠে গেলেই ভাল দোকান পাবে, তারা ভাল খাবার দেয়। ফুল্‌কা, ভাত—যা চাইবেন পাবেন।

হোটেলও খুঁজে পেল, কিন্তু তখনই যাওয়া গেল না।

হোটেলের সামনে যেতেই চোখে পড়ল—ওর দাদা দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে গল্প করছেন!

হ্যাঁ, ওর দাদাই।

সেই মুখ, সেই চোখ, সেই ঘাড় নাড়া, মায় হাত তুলে কথায় জোর দেবার ভঙ্গীও।

মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়েও গেল, 'দাদা !...তুমি এখানে !'

সে ছেলেটি এবার এদিকে ফিরল। ফিরল প্রথমটায় কে কাকে ডাকছে ঠিক বুঝতে না পেরে, কিন্তু অনন্তর দিকে চোখ পড়তে তার মুখেও একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটল। কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল, আগে যার সঙ্গে কথা কইছিল, তাকে বা সে প্রসঙ্গও বোধহয় আর মনে রইল না—এদিকেই চেয়ে রইল, বরং দু-পা এগিয়েও এল।

কারণ খুব স্পষ্ট এবং সরল।

দাদা ও ভাইয়ের মুখে কিছু মিল থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। আর যে আয়নার নিজের মুখ বহুবার—অগণিতবার দেখেছে, তার চোখে সে মিল ধরাও পড়বে।

অনন্তর প্রথম বিস্ময় কেটে গেছে ততক্ষণে—বিদ্যুতের আলোয় ভাল ক'রে দেখারও সুযোগ হয়েছে।

মিল আছে ঠিকই, অমিলও কিছু কিছু চোখে পড়ছে এবার।

প্রথমত কাপড় পরার ধরন—দাদা প্যান্ট ছাড়া পরে না, এর পরনে ধুতি ও কলিদার পাঞ্জাবি। তাও, পরেছে এদেশী ধরনে। এদেশেও এখন প্যান্টের সংখ্যাই বেশী। তবু ধুতিও বেশ কিছু লোক পরে। তা ছাড়া মুখে পান, দাদা পান খায় না।

তবু তখনও বিস্ময়ের ধাক্কা কাটে নি।

কাছে এগিয়ে এসে আমতা আমতা করে বলল, 'আপ—ইয়ে, একদম হামারে বড় ভাইয়াকা মাফিক সুরত হ্যায় আপকা—উসি কা লিয়ে মৈ ঘাবড়ায় গিয়া—'

এ ছেলেটিও তা বুঝেছে, সে এ কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'আপ বাঙ্গালী হ্যায় ?'

'জী।' উত্তর দিল অনন্ত।

'মৈ ভি বাঙ্গালী হুঁ।'

'বাঙ্গালী!' আবারও চমকে ওঠার পালা। 'আপকা শুভ নাম?'

'হমারে নাম সূরয চ্যাটার্জী!'

'চ্যাটার্জী!…আপকা পিতাজী?

'পবকাশ চ্যাটার্জী।'

কেমন যেন পাথর হয়ে গেল অনন্ত।

আর যাই হোক ঠিক এ রকম ভাবে নি সে। এ তারই জ্যাঠতুতো ভাই, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

অর্থাৎ যাঁকে সন্ন্যাসী বলে, উচ্চস্তরের সাধক বলে মনে মনে এতদিন পূজা করেছে—তিনি এখানে এসে বিবাহ করেছেন কিনা কে জানে, স্ত্রীলোক নিয়ে ঘর-গৃহস্থালী পেতেছেন।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'মৈ আপকা চাচেরা ভাই হুঁ। প্রকাশ চ্যাটার্জীকা ছোটা ভাই হমারে পিতাজী। মৈ উনহিকো ঢুঁড়নে আয়া হুঁ। লেকিন হাম শোচা থা উন্‌হোনে সন্ন্যাস লিয়া, কঁহি তপস্যা কর্ রহা হ্যাঁয়।'

সূরয হাসল। জানাল, কিছু ভুল করে নি ওরা। তিনি সন্ন্যাস নেবার জন্যেই এসেছিলেন, কিন্তু পাকেচক্রে পড়ে ভাগ্যের লিখনে বিবাহ ক'রে সংসার পাততে হয়েছিল। তা এখানে দাঁড়িয়ে বৃথা সময়ক্ষেপ ক'রে লাভ কি? কাছেই ওদের ডেরা—মা আছেন সেখানে, ভাইয়া চলুক, চা নাস্তা তো খাক। তারপর, মালপত্র কোথায় রেখেছে অনন্ত? সেখান থেকে আনিয়ে নেবে সে। নিজের চাচেরা ভাইকে সে হোটেল-ধর্মশালায় থাকতে দেবে না, এটা তো ঠিক!

কতকটা অভিভূতের মতোই সঙ্গে গেল অনন্ত।

বাড়ি ওদের সত্যিই খুব কাছে। সামান্য বাড়ি, তবে নদীর ওপরে। সূরয আছে, ওর বৌ আছে। একটি বাচ্চা। শুনল সূরযেরা তিন ভাই, দুই বোন। বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। ভাইদের এখনও হয় নি। একটি ভাই এখনও ছোট, স্কুলে পড়ে।

'লেকিন আপকা পিতাজী—হমারে—কেয়া নাম, জ্যেঠা—কাঁহা? হ্যায় না?'

'না, তিনি নেই,' সূরয জানায়।

তবে ওর মা আছেন। তাঁকে ডাকে সূরয। তিনি ঘোমটা দিয়ে নীরবে এসে দাঁড়ান।

অনন্ত প্রণাম করতে বাঙালীদের মতো দাড়িতে হাত দিয়ে মুখে ঠেকান না। অর্থাৎ বাঙালীর মেয়ে নন। সে শিক্ষাদীক্ষাও পান নি।

বিজলী এসেছে এখানে। সে আলোয় মুখ দেখার কোন অসুবিধা হয় না। ভদ্রমহিলা খুব রূপসী না হলেও এককালে ভালই দেখতে ছিলেন, তা বোঝা যায়। এদেশীয়া মহিলা। চালচলন, কথাবার্তা সবই এদেশীয়দের মতো। তবে কথা খুবই কম কইলেন, কাঁদলেন অনেক বেশী। জ্যাঠামশাইয়ের প্রসঙ্গ ওঠামাত্র জল ভরে এসেছিল চোখে। তারপর থেকে বারবারই চোখে জল আসতে লাগল তাঁর।

ইতিমধ্যে সূরযের স্ত্রী একটা ট্রেতে ক'রে দুগ্ধবহুল চা, বিস্কুট, ডালমুট ও লাড্ডু সাজিয়ে এনে রেখে গেল। হাতজোড় ক'রে নমস্কারও জানাল।

এরপর সূরয উঠে পড়ল অনন্তর মালপত্র এখানে আনার জন্যে। কিন্তু অনন্ত ওর হাত ধরে নিবৃত্ত করল। আগে সে জ্যাঠামশাইয়ের সংবাদ চায়। তিনি বেঁচে আছেন, না নেই? তারপর সে কোথায় থাকবে, ক'দিন থাকবে ঠিক হবে। তার ছুটি অল্পদিনের, জ্যাঠামশাইয়ের খোঁজ করতেই এসেছে প্রধানত, তাঁকে দর্শন করতে—বেঁচে আছেন এবং কোথায় আছেন জানলে অবিলম্বে সে সেখানেই চলে যাবে। আর তাহলে মিছিমিছি মালপত্র টানাটানি ক'রে লাভ নেই। খেয়ে সে এখান থেকেই যেতে পারে—সে বিষয়ে কোন সঙ্কোচ নেই ওর, তবে পহেলা—

এই কথায় অশ্রুমুখী জ্যাঠাইমার চোখের জল আরও বেড়ে গেল। সূরযের মুখেও একটা বেদনার ছায়া পড়ল। সে মাটির দিকে চোখ নামিয়ে যা বলল, তার অর্থ এই দাঁড়ায়—ওদের পিতাজী এখানে সংসার পাতলেও বা পাততে বাধ্য হ'লেও—তাঁর আসল লক্ষ্যের কথা ভোলেন নি—অর্থাৎ সন্ন্যাস নেবার কথা। তিনি মূলত মহাপুরুষ, যা-ই করুন নিবিড় বৈরাগ্য তাঁকে সর্বদা ঘিরে থাকতই। সূরযের আর তার পরের ভাইয়ের রোজগারের ব্যবস্থা হতে ওদের বুঝিয়ে বলে, স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে তিনি এখান থেকে চলে গেছেন।

কোথায় গেছেন, তা ওরা কেউ জানেন না। স্ত্রী পাছে শেষ মুহূর্তে ভেঙে পড়েন বা বাধা দেন এই ভয়ে একদিন সন্ধ্যা রাত্রেই 'একটু ঘুরে আসি' বলে সেই যে বেরিয়ে গেছেন আর ফেরেন নি।

ওরা খোঁজাখুঁজি করেছিল বৈকি। উদ্বিগ্নও হয়ে উঠেছিল যথেষ্ট—কারণ, যাওয়ার কথা ছিল ঠিকই, তবে যা দিনকাল কোন দুর্ঘটনা ঘটাও তো বিচিত্র নয়। তবে সে উদ্বেগে বেশীদিন থাকতে হয় নি। দিন তিনেক পরে একটা চিঠি এসেছিল। 'আমি ভাল আছি, আমার জন্যে ভেবো না।' ঠিকানা ছিল না, পোস্ট মার্ক দেখে মনে হয় উত্তর কাশীতে ডাকে ফেলা হয়েছে। উনি প্রায়ই বলতেন, যমুনোত্রার পথে কোথায় ওঁর গুরুজী থাকেন, উনি সেখানেই চলে যাবেন। কোন পরিচিত লোকালয়ে থাকতে চান না। সেই জন্যে আর ওরা কোন খোঁজখবর করে নি। বলে-কয়েই তো গেছেন, মাঝখান থেকে তাঁর তপস্যার পথে বিঘ্ন ঘটিয়ে লাভ কি? জীবন তো অনেকখানিই কেটে গেছে—আর কটা দিনই বা সময় পাবেন।

অনন্ত প্রায় শুনতে শুনতেই মনস্থির ক'রে ফেলল। এঁরা এত সহজে হাল ছাড়লেও সে ছাড়বে না। না, তপস্যায় বিঘ্ন সেও ঘটাবে না, তবু দেখে যাবার চেষ্টা করবে। তাঁর পরিবার যে এখনও তাঁকে ভোলে নি, সেই প্রমাণই দিয়ে যাবে।

আর সেই কারণেই এখানে বাসা বাঁধা উচিত হবে না। এত সহজে ছাড়বে না এরা। সে কোনমতে এদের প্রতিনিবৃত্ত করে—ধর্মশালায় কোন অসুবিধা হচ্ছে না, এক যা বাইরে খাওয়া—তা এখানে যখন সে বন্দোবস্ত হয়েই গেল, তখন আর মিছিমিছি এত টানাহেঁচড়া ক'রে লাভ কি—বুঝিয়ে, রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে ছোট দুটি ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ ক'রে, ভাবীর সঙ্গে দু-একটা ঠাট্টা-তামাশা ক'রে পরের দিন সকালে এখানে এসেই চা-নাস্তা খাবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্মশালায় ফিরে এল এবং মালপত্র নিয়ে ভোরের বাসেই উত্তর কাশী রওনা দিল।

শুধু ধর্মশালায় ম্যানেজারকে ব্যাপারটা বলে বুঝিয়ে এল। ওর মোটে সাত-আট দিন ছুটি, সে সুরযরা বুঝবে না, মিছিমিছি আটকে রাখবে—তাই সে এমনভাবে বিদায় না নিয়েই চলে যেতে বাধ্য হ'ল।

উত্তর কাশীতে নেমে কিন্তু এতক্ষণের উৎসাহ আর ঔৎসুক্য বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা বড় রকম আঘাত খেল।

যমুনোত্রীর পথে কোন্ এক অখ্যাত গুহায় জ্যাঠার গুরু থাকেন। সেইখানে গিয়ে তপস্যা করছেন তিনি। কিন্তু সে স্থানটার নামও তো জানে না। নিশ্চয় বাস-রাস্তার ওপর নয়, এমন স্থানে কেউ কখনও নির্জন বাস করবে না, তপস্যা তো নয়ই। তবে?

কোথায় কোথায় ঘুরবে? এত সময়ই বা কই? দীর্ঘদিন ধরে আপিস কামাই ক'রে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয় কিছু।

মালপত্র এক জায়গায় রেখে একটু চা আর খাবার খেয়ে বাজারে দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করল। বাঙালী সাধু একজন এসেছেন—গৃহস্থাশ্রমে নাম ছিল প্রকাশ চ্যাটার্জী—কেউ জানে কোথায় আছেন তিনি?

কেউই বলতে পারল না, বলা সম্ভব নয়।

কেউ বলল, রামকৃষ্ণ মিশনের কুঠিয়ায় যাও।

কেউ বলল, ডাক্তার বোসের বাড়ি যাও। তিনি হয়ত বলতে পারেন। কেউ কেউ কোন পাণ্ডা ধরার পরামর্শ দিল।

একজন বলল শুধু, উজালীতে এক বাঙালী সাধু আছেন স্বামী অখণ্ডানন্দ, খুব জানপড় আদমি—সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ—তিনি একটা ভাল পরামর্শ অন্তত দিতে পারবেন।

এইটেই মনে লাগল।

গেল উজলী। স্বামীজীকে খুঁজে বার করতেও দেরি হ'ল না।

তিনি সব শুনে খুব একচোট হেসে নিলেন। বললেন, 'তিনি এখানেই আছেন, এই কাছেই। তবে সন্ন্যাস নেওয়া তাঁর এখনও হয় নি। মোদ্দা হাল তিনি বোধহয় এখনও ছাড়েন নি। হলই বা চুয়াত্তর বছর বয়েস!…আমি লোক দিচ্ছি সঙ্গে—ও আপনাকে পৌঁছে দেবে। তবে মালপত্র নিয়ে যাবেন না। একটা ধর্মশালা দেখিয়ে দিচ্ছি, রেখে যান। পরে নিচে নেমে খাওয়া-দাওয়া ক'রে আসবেন একবার।'

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না অনন্ত, এ যেন এক কি রহস্যের ইঙ্গিত দিলেন ইনি, সাধু-সন্ন্যাসী হন নি—এই বয়সে আশাও ছাড়েন নি। তবে এখানে

কি করছেন। অমন সাজানো সংসার, অত ভালো ছেলেমেয়ে সব ছেড়ে এলেনই বা কেন? আর, আপন জ্যাঠা—তবু তাঁর কাছে মালপত্র নিয়ে যাওয়া যাবে না কেন?

তবু, স্বামীজীর উপদেশ লঙ্ঘন করতেও সাহস হ'ল না। ধর্মশালাটি ভাল, বেশ খটখটে পরিষ্কার। চারপাই আছে, বিছানাও। সেখানে ওর সামান্য মাল রখে মুখ হাত ধুয়ে তখনই বেরিয়ে পড়ল। একটু নামতে হয় সে রাস্তা থেকে—তবু খুব দূর নয়।

কাছে গিয়ে বুঝতে পারল ব্যাপারটা। স্বামীজীর উপদেশের অর্থও।

শ্লেট পাথরের নিচু চালওলা মাটির গাঁথুনি পাথরের ঘর একখানি। সামনের জায়গাটুকুতে দুটো মোষ, একটা ছাগল। ফলে যেমন দুর্গন্ধ তেমনি অপরিষ্কার। তার মধ্যেই দোরের সামনে এক খাটিয়ায় এক বৃদ্ধা শুয়ে আছেন, বাইরে বসে তেমনি মলিন বস্ত্র পরিহিত এক বৃদ্ধ বসে চ্যাচারির পাখা দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে।

সঙ্গে যে গিয়েছিল সে দূর থেকেই লোকটিকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ওহি চ্যাটার্জি বাবু। চলে যাইয়ে।'

এবং সঙ্গে সঙ্গে, প্রায় চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরিচয় দিতে প্রকাশ চাটুজ্যে চিনতে পারলেন এবং বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বসতে দেবেন কোথায় সেই সমস্যা। নিজের কাঁধের ময়লা গামছাটা দিয়ে নিজের খাটিয়াটাই ঝেড়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে বললেন, 'এর মধ্যেই যা হয় ক'রে বসুন বাবা।'

'ওকি, আমাকে আপনি-আজ্ঞে করছেন কেন?'

'না, মানে অব্যেস তো নেই। ওসব কবে ভুলে গেছি। বাংলা কথাই ভুলতে বসেছি। এখানে ঐ দু-একজন যা বাঙালী আছেন, মধ্যে মধ্যে কদাচিৎ দেখা হয়, তাই দুটো-চারটে কথা—'

অনন্তর আসার উদ্দেশ্য ও এই রহস্য উন্মোচনের অনুরোধটা শুনে অনেক-ক্ষণ মৌন হয়ে রইলেন বৃদ্ধ। বেশ একটু যে লজ্জিতও হলেন তাতে সন্দেহ নেই।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'বলছি বাবা, সবই খুলে বলছি। না,

আমার বা তোমাদের সত্যিকারের লজ্জা পাবার মতো কিছু করি নি। প্রথম এসে দেবপ্রয়াগে নেমে কদিনের আড্ডা গেড়েছিলাম প্রধানত তুই কারণে। কাকে গুরু করব, কোথায় গেলে সৎ গুরুর সন্ধান পাব—তারই খোঁজ করা, আর নিজের মনটাও একটু ভাল ক'রে থিতিয়ে দেখা। ঝোঁকের মাথায় যা ঠিক করেছি তা সত্য কিনা। সত্যিই কি আমার মনে তেমন তীব্র বৈরাগ্য দেখা দিয়েছে ? সেই অবসরে যে মহামায়া আমাকে নিয়ে এই খেলা খেলবেন তা ভাবি নি।

'আমি একটা বাড়ির ওপরের চিলেকোঠার ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম। নিচে অলকানন্দার জল দেখা যেত, দূরে পাহাড়, নির্জনে চিন্তা করার মতোই স্থান। কিন্তু সে বাড়িতে আরও ভাড়াটে ছিল। প্রত্যহই রাত্রে ১০টা নাগাদ একটা গোলমাল শোনা যেত। কে যেন কাকে মারধোর করছে, সেই সঙ্গে মেয়ে-গলার কান্না। তু'তিন দিন পরপর এই চেঁচামেচি শুনে বাড়িওলাকে জিজ্ঞাসা করি, সে বলে ও এক পাণ্ডাই। এককালে পয়সাকড়ি ছিল এখন মদে আর জুয়াতে সর্বস্বান্ত। কী বলব বাবুজী, ব্রাহ্মণের কলঙ্ক—ও এখন মেয়েটাকে ভাড়া খাটাতে চায়। স্ত্রী আর মেয়ে বাধা দেয় বলে তাদের ঐ রকম অমানুষিক মারধোর করে। বলি, তা তোমরা শাসন করতে পার না ? সে বলে, বাবু ওর সঙ্গে পুলিস দারোগার ষড় আছে—আসলে সেই ঘরে আসতে চায়—ওকে কে ঘাঁটাবে ?

'মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল বাবা। তবু আর একটা দিন ঐভাবে কাটল। সন্ধ্যের একটু আগে দেখি এক ভদ্রমহিলা একটি যুবতী মেয়েকে নিয়ে হুড়মুড় ক'রে আমার ঘরে ঢুকে পড়ে যেন পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল। বললে, বাবুজী ব্রাহ্মণের কুমারী মেয়ে, একে ঐ রাক্ষসটা এক ছোট জাতের ডাকাতের কাছে সাতশ' টাকায় বিক্রী ক'রে দেবে বলে ঠিক করে এসেছে। মেয়ে কি বলতে গিছল। ঐ দেখুন গরম লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিয়েছে বাবু !

'বাবা, সে অনেক কাণ্ড, সব কথা আজ আর মনেও নেই, বলতেও পারব না। কিন্তু আমার মনে হল ভগবানই এই পথ দেখিয়ে দিলেন। 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর' স্বামীজীর কথাও মনে হ'ল।

আসার সময় কিছু টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলাম—৭০০ টাকা গুণে দিয়ে একরার-নামা লিখিয়ে নিলাম লোকটার কাছ থেকে। কিন্তু তারপর আর এ জঁাতাকল থেকে নিস্তার পেলুম না। পাড়ার লোক হৈ-হৈ ক'রে এসে পড়ে গলায় মালা দিয়ে কাঁধে ক'রে নগরভ্রমণ করল, আমি যে দেবতা তা আর কারও জানতে বাকি রইল না। ফলে পরের দিনই গুরুর আসনে বসতেও হ'ল—এবং বৈদিক মন্ত্র পড়ে বিয়েও করতে হ'ল, আর তার ফলে রোজগারের চেষ্টাও।'

এতক্ষণে অনন্ত কথা বলার অবসর পেল।

'কিন্তু এটা? এখানে?'

'সেও ভাগ্য। ইতিমধ্যে আমার দীক্ষা হয়েছে, সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় লাভ হয়েছে—তাঁর চরণেই চলেছি, অন্তত বাকি কটা দিন যা পারি একটু ভগবানের নাম নিয়ে কাটাব। কিন্তু এখানে এসে এই ফ্যাঁসাদ। এই মহিলা আমার গুরুভগ্নী। গুরু আদেশ দিলেন, তিনি অন্তর্যামী, আমি আসছি মনে মনে জেনে নিজেই এখানে এসে আদেশ দিলেন, তোমার কর্ম এখনও কাটে নি, তোমাকে এই কর্মসন্ন্যাস দিলাম, এই মহিলা আমার শিষ্যা—সন্ন্যাস নেন নি, কিন্তু দীর্ঘকাল যতটা সম্ভব—মানুষের সেবা ক'রে গেছেন। এককালে বিপুল সম্পত্তি ছিল, সব দান ক'রে আজ নিঃস্ব। সম্প্রতি একটা স্ট্রোক হয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তুমি এঁর সেবা করো—এ-ই তোমার সন্ন্যাস। ধনীভাবে নয়, এই সামান্য দুধের ব্যবসাতেই তোমাদের চলে যাবে। যাতে যায়, আমি সেদিকে লক্ষ্য রাখব।...এই বলে তিনিই হোম ক'রে বৈদিক মন্ত্র পড়ে আমাদের একটা বিবাহও দিয়ে দিলেন। সেই থেকে বাবা এ-ই করছি। তবে তাতে দুঃখ নেই। তোমার এই শয্যাশায়িনী রুগ্‌নো জ্যাঠাইমা বহু শাস্ত্র পড়েছেন, উপলব্ধি করেছেন—তিনি আমাকে সেই পথের সন্ধান দিচ্ছেন, আমি খুব আনন্দে আছি। এর সেবা করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।'

অনন্ত হেঁট হয়ে দুজনকেই প্রণাম করল আর একদফা।

গত রাত্রে দেবপ্রয়াগের সংসার দেখে যেটুকু হতাশা ও ক্ষোভের মেঘ দেখা দিয়েছিল মনে—তা নিঃশেষে উড়ে গেল।

অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা

কয়েক বছর আগের কথা। ঘটনাচক্রে উত্তর ভারতের এক মাঝারি শহরে গিয়ে পড়ে এক মন্দিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

সেটা একটা কি মেলার সময়, বহু যাত্রী সমাগম হয়েছে। শহরে হোটেল বা ধর্মশালার সংখ্যা খুব বেশী নয়, যা ছিল তা সবই ভরে আছে, ধর্মশালা-গুলির উঠান ও বারান্দাও খালি নেই, থৈ থৈ করছে লোক।

এটা অত খেয়াল করি নি আসবার আগে। বা জানতুম না। অসহায় ভাবে এক হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, রিক্শায় বিছানা স্যুটকেশ নিয়ে— আর ভাবছি স্টেশনেই ফিরে যাবো কিনা, দারোয়ানটি দয়া-পরবশ হয়ে বলল, 'বাবুজী এই পাড়াতেই এক মন্দির আছে, তাদের একটা অতিথিশালাও আছে, সামান্য কিছু দিলেই তারা থাকতে দেয়।'

শুধু তাই নয়, সে রিক্শাওলাকে ডেকে মন্দিরের ঠিকানাটাও বুঝিয়ে দিলে।

মন্দিরে ঢুকতেই এক সৌম্যমূর্তি বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। দাঁড়িতে গোঁফেতে এবং চেহারায়—ভদ্রলোক বয়সকালে রূপবান ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই—বেশ ঋষি ঋষি দেখাচ্ছে।

আন্দাজে বোধ হ'ল তিনিই পূজারী হবেন। তাঁকে বললাম সমস্যাটা। তিনি সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ আছে—অতিথিশালাটালা কিছু নয়, উৎসব-টুৎসবে ভলান্টিয়াররা থাকে, অন্য সময় কেউ আশ্রয়প্রার্থী হ'লে থাকতে দেওয়া হয়। প্রণামীও সামান্য, দৈনিক তিন টাকা। তবে কল পাইখানা একটাই, ঘরে কোন আলাদা ব্যবস্থা নেই। খাটিয়াও আছে দু'-খানা করে—কিন্তু সে তো ছেক্রেটারী বাবুর পারমিছান ছাড়া দেওয়া যাবে না।

'তা তিনি থাকেন কোথায়?' প্রশ্ন করি। একটু যা আশার আলো দেখছিলাম তাও শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

'থাকেন বাবু তিনি সেই চক বাজারে, তাঁর ওখানে গরম কাপড়ের কারবার। তবে আজ আবার তো তাঁর জয়পুরে মেয়ের বাড়ি যাওয়ার কথা—'

আর বৃথা বাক্যব্যয় না ক'রে য়্যাবাউট্ টার্ন করলাম—রিক্শাওলার মূর্তি খুবই উগ্র হয়ে উঠেছে, উগ্রতর ক'রে লাভ কি ?' কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে অকস্মাৎ যেন দেবী বিপত্তারিণীর আবির্ভাব ঘটল—মূল মন্দিরের মধ্য থেকে।

আমি তো তখন সেদিকে পিছন ফিরেছি, তীক্ষ্ণ মধুর কণ্ঠস্বরই কানে গেল, 'আপনার কি ভীমরতি ধরেছে নাকি। দেখছেন, ভদ্রলোকের ছেলে সব জাগা ঘুরে এখানে এসেছেন, মন্দিরেও যদি আছ্রয় না পান তো যাবেন কোথায়। ঘুরে ঘুরে কেলান্ত—সে তো দেখাই যাচ্ছে। ছেক্রেটারী না থাকলে পূজারী কেউকে আছ্রয় দিতে পারবেন না, এ আবার কেমন কথা!'

ঋষি একটু ভয়ে ভয়ে বলতে গেলেন, 'পরে যদি কথা ওঠে ?'

'কি করবেন ? আমাদের কাঁচা মাথা কেটে নেবেন ? আর তিনি কিছু বলেন সে আমি বুঝব। যা বলার সে তো চিরকাল আমিই বলি, আপনে আর কোন্ কালে কি করেছেন শুনি!...না, বাবা, আপনে রিক্শাওলাকে ছেড়ে দেন, বলেন মাল দুটো ওদিকের বারান্দায় রেখে চলে যেতে, আমি ঘর খুলে দিচ্ছি।'

ততক্ষণে ফিরেছি বৈকি।

অপরাহ্ণের আলো ম্লান হয়ে এলেও একেবারে মুছে যায় নি, তাছাড়া নাটমন্দিরও খোলা এবং বিরাট, সেখানে সহজে অন্ধকার নামে না। দেখলাম মধ্যবয়সী মাঝারি গড়নের শ্যামাঙ্গী একটি মহিলা, বয়স কত তা আন্দাজ করা শক্ত, কিন্তু বর্ণ যাই হোক ভদ্রমহিলার মুখ-চোখ-ললাটের সুডৌল গঠনে অনায়াসে সুন্দরী বলা যায়। বয়সও মনে হ'ল যা, যত বেশীই হোক, ঠাকুর-মশাইয়ের থেকে ঢের ছোট।

উনি কিন্তু কথাগুলো বলেই কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং প্রায় মিনিট খানেকের মধ্যেই একটা চাবি ও ঝাড়ু হাতে দেখা দিলেন। একটা ঘরের চাবি খুলে রিক্শাওলাকে এক ধমক দিয়ে মালগুলো তাকে দিয়েই ঘরে তুলিয়ে আমাকে কোনরকম বাধা দেবার অবসর মাত্র না দিয়ে ঘরটা চলনসই গোছের পরিষ্কার করে দিলেন।

তারপর বললেন, 'বাবা, এই মন্দিরের বাইরের ঐ যে বস্তি দেখছেন ওখান থেকে আমি একটা ছোঁড়াকে ডেকে দিচ্ছি, সে এসে ঘরটা মুছে দিক, যদি

জামাটামা কিছু কাচবার থাকে কাচিয়ে নেবেন, তাকে চার আনা পয়সা দিয়ে দেবেন, বেশী দেবেন না। রেট খারাপ করা ঠিক না।'

এবং—আবার চোখের নিমেষেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তাই হ'ল। যেন মন্ত্রবলে একটি ছেলে কোথা থেকে বালতি ন্যাতা সংগ্রহ করে এনে ঘর মুছে, আমার গেঞ্জি প্রভৃতি দু-একটা জিনিস কেচে দিয়ে চলে গেল। চার আনা পয়সা দিতেও কোন উচ্চবাচ্য করল না।

আর ঠিক তেমনি ভাবেই, ভোজবাজির মতোই, বোধহয় বাইরের কোন দোকান থেকে, এক অপরিসীম নোংরা জামা পরা ছেলে এসে এক কাপ চা ও দুখানা বিস্কুট রেখে চলে গেল। বলে গেল, 'ফিন আকর কাপ লে জায়েঙ্গে, আট আনা।'

কৃতজ্ঞ হলুম বৈকি। তখন সত্যিই প্রাণটা টা-টা করছিল। আর এই সঙ্গেই বুঝলুম মহিলার শাসন এ মন্দিরের মধ্যেই শুধু নয়, বাইরেও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত—কেউ বেশী পয়সা নিতে কিংবা ওঁর হুকুম অমান্য করতে সাহস করে না।

কারণটা অবশ্য পরে শুনেছিলুম পূজারা মশাইয়ের কাছে। মহিলার একটু হোমিওপ্যাথী চিকিৎসাও আসে, এদের সকলেরই ওঁকে দরকার হয় মাঝে মাঝেই।

আবার ওঁর দেখা পেলাম আধঘণ্টার মধ্যেই।

আমি তখন সবে মুখ হাত ধুয়ে বিছানা বিছিয়ে শুয়েছি একটু, দোরের বাইরে ছায়া পড়ল।

'বাবা, রাত্রে আহারের কি করছেন?'

'আজ্ঞে কিছুই তো ঠিক করি নি। কাছাকাছি হোটেল-টোটেল কিছু আছে? কিম্বা পুরী-টুরীর দোকান? অবশ্য একটা ডবলরুটি হ'লেও চলে যাবে—'

'তার দরকার হবে না। দিনমান হ'লে প্রসাদই দিতে পারতাম। রাত্রে তো শীতলের ব্যবস্থা—দুধ আর মিষ্টি—এর মধ্যে এতগুলি দেবতা বাবা, এত লুচি ভাজা সম্ভব নয়। মূল মন্দির দেখছেন রাধাকৃষ্ণের, তার পাশে পাশে তো

আছেন অনেকগুলি, গণেশ আছেন, শীতলা আছেন, মনসা আছেন, শনি আছেন, পাশের ঐ ঘরে মা কালীও আছেন। মানে বাঙ্গালীদের যা দরকার। সকালে ভোগ হয়, আটজনের। এ মন্দির এখানের এক ভদ্রলোক বানিয়েছিলেন, মূল মন্দির, এখন স্থানীয় বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা, দু-একজন মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীও আছেন—টাকা তাদেরই বেশী—উদ্যোগী হয়ে একটা সমিতি করেছেন, তাঁরাই চালান।'

তারপর একটু থেমে যেন দম নিয়ে বলেন, 'আমরা পাই বাবা মাসে চারশোটি টাকা। আগে ছিল সাড়ে তিনশো, অনেক ধরপাকড় ক'রে চারশোয় দাঁড়িয়েছে। ঠাকুর মশাইয়ের পারিশ্রমিক বলেন পারিশ্রমিক, ভোগের খরচা বলেন ভোগের খরচাও। বিধিমতো ভোগ পূজা হবে কোথা থেকে? ফুল চন্দন থেকে শুরু ক'রে—ভোগ শীতল সবই ওর মধ্যে। কাঠ কয়লা ঘুঁটে, কেরোচিন তেল—সবই তো আছে।'

'এঁরা আর কিছু দেন না?'

'দেন, মিথ্যে কথা বলব না—ভগবানের সেবা ক'রে যাচ্ছি। দুর্গাপূজা কি মনসা শীতলার পূজায় যে বিশেষ প্রণামী পড়ে—সমিতি তা নেয়। নিত্য যা প্রণামী পড়ে তার টাকা পিছু শতকরা দশ পয়সা আমাদের। আর বছরে চারখানা শাড়ি, দু-তিনখানা ধুতি। পড়ে অনেক, ওঁরা বিক্রী করেন সেগুলি। তবে হ্যাঁ, ওঁদেরও তো খরচা কম না। একটা ঝিয়ের মাইনেও দেন, ঠিকে ঝি, মাসে অর্ধেক দিন কামাই—বাসনের স্তূপ পড়ে, ভোগরান্নার বাসন তো রাখা যায় না—সেসব আমাকেই করতে হয়, তা থেকে মন্দির মার্জনা, পূজার যোগাড় সবই তো আছে, তা, ঐ যা বলছিলাম, নিজেরা যা খাই, তাই ঐ ভোগ দিয়ে খাওয়া। মা কালীর মাছ মাংস ভোগ দেওয়ার কথা, কোন ভক্ত যদি কখনও সিধা আর মাছ পাঠান, প্রসাদ পাবেন বলে—তখনই মাছ রাঁধা হয়, আমাদেরও মুখে পড়ে। শীতলে আর বিশেষ কিছু হয়ে ওঠে না, অনেক ভক্ত আসেন আরতির সময় মিষ্টি হাতে ক'রে—এক মহাজন তাঁর গরুর দুধ পাঠান কিছু—তাতেই ঐ শীতল চলে যায়।'

'তবে আমাকে আর কি দেবেন?' আমি বাধা দিয়ে বলি, 'অবশ্য মিষ্টি-টিষ্টি খেয়েও রাতটা চলে যেতে পারে—'

'না না, বাবা তার দরকার হবে না। আমরা তো রাতে খাই, রুটিই ক'রে নি কিংবা একটু ভাতও। আমরা বাঙাল তো—। আপনে একটু কষ্ট করে তাই খাবেন। কাল দিনমানে প্রসাদ দিতে পারব। দেওয়া তো উচিত, মন্দিরে যাঁরা থাকবেন—তাঁদের দেওয়া উচিত, কিন্তু বাবা পয়সাতেও কুলায় না, শরীলেও না। সাহায্য করার তো কেউ নাই। আর পয়সা নিয়ে প্রসাদ দেওয়া সে বড় খারাপ লাগে। হোটেল চালাচ্ছি বলে বোধহয়। দু-একবার দু-একজনের পীড়াপীড়িতে তাও করেছি—তাঁরা কিন্তু দুটা টাকা দিয়ে যেন মাথা কিনে নেন—চাকরবাকরের মতো আচরণ করেন। তবে আপনার কথা আলাদা, একা এসেছেন অসহায়—'

আর দাঁড়ালেন না তিনি। আরতির সময় হ'ল বলে চলে গেলেন।

রাত্রে আরতির সময় গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখলাম অনেক ভক্তই আসেন। বাঙালী অবাঙালী সমানভাবে। মিষ্টির বাক্সও পড়ে অনেক। তবে ভদ্র-মহিলা কিছু রাত্রের জন্য সরিয়ে রেখে বাকী তখনই প্রসাদ করিয়ে হাতে হাতে সকল দর্শনার্থীকেই কিছু কিছু দিয়ে দেন। মনে মনে এই ব্যবসার বুদ্ধির তারিফ করলাম। বাড়তি প্রসাদ, হালওয়াইয়ের দোকানে বিক্রী করলে আর কত হ'ত। এই ভাবে সকলে কিছু কিছু প্রসাদ পান বলে মিষ্টি আনারও উৎসাহ বাড়ে।

আরতি ও শীতলের পর্ব প্রায় একসঙ্গেই চুকে যায়। তারপর ঠাকুরমশাই বসে কিছুক্ষণ সমাগত ভক্ত—যাঁরা শুনতে চান—তাঁদের কিছু কিছু সৎকথা শোনান। লক্ষ্য ক'রে দেখলাম—বাড়ি ওঁদের পূর্ববঙ্গে সে তো বোঝাই যাচ্ছে, দীর্ঘদিন এদিকে থাকার ফলে সে টান বা বাঁকা উচ্চারণ অনেকটা শুধরে নিয়েছেন, তবে এখনও দু-একটা শব্দে ধরা পড়ে যায়।

শয়ন আরতি শেষ হল রাত সাড়ে আটটা নাগাদ—আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রমহিলা দেখা দিলেন, থালায় পরিপাটি সাজানো এবং একটি ঝকঝকে বড় কাঁসি চাপা দেওয়া অন্নব্যঞ্জন নিয়ে। দেখলাম, পিছনে, সম্ভবত ওঁরই মেয়ে —সুশ্রী আঠারো-উনিশ বছরের ম্যাক্সিপরা একটি তরুণীর হাতে আসন, একটা জলের জাগ ও একটি গ্লাস।

ঢাকা খুলতে মনটা খুশীতে ভরে গেল, ফুলফুলে মল্লিকা ফুলের মতো ভাত, দু-তিন রকমের ব্যঞ্জন। অল্প একটু দুধ আর একটি বরফিও দিতে ভুল হয় নি।

মেয়েটি আসন পেতে দিয়ে যেন একটু বিরক্ত মুখেই চলে গেল, উনি থালা ধরে দিয়ে সেখানে উবু হয়ে বসলেন, 'খেতে বসেন বাবা, আর কি লাগে না লাগে একটু দেখে যাই।'

'না না, আপনি নিজে, ছি ছি! আমাকে বললে আমিই যেতাম—কেন এত কষ্ট ক'রে এলেন—'

'তাতে কি হয়েছে বাবা, আপনি আমার থেকে হয়ত বয়স্কই হবেন, তবে আমি শ্যামসুন্দরের সেবিকা, আমার সন্তানতুল্য। তায় অতিথি। নেন, বসেন।' বসলাম অবশ্য তখনই, শুরু ক'রে আরও অবাক, এত সুস্বাদু রান্না বহুকাল খাই নি। বললাম সে কথাও।

উনি অবশ্য অযথা বিনয় করলেন না।

'তা বাবা একথা অনেকেই বলেন, আমি কিন্তু কিছুই জানতাম না, আদরের মেয়ে আদরের বৌ ছিলাম, এই পাটিছনে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। এঁরা ছিলেন গুরু বংশ, তাই রক্ষা, এসে এক শিষ্যবাড়ি উঠলাম। অন্য কিছু আনার চেষ্টা করি নি বাবা, গহনা দু-একখানা এনেছিলাম। শিষ্যদেরও তো তখন অবস্থা ভাল না—কত আর অত্যাচার করব। শেষ অবধি কৃষ্ণনগরে এক ঘর ভাড়া ক'রে এসে উঠলাম। এই যে ঠাকুরমশাই দেখছেন—আমার শ্বশুরের এক ছেলে, আদরে মানুষ, কিছুই জানতেন না। আমি দেখলাম—তখন আমার দুটি ছেলে হয়ে গেছে—কিছু না করলে চলবে না, আমিই পুরোহিত দর্পণ কিনে দিয়ে পূজার মন্ত্র মুখস্থ করিয়েছি, যেমন ছোট ছেলেকে পড়ায় তেমনি করে। আর সত্য কথা বলতে কি বাবা, উনি শেখার আগে আমিই শিখে গেছি। এখনও কোন্‌টার পর কি, পূজা আরতির ব্যাপারে—সব মনে থাকে না ওঁর, আমাকেই পর পর মনে করিয়ে দিতে হয়, হাতের কাছে যুগিয়ে দিতে হয়।'

'ও তাই,' আমি বলি, 'দেখলাম বটে আপনি আরতি শীতলের সময় সব হাতে হাতে তুলে দিচ্ছেন, আমি ভাবলাম ওঁর কোমরে কি হাতে ব্যথা—'

'না বাবা। উনি অবশ্য বলেন, না। কিন্তু, পাছে সকলের সামনে কিছু ভুলে ক'রে বসেন—তাই সাবধান থাকি। জানেন, করেনও—তবে বাবা বড় অন্যমনস্ক, বড় ভুলো—আসলে কথা কি, একটু উদাসীনও—। পুঁথিপত্র পড়েছেন অনেক, ভক্তদের যখন উপদেশ দেন তখন অন্য মানুষ, কিন্তু পূজার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেন নি এখনও মনে মনে। এটা ওঁর বংশের অপমান মনে করেন।'

ততক্ষণে আমার খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে।

উনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'সে কি আর দুটো-কটা ভাত আনি বাবা, আর একটু কিছু—'

'না না। আর পেটে ধরবে না। নইলে এমন সুখাদ্য সব, ছেড়ে দিতাম না।'

'আর সুখাদ্য! জিনিস কই বাবা, পয়সা কই! রান্নাও জানতাম না। সবই নিজে শিখেছি। আসলে কথা কি জানেন বাবা—যার নিজের জিব্‌ভার তার আছে, সেই ভাল রাঁধতে পারে। তা শিখে কি হবে বলুন, নানা পদ রাঁধব সে উপায় তো শ্যামসুন্দর রাখেন নি।'

আমার কোনো বাধা না মেনে নিজেই বাসন সব গুছিয়ে নিয়ে চলে গেলেন।

মনে হ'ল রান্নার প্রশংসায় খুবই খুশী হয়েছেন ভদ্রমহিলা। ভোরবেলাতেই —সেই ময়লা জামা পরা ছোকরা নয়—কালকের সেই মেয়েটিই বড় একটা গ্লাসে চা, আর বোধহয় রাত্রে কোন ভক্ত বালুশাহী এনেছিলেন, তাই দুখানা এনে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে চলে যাবার উপক্রম করল। মুখ বিরক্তিতে ভরা। কিন্তু অত সহজে আমি ছাড়লুম না। প্রায় পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললুম, 'কেন আমার অপরাধ এমন ক'রে বাড়াচ্ছেন! আমিই যেতাম ওখানে।'

'ওখানে বসে চা খাবার জায়গা নেই।'

শুষ্ক রসকষহীন উত্তর।

'তা এর প্রয়োজন কি। আমি দোকানেই খেয়ে আসতে পারি—'

'সে ওঁকে বলুন গে। আমার মাকে। আমাকে যা হুকুম করেছেন আমাকে তো তা করতে হবে।'

সে আর দাঁড়াল না। একরকম ঠেলেই বেরিয়ে গেল।

আমি চা খেয়ে গ্লাস ডিস ধুয়ে পৌঁছে দেবার অছিলায় একেবারে ওঁদের কোয়ার্টারের (মন্দির সংলগ্ন দুটি ঘর, একটু দালান মতো আর রান্নাঘর) দোরে গিয়ে হাজির হলুম।

দেখলুম ভদ্রমহিলা রোয়াকের ধারে একরাশ বাসন, মায় কড়া হাঁড়ি নিয়ে মাজতে বসেছেন।

অর্থাৎ ঝি আসে নি।

'আপনে আবার এলেন কেন বাবা, আমার মেয়েই নিয়ে আসত। এখানে দাঁড়াবার মতোও জাগা নাই। ঐখানেই রাখেন। এদিকে আর আসতে হবে না।'

আমি বললাম, 'আজ মাহারিন আসে নি বুঝি। আপনি তাই বলে আর দুপুরে কিছু করার চেষ্টা করবেন না, আমি একটু বেরোব, অমনি কোথাও থেকে—'

'ছি বাবা। আপনে এত ছেলেমানুষ কেন এই বয়সেও। এতগুলি দেবতার ভোগ—এ তো রাঁধতেই হবে। ছেলেমেয়ে সংসার স্বামী—এদেরও তো অভুক্ত রাখা চলবে না—আপনাকে দু'মুঠো প্রসাদ দিতে আমি মরে যাবো? ঈছপের গল্প মনে করুন না, পড়েন নি? ষাঁড়ের শিং-এ মশা বসার কথা? যান যান—কাজ সেরে আসেন গা—বারোটার মধ্যে পৌঁছবেন কিন্তু।'

দুপুরে খাবার দিতে এলে ওঁর সংসারের কথাটাই পাড়লাম।

'আপনার কি ঐ একটি মেয়ে? এক সন্তান?'

'ষাইট ষাইট! আমার তিনটি ছেলে দুটি মেয়ে। বড় মেয়েই আমার দ্বিতীয় সন্তান, তার বিবাহ এই শ্যামসুন্দরই দিয়েছেন বলতে গেলে। কোথা থেকে পাত্র এল, টাকার যোগাড় হ'ল, কিছুই জানি না। বিবাহ ভালই হয়েছে বাবা, জামাই দিল্লীতে কাজ করে, অফিছার। তবে সে বড় আসে না, মেয়েকেও আসতে দেয় না। বলে ঐ তো ওঁদের জাগা, আর মায়েরও বড় কষ্ট হয়, এত ঝঞ্ঝাট চাপলে—। তবে আসে, পূজার পর এসে দেখা ক'রে যায়

—ছুদিনের জন্য···না বাবা। অশান্তি অনন্তর। বড় ছেলেটা বাবা—বি. এ. পাছ করল, কাজ-কামের চেষ্টা দেখবে—না সে ঐ যে কি বলে হিপি না কি, তাই হয়ে গেল। কোথায় থাকে কি করে কিছুই জানি না। কাদের সঙ্গে মেশে, তাও না। মাঝে মাঝে আসে, মড়ার মতো হয়ে—দাড়ি গোঁফ একরাশ চুলে জটা, ময়লা কাপড় জামা—নেশায় বুঁদ হয়ে আসে, তিন-দিন ছুইদিন ধরে ঘুমোয়, তারপর উঠে জোর ক'রে কিছু টাকা নিয়ে আবার সরে পড়ে।'

'ঠাকুর মশাই কিছু বলেন না ?'

'বলেন না! খুবই বলেন। তবে বলেন আমাকেই। বলেন, খেতে দেবে না, তাড়িয়ে দেবে, পুলিশ ডাকবে। আমি কি পারি, বলেন বাবা, জ্যেষ্ঠ সন্তান। বড় আশার বড় আদরের ছেলে।'

'তার পরেরটি ?'

'সে লেখাপড়া বিশেষ শেখে নি। ছোটবেলা থেকে রোগে ভুগে মাথাটা বড় ছুর্বল। বলেছিলাম বাবার সঙ্গে থাক, পূজার কাজ শেখ্। সে রাজী না। এখানে এক ভদ্রলোক একটা ওষুধের দোকানে কাজ ক'রে দিয়েছেন। সকালে কিছু খেয়ে বেরিয়ে যায়, ছুপুরে তাঁরাই কি টিফিন দেন—রাত্রে আসে মড়ার মতো—ছুটো খেয়েই শুয়ে পড়ে। আমাদের সঙ্গে কথাই হয় না বলতে গেলে। মাসে একশোটি টাকা পায়—সে ওর জামাকাপড়েই চলে যায়। তাছাড়া পান সিগারেট তো আছেই। মালিক বলেছে ইন্‌জেকছন্ দেওয়ার কাজ শিখিয়ে দেবে, তাতে দৈনিক চার-পাঁচ টাকা রোজগার হবে।'

'আর ছোট ছেলেটি ?'

প্রশ্ন ক'রে ফেলেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। ভদ্রমহিলার ছুই চোখ জলে ভরে এল।

বললেন, 'বাবা, সেই বোধহয় ভাইগ্যের চরম মার আমার উপর। সে ছেলে আমার গর্ভের সেরা সন্তান, নাম ছিল আলো—বংশ আলো করা ছেলে। যেমন রূপ তেমনি সৎ স্বভাব, তেমনি বুদ্ধি। তেমনি লেখাপড়াতেও। ক্লাছে কখনও সেকেন হয় নি। ভাল ক'রে পড়াব বলে কইলকাতায় রেখেছিলাম এনাদের এক শিষ্যবাড়ি, বরানগরে। তাঁরাও ব্রাহ্মণ। ভদ্রলোক। তাও

গলগ্রহ করি নি। মাসে মাসে টাকা পাঠিয়েছি যতটা পারি। ইছকুল ফাইনালে জলপানি পেয়েছিল। কী যে হ'ল বাবা—কাদের পাল্লায় পড়ল, কী করল তা জানি না—একদিন একদল ছেলে গিয়ে জোর ক'রে কোথায় ধরে নিয়ে গেল। পরের দিন নালার ধারে পাওয়া গেল—ছুরি, গুলি কিছু মারতে বাকি ছিল না।' হু হু ক'রে কেঁদে উঠলেন ভদ্রমহিলা।

তার মধ্যেই বাসনগুলো নিয়ে প্রায় ছুটে চলে গেলেন।

আবার এলেন বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ—এক গ্লাস চা নিয়ে।

আমি শোকের প্রসঙ্গ আর তুলতে না দিয়ে অন্য কথাই পাড়লুম। হয়ত একটু রাগও ছিল, সকালের ব্যবহারে বললুম, 'তা আপনার ঐ মেয়েটি তো বাড়িতেই থাকে, সে আপনাকে একটু সাহায্য করে না কেন?'

'না বাবা, ঠিক বাড়িতে যে বসে আছে তা নয়। এবার ইছকুল ফাইনাল দেবে। পড়া শুরু করতেই দেরি হয়ে গেছে। বেশী বয়সে দেবে। ওর এই সতেরো বছর চলছে। এ বয়সে কেলাস টেন—একটু বেশীই শোনাবে। তবে সে দোষ আমাদের, ঠিক সময়ে ভর্তি করা যায় নি। এ যে দেখছেন—ইছকুলে ওদের কি সব গণ্ডগোল চলছে—কদিন বন্ধ।'

'তবু কিছু কি আর করতে পারে না তাই?'

'পারে বৈকি, পারে।' মহিলাও সায় দিলেন কিন্তু তারপরই কেমন যেন স্থির চোখে আমার দিকে চেয়ে নীরব হয়ে গেলেন। বোধ হ'ল আমার মনের ভেতরটা বুঝতে চাইছেন। অর্থাৎ আমি কেমন লোক!

সেটা প্রমাণ হ'ল পরে আবার কথা শুরু করতেই। বললেন, 'তা বাবা একটা কথা আপনাকে খুলেই বলি। লজ্জার কথা—সকলকে বলা যায় না। লজ্জাই অবশ্য, কোন কলঙ্কের কথা কিছু না। আপনারে বলেছি বাপের আদুরে মেয়ে ছিলাম। আমার বাবাও পণ্ডিত ছিলেন, মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত কলেজে ডাক পড়ত। একবার, তখন আমার নয় দশ বছর বয়স—আমাকে আর মাকে নিয়ে কইলকাতা এসেছিলেন। সেই সময়ই, তার মধ্যেই দুই দিন থিয়েটার, দুই দিন ছিনেমাও দেখিয়েছিলেন। সেই প্রথম এ জিনিস দেখা আমার। সে যে বাবা কি হ'ল আমার মনে, কি বলব। কেবলই মনে হ'তে

লাগল, আমার মধ্যেও অভিনয় করার শক্তি আছে। ভগবান আমাকে এই জন্যেই পাঠিয়েছেন। বিশেষ যখন শুনলাম ছিনেমার নটীরা হাজার হাজার টাকা পায়—তখন থেকে আমার ওই ধ্যানজ্ঞান হ'ল।

'আমি যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলাম বাবা, দিনরাতে ফাঁক পেলেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করার অভ্যাস করতাম। শুধু যে দেখা বইগুলো তাই নয়। এদিক ওদিক থেকে নাটক চেয়ে এনে পড়ি আর তার মেয়েদের পাটগুলা করার চেষ্টা করি।

'তারপর বাবা, বোঝেনই তো। বিয়া—কি বলে বিবাহ হ'ল। আমার থেকে ঠাকুরমশাই বয়সে খুব বড় না, তবে বরাবরই রাশভারি, গম্ভীর। তিনি এসব পছন্দ করেন না। কোনদিন সঙ্গে ক'রে কোন থিয়েটার ছিনেমায় নিয়ে যান নি। তাছাড়া—এই তো জীবন দেখছেন, লণ্ডভণ্ড, যা কিছু সাধ কিছুই মিটল না। ভাল ছেলেটা চলে গেল, বাকী দুটো তো বাজে খরচ। বড় মেয়েটার বিবাহ দিছি, ও বড় সংসারী সেই বাইল্যকাল থেকেই। এই ছোট মেয়েটাই একটু ছৌখীন, সাজপোশাক ভালবাসে—লুকিয়ে ছিনেমাতে যায়—পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে, ইছকুলে আব্‌বৃত্তি ক'রে পেরাইজ পেয়েছে দু-তিনবার। এখানে বাঙালীরা থিয়েটার করে—ওকে পাট দিতে চেয়েছিল, ঠাকুরমশাই রাজী হয় নি। তা বাবা উনি ঘুমোলে গিয়ে একটা ছোট পাট করে এসেছিল। ভালই করেছিল।

'সেই আমার বড় সাধ বাবা। এই গোপন কথাটা আপনাকে বললাম, তাই ওরে আগুনের ধারে যেতে দিই না, বাসন মাজা ঘর মোছা এসব কাজ করতে দিই না। তবে বোনা সেলাই এসব পারে, করেও। বুনেও দু-এক টাকা রোজগারও করে মধ্যে মধ্যে। মনে মনে ইচ্ছা, কোন সুযোগে ওকে ঐ লাইনে দেব, কিংবা এমন ছেলে যদি পাই যার এই শখ্‌ আছে—তার সঙ্গে বিয়া দেব। আমার যে সাধ মেটে নি, মিটল না, ওর যেন মেটে।'

'আপনি তো শুনেছি ভাল গাইতেও পারেন।'

'সেও তো বাবা ঐ শুনে শুনে যা শিখেছি—ভজন কীর্তন শ্যামাছঙ্গীত। শিখলে আমার নাম হত বাবা, এটা অহঙ্কার না, সইত্য কথাই বলছি।'

তখনকার মতো চলে গেলেন। কিন্তু সেই দিনই সন্ধ্যায় আরতির পর

উনি মন্দিরের এক কোণে বসে চোখ বুজে গান ধরলেন। পর পর ক'টি ভজন, শ্যামাসঙ্গীতও। দেখলাম সত্যই অহঙ্কার নয়—অপূর্ব গলা এবং নিখুঁত সুরজ্ঞান।

পরের দিনই ওখান থেকে চলে আসতে হ'ল। আর গান শোনা হয়ে উঠল না। ওঁকে ব্যক্তিগতভাবে ত্রিশটি টাকা প্রণামী দিতে গেলাম, উনি জিভ কেটে পিছিয়ে গেলেন। 'যদি দিতে হয় আপনাদের ঠাকুরমশাইকেই দেন।'

তাই দিলাম। ঠাকুরমশাই অনুগ্রহ করে তা গ্রহণও করলেন।

এর পর ঘুরতে ঘুরতে একেবারে গত বছর দু'দিনের জন্যে ওখানে গিয়ে পড়েছিলাম আবার।

দেখলাম সব ঠিক তেমনিই আছে, কেবল ভদ্রমহিলাটিকেই বড় অবসন্ন বোধ হ'ল।

রাতে প্রসাদ দিতে এলে প্রশ্ন করলাম, 'আপনার ছোট মেয়ে কোন কাজ-কর্ম করছে, চাকরিবাকরি, না বিয়ে হয়ে গেছে? দেখছি না তো এখানে?'

একটুখানি মৌন থেকে নিচু গলায় বললেন, 'বাবা সে তো একটা কাজ ক'রে ফেলেছি, জানি না কি করলাম, মেয়েটার সর্বনাশ করলাম কিনা। তার জন্য যা কখনও হয় নি—তাই হয়েছে, ঠাকুরমশাই আমার লাঞ্ছনার বাকী রাখেন নি। বুরা কালে মারও খেয়েছি।

'তবে আপনি তো জানেন আমার সাধ আর জিদের কথা। মেয়েটা তখন বি. এ. পড়ছিল বাবা, এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক এলেন, খুব অল্প বয়সও নয়, তবে সুপুরুষ। দেখলাম এখানের বাঙ্গালী কর্তরা খুব খাতিরও করেছেন—পরে শুনলাম, বোম্বাইয়ের এক বড় ফিল্মি কোম্পানীর ক্যামেরামান। খুব নাকি নাম হয়েছে এর মধ্যেই কোন এক নটীকে নাকি বিয়াও করেছিলেন, সে বিয়া ছেদ হয়ে গেছে—সে এখন কোন নবাবের ঘর করে।

'শুনে, বাবা, কেমন জানি মনে হ'ল, এ শ্যামসুন্দরেরই নির্দেশ, আমার প্রতি তার করুণা। আমার আকুল ডাকে তিনি সারা দিয়েছেন। মেয়েটাকে তাঁর সামনে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিলাম। বোধহয় তাঁর মনে ধরল। ওখানে নটীই দেখেছে সব, নষ্ট ভ্রষ্ট মেয়েদের। ফুলের মতো নিষ্পাপ মেয়ে

অল্প বয়স, এমন তো দেখে নি। রোজই আসতে আরম্ভ করল। বোধহয় বাবা অনুমান ক'রে থাকবে আমার ইচ্ছা—একদিন অনেক রাত্রে এল, আমাকে গোপনে ডেকে কইল, তার আর সময় নাই, তিনদিন পরেই চলে যেতে হবে, আমি যদি চুপিচুপি রেজেস্টারী বিয়াতে মত দিই সে খুকীকে বিবাহ ক'রে নিয়ে যাবে—আর আমার পা ছুঁয়ে বলছে—ওকে বড় অভিনেত্রী করে দেবে। ও আরও মন্দিরের কপাট ছুঁয়ে বলল যে, দলে পড়লে এক-আধদিন মদ খায়। নইলে সে মাতাল নয়। ওখানে ফ্ল্যাট কিনেছে—পথের ভিখারীও না।

'আমি বাবা রাজী হয়ে গেলাম। ঘুষঘাষ দিয়ে কি করল জানি না, রেজেস্টারীও হয়ে গেল পরের দিন। মেয়েরও দেখলাম খুব ইচ্ছা। দুজনে পরের দিন ভোরের পেলেনে চলে গেল। পরে বাবা সকলে আমাকে ধিক্কারই দিয়েছে, ছি ছি করেছে। বলেছে জেনেশুনে মেয়েটাকে আমি কসবী করে দিয়েছি। জানি না বাবা কি করলাম।'

'না দিদি, কাজটা ভাল করেন নি। ওদের চেনেন না, লম্পট আর লোচ্চার দল সব। মায়া নেই, দয়া নেই, ভদ্রতা নেই।·· তা মেয়ে আপনাকে চিঠি দেয় না?'

'চিঠি দেয় বাবা, ঐ এক লাইন দু লাইন। আমি ভাল আছি, তোমরা কেমন আছ। আর কোন খবর দেয় না। যাবার পরই, পেরায়—একটা দু'শো টাকা মনি অর্ডার করেছিল, উনি নিতে দেন নি।'

তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ কেমন যেন ফেটে পড়লেন। বললেন, 'বাবা বহু দিন শ্যামসুন্দরের সেবা করেছি, মা কালীর সেবা, কখনও স্বপ্নেও অন্য পুরুষের কথা ভাবি নি—আমার এত বড় শাস্তি ওঁরা দেবেন না। আমার আকিঞ্চে পুরবেই!'

স্বপ্নসন্ধ্যা

সেদিনটি স্মরণীয় বৈ কি। ইতিহাসে—অন্তত ওর ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখার মতো দিন।

সেদিন চারদিক থেকে এসেছিল অভিনন্দন, এসেছিল আনন্দোচ্ছ্বাস—তার চেয়েও বড় কথা, বন্ধু বান্ধবী—আত্মীয়ার চোখে দেখেছিল কুটিল ঈর্ষার প্রকাশ। সেদিনটা ওর জীবনে চরম বিজয়গর্বের দিন সন্দেহ নেই।

কত কী বলেছিল ওকে।

সেদিনের সে উন্মত্ত আনন্দের ঘূর্ণাবর্তে কত কী উড়ে এসে পড়েছিল—রোমের কার্নিভালে দেখা সেই অনন্ত কাগজের ফিতের মতো—চারদিক থেকে, অজস্র।

বন্ধুদের কেউ বলেছিল, 'তুই-ই এ যুগের উমা। সেই ট্র্যাডিশনকে আবার রিভাইভ করলি!'

কেউ বলেছিল, 'সাক্ষাৎ পার্বতী। সত্যি—তোরই তপস্যা সার্থক!'

কেউ বা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বলেছিল, 'নামটা পালটে নে নীলা। ও নাম তোকে মানায় না। তোর নাম অর্পণা রাখাই উচিত। সেই পর্ণহীন উপবাসের কাহিনী যে সত্য—তা তোকে দেখেই বুঝছি।'

হ্যাঁ—আজ আর আত্মপ্রবঞ্চনা ক'রে লাভ নেই—গর্ব একটু হয়েছিল তার।

আর গর্ব হবারই তো কথা। চারদিক থেকে এই যে স্তুতি ও ঈর্ষার ঝড় বয়ে গিয়েছিল তাকে কেন্দ্র ক'রে—তার মধ্যে বড় সাফল্য একটা কিছু নিশ্চয়ই ছিল। একটা বড় রকমের কৃতিত্ব, বড় একটা বিজয়ের ইতিহাস।

শিবের ব্রত নষ্ট করেছে সে। যোগীশ্বরের ধ্যান ভেঙেছে।

চির-উদাসীন চির-নিস্পৃহ বৈরাগী ভোলা মহেশ্বর আজ গৃহবাসী হয়েছেন—সে তো তারই জন্য। তারই কৃতিত্বে।

শেষাদ্রি ঘোষাল মনসিজের আয়ত্তের বাইরে, যেহেতু মন বলে বস্তুটি তাঁর নেই, এই কথাই সকলে জানত।

সেই শেষাদ্রি ঘোষাল পরাজিত হলেন তার কাছে—একটা সাধারণ সামান্য মেয়ের কাছে—এ কি কম কথা!

এই একটি দিনের বিজয়গর্বের বিনিময়ে বাকী সমস্ত পরমায়ু দিতেও প্রস্তুত ছিল সে। সমস্ত প্রাণ পণ ক'রেই তো এ তপস্যায় নামা তার।

কিন্তু বিধাতা যে তার প্রাণ নিয়েই এ তপস্যা সার্থক করবেন—এ-হেন সিদ্ধি দেবেন তাকে—তা কি সে স্বপ্নেও ভেবেছিল? জয় হ'ল তার ঠিকই—

কিন্তু এর আনন্দ যে ভোগ করবে সে কোথায়?

শেষাদ্রি ঘোষাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা অধ্যাপক।

কিন্তু সেইটাই তো তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় নয়।

তিনি সত্যকারের পণ্ডিত, জ্ঞানতপস্বী। লেখাপড়াই তাঁর জগৎ, ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর প্রাণ—তার বাইরে আর কিছু আছে বলে তিনি জানেন না। তাঁর এক একটি ছাত্রের কৃতিত্বই তাঁর জীবনের এক একটি সার্থকতা। তাঁর ঐ আপার সার্কুলার রোডের অত বড় বাড়িটা এককালে হাঁ-হাঁ করত—তাঁর বাবা মা মারা যাবার পর। কিন্তু আজ সেখানে বোধ করি একটি ফুলদানীও রাখার স্থান নেই। সদরের চলন থেকে শুরু ক'রে ওপরের চিলেকোঠা পর্যন্ত ভরে গেছে বই আর পুঁথিতে। আলমারী, র‍্যাক, তক্তপোশ, খাট, টেবিল যেখানে যা ছিল, সব বইতে ভরে গেছে। যেসব আসবাব বই বহন করার মতো নয়, তা নির্মম ভাবে বিদায় দিয়েছেন তিনি—বইয়ের র‍্যাক কিম্বা আলমারীর স্থান করবার জন্য।

সেকালের বাড়ি, প্রতি তলায় বাথরুম ও পাইখানা ছিল। তার মধ্যে দোতালারটি মাত্র রেখে বাকী তু'প্রস্থই ঘর ক'রে ফেলেছেন—এবং সে ঘরে এখন বই থাকে। রান্না ভাঁড়ার দুটি ঘর এখন ছাত্রদের গবেষণা করার ঘর হয়ে দাঁড়িয়েছে—কারণ সেই ঘরেই যত দুষ্প্রাপ্য বই থাকে—সেখানে একটা ক'রে টেবিলও পাতা আছে, তার সঙ্গে দুখানা ক'রে টুল।

এই হলেন শেষাদ্রি ঘোষাল।

সুপুরুষ—হ্যাঁ, একদা সুপুরুষই ছিলেন হয়ত, আজও একেবারে সে কান্তি বিনষ্ট হয় নি কিন্তু তিনি নিজে সে বিষয়ে সচেতন নন। কখন যৌবন এল, কতদিন ছিল, কবে প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করলেন—তা বোধকরি কোনদিন ভেবেও দেখেন নি। আজ তাঁর সব চুলই প্রায় পেকে এসেছে—হয়ত একটু অকালেই পেকেছে, কিন্তু তাঁরই ভ্রমরকৃষ্ণ বিপুল অবিন্যস্ত চুল যে এককালে তরুণ-তরুণীরা হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখত তা তিনি আজও জানেন না। এমন কি. কোনকালে সে চুল কালো ছিল কিনা তা আজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে হয়ত বিব্রত হয়ে পুরনো পুঁথির পাতা ওলটাতে বসবেন, অর্থাৎ তাতে কিছু লেখা

আছে কিনা সে বিষয়ে।

যিনি নিজের চেহারা সম্বন্ধে সচেতন নন—তাঁর কাছে বাহ্যিক আর কোন বিষয়ের সচেতনতা আশা করাই অন্যায়। বিবাহ তিনি করেন নি—জ্ঞানচর্চায় ব্যাঘাত ঘটবে বলে। বাপ-মায়ের এক ছেলে তিনি—অবশ্য এক-মাত্র সন্তান নন। একটি বোন ছিল, তার ছেলেমেয়েরা আজও আছে। তারা আসেও কখনো-সখনো, এলে তিনি যথেষ্ট ব্যস্ত হয়ে পড়েন কিন্তু পরক্ষণেই ভুলে যান. এমন কি দু ঘণ্টার মধ্যেই আবার দেখা হ'লে আকাশ থেকে পড়েন, 'আরে সুনীল যে, কখন এলি?' কিম্বা 'বুড়ুমা, কখন এলে মা?' ইত্যাদি। তারা আজকাল তাই আসাই ছেড়ে দিয়েছে। কলকাতায় এলেও অন্য কোন আত্মীয়ের বাড়ি ওঠবার চেষ্টা করে।

শেষাদ্রির মা মারা গিয়েছিলেন অনেক আগে। তিনি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে কী হ'ত বলা যায় না। বাবা বেঁচে ছিলেন, ওঁর ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত। কিন্তু বিবাহ দিয়ে যেতে পারেন নি। বহুবারই বলেছেন, চেষ্টার যে খুব ত্রুটি করেছেন বা কর্তব্যে অবহেলা করেছেন তা নয়—কিন্তু যত বারই কথা পেড়েছেন ততবারই শেষাদ্রি তা ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন আগামী কোন অনিশ্চিত দিনের জন্য। বাবা তো আর মা নন—মায়ের তূণে যতরকম অস্ত্র থাকে তার কিছুই প্রায় তাঁর নেই। তাই একদা ছেলেকে বাউণ্ডুলে রেখেই শেষাদ্রির বাবাকে পরলোক যাত্রা করতে হয়েছিল।

ব্যস, তারপর থেকে শেষাদ্রি নিশ্চিন্ত।

বোন থাকত বিদেশে—চিঠি লেখা ছাড়া বিশেষ কিছু ক'রে উঠতে পারত না সে। তাও সে অতি অল্প বয়সে মারা গেল। আর চেষ্টা করে কে? মাসী, কাকী, জেঠি, পিসি একেবারে যে কেউ না ছিল তা নয় কিন্তু শেষাদ্রি তাঁর চার পাশে নীরস শুষ্ক বইয়ের নিশ্ছিদ্র প্রাচীর রচনা ক'রে তাঁদের আক্রমণ অনায়াসেই প্রতিহত করতে পেরেছিলেন।

সুতরাং শেষাদ্রির সংসার বলতে দুটি চাকর ভরসা। এরাই রান্না-খাওয়া, বাড়িঘর সাফ করা, অতিথি সৎকার, ছাত্রদের চা জল ইত্যাদি সরবরাহ এমন কি আত্মীয় এলে আদর আপ্যায়ন সব করে। তার চেয়েও বড় কাজ—বইয়ের পরিচর্যাও তাদেরই করতে হয়। কাজের তুলনায় লোক বরং কম—

কিন্তু বেশী লোক রাখা মানেই বেশী জায়গা জুড়ে থাকা—কাজেই দুজনের বেশী লোক রাখতে তিনি রাজী নন। আগে একজনই ছিল তবে তাতে বড় অসুবিধা—সে দেশে যেতে চাইলে কি অসুস্থ হয়ে পড়লে বড় মুশকিলে পড়তে হয়। একবার বংশীবদন একজন বদলী রেখে দেশে গিয়েছিল। নতুন লোকটা এ বাড়ির হালচাল এবং বাড়িওয়ালার ধরন-ধারণ দেখে হকচকিয়ে গেল। বুঝল যে এ কাজ তার দ্বারা চলবে না। তখন বুদ্ধিমানের যা কাজ সে তাই করল—বাজার করার নাম ক'রে একটি দশ টাকার নোট বাগিয়ে নিয়ে সরে পড়ল। শেষাদ্রি তা টেরও পেলেন না, তাঁর মনেও ছিল না কথাটা। এমন কি তাঁর দুপুরের খাওয়া যে হয় নি তাও মনে পড়ল না। তিনি জামাকাপড় ছেড়ে যথারীতি অন্যদিনের মতোই পোর্টফোলিও ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দরজা দেবার কথা কাউকে বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ বংশীবদন নিত্য বন্ধ করে। সেই কারণেই নিজেও বন্ধ করলেন না। ঐ রকম হা হা করছিল সদর দরজা বলেই বোধহয় কোন চোর ভাবতে পারে নি যে বাড়ি সম্পূর্ণ খালি, বাড়িতে কেউ নেই। তাই বড় রকমের চুরি কিছু হয় নি। কেবল পাড়ার বস্তির ছেলেরা সদরের স্তূপাকার করা বই থেকে কিছু নিয়ে গিয়েছিল খেলা করার জন্য, দু-একখানা ঐখানে বসেই ছিঁড়ে নষ্ট করেছিল।

বাড়ি ফিরে সে দৃশ্য দেখে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে শেষাদ্রি চিৎকার করে বংশীবদনকে ডেকেছিলেন; সাড়া না পেয়েও মনে পড়ে নি কথাটা, ভেবেছিলেন বাইরে কোথাও গেছে। আরও চটে গিয়েছিলেন ওর এই বে-আক্কেলপণাতে। তারপর রাত আটটা পর্যন্ত যখন কাউকে দেখলেন না তখন তাঁর মনে পড়ল যে বংশীবদন দেশে গেছে এবং তার বদলী একটা লোক রেখে গেছে। সে লোকটাই বা কোথায় গেল? তখন মনে পড়ল তার দশ টাকার নোট নিয়ে বাজার যাবার কথা—আর তখনই মনে পড়ল যে সকালে আজ তাঁর খাওয়া হয় নি। কেন যে দুপুরে অত খিদে পাচ্ছিল এবার তাও পরিষ্কার হয়ে গেল।

এরপর তাঁকে আর একটা চাকর খুঁজে বার ক'রে কাজ বুঝিয়ে দিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। সেই কারণেই বংশীবদন ফিরলেও একে আর

ছাড়ান নি, দুজনেই আছে। এই লোকটা নাকি চোর, বংশীবদন প্রায়ই অনুযোগ করে—কিন্তু সে অনুযোগ শেষাদ্রি গায়ে মাখেন নি। তাঁর আছেই বা কি এমন, আর তার কতই বা চুরি করবে? বইটই ওরা তত বোঝে না, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত।

দু-দশ টাকা চুরি বরং সহ্য হবে—কিন্তু ভৃত্যহীন অসহায় অবস্থা সহ্য হবে না।

এই শেষাদ্রি ঘোষাল।

এতদিন ধরে নিরঙ্কুশ ভাবে নিভৃত নীরব জ্ঞানতপস্যা চালিয়ে এসে—এই প্রায় বৃদ্ধবয়সে নীলার কাছে পরাজিত হলেন।

এ গৌরব কি কম!

নীলা তাঁর ছাত্রী। সুনাম শোনাই ছিল, কাছে এসে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। এ-ই তো যথার্থ অধ্যাপক, এই তো সেই প্রাচীন কালের আচার্য। জ্ঞান আহরণ ও বিতরণ—পঠন ও পাঠন, এর বাইরের জগৎ বলতে কিছুই জানা নেই।

কিন্তু শ্রদ্ধা তো করে অনেকেই, যারা যারা শেষাদ্রির সংস্পর্শে এসেছে, সকলেই। মুগ্ধও হয় তাঁর নির্মল দেবতুল্য চরিত্রে, শিশুর মতো স্বভাবে।

নীলা সেইখানেই থামল না।

ওর মনে এক অদ্ভুত খেয়াল চাপল, এক আকাশস্পর্শী দুরাশা।

এই যোগীশ্বরের যোগ ভাঙাতে হবে, শ্মশানবাসীকে করতে হবে গৃহী। তপস্বীর তপস্যাকে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে ওর রাঙা পায়ের ধুলোয়।

'মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল।'

না-ই বা হ'ল সে উর্বশী, তবু সেই জাতেরই তো! ঐ সাধকের সমস্ত সাধনা তার এই কমলকোমল-রক্ত-চরণপ্রান্তে সমাধিস্থ করতে না পারলে, তাঁর এতদিনের তিল তিল তপস্যায় রচিত চারিত্রিক সুনামকে ধূল্যবলুণ্ঠিত না দেখতে পেলে বৃথাই তার নারীজন্ম!

সে অবশ্য নিজের সংকল্পের কথা জানাল না কাউকে, কিন্তু কাজে লেগে গেল।

তখন শেষাদ্রির বয়স আটচল্লিশ, নীলার একুশ।

তাই নীলা যখন ছায়ার মতো তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে শুরু করল, তখন শেষাদ্রি বা তাঁর পরিচিত অন্য কেউ—তার এই সংকল্পের কথা অনুমানমাত্র করতে পারে নি। এদিকে যে কিছু অনুমান করার আছে তাও ভাবতে পারে নি। পাঠে অনুরাগিণী ছাত্রী এমন অনেক আছে, যাদের সাধ্যের চেয়ে সাধ বেশি—তারা পড়ার চেয়ে অধ্যাপকদের সেবা ক'রেই পরীক্ষাপর্ব এবং তার পরের পর্বটাও তরে যেতে চায়। তাছাড়া শেষাদ্রি ঘোষালের ক্ষেত্রে অন্তত, এ রকম তদ্গত ভক্তির নিদর্শন খুব দুর্লভ ছিল না।

না, কেউই সন্দেহ করে নি—নীলার গোপন অন্তরবাসিনী চিরকালীন নারীর শাশ্বত বিজয়বাসনা।

নীলা এম. এ. পাস করল, রিসার্চ স্কলারশিপ পেল, থিসিসও দিল। সে থিসিস বলতে গেলে শেষাদ্রির মুখ থেকে শ্রুতিলিখনে লেখা—সুতরাং ডি-ফিলও আটকাল না।

ডি-ফিল পাওয়ার সংবাদ যেদিন বেরোল সেদিন শেষাদ্রি প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে নীলা, তুমি এখন কি করবে?'

'আপনি তো স্যার বিলেত যাচ্ছেন—সে কবে?'

'সামনের অক্টোবরে।'

'আমিও যাব।'

'কি ক'রে?' বিস্মিত শেষাদ্রি আকাশ থেকে পড়লেন।

'সে আমি যেমন ক'রেই হোক যাব। ভাববেন না।'

'কিন্তু তুমি—বিয়ে-থা করবে না? সংসারী হবে না?'

'আপনার মুখেও এ প্রশ্ন স্যার? আমি যদি বলি আপনি পথ দেখান।'

এই বয়সেও লাল হয়ে ওঠেন শেষাদ্রি! মাথা হেঁট ক'রে বলেন, 'কী যে বলো নীলা!'

'ঠিকই বলছি—আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও।'

শেষাদ্রি আরও বিব্রত হয়ে হাতের খাতাটার দিকে চেয়ে রইলেন।

'সে সব কথা থাক স্যার। কিন্তু আমি না গেলে আপনি বড় অসুবিধায় পড়বেন। বই খাতা কাগজ এসব গুছিয়ে রাখে কে?'

'তা বটে। কথাটা সত্যি।'

মনে মনে শেষাদ্রিও স্বীকার করেন। নীলা কবে যে তাঁর ছাত্রী থেকে সেক্রেটারীতে রূপান্তরিতা হয়েছে তা তিনিও জানেন না। শুধু এইটুকু জানেন যে আজকাল তাঁর সব দরকারী কাগজপত্রগুলো নীলা ঠিক ক'রে রাখে এবং প্রয়োজনমতো ঠিক ঠিক হাতে জুগিয়ে দেয়—সে ভারি আরাম। আগের মতো একটা খাতা কি একটা বই হাতড়ে বার করতে এক ঘণ্টা সময় লাগে না।

তিনি খুশী হয়ে বললেন, 'যেতে পারো তো ভালই। কিন্তু কী পড়বে?' এবং তার পরই মহা উৎসাহে নীলা এখন ওখানে কী কী পড়তে পারে, কী পড়া উচিত, কত কি সুযোগ আছে—সেই আলোচনাতে ডুবে গেলেন।

নীলা করলেও অসাধ্য সাধন। কোথা থেকে কী সূত্রে যে সে একটা স্কলারশিপ যোগাড় করলে তা কেউ টেরও পেল না। বাকী রইল যাওয়া-আসার খরচা—সেটাও এক জ্যেঠার কাছ থেকে নিয়ে শেষাদ্রির আগেই সে বিলেতে পৌঁছে গেল।

শেষাদ্রির তাতে সুবিধে হ'ল খুব, সেটা তিনিও একদিন স্বীকার করলেন।

শেষাদ্রি গিয়েছিলেন অধ্যাপক হয়ে—এক বছরের জন্য। তাঁর যখন ফেরবার সময় হ'ল তখনও নীলার কাজ সামান্য বাকী আছে।

শেষাদ্রি বললেন, 'তোমার ওপর নির্ভর করা এমন অভ্যাস হয়ে গেছে নীলা যে এই ক'টা মাস ওখানে গিয়ে খুব অসুবিধা বোধ করব।'

নীলা আর তিনি একই পাড়াতে দুখানা ঘর পেয়েছিলেন—কাছাকাছি বাড়িতে। সেও অবশ্য নীলারই কৃতিত্ব, কারণ ঘর সে-ই ঠিক ক'রে রেখেছিল। এখানে আসার পর কোন অসুবিধাতেই তাই পড়তে হয় নি শেষাদ্রিকে। ঠিক নিজের কাজে যতটুকু অনুপস্থিত থাকা প্রয়োজন ততটুকু—এবং রাত্রে ঘুমের সময় ছাড়া সমস্ত সময়ই কাছে কাছে থাকত। ভোরে উঠে চলে আসত, ওধারে বহু রাত্রি পর্যন্ত থাকত। সেক্রেটারী, ছাত্রী, ব্যক্তিগত সেবিকা—নীলা ছিল একাধারে সব। কী নোট কোন্‌দিন টাইপ করতে হবে, পরের দিনের লেকচার নোট তৈরী করতে কোন্ কোন্ বই লাগবে—সেসব ছিল ওর নখদর্পণে—চাইবার আগেই হাতের কাছে যুগিয়ে রাখত সে।

তাতে কাজ করার খুব সুবিধা হ'ত শেষাদ্রির। সময়ও অনেক বাঁচত।

সেদিনও নীলা ভোরের চা খেয়েই চলে এসেছিল ওঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতে। সে শেষাদ্রির কথার উত্তরে বেশ সপ্রতিভ ভাবে বললে, 'কিন্তু ক'টা মাসই বা বলছেন কেন স্যার! এবার দেশে ফিরলেই বা আমাকে ক'দিন পাবেন?'

'কেন? পাবো না কেন?' শেষাদ্রি যেন আকাশ থেকে পড়েন।

'বাঃ, আমি কি চিরকালই এমনি থাকব? আমাকে এবার যা হোক কিছু সেট্‌ল্ করতে হবে না? হয় বিয়ে নয় চাকরি—যা-ই কেন না করি, এখনকার মতো অত স্বাধীনতা থাকবে না এটা তো ঠিক? হয়ত কলকাতাতে থাকাই হবে না।'

শেষাদ্রির মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি কিছুক্ষণ বিহ্বলভাবে বসে থেকে বললেন, 'তাই তো! এটা তো ভেবে দেখি নি। সত্যিই তো, তোমারও তো ভবিষ্যৎটা ভাবতে হবে! স্বার্থপরের মতো নিজের কথাই তো শুধু ভাবলে চলবে না।'

স্যুটকেশটার জিনিসগুলো মেঝের ম্যাটিং-এর ওপর ঢালতে ঢালতে নীলা বললে, 'একটা কিন্তু উপায় আছে স্যার!'

'কী বলো তো?' সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েন শেষাদ্রি।

'আপনার আর আমার ভবিষ্যৎ মিলিয়ে দেওয়া!'

খুব সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে বলে নীলা।

এত সহজ এবং এত স্বাভাবিক যে শেষাদ্রি কথাটা ধরতেই পারেন না। অবাক হয়ে খানিকটা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেন, 'অর্থাৎ—?'

'অর্থাৎ আমাকে যদি বিবাহ করেন তা'হলে এসব কোন সমস্যাই আর থাকে না।'

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শেষাদ্রির গৌর বর্ণ তামাটে হয়ে গেছে। তার ওপরও মেচেতার মতো ছোপ পড়েছে স্থানে স্থানে—তবু তিনি যে অরুণবর্ণ হয়ে উঠলেন তা বেশ বোঝা গেল।

'যাঃ, কী যে বল নীলা! তোমার ঠাট্টাগুলো—। যাঃ!'

যার-পর-নাই অপ্রতিভ হয়ে পড়েন শেষাদ্রি। কথাগুলো ছেলেমানুষের

মতোই অসংলগ্ন হয়ে পড়ে তাই। কী বলা উচিত ভেবে না পেয়ে বিশেষ কিছুই বলতে পারেন না।

'আমি কিন্তু ঠাট্টা করি নি স্যার। সিরিয়াসলিই বলছি। অনেকদিন ধরে ভেবে দেখেছি। আপনার যা অসহায় অবস্থা, আমি চলে গেলে আপনি খুব অসুবিধেয় পড়বেন—আমিও ফেলে গিয়ে স্বস্তি পাব না।'

'তাই বলে—। নাঃ, কী যে বলো! তোমার বয়স আর আমার বয়স!'

'সে আপত্তি তো আমার তরফ থেকেই ওঠবার কথা। আপনি সে চিন্তা করছেন কেন?'

'না না। আমার এই বয়সে বিয়ে! কি বলছ নীলা! সে যে আমি ভাবতেই পারি না।'

'সে দিক দিয়ে ভাবছেনই বা কেন? যেমন আছি তেমনিই থাকব। শুধু সেই ভাবে চিরকাল হাতের কাছে থাকবার একটা সামাজিক অনুমোদন নেওয়া বইতো নয়।'

'না না—এসব জিনিস এত তুচ্ছ নয় নীলা। দেহের ধর্ম আছে। বয়সের এত তফাৎ—। ধরো আমি আর দু-এক বছরের মধ্যেই বুড়ো হয়ে যাব—তুমি তখনও যুবতী থাকবে। তোমার বাবা-মাই বা রাজী হবেন কেন? আর লোকেও যা-তা বলবে।'

'আপনি এসব কথা এখনও চিন্তা করেন তাহলে। লোকে কী বলবে, দেহের ধর্ম—এই সব তুচ্ছ কথা!'

ঈষৎ কি ব্যঙ্গের সুরই গলায় ফোটে নীলার।

ফুটলেও শেষাদ্রি সেদিক দিয়ে যান না। বলেন, 'না—এসব ভাবতে হবে বৈ কি। জীবন নিয়ে কথা। না, ওসব কথা যাক্ নীলা!'

নীলা আর কথা কয় না। যেমন জিনিসপত্র গুছিয়ে দিচ্ছিল তেমনি দিতে থাকে।

তার পরবর্তী কথা এবং আচরণও সহজ এবং স্বাভাবিক স্তরেই নেমে আসে। অন্য দিনের সঙ্গে এদিনের কোন তফাৎ বোঝা যায় না। যেন এই মধ্যবর্তী সময়ের কথাগুলো কোনপক্ষেই উচ্চারিত হয় নি।

শেষাদ্রি কিন্তু সত্যিই বিলেত থেকে ফিরে বড় অসুবিধা বোধ করতে লাগলেন। যখন একা ছিলেন তখন ঠিকই চলে যেত—কিন্তু মধ্যে এই কটা বছর নীলা এসে সব ওলট-পালট ক'রে দিয়ে গেছে। অভ্যাসটা গেছে খারাপ হয়ে। এখন কিছুই হাতের কাছে খুঁজে পান না। না বই, না খাতা, না কোন নোট্স্—এমন কি ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস জামা-কাপড় পর্যন্ত।

খুঁজে পান না—তার ফলে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। অথচ সে বিরক্তি কার ওপর তাও বোঝা যায় না। অন্য ছাত্র-ছাত্রীরা সাহায্য করতে এগিয়ে আসে কিন্তু তাদের আনাড়িপনা আরও বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে।

আর তার ফলে—যে দুর্নাম ওঁর কখনও ছিল না—খিটখিটে বলে একটা দুর্নাম রটে যায় ছাত্রসমাজে।

এরই মধ্যে একদিন এসে পড়ল নীলা।

সত্যি-সত্যিই যাকে বলে বেঁচে গেলেন শেষাদ্রি। যেন কোন্ জাদুমন্ত্র-বলে সব আবার ঠিক হয়ে গেল।

তেল-দেওয়া কলের মতো সব নিঃশব্দে ও নিশ্চিত গতিতে চলতে লাগল।

এ শ্রেণীর জিনিস শেষাদ্রির চোখে পড়বার কথা নয় কিন্তু এবার যেন, তফাৎটা বড় বেশি বলেই চোখে পড়ল।

আর চোখে পড়ল বলেই যে কথাটা একদা অসম্ভব, অবাস্তব, বিবেচনার অযোগ্য বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই কথাটাই নতুন ক'রে ভেবে দেখতে লাগলেন।

অবশ্য ভাবাও তাকে ঠিক বলে না। মনের অবচেতন থেকে সচেতনতার মধ্যে এই চিন্তাটা উঁকি মারার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ধমক দেন, জোর ক'রে ঠেলে সরিয়ে দেন তাকে। কিন্তু আবারও সে উঁকি দেয়—আবারও নিজের উপস্থিতিটা জানিয়ে দেয়।

ছি ছি! কী লজ্জা, কী লজ্জা!

এ কী স্বার্থপর হয়ে উঠলেন তিনি!

কিন্তু সুবিধা খুব—এটাও মনে মনে স্বীকার না ক'রে পারেন না।

তবু—হয়ত কথাটা শেষাদ্রি কিছুতেই তুলতে পারতেন না—যদি না নীলা নিজে থেকেই কথাটা তুলত।

নিজেই একদিন বললে, 'আমি স্যার সাগর ইউনিভার্সিটিতে একটা কাজ পাচ্ছি। ভাল মাইনে। ওখানেই চলে যাব ভাবছি!'

'সাগরে?' চমকে ওঠেন শেষাদ্রি, 'সে যে অনেক দূর!'

'হ্যাঁ, তা দূর আছে একটু।' স্বীকার করে নীলা।

'কেন—এখানে তো সেই কী বলছিলে কী একটা কলেজে—'

'সে অনেক কম মাইনে। এখানে যা পাচ্ছি, তার সিকি।

'তা—তা তোমার বাবা-মা তোমার বিয়ের কথা তুলছেন না?'

'তুলছেন বইকি। কিন্তু তাতে আপনার কি সুবিধা হবে বলতে পারেন? সে তো আরও দূরে চলে যাব!'

'কেন—এখানে কি সম্বন্ধ হ'তে পারে না? কলকাতাতেও তো ঢের ভাল পাত্র আছে!'

'সে দূরত্বের কথা বলি নি।' শেষাদ্রির অবৈষয়িকতায় প্রায় হতাশ হয়ে পড়ে নীলা, 'আমি বলছি বিয়ের পর আমার স্বামী বা শ্বশুরবাড়ি তো আর আমাকে এমন ক'রে দৈনিক ষোল ঘণ্টা আপনার কাছে থাকতে দেবেন না?'

'ও, তুমি সেই কথা বলছ!' বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েন তিনি, 'আমি অবশ্য সে ভেবে, শুধু নিজের অসুবিধার কথা ভেবেই বলি নি!'

'কিন্তু সেটা কি ভাববার মতো কিছু নয়?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে নীলা।

'কিন্তু—কিন্তু সে আর—মানে তার আর আমি কি করব? কী আর করতে পারি? মানে তুমি কি বলতে চাইছ নীলা?'

'বলতে চাইছি যে জীবনে ঢের নির্বুদ্ধিতা করেছেন আর করবেন না। আমিই আপনার লাস্ট চান্স! আর কেউ সহজে আপনাকে বিয়ে করতে চাইবে না। চাইলেও—আপনার তাতে কোন সুবিধে হবে না। এখনও সময় আছে, আমাকে বিয়ে করুন—আর কিছুই ভাবতে হবে না!'

প্রথম প্রথম নীলার কথায় বিস্মিত হতেন শেষাদ্রি, তাঁর ভদ্রতায় আঘাত লাগত। কিন্তু আজকাল আর হন না। কারণ, বুঝে নিয়েছেন যে, ওর

স্বভাবই ঐ রকম। তাছাড়া এতদিনের ঘনিষ্ঠতাতেও অনেকটা অধিকার বেড়েছে নীলার। অনেক বেশি সহজে কথা বলার অধিকার।

আজ আর তিনি উড়িয়েও দিলেন না কথাটা সেদিনের মতো। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কথাটা কি তুমি ভাল ক'রে ভেবে দেখেছ নীলা ?'

'দেখেছি বইকি। অনেক দিন ধরেই ভাবছি বলতে গেলে।'

'সব প্রস্ য়্যাণ্ড কন্‌স্ ? এ বিবাহে আমিই জিতব, পাব অনেক, তুমি কিছুই পাবে না। টাকাকড়িও আমার বিশেষ নেই। পৈতৃক অর্থ যা ছিল তা সব ভাগ্নে-ভাগ্নীদের দিয়েছি। থাকার মধ্যে এই বাড়িটা আছে আর বইগুলো। বইগুলো সরাবার জায়গা নেই বলে বাড়ি মেরামত করা হচ্ছে না। ভাবছি আর একটা বাড়ি ভাড়া করব বইগুলো রাখার জন্যে—সে আরও খরচা। আমার যা আয় তাও তুমি জান। সংসার চালাতে পারবে ?'

'না পারি নিজেও চাকরি করব। তখন এখান থেকে যা পাই তাতেই খানিকটা উপকার হবে।'

'তোমার আমার বয়সে কিন্তু অনেক তফাত।'

'তা জানি।'

'তবু একবার ভাল ক'রে ভেবে ছাখো নীলা। মনস্থির করার আগে একটু সব দিক ভেবে নাও। হয়ত সে সুযোগ আর পাবে না। এর পর ফেরবারও পথ থাকবে না।'

'কিন্তু আপনি কি ভেবে দেখেছেন ?'

এবার আর কণ্ঠের নিস্পৃহতা রাখা যায় না। আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বেরিয়েই পড়ে।

'হ্যাঁ—তা মানে লাভের পাল্লা তো আমার দিকেই ঝুঁকছে। কিন্তু আমার কথা ভেবো না নীলা—তোমার কথাই ভাবো। শুধু তোমার দিকটা।'

পরের দিন নীলা ট্যাক্সি নিয়ে আসে একেবারে।

'চলুন।'

'কোথায় ?' আকাশ থেকে পড়েন শেষাদ্রি।

'রেজিস্ট্রারকে একটা নোটিশ দিতে হয়, সেটা সেরে ফেলা দরকার। ফর্ম

আমি নিয়েই এসেছি, ফিল্-আপও করেছি, শুধু সইটা বাকী। গাড়ি নিচে দাঁড়িয়ে আছে।'

'রেজিস্ট্রার?'

'হ্যাঁ। রেজিস্ট্রী বিয়েই তো হবে? এ বয়সে নিশ্চয়ই আনুষ্ঠানিক বিয়ে করতে চাইবেন না আপনি। সুতরাং একটা নোটিশ দেওয়া দরকার।'

'ওঃ।'

কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েন শেষাদ্রি। এত শীঘ্র মনস্থির করা শুধু নয়, কাজও সেরে ফেলতে হবে তা তিনি ভাবেন নি।

একেবারে চিরদিনের মতো অন্ধ গহ্বরে ঝাঁপ দেওয়া। প্রত্যাবর্তনের, ভুল সংশোধনের আর সুযোগ পর্যন্ত না রেখে।

'তুমি মন স্থির করেছ তো? সব দিক ভেবে দেখেছ তো?' অনেকক্ষণ পরে প্রশ্ন করেন শেষাদ্রি।

'সে তো আমার স্থির করাই ছিল—আপনাকে বলেছি।'

'তা বটে। তবু—ছ্যাখ, ফেরবার আর পথ থাকবে না। কাজটা করতে যাচ্ছ চিরদিনের মতো!'

'সে চিরদিনের আর কত বাকী আছে আপনার? বেশির ভাগই তো একা একা স্বার্থপরের মতো কাটিয়ে দিলেন। এখন দুশ্চিন্তা তো বরং আমারই হবার কথা!'

'না, সেই তোমার কথাই বলছি।'

'চলুন, চলুন, উঠুন। এতকাল আপনার কথাই তো শুধু ভাবলেন। এই যে দৈনিক এতখানি সময় আপনার কাছে কাটাই তাতে কে কী বলছে, আমার ভবিষ্যৎটা কি হবে তা কখনও ভেবেছেন? নিজের কথা ছাড়া আর কারুর কথা ভাবা আপনার অভ্যেস আছে?'

'তা বটে। বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে। তোমার কথাটা ভাবা উচিত ছিল। বরং—'

'উঠুন, বেরিয়ে পড়ুন। আর বরং-এ কাজ নেই। এতকাল যা করলেন না—এখন আর পারবেন না।'

অগত্যা শেষাদ্রিকে উঠতে হয়েছিল। রেজিস্টারের অফিসে গিয়ে নোটিশও

দিতে হয়েছিল একটা।

তার পর বিয়ে, তদুপলক্ষে গ্রেট ইস্টার্নে প্রীতিভোজ—আপনার সহজ নিয়মেই এসেছিল—একটার পর একটা। অভিনন্দনে-ঈর্ষায়-উপহারে জড়ানো সে অদ্ভুত দিন কটা গেছে। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ফলবান দিন। মনে হয়েছে সে সকলকে ডেকে বলে, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' কথার কথা নয়।

সে নিজেই তার প্রমাণ।

সে আজ এক বছরের কথা। আজ তাদের বিবাহ-বার্ষিকী।

সেই কথাই ভাবছে নীলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই স্বপ্ন-মাখানো সন্ধ্যায়।

সুদীর্ঘ একটি বছর কেটে গেছে। বিজয়িনীর জীবনপাত্রের সমস্ত গৌরব-সুধাটুকু নিঃশেষিত হয়েছে।

আজ আর স্বপ্ন নেই। বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে।

আজ মনে সেই প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠেছে। তপস্যার সিদ্ধি তো মিলেছে—কিন্তু কী মিলল শেষ পর্যন্ত?

কী লাভ হ'ল তার?

শেষাদ্রি নিশ্চিন্ত হয়েছেন, সুখীই হয়েছেন, বলতে হবে। সংসার সম্বন্ধে নিজের জীবনের দৈহিক বা ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে আর কিছুই ভাবতে হয় না। কিছুই ভাবতে হয় না তাঁকে—সমস্ত সময়টাই তাঁর বই ও পুঁথিতে দিতে পারেন।

কিন্তু নীলারও যে একটা জীবন আছে, তারও যে জৈবিক সত্তা আছে, একথাটা শেষাদ্রি একবারও ভেবে দেখেন না।

বরং বিয়ের আগে ভেবেছিলেন। কথাটা তুলেও ছিলেন। তাই থেকেই নীলার কোথায় একটা সূক্ষ্ম আশা জেগেছিল মনে। কিন্তু এখন একেবারেই নির্বিকার শেষাদ্রি। রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত পড়াশুনা ক'রে যখন তিনি এসে শোন, তখন এই ঘরেরই আর একটা খাটে, তাঁর চার হাতের মধ্যে আর একটা প্রাণী যে তখনও পর্যন্ত হয়ত বা বিনিদ্র জেগে বসে আছে, সে কথাটা একবারও মনে পড়ে না তাঁর।

নীলাকে একটা চাকরি নিতে হয়েছে। হয়ত শিগগিরই টিউশানী খুঁজতে হবে। এত টাকা মাইনে শেষাদ্রির—কিন্তু সংসার চলে না তাতে। বইয়ের দোকানেই সব টাকা চলে যায়। শেষাদ্রি যে এমন নিঃস্ব, কোথাও এক পয়সা জমানো বা উদ্‌বৃত্ত নেই—একটা লাইফ ইন্‌সিওরেন্স পলিসি পর্যন্ত না—তা একবারও ভাবতে পারে নি নীলা। আছে শুধু এই বাড়িটা, সেও যে কতকাল মেরামত হয়নি তার ঠিক নেই, এবার হয়ত ভেঙে পড়ে যাবে। তু'বছরের ট্যাক্সই বাকী পড়ে ছিল—নীলা শোধ করেছে। বাড়ি মেরামতের টাকা তাকেই যোগাড় করতে হবে—এবং দাঁড়িয়ে থেকে ব্যবস্থাও।

তাহ'লে সে পেল কি?

গৌরব। মূর্খ নির্বোধ নীলা। সেটাও সে নিজের সৃষ্টি করা মানসিক দুরবীন দিয়ে অনেকটা বাড়িয়ে দেখেছিল।

কিছুদিন পরেই সে ভুল ভেঙেছে তার।

শেষাদ্রির পরিচয় কতটুকু গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ? শুধু এই বিশেষ বিষয়ের ছাত্রসমাজে ও কতকগুলি অধ্যাপকের মধ্যে। বাকী কে খবর রাখে? অপরে তাদের স্বামী-স্ত্রী পরিচয় পেলে মুচকি হাসে। করুণার হাসি। কৌতুকের হাসি। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। যারা শেষাদ্রির পরিচয় জানে তারাও মনে করে নীলা পয়সার লোভে শেষাদ্রিকে বিয়ে করেছে। তারাও হাসে মনে মনে। সুতরাং কী এমন গৌরবই বা পেল সে?

কোন এক অপরিণত বয়সে মনকে সে বুঝিয়েছিল যে এরকম ঘটনা ঘটলে শিক্ষিত সমাজের মাথার ওপর দিয়ে চলতে পারবে সে, সবাই তাকে খাতির করবে, সমীহ করবে, স্ত্রীলোকরা ঈর্ষা করবে। আজ সে কল্পনার সঙ্গে বাস্তব কিছুমাত্র মেলে না। কেউ তাদের কথা নিয়ে মাথাই ঘামায় না। তাছাড়া তারা যায়ই বা কোথায়? কোথায় তাদের সমাজ? চাকরি বজায় রাখতে যাওয়া ছাড়া শেষাদ্রি কোথাও নড়তেই যে চান না। তার ফলে শরীরও ভেঙে পড়েছে তাঁর। ডায়াবেটিস, লো প্রেসার, বাত। সেই তরিবৎ করতে করতে নীলার অর্ধেক সময় চলে যায় আজকাল।

অর্থাৎ বর্তমানও নেই, ভবিষ্যৎও নেই। কিছুই নেই তার। সন্তান হবে না, টাকাও থাকবে না। যতদিন বেঁচে থাকবে নিজেকে চাকরি ক'রে খেতে

হবে। হয়ত বা স্বামীকেও খাওয়াতে হবে…

ঘর থেকে শেষাদ্রি ডাকলেন, 'নীলা—।'

'কী বলছ ?' ঘরে গিয়ে দাঁড়াল সে।

'আচ্ছা, ক্যালেণ্ডারের আজকের তারিখে লাল পেন্সিলের দাগ দিয়ে রেখেছ কেন বল তো ?…আজ কি কোন এন্‌গেজমেন্ট ছিল আমার ?'

'না। ওটা আমার এক নির্বুদ্ধিতার স্মারক, ও কিছু না। ও পাতাটাই ছিঁড়ে ফেল।'

'নির্বুদ্ধিতা ? কিসের নির্বুদ্ধিতা ? কী বলছ কিছুই বুঝছি না। তোমার মুখটাই বা অত শুকনো দেখাচ্ছে কেন নীলা ? শরীর খারাপ হয়েছে ?'

বহুকাল পরে বোধহয় নীলার মুখের দিকে তাকাবার সময় হ'ল তাঁর। এধরনের কুশল প্রশ্নও তাঁদের বিবাহিত জীবনে সম্ভবত এই প্রথম।

সহসা নীলার দুই চোখ জ্বালা ক'রে জল ভরে আসে।

তবু তার দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয় না—বরং তা থেকে যেন আগুনই ঠিকরে বেরিয়ে আসে : 'তুমি, তুমি আমাকে আগাগোড়া ঠকিয়েছ। তুমি ভণ্ড, তুমি অপদার্থ—তুমি জোচ্চোর। তুমি আমার সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ ক'রে দিলে !'

বহুদিনের রুদ্ধ রোষ আর ব্যর্থতা ফেটে পড়ে তার কণ্ঠস্বরে।

অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে চেয়ে বসে থাকেন শেষাদ্রি। কী বোঝেন কে জানে। তারপর ধীরে ধীরে বলেন, 'কিন্তু আমি তো তোমাকে ঠকাতে চাই নি নীলা! তোমার কাছে গোপনও করি নি কিছু—বরং সত্য বলে সতর্ক ক'রে দিতেই চেয়েছিলুম। তুমিই শুনতে চাও নি কোন কথা যে !…আসলে তুমিই তোমাকে ঠকিয়েছ !'

এই মর্মান্তিক সত্য—যা ক্রমাগত ক'দিন ধরে তার নিজের মনের মধ্যেই ধ্বনিত হচ্ছিল—স্বামীর মুখ থেকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না নীলা। সেইখানেই মেঝেতে আছড়ে পড়ে নির্মম ভাবে মাথা ঠুকতে থাকে।

লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ ছিল না।

একটু অপ্রস্তুত হবার কথা—এই মাত্র।

সে অপ্রতিভতা কৌতুকে ঢেকে ফেলার চেষ্টাই স্বাভাবিক। আর তা-ই করেছে, উভয় পক্ষই। উভয় পক্ষ কেন—বাড়ির সকলেই, ঘটনাটা নিয়ে প্রচুর হাসাহাসি করেছে। কর্তৃস্থানীয়রাও বাদ যান নি।

সে হাসির পিছনে কোন জ্বালা থাকার কথা নয়, ছিলও না। ব্যাপারটা ঐখানেই মিটে যাওয়া উচিত ছিল, আর মিটে গেছে ভেবেই নিশ্চিন্ত হয়েছিল সবাই। ভুলেই গিয়েছিল বলতে গেলে।

একমাত্র উর্মিলা ছাড়া।

উর্মিলাই শুধু অত তাড়াতাড়ি ভুলতে পারল না।

তারই মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা জের রয়ে গেল ঘটনাটার। অথচ কেন যে এই অকারণ অস্বস্তি, নিজের কাছেই এত লজ্জা-লজ্জা ভাব—তা সে-ই কি বুঝতে পারছে ?

এমন একটা কিছু ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে নি। এমন এর আগেই তো কতবার হয়েছে।

ভুল হওয়া কারুর পক্ষেই আশ্চর্য নয়।

এই ধরনের ভুল হওয়াই—এরকম ক্ষেত্রে স্বাভাবিক।

আর ভুল দিয়েই তো তাদের জীবন শুরু।

আসলে বিধাতারই যে ভুল। বিধাতার ভুল বলেই তার বোঝা সারা জীবনই হয়তো বইতে হবে তাদের, সে ভুলের জের টেনে চলতে হবে।

যমজ ভাই কি যমজ বোনদের মধ্যে একেকে অন্য বলে ভুল করা কিছু-মাত্র বিচিত্র নয়—তা সকলেই জানে।

সীতা আর উর্মিলা যমজ বোন। মাত্র দেড় ঘণ্টা সময়ের ব্যবধান ওদের জন্মে। সেই হিসেবে সীতা বড়, উর্মিলা ছোট।

অবশ্য তফাৎ শুধু ঐ সময়টুকুরই নয়।

আরও তফাৎ আছে।

খুঁটিয়ে দেখলে অনেক কিছুই আরও নজরে পড়বে।

গায়ের রঙেই তফাত আছে। দুজনেই ফরসা, কিন্তু ওরই মধ্যে সীতা একটু বেশি, অন্তত একপোঁছ। চোখের রঙেও খানিকটা পার্থক্য আছে। দুই বোনের কারুরই, কৃষ্ণতার নয়ন যাকে বলে, তা নয়—ইংরেজীতে যাকে বলে ব্রাউন, বাংলায় বাদামী বললে ঠিক যা বোঝানো যায় না—ওদের দুজনেরই চোখের তারা সেই রঙের। একই রঙ বটে—তবু ওরই মধ্যে ঊর্মিলারটা যেন একটু গাঢ়—অনেকটা কালো-ঘেঁষা। সীতার ডান জ্রর পাশে ছোট্ট একটা ফোড়ার দাগ আছে, ঊর্মিলার থুঁতনিতে ছোট্ট একটি তিল।

কিন্তু এসব ছোটখাটো তথ্য, খুব পরিচিত লোক ছাড়া এসব তফাত চট ক'রে ধরতে পারে না। একমাত্র ওদের মা-ই পারেন, কে কোন্‌টি এক নজরে বুঝতে পারেন। বাকী সবাই, দাদা-কাকারা এমন কি বাবাও ভুল ক'রে বসেন এক এক সময়ে। তাও, সহসা দেখলে কি পিছন থেকে দেখলে, মা-ও বুঝতে পারেন না। পিছন থেকে পাশ থেকে দুজনকে হুবহু এক-রকম দেখায়। এক গঠন, এক গ্রীবাভঙ্গী, একরকমের ঘন ভারী চুল। চলার ভঙ্গী বসার ভঙ্গী সমস্ততেই আশ্চর্য মিল। এমন কি গলার আওয়াজেও। আড়াল থেকে কথা কইলে কে বলছে তা এক ওদের মা ছাড়া কেউ ধরতে পারেন না।

বাপের বাড়িতে এই ধরনের ভুলভ্রান্তি মারাত্মক কিছু নয়, হাস্যকর—প্রচুর ও নির্মল কৌতুকের উৎস—এই শুধু। এ নিয়ে যে চিন্তা করার কিছু আছে বা উদ্বিগ্ন বোধ করার—তা কারুর মাথাতে যায় নি। বরং অনেক সময় ওদের মামা-মামী কাকা-কাকীর দল ইচ্ছে ক'রে গুলিয়ে দিয়েছেন, অপরকে ধাঁধায় ফেলবার জন্যে। তখনও সবাই নিশ্চিন্ত ছিল যে, একদিন দু'জনেই দু'দিকে চলে যাবে, মেয়ে মানুষ-করা তো পরের বাড়ি পাঠানোর জন্যেই—কদাচিৎ কালেভদ্রে কখনও দেখা হবে, এ ভ্রান্তি-কৌতুকের অবকাশই থাকবে না আর।

হয়তো হ'তও তাই। কিন্তু বিধাতার ভুলের সঙ্গে তাল রাখতে ওদের

বাবা জীবনবাবু আর একটা ভুল ক'রে বসলেন।

কেন কে জানে—তাঁর মাথাতে গেল, তাঁর এই যমজ কন্যা দুটিকে এক বাড়িতে পাঠাবেন। সম্ভব হ'লে যমজ পাত্রে। কে যেন কবে তাঁকে বলেছে, যমজ ভাইবোনদের রক্তে একটা প্রবল আকর্ষণ থাকে পরস্পর সম্বন্ধে, দূরে গেলে দু'জনেরই মনে একটা ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হবে সে বিচ্ছেদের, স্নায়ু পীড়িত হতে থাকবে অহরহ। একজনের শ্বশুরবাড়িতে অসুখ করলে এও তার শ্বশুরবাড়ি বসে অসুস্থ বোধ করবে, তার ওপর দেখতে না পেলে খুব কষ্ট হবে। এরও গুরুতর অসুখ বেধে বসে থাকবে হয়তো। আর দূরে শ্বশুরবাড়ি হলে দেখতে তো পাবেই না।

প্রথমটা ওঁর এ প্রস্তাব সবাই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল।

তুমিও যেমন, উনি বললেন আর যমজ পাত্র এসে হাজির হ'ল! সজাতি, পাল্‌টি ঘর হওয়া চাই—পাত্ররা দেখতে শুনতে চলনসই হবে, লেখাপড়া জানবে কিছু, এনে-নিয়ে খাবার মতো উপার্জনক্ষম হবে—এতগুলো শর্ত পুরিয়ে যমজ পাত্র যোগাড় করা অত সহজ নয়।

কিন্তু দেখা গেল কৌতুক করার ইচ্ছা স্বয়ং বিধাতারও।

জীবনবাবু কবে লুকিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন তা কেউ জানে না, একসময় যখন সত্যি-সত্যিই রাম-লক্ষ্মণের বাবা বিরাজবাবুর চিঠি এল যে, তিনি এ বিবাহে সম্মত শুধু নন—উৎসুকও, তখন বাড়িসুদ্ধ এবং বাড়ির বাইরের আত্মীয়-স্বজনরাও অবাক হয়ে গেলেন। সত্যি-সত্যিই সমস্ত শর্তে মিলেছে, দুটি ভাই-ই এম. এ. পাস, একজন কোন্ কলেজের লেকচারার, আর একজন বীমা কর্পোরেশনের ভাল চাকুরে। স্বভাব-চরিত্র দু'জনেরই ভালো—সে খবর নেবার সূত্রও বিরাজবাবু দিয়ে দিয়েছেন,—পরিবার ছোট, দেখতে-শুনতেও খারাপ নয়, রংটা ময়লা একটু, এই যা। বিরাজবাবু নিজে এখনও উপার্জন করেন, কলকাতায় নিজের বাড়ি আছে। সজাতি, স্বঘর। এমন কি ঠিকুজীতেও মিলে গেল। দু'পক্ষের জ্যোতিষীই রায় দিলেন—একেবারে রাজযোটক মিল, এরকম সচরাচর দেখা যায় না।

তা মিল হয়েওছে।

পাত্রপাত্রীদের স্বভাবে মিল তে হয়েছেই—কুটুম্বে-কুটুম্বেও মিল হয়েছে।

দেনা-পাওনার ব্যাপার ছিল না, অর্থাৎ দর-কষাকষি ছিল না, কিন্তু পাওনা-টাওনার প্রত্যাশা একটা থাকেই। সেদিক দিয়েও বিরাজবাবু বা তাঁর স্ত্রীর ক্ষোভের কোন কারণ ঘটে নি। ওঁদের আশার অতিরিক্তই দিয়েছেন জীবনবাবু। আসল যেটা মানুষ, সে-ও পছন্দ হয়েছে, উভয় পক্ষেই। তার মধ্যে বড় কথা—এঁদের বৌ পছন্দ হয়েছে। বৌদেরও পছন্দ হয়েছে শ্বশুরবাড়ি, শ্বশুর-শাশুড়ী। শ্বশুরের স্নেহ পাওয়া শক্ত নয়, শক্ত যেটা সেটাও পেয়েছে সীতারা—শাশুড়ীসুদ্ধ প্রসন্ন ওদের ওপর। এককথায় সুখীই হয়েছে ওরা।

জীবনবাবুর তাতে ডবল আনন্দ। মেয়েরা সুখী হয়েছে—সেটা একটা কারণ তো বটেই, বড় কারণ যেটা আনন্দের, সেটা হ'ল—তাঁর পরিকল্পনা সফল হয়েছে। সংশয়বাদী সকল আত্মীয়ের ওপর এক হাত তিনি নিতে পেরেছেন। এ সার্থকতা যে তাঁরই বিজয়গৌরব!

না, এ পর্যন্ত বড়রকম কোন গোলমাল হয় নি।

আজও যা হয়েছে তা গোলমালের পর্যায়ে পড়ে না।

রাম-লক্ষ্মণ এরাও যমজ, চেহারাতেও মিল যথেষ্ট, কিন্তু এরা অতি সহজে একটা বড়রকমের অমিল রচনা করেছে। দু'জনের কেশ-সজ্জা দু'রকমের। একজনের মাঝে সিঁথি, আর আর একজনের বাঁয়ে। একজনের ঘাড় চাঁচা-ছোলা কামানো—আর একজনের আধুনিক ফিল্ম আর্টিস্টের কায়দায় অবিন্যস্ত, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া। অর্থাৎ কে কোন্ জন চিনতে না-পারার কোন কারণ নেই।

কিন্তু পুরুষের পক্ষে ব্যাপারটা যত সহজ, মেয়েদের পক্ষে ততটা নয়।

তাই কোন অঙ্গে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করতে না পেরে বেশভূষার সাহায্য নিয়েছে ওরা; নিয়েছেন ওদের শাশুড়ীই। তিনিই ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে পাওয়া এবং মুখ-দেখানি বাবদ যত কর্ণ-ভূষণ পেয়েছিল ওরা, তার মধ্যে থেকে বেছে সীতাকে দিয়েছেন যাবতীয় দুল বা ঝুমকো জাতীয় জিনিস, উর্মিলাকে দিয়েছেন কান, মাকড়ি ও টব। ছেলেদের বার বার মুখস্থ করিয়ে দিয়েছেন—কে কোন্‌টা পরে। বলেছেন, 'ভাল ক'রে

মনে না রাখলে নিজেরাই বিপদে পড়বি, কে কার বৌকে ধরে টানবি তার ঠিক নেই।'

এ ছাড়াও একটা ব্যবস্থা করেছেন জয়ন্তী দেবী।

ঊর্মিলার সবুজ রঙ পছন্দ। তাকেই সবগুলো সবুজ ও নীল রঙের শাড়ি (যত রকমের সবুজ ও যত রকমের নীল আছে) বেছে দিয়েছেন। সীতাকে দিয়েছেন—হলদে, বাসন্তী, চাঁপাফুল, লাল, মেরুন, পাটকিলে—ইত্যাদি। ছেলেদের বলে দিয়েছেন, 'এর পর যখন কেনবার দরকার হবে, তখনও এই হিসেবেই কিনিস, তাহলে আর গুলিয়ে যাবে না, মনে রাখাও সহজ হবে।'

সেই ব্যবস্থাই চলছিল।

এ পর্যন্ত ভুল কোথাও হয় নি।

বিপদ বাধাল আজ ঊর্মিলার বেয়াড়া শখটাই।

বেয়াড়া বললে অবশ্য ঊর্মিলার ওপর কিছুটা অবিচারই করা হবে। নিষিদ্ধ ফলে মানুষ মাত্রেরই লোভ হয়—ওরা তো মেয়েমানুষ। মেয়েদের ক্ষেত্রে সেই আদি মাতা 'হবা'র আমল থেকেই চলে আসছে এটা। তাছাড়া বাঙালী মেয়েদের পক্ষে অবস্থাটা আরও অসহ। শাড়ি-অলঙ্কারের বৈচিত্র্যেই তাদের জীবন। ঐ যে যে-রঙের শাড়িগুলি নিষিদ্ধ করা হয়েছে আর যে গহনাগুলি— তার দিকেই ওদের লোলুপ সতৃষ্ণ দৃষ্টি গিয়ে পড়বে—এই তো স্বাভাবিক।

অবশেষে আর থাকতে না পেরে আজই ঊর্মিলা প্রস্তাবটা করেছে সীতার কাছে, 'ছাখ্ দিদি, দুপুরে তো ওরা কেউ বাড়ি থাকে না, অন্য কেউও আসে না বিশেষ। এই সময় আমি যদি তোর ঐ পাটকিলে রঙের শাড়ি আর ঐ বড় পাশা-ঝুম্‌কোটা একটু পরি—ক্ষতি কি?'

বিস্ময়ে, কৌতুকে, একটা অজানা আশঙ্কায় সীতার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। কী বলবে, বারণ করবে, না নিজেও এইভাবে শখটা মেটাবে—কিছুই ভেবে পায় না। প্রস্তাবটার দুঃসাহসিকতাতে কতকটা নির্বাক হয়ে যায়।

'যদি—যদি কেউ জানতে পারে? মা যদি বকেন?'

অবশেষে উৎকণ্ঠিত ক্ষীণ স্বরে প্রশ্ন করল।

তার চোখ দুটোও উর্মিলার আশমানী রঙের দামী শাড়িটায় পড়ে আবদ্ধ হয়ে যায়। লোভে ও লালসায় দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'মা টের পেলে তো!···আর যদিই বা পান, আমাদের মাথাটা কিছু গর্দান থেকে নামিয়ে নেবেন না। আমরা এমন কোন গর্হিত কাজ কিছু করছি না।···কেনই বা এমন ক'রে চিরদিনের জন্যে কতকগুলো শখের জিনিস ট্যাবু ক'রে রাখব বল্?···তাছাড়া কে-ই বা এখন আসছে? তুইও যেমন!'

'তা বটে,' সীতা কেমন যেন একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তবুও, 'তবে কি জানিস, এতে অভ্যেসটাও খারাপ হয়ে যায়। আবারও এটা-ওটা পরতে ইচ্ছে হবে, শেষে কোনদিন একটা বিভ্রাট বেধে বসে থাকবে।'

'বিভ্রাট আর কি, আমার বর না হয় তোকে ধরে চুমু খাবে—এই তো! তা খেলই বা, শালী-ভগ্নিপতি তো—এমন কোন দুষ্য সম্পর্ক তো নয়! দোষ কি?'

মুখে বলেছিল, কিন্তু সম্ভাবনাটার সম্ভাব্যতা ওর সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। সেই জন্যেই এতটা বেপরোয়া হতে পেরেছিল।

কিন্তু সীতার মন থেকে দ্বিধাটা কিছুতেই যেন যেতে চায় না।

শেষ পর্যন্ত উর্মিলার তরফ থেকে প্রবল যুক্তি-তর্কের পর—বিবেক ও আশঙ্কার সঙ্গে একটা রফা করে। উর্মিলা তার পাটকিলে রঙের শাড়ি আর পাশা-ঝুম্‌কো পরে সাজতে চায় সাজুক—সে নিজে আজই কোন আইনভঙ্গ করতে রাজী নয়। আশমানী ঢাকাইটার ওপর লোভ তারও কিছু কম নয়—কিন্তু ভয় আরও বেশি। ফাঁড়াটা উর্মিলার ওপর দিয়ে ভালয় ভালয় কেটে যাক, পরে একদিন দেখা যাবে।

উর্মিলার আকাঙ্ক্ষা তখন আর অগ্রপশ্চাৎ কোন চিন্তা বা সতর্কতার বাঁধ মানছে না। যখন অসম্ভব বলে বোধ হচ্ছিল তখন একরকম—এখন খানিকটা এগিয়ে আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। শীতের স্রোত যে বাধাতে আবদ্ধ থাকে বর্ষার জল তা গ্রাহ্যও করে না, অনায়াসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। উর্মিলারও সেই অবস্থা, সে তখনই দিদির ঘর থেকে তার শাড়ি, রঙ মেলানো জামা আর বিয়ের দরুন ভারী পাশা-ঝুম্‌কোটা নিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। নির্জন ঘরে সে একাই সাজবে, সে সজ্জা কেউই দেখবে না সে নিজে ছাড়া,

বড় জোর দিদির ঘরে গিয়ে কাপড়-জামা ছাড়বার সময় তাকে দেখানো যেতে পারে—এসব কোন কথাই তার মনে এল না। বাধা-নিষেধ অতিক্রম করতে পারবে—এই একটি চিন্তাই তার অন্য সমস্ত চিন্তা বিবেচনাকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে।...

কাপড়-জামা, গহনা পাল্‌টে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। বড় আয়না, দেখার কোন অসুবিধা নেই, আর তা নেই বলেই ত্রুটিটাও চোখে পড়ে। সজ্জাটা পুরো হয় নি—শখ মেটাতে গেলে ভাল ক'রেই মেটানো দরকার। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে টানা থেকে হাতড়ে হাতড়ে পরিপূরক প্রসাধন-সামগ্রীগুলিও খুঁজে বার করল। টিপ থেকে লিপষ্টিক পর্যন্ত পাটকিলে রঙের হওয়া চাই, এইটেই এখনকার ফ্যাশন।

সব শেষ ক'রে আর একবার দেখবে—অনেকক্ষণ ধরে, কেমন দেখায়।...

আর, কেমন দেখায় সেই দেখার নেশাতে মশগুল ছিল বলেই জুতোর আওয়াজটা শুনতে পায় নি। দুপুরে সবাই ঘুমোচ্ছে, সেই সব ঘুমন্ত লোক—বিশেষ মাকে না জাগাবার প্রাণপণ চেষ্টায় খুব বেশি শব্দ হয় নি এটা একটা ঠিক—তবু সিঁড়ির মুখেই যার ঘর—তার কানে সেটুকুও যাওয়া উচিত ছিল। নিজের রূপের স্বপ্নে নিজে বিভোর ছিল বলেই ঊর্মিলার কানে সেটা যায় নি, একেবারে নিজের মুখের একান্ত কাছে আয়নাতে আর একজনের মুখের ছবি ফুটে উঠতে প্রথম সে সচেতন ও ত্রস্ত হয়ে উঠল—কিন্তু তখন ঘটনা তার আপন নিয়মে কাজ শুরু করেছে—তখন আর সতর্ক হবার কি সরে যাওয়ার সময় ছিল না।

সবটাই দৈবের যোগাযোগ।

সেই দিনই কী একটা গোলমালে রামের কলেজ বসতে পায় নি।

এতদিন পর্যন্ত ওদের কর্তৃপক্ষ বাইরের ঝড়-ঝাপ্‌টা ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু সেদিন আর পারলেন না। তাও—এই হঠাৎ পাওয়া বাড়তি ছুটির দিনগুলোয় রাম সাধারণত ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে চলে যায়—কিন্তু সেদিন রাস্তাতে ট্রাম ছিল না, ফলে বাসও দুষ্প্রাপ্য ও দুরারোহণীয় হয়ে উঠেছে। সুতরাং ঘণ্টা-দেড়েক কলেজের বারান্দায় অন্য অধ্যাপক বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা

দিয়ে আরও ঘণ্টাখানেক বাসে ওঠার বৃথা চেষ্টা ক'রে অগত্যা বাড়ির পথই ধরতে হয়েছে তাকে। আর অসময়ে বাড়িই যখন ফিরতে হয়েছে, তখন প্রায়-নবোঢ়া বধূকে সানন্দ চমক লাগাবার লোভ হওয়াও স্বাভাবিক। কতকটা সেই কারণেই এত সন্তর্পণে পা টিপে-টিপে আসা তার। মা-র ঘুম না-ভাঙাবার উদ্দেশ্যই প্রধান—কিন্তু তার মূলেও দুটো কারণ, মা-র ঘুম ভাঙলে স্ত্রীকে চমকে দেওয়া যায় না, চাই কি 'দুজনে মুখোমুখি' নিভৃত বিশ্রম্ভালাপের আশাটাও সুদূরপরাহত হয়ে যেতে পারে।...

প্রথমটা রামের যে একটু সন্দেহ না হয়েছিল তা নয়।

দুপুরে বিশ্রামের সময় বড়বৌ ছোটোর ঘরে থাকবে এটা হয়তো এমন কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়—কিন্তু সেই বড়বৌ এ-ঘরে একা থাকবে এবং এমন পরিপাটি ক'রে প্রসাধন করবে—এইটেই অস্বাভাবিক বলে মনে হ'ল। তবে কি কোথাও নিমন্ত্রণ আছে? কিন্তু তাহ'লে মা জানবেন না, তারা জানবে না—এই বা কি ক'রে হয়! না কি কোন সিনেমায় যাবে—চুপি-চুপি মাকে লুকিয়ে? তাই এ-ঘরে এসে সাজছে, টুপ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবে বলে?...তা-ই বা কি ক'রে হয়, মা তো বেলা চারটেতেই উঠে পড়বেন, দুপুরের শো শেষ হতে অন্তত পাঁচটা।

কিন্তু সন্দেহ সংশয় দূরের কথা,—তথ্য। সত্য যা তা হচ্ছে সুসজ্জিতা রূপসী স্ত্রী। দিনের বেলা এমন পরিপাটি ক'রে সাজা অবস্থায় নিরিবিলিতে স্ত্রীকে দেখা আজ পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি। স্ত্রী যে সত্যি-সত্যিই এত ভাল দেখতে—এর আগে এমন ক'রে বোঝে নি। 'প্লেজাণ্ট সারপ্রাইজ'টা উভয় পক্ষেই—রাম মনে মনে মানতে বাধ্য হ'ল। বরং তার দিকে আরও বেশি। তাই এই অসময়ের প্রসাধন যে সব কুটিল ও সর্বনাশা সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারত তা আর জন্মেরই অবকাশ পেল না, আবেগ ও প্রলোভনই বড় হয়ে উঠল। ঘরে আর কেউ নেই, শুধু সেইটুকু দেখে নিতে যে কয়েক মুহূর্ত প্রয়োজন, তার বেশি অপেক্ষা করতে পারল না সে—পিছন থেকে গিয়ে উর্মিলাকে সবেগে সজোরে বুকে চেপে ধরে উন্মত্ত ও উত্তপ্ত চুম্বনে অভিভূত আচ্ছন্ন ক'রে দিল।

উর্মিলা কোন বাধা দিতে পারল না, সে সুযোগই পেল না।

মুখে জানাতেও পারল না নিজের পরিচয়—কারণ, মুখ বন্ধ। আলিঙ্গন-মুক্ত হবার চেষ্টাটা শুধু কিছু কিছু করল, কিন্তু—সেটাও খুব একটা কার্যকরী হ'ল না—কারণ, রামের কঠিন বাহুবন্ধন। রামও এই বাধাদানের চেষ্টাকে সহজাত লজ্জা মনে ক'রে আলিঙ্গন নিবিড়তর করল। একেবারে তার প্রথম খেয়াল হ'ল সীতার কণ্ঠস্বরে, চাপা অথচ প্রায় আর্তকণ্ঠে চিৎকার ক'রে উঠল সে, 'আরে, আরে, ও কী করছ—ও যে উমি, উমি! ছিঃ ছিঃ!...ছাড়, ছাড়!...মা গো, যা ভয় করেছি তাই! ঐ জন্যেই বারণ করেছিলুম মুখপুড়িকে—'

এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত এবং স্বাভাবিক।

প্রথম বিস্ময়, পরে লজ্জা। আরও পরে হাসাহাসি।

সীতা বলল, 'দেখলি তো! এই ভয়ই করেছিলুম। সেই কেলেঙ্কারী একটা ক'রে তবে ছাড়লি!'

উর্মিলা মুখ গোঁজ ক'রে বলল, 'বা রে, আমি কি ক'রে জানব যে, জামাই-বাবু কাজ-কর্ম কামাই ক'রে অসময়ে বাড়ি এসে বৌয়ের খোঁজে শালীর ঘরে ঢুকবেন!'

'শালী কেন—ভাদ্দর-বৌ বল!' স্বামীর দিকে কটাক্ষ ক'রে হেসে বলেছিল সীতা।

'শালী বলাই ভাল। আমাদের তো এই সম্পর্কটাই জন্মগত। ওটা ওদের—'

উর্মিলাও হেসে জবাব দিয়েছিল।

কথাটা সেইখানেই চাপা পড়ে যাবার কথা।

পড়লও তাই।

মা-ও ঘুম থেকে উঠে সব শুনে খুব খানিকটা হাসলেন। ছোট-বৌকে সস্নেহে টেনে কাছে বসিয়ে গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'আবাগীর বেটি, এতই যদি শখ হয়েছিল, আমাকে একটু বলিস নি কেন? তাহলে আগে থাকতে ওদের সাবধান ক'রে দিতুম। এবার থেকে যখন এমন শখ হবে—খুলে বলিস। লজ্জা করিস নি। দেখলি তো—সামান্য একটু লজ্জা করতে

গিয়ে আরও বেশী লজ্জা ডেকে আনলি।'

আবার একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন, 'বরং একটা কাজ কর্ না হয়। তোরা কেউ একজন হাতে—কনুইয়ের কাছে কিংবা পষ্ট দেখা যায় এমন জায়গায়—একটা উল্‌কি ফুটিয়ে নে, একেবারে জন্মের মতো চিহ্ন হয়ে থাক। তাহলে আর এসব ফ্যাসাদ হবে না।'

আরও খানিকটা হাসাহাসির মধ্যে এ আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটল।

সর্বশেষ হাসাহাসিটা হ'ল বিরাজবাবু ও লক্ষ্মণ বাড়ি ফিরতে।

বিরাজবাবু মুখে কিছুই বললেন না, কিন্তু তাঁর প্রসন্ন উজ্জ্বল মুখ দেখেই বোঝা গেল যে, পরিস্থিতির কৌতুক রসটা তিনি বেশ উপভোগ করলেন। লক্ষ্মণ অবশ্য একটু ঠাট্টা-তামাশা করল, তবে সে খুব একটা কিছু নয়। কোন ব্যাপারেই বেশিক্ষণ বা বেশি পরিমাণ হৈ-চৈ চেঁচামেচি তার পোষায় না।

শুধু রাত্রে শুতে গিয়ে যখন ঊর্মিলা তাকে ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'হ্যাঁ গো, তুমি কি আমার ওপর রাগ করলে? সেই থেকে এই কথাটা ভেবেই আমার মনে শান্তি নেই।' তখন তাকে বুকের মধ্যে নিবিড় ভাবে টেনে নিয়ে ওর লজ্জারক্ত অর্ধ-অপ্রতিভ মুখখানা তুলে ধরে বলেছিল, 'তুমি একটা আস্ত পাগল। এর জন্যে রাগ করব কেন? এ তো ভুল ছাড়া আর কিছু নয়। তাছাড়া ভুলে যাচ্ছ আমরা যমজ, আমাদের সম্বন্ধে আমাদের প্রীতি আর আকর্ষণ বাইরেরর সমস্ত আকর্ষণের থেকে বেশি। তুমি আরও কিছু করলেও আমি রাগ করতুম না—বুঝলে সোনা মেয়ে!'

এর পর আর কোন সঙ্কোচ, অপরাধবোধ কি অস্বস্তি থাকার কথা নয়।

আর, ঠিক যে কোন সাকার সঙ্কোচ বা অস্বস্তি বোধ করছিল ঊর্মিলা—তাও না। শুধু কী যেন একটা আব্‌ছা মনোভাব—যা এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—যার কোন অর্থ নেই, সংজ্ঞা নেই, তাকে বহু রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়ে রাখল।

তার পর অবশ্য সকালের সাংসারিক কাজ-কর্মে সে কথাটা মনে ছিল না। প্রত্যুষ থেকে বেলা এগারোটা পর্যন্ত নিরন্ধ্র অনবসরে কাটে, তখন উপস্থিত কাজ ছাড়া কোন কথাই মনে থাকার উপায় থাকে না।

একেবারে দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর শুতে এসে আবার মনে পড়ল

কথাটা। বিয়ের পর এখানে প্রত্যহ দীর্ঘরাত্রি ধ'রে জাগরণের ফলেই দুপুরে ঘুমনোর অভ্যাস হয়েছে ওদের। কোন কোন দিন হয়তো দুই বোনে বসে গল্প করতে করতেই কাটিয়ে দেয়—তবে সে কদাচিৎ, বেশির ভাগই যে-যার ঘরে গিয়ে শয্যা আশ্রয় করে। কিন্তু আজ, দুই চোখ তন্দ্রায় ভারী হয়ে থাকা সত্ত্বেও, উর্মিলা সীতার ঘরে গিয়ে জাঁকিয়ে বসল এবং সম্ভব-অসম্ভব প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক বহু বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা ক'রে জেগে থাকার ও জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করল। তবু একসময় দেখা গেল সীতা গভীর নিদ্রাভিভূত, উর্মিলার কথা শোনার বা তার উত্তর দেওয়ার মতো অবস্থা আর নেই।

তখন আর নিজেকে নিয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

নিজের ঘরেই ফিরতে হ'ল তাকে।

ঘুমের চেষ্টা সে-ও করল খানিকটা, কিন্তু ঘুমে যতই তার শরীর আচ্ছন্ন থাক—মনের যে নিষ্ক্রিয়তায় চোখে তন্দ্রা নামে, সেটা তার নেই তখন।

ফলে আবার সেই অস্বস্তিটা দেখা দেয় একটু একটু ক'রে।

আকারহীন সেই সঙ্কোচ ও লজ্জা।

যে চিন্তাটাকে এতক্ষণ দু'হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে রেখেছিল—সেইটেই পেয়ে বসে তাকে।

কালকের সেই ঘটনাটার কথা।

কী লজ্জা! কী লজ্জা! ছিঃ ছিঃ!

এই নাক-কান মলা, আর কোনদিন যদি সে এমন বেয়াড়া শখ করে!

না-ই বা কেউ বকলেন তাকে, না-ই বা গঞ্জনা দিলেন, তার নিজের তো হায়া-লজ্জা বলে আছে কিছু!

কিন্তু এই আত্মধিক্কার ও গ্লানিটাও যে তার মনের আসল চেহারা নয়—সেটা ক্রমশ স্বীকার করতে বাধ্য হয় উর্মিলা।

আসল যা—তার সম্বন্ধে সে অনবহিতও নয়।

নয় বলেই কাজে কর্মে, নানা বাজে কথায়,—এখন সঙ্গীহীন ঘরে সরব আত্মধিক্কারে—মনের সেই আসল চিন্তাটাকে ঠেলে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে, ভুলে থাকতে চেয়েছে।

এক সময় সে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।

মন তার স্বাভাবিক কাজ ক'রে গেছে।

কখন যে সেই চিন্তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তা উর্মিলা বুঝতেও পারে নি।

কালকের ঐ ভুলটা নিরবচ্ছিন্ন গ্লানিরই সৃষ্টি করে নি—একটা অনাস্বাদিত পুলকানুভূতিরও কারণ হয়েছে।

অস্বীকার ক'রে লাভ নেই, রামের বলিষ্ঠ বাহুর নির্দয় নিপীড়ন এবং সেই উন্মত্ত চুম্বন ভাল লেগেছে তার। ভাল লেগেছে বললেও বুঝি ঠিক বোঝানো যায় না। এরকম অভিজ্ঞতা আর কখনও হয় নি তার, এই বিবাহিত জীবনেও না।

বিয়ের আগে তাদের দুই বোনের কারও জীবনেই উল্লেখযোগ্য কোন প্রণয়ের ঘটনা ঘটে নি। কোন প্রবল আসক্তিই বোধ করে নি কোন পুরুষ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে। সুতরাং, এ ধরনের কোন অনুভূতিও বোধ করে নি।

বিয়ের পর করেছে এটা ঠিক।

ওর স্বামী তরুণ-বয়স্ক। সম্ভবত তারও কোন উল্লেখযোগ্য পূর্ব-প্রণয়ের ইতিহাস নেই। অর্থাৎ স্ত্রীর সম্বন্ধে আসক্তি ও ঔৎসুক্য তারও যথেষ্ট। স্ত্রীকে কামনা করেছে সে সাধারণ তরুণ যুবকের মতোই। তাতে কোন বৈলক্ষণ্যই টের পায় নি ও। আর সেই কারণেই, এতদিন পর্যন্ত তার আলিঙ্গন-চুম্বনই পর্যাপ্ত বোধ হয়েছে, নিজেকে সুখী ও তৃপ্ত বোধ করেছে।

আজও সে তৃপ্তির স্বাদ বিস্বাদে পরিণত হয় নি। হবার কোন কারণ আছে বলেও মনে করে না উর্মিলা। সুখী সে, খুবই সুখী—এমন স্বামী পেয়ে। না, মনের ভেতর যতদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে সে—ক্ষোভ, দুঃখ বা অভাববোধ বলতে তার কিছু নেই। স্বামীকে সে আর কারও সঙ্গে তুলনাও করছে না। তবু—কালকের ঐ আকস্মিক অভিজ্ঞতা যে তার ভাল লেগেছে—সেটাও অস্বীকার করতে পারছে না সে কোনমতেই।

অনাস্বাদিতপূর্ব এ অভিজ্ঞতা। কারও কঠিন আলিঙ্গনে নিপীড়িত হওয়ায় যে এত সুখ, এত আনন্দ—এর আবেশ যে এত দীর্ঘস্থায়ী, তা কালকের আগে আর কখনও এমনভাবে অনুভব করে নি। মনে হচ্ছে জীবনে এই প্রথম সে কোন পুরুষের সাহচর্য লাভ করল, তার জীবনের মানসপদ্মটি প্রথম ভ্রমরের

পাদস্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, প্রথম সূর্যের কিরণে বিকশিত হ'ল। তার এতকালের তৃষ্ণা খুঁজে পেল আকাঙ্ক্ষিত পেয়।

বুঝি এই কামনাই ছিল মনে মনে। এরই জন্য ছিল একটা সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা। সব পেয়েও কী যেন পায় নি ; অথচ কী যে ঠিক পেতে চেয়েছিল তাও বুঝতে পারে নি কখনও।

আজ পেরেছে। আজ বুঝেছে পুরুষের প্রণয়-প্রকাশের বক্তব্য এক হ'লেও ভাষা ও ভঙ্গীতে কিছু পার্থক্য থাকে। আর তা থাকে বলেই দেশে দেশে যুগে যুগে নরনারীর জীবনে নানা অঘটন ঘটে।

না না—ছি ছি! এসব কি ভাবছে সে ছাই-ভস্ম!

এই ওর শিক্ষা, সদ্বংশের সংস্কার!

রাম যে ওর ভাশুর এবং ভগ্নিপতি দুই-ই। তার সম্বন্ধে ওর এ কী চিন্তা!

ওর স্বামীই কি কম! সে-ও তো যে-কোন মেয়ের সাধনার ধন। সুশ্রী, ভদ্র, শান্তস্বভাব। সে-ও তরুণ, তার মনের প্রণয়-বাসনাও কারও চেয়ে কম নয়। পশুর মতো, দানবের মতো যদি তার লালসার চেহারা কদর্য ও রূঢ়ভাবে প্রকাশ না পায় তো তাকে সাধুবাদ দেওয়াই তো উচিত।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল উর্মিলা।

জোর ক'রে ঘরের কাজে লেগে গেল।

তাকের টুকিটাকি জিনিস, টেবিলের ওপরের বই ঘড়ি ওষুধপত্র—সরিয়ে নতুন ক'রে সাজাল। আলমারির কাপড়-জামা অকারণেই টেনে বার ক'রে আবার তুলে রাখল—যেমন ছিল তেমনিই। তারপর ঝিকে সরিয়ে লেগে গেল চা করতে। চায়ের পর্ব শেষ হ'তে শাশুড়ীর কাছ থেকে বঁটি টেনে নিয়ে কুটনো কুটতে বসল।

এর পর আর নিভৃত চিন্তার অবসর থাকে না।

ভাশুর, স্বামী, শ্বশুর একে একে কর্মস্থল থেকে ফিরতে থাকেন, তাঁদের কারও জলখাবার, কারও কফি চাই। কেউ রাতে গরম জলে স্নান করবেন, তার ব্যবস্থা ঠিক রাখা দরকার। এমনি নানান খুচরো কাজে রাত্রের খাওয়া

শেষ না হওয়া পর্যন্ত এক মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়াবারও ফুরসৎ পাওয়া যায় না।

রাত্রে শুতে এসে উর্মিলাই নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল তার স্বামীকে। বলল, 'আজ তোমাকে একটুও ঘুমোতে দোব না। সারারাত জেগে গল্প করতে হবে তোমাকে।'

লক্ষ্মণ আশ্চর্য হয়ে বলে, 'হঠাৎ?'

'হঠাৎ আবার কি! এই তো মোটে দু'মাস বিয়ে হয়েছে আমাদের। এরই মধ্যে পুরনো হয়ে গেলুম নাকি যে, আমার সঙ্গে গল্প ক'রে আর রাত জাগা যায় না? বিয়ের পর প্রথম প্রথম এক মাস তুমিই আমাকে ঘুমোতে দিতে না একটি মিনিটও, আমার চোখ করকর করত—তবু জাগিয়ে রাখতে। সেই আমি কি একেবারে অরুচির জিনিস হয়ে গেলুম!'

আকস্মিক এই আবেগ বা এই ঝাঁঝ—কোনটারই অর্থ খুঁজে পায় না লক্ষ্মণ, তার জন্য কোন অনুসন্ধিৎসাও বোধ করে না তেমন, শুধু সে-ও স্ত্রীকে বুকে সামান্য একটু চেপে ধরে বলে, 'তুমি একটা আস্ত পাগল!'

কিন্তু রাত আর প্রভাত ছাড়াও দিনের একটা বড় অংশ বাকী থেকে যায়। অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যার আগে মধ্যাহ্ন বলে একটা সময় আছে; যখন বাড়িসুদ্ধ সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, বা বিশ্রাম করে। থমথম করতে থাকে দুপুরের রোদ বাড়ির উঠোনে পড়ে, রাস্তার কোলাহল যাতায়াত হয়ে আসে স্তিমিত, পাশের বাড়িতে আল্সেয় বসা কাকের ডাক এমন কি অদূর বড়রাস্তায় ট্রাম-বাসের শব্দও মধুর বলে মনে হয়—তখন তারও চোখে তন্দ্রা নামার কথা, তন্দ্রা আর স্বপ্ন—বিশেষ এই দু'দিন রাত্রি-জাগরণের পর তো অজ্ঞানের মতো ঘুমনো উচিত ছিল—কিন্তু তা নামে না। খানিকটা চুপ ক'রে চোখ বুজে শুয়ে থাকে, তারপর বিরক্ত হয়ে উঠে দিদির ঘরটা দেখে আসে, শাশুড়ীর বিছানায় গিয়ে শব্দ ক'রেই বসে একবার—কিন্তু কাউকেই জাগাতে পারে না। সবাই সুষুপ্ত—শুধু সে ছাড়া। একমাত্র তারই চোখে ঘুম নেই, মনে শান্তি নেই। অথচ শুধু প্রয়োজন নয়, আয়োজনও সম্পূর্ণ, নিদ্রারই উপযোগী। শেষ বসন্তের আতপ্ত বাতাস আর রৌদ্রের আভা থেকে আত্মরক্ষা করতে ঘরের

জানলা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে সেই বেলা দশটা থেকেই—ঠাণ্ডা অন্ধকারে পূর্ণ বিশ্রামের আমন্ত্রণ, ঘরে এসে বসলেই সমস্ত স্নায়ু শিথিল হয়ে আসার কথা। তবুও—

বিরক্ত হয়ে উর্মিলা রাস্তার দিকের একটা জানলা খুলে দেয়। আসুক গরম বাতাস, কড়া রোদের ঝাঁঝ। ঘুম আসবে না, শুধু শুধু অন্ধকারে ঝিমিয়ে পড়ে থাকা—এ তার পোষায় না।

সে একটা মাসিকপত্র নিয়ে ইজিচেয়ারটাতে এসে বসে। ভাল একটা জমাট গল্পের সন্ধানে অন্যমনস্কভাবে পাতা ওল্‌টায়। কিন্তু সে গল্পের খোঁজ আর করা হয় না শেষ অবধি। খুঁজবে যে—সেই মনই তার অন্যত্র চলে গেছে ইতিমধ্যে।...

আচ্ছা, এমন হয় নাকি? এক চেহারা, এক রকম গলার আওয়াজ, মাথার চুল, চোখের তারা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত এক রকমের—আকৃতিতে এত মিল, অথচ প্রকৃতিতে এত তফাত! তবে যে বাবা বরাবর বলে এসেছেন যে, যমজ ভাই-বোনদের চিন্তা বা মানসিক গঠন পর্যন্ত একরকম হয়!...সব বাজে কথা। এই তো তার স্বামী আর ভাশুর—দুটি সম্পূর্ণ দু'রকমের। লক্ষ্মণ কিছুতেই তাতে না, কিছুতেই বিচলিত হয় না—শান্ত নির্বিরোধ, আর রাম ঠিক তার উল্‌টো, সর্বদা হাসিতে খুশিতে তামাশায় যেন ঝলমল করতে থাকে। সে বাড়ি এলে মনে হয় একসঙ্গে দশটা মানুষ এসে ঢুকল; একাই এত চেঁচা-মেচি করে। প্রাণবন্ত, পুরোপুরি মানুষ একটা।

আশ্চর্য! ওর স্বামীই বা এমন সৃষ্টিছাড়া রকমের ভাল মানুষ হ'তে গেল কেন? সর্বদাই তার ভয়—বুঝি কি অভব্যতা বা অভদ্রতা ক'রে বসল। স্ত্রীকে আদর করে, তাও যেন সন্তর্পণে—ভয়ে ভয়ে। স্ত্রী কি মনে করবে, কিংবা তার আঘাত লাগবে—এই ভয়েই যেন গেল সে।

এর চেয়ে লক্ষ্মণ যদি একটু বর্বর গোছের মানুষ হ'ত, একটু রূঢ়, এক-সময় তাকে মার-ধোর করত আবার প্রচণ্ড আদরে প্লাবিত ক'রে দিত—বোধ করি সেও ভাল ছিল।...

দুই ভাইয়ে কত তফাত!..

ভাবতে ভাবতে মন কখন তার ঈপ্সিত চিন্তায় ফিরে আসে তা টেরও পায়

না উর্মিলা। অবশেষে বিগত অপরাহ্ণের অভিজ্ঞতা রোমন্থন করতে করতে একসময় তার সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ-শিহর জাগে। ঠোঁট দুটি অসহনীয় পুলকে ও অসহ তৃষ্ণায় ঈষৎ বিস্ফারিত হয়ে থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে—অদেহী একটা যন্ত্রণায় যেন সমস্ত দেহ-মন আকুঞ্চিত হ'তে থাকে বার বার।

আরও খানিক পরে যেন অভিভূতের মতোই ড্রেসিং টেবিলটার সামনে গিয়ে বসে, ঠিক আগের দিনের মতোই। অবচেতন মন তার স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে খোঁজে আর একটা মুখ—উন্মুখ হয়ে থাকে আর একটি নিভৃত আবির্ভাবের জন্যে।

তার পরই যেন আছড়ে গিয়ে পড়ে বিছানার ওপর।

নিজেকে যেন টুকরো টুকরো ক'রে ফেলতে ইচ্ছা হয়—ইচ্ছা হয় নিজেই নিজের গলা টিপে ধরে এই দেহটার অস্তিত্ব শেষ ক'রে দিতে, তাতে যদি এই কদর্য চিন্তার হাত থেকে অব্যাহতি পায়।

আরও খানিক পরে দু'চোখ জ্বালা ক'রে জলের ধারা নামে। একটা নিগূঢ় অকারণ অব্যক্ত ও অস্পষ্ট অভিমানের বেদনাই যেন সে ধারা বেয়ে বেরিয়ে আসে—নিঃশব্দে, নিঃশেষে।

আর তাতেই যেন খানিকটা শান্তি পায়, প্রকৃতিস্থ বোধ করে।

সেদিন রাত্রে কথায় কথায় একসময় স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল উর্মিলা, 'হ্যাঁগো, তুমি যে সেদিন বলেছিলে তোমাদের বদলির চাকরি, দরকার হ'লে বাইরে যেতে হবে?'

'হ্যাঁ, বলেছিলুম তো। কেন বল দেখি? এখন থেকেই ভয় হচ্ছে নাকি?'

'না, না। তা নয়।...এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলুম। তা বেশ তো, হ্যাঁগো, চল না কোথাও দু-চার মাসের জন্যে বদলি হয়ে—বেশ, তুমি আর আমি থাকব—এই ক'টা মাস, আবার একটু তদ্বির ক'রে না হয় ফিরে আসবে।'

বিস্মিত হয় লক্ষ্মণ। একটু ভুলও বোঝে। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আহত কণ্ঠে বলে, 'কেন বল তো? এরই মধ্যে শ্বশুরঘর করায় অরুচি হয়ে গেল নাকি!...না কি, এটাই পৃথক হবার প্রস্তাবের পূর্বাভাস?'

'ওমা, ছি ছি! আমি কি তাই বললুম নাকি! ঘাট হয়েছে আমার, কথা বলাই দেখছি অন্যায় হয়েছে।...বলে কত তপস্যা করলে তবে এমন শ্বশুর-শাশুড়ী মেলে—আমি তাঁদের ছেড়ে পৃথক হয়ে যাব! বেশ তো তুমি আমাকে এই চিনলে এতদিনে!'

'তাহ'লে এ কথার মানে?' আরও বিস্মিত হয় লক্ষ্মণ।

লজ্জিত ও অপ্রতিভ উর্মিলা তার হাতের খাঁজে মুখটা গুঁজে দিয়ে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে, আস্তে আস্তে বলে, 'এমনিই, তোমাকে খুব একান্ত ক'রে পেতে ইচ্ছে করে কিছুদিন। এই, আর কিছু নয়।'

আশ্বস্ত হয় লক্ষ্মণ। আগের দিনের মতোই মুখটা তুলে ধরে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলে, 'তুমি একটা আস্ত পাগল, বুঝলে!'

একটি অখ্যাত জীবন

প্রথমটা আমার স্ত্রী কমলাও চিনতে পারেন নি। আমার তো চেনবার কথাই নয়। কারণ কমলারই ছাত্রী—সেই সুবাদে আসত যেত, ভাল ক'রে তাকাবারও প্রয়োজন পড়ে নি। আর সে আসা যাওয়াও তো দীর্ঘদিন অন্তর অন্তর। সব সময় আমি থাকতুমও না বাড়িতে। আমি কাজ করতুম সরকারী দপ্তরে, কমলা স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। যা দেখেছি, শুনেছি তার বেশি। তাই শেষ পর্যন্ত উনি যখন চিনতে পেরে বললেন, 'সেই যে গো—সূর্যকুণ্ডের নীলি। মনে পড়ছে না?' তখন চিনতে পারলুম ঠিকই, তবে চেহারাটার কোন স্মৃতি মিলিয়ে নিতে পারলুম না।

এমন অনেক ছাত্রীই বাড়ি আসত। দীর্ঘদিন ধরেই আসছে। কালিদাস রায়ের 'ছাত্রধারা'র ভাষায় 'বর্ষে বর্ষে দলে দলে' এসেছে। আমার স্ত্রী হেড-মিস্ট্রেস ছিলেন, হলেন প্রিন্সিপাল। মানে ইন্টার কলেজ হল যখন। পরে ডিগ্রি কলেজও হয়েছিল—ওঁর পদবী যায় নি, সে যোগ্যতা ওঁর ছিল। তবে সেজন্য যে এত ছাত্রী আসত যেত তা নয়—উনি যেমন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন, সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু ক'রে সরকারি ইন্সপেক্টররা পর্যন্ত সমীহ ক'রে চলতেন—তেমনি ছাত্রীদের ছিলেন আপনজন। তারা ভয়ও করত,

ভালও বাসত। তার কারণ উনিও তাদের ভালবাসতেন—যাদের মধ্যে কিছু প্রতিশ্রুতি দেখতেন, তাদের দিকে ব্যক্তিগত মনোযোগ দিয়ে চোখে চোখে রাখতেন—বিগড়ে না যায়।

নীলিমা ক্লাসের সেরা ছাত্রী না হ'লেও ভাল ছাত্রী ছিল। গানের গলাও ছিল মিষ্টি, বোনার হাত ভাল। ভাল আলপনা দিতে পারত। সেই জন্যে নীলিমাকে যখন হঠাৎ পড়াশুনা বন্ধ করতে হ'ল, উনি খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। ওঁর সে আপসোস আর ব্যাকুলতা দেখেছি বলেই—আজ বলামাত্র মেয়েটার কথা মনে পড়ল।

অথচ সেদিন আর কোন উপায়ই ছিল না। বাবাকে দুর্দান্ত হাঁপানির জন্যে অসময়ে রিটায়ার করতে হয়েছিল, পেনসন যা পাবার কথা তার অনেক কম পেতেন। বড় সংসার, লোক রেখে চালাবার সামর্থ্য ছিল না। ওর বাবা কিছু কিছু ঠিকুজি কোষ্ঠী করতেন, তাতেই বা কত আয় হবে। তেমন নামকরা বড় জ্যোতিষী কিছু ছিলেন না। তাছাড়া মাসের অর্ধেক দিন যাকে বসে বসে হাঁপাতে হয়—সে আর কত রোজগার করবে?

এইখানেই সম্পর্কের পূর্ণচ্ছেদ পড়বার কথা। কিন্তু পড়ল না। বছর তিন-চার পরে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম থেকে খবর এল—এক রোগিণী কমলাকে দেখতে চায়। নাম নীলিমা লাহিড়ী। তার নাকি অবস্থা খারাপ। উনি প্রায় তখনই ছুটে গেলেন। সত্যিই অবস্থা খারাপ। টাইফয়েডের সঙ্গে নিউমোনিয়া যোগ হয়েছে। বাড়িতে কোন চিকিৎসা হচ্ছিল না দেখে পাড়ার লোকে দয়া ক'রে হাসপাতালে ফেলে দিয়ে গেছে। ওঁকে দেখে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল মেয়েটা। মোটামুটি সুশ্রী দেখতে ছিল। স্বাস্থ্যও খুব খারাপ ছিল না। সেই মেয়ের এই হাল, মাত্র দু-তিন বছরে।

তা উনি করলেনও ঢের। ওষুধ পথ্য নিজেই কিনে দিলেন। তারপর মেয়েদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে ম্যানেজিং কমিটির মেম্বারদের ধরে কিছু কিছু আদায় ক'রে—তার সঙ্গে নিজেও কিছু যোগ ক'রে চিকিৎসার খরচ চালিয়েও পাঁচশো টাকা সঙ্গে দিয়ে নিজের বৌদির কাছে পাঠিয়ে দিলেন আজমীরে—যাতে মাস দুই থেকে আসতে পারে।

এরপর যে সহজ কৃতজ্ঞতাটুকু আশা করে মানুষ (অবশ্যই জীবন-

অভিজ্ঞরা জানেন, কৃতজ্ঞতা আশা না করাই উচিত, তাতে অনেক শান্তি) তা পেলেন না কমলা। নীলিমা সেখান থেকে নাকি মাসখানেক পরেই চলে এসেছিল এবং এসে তাঁদের পৌঁছ-সংবাদ দিলেও, বড় দিদিমণিকে কিছু জানানো প্রয়োজনবোধ করে নি।

মুখে প্রকাশ না করলেও আমি বুঝেছিলুম উনি একটু ক্ষুণ্ণই হয়েছিলেন।

তবে কারণটা বোঝা গেল আর বছর খানেক পরে।

বলতে গেলে যখন আমাদের পাড়াতেই—মিনিট তিনেকের পথে—একটা বাড়িতে এসে ওরা উঠল।

না, নীলিমা দেখা করে নি বা খবর দেয় নি। খবর পাওয়া গেল লোক-পরম্পরায়।

যা শোনা গেল তা থেকে নীলিমার সংসার চালানোর ইতিহাস অনুমান করতে বিলম্ব হল না। অনুমানই বা কেন—কেউ কেউ তো স্পষ্টই বলে দিলেন।

ওর পরের ভাইকে নীলিমাই বলে কয়ে এক কারখানাতে ঢুকিয়েছিল। সে কোথায় পালিয়ে গেছে। ছোট দুটো ভাই বোন পড়ছে এখনও। কে একটি মাঝারি আয়ের ছোকরা সন্ধ্যায় আসে, রাত্রে ওখানেই খায়, রাত সাড়ে নটা দশটা পর্যন্ত থাকে। সে-ই ওদের সংসারের সব খরচ চালাচ্ছে। এ পৃথক বাড়িও সেই ছেলেটিই ঠিক করেছে। ছোট বাড়ি, ভাড়া কম। নিচের তলা সবটাই দোকান ঘর। অর্থাৎ বাইরের কেউ আসার সম্ভাবনা নেই।

কমলা সব শুনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

এর বছর দুই পরে ছোট বোন ইভা নিজেই একটা পাত্র ঠিক ক'রে ফেলল। তবে স্ব-ঘর, কথাবার্তার বিয়েতেও দোষ নেই। কথাবার্তাও চলল। দেখা গেল প্রণয়ের পরিমাণ দিয়ে পণের পরিমাণ সবটা শোধ হয় না। কিছু না কিছু না ক'রেও পাঁচ হাজার টাকার কম বিয়ে উঠবে না। তাও কাশী শহর বলেই—এই অঙ্কে নাকি বিয়ের কথা ভাবা যাচ্ছে। কলকাতা হলে স্বপ্ন দেখাও সম্ভব হত না।

নীলিমার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে, কোন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলেই

ছুটো ঠোঁটের ভঙ্গীতে একটা দৃঢ় সঙ্কল্পের ভাব ফুটে উঠত। একথা কমলাই বলেছেন অনেকবার।

কোথা থেকে কি করল জানি না—বোনকে ছু-চারটে দিন ধৈর্য ধরে থাকতে বলে হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল। জনশ্রুতি—বিশ্বেশ্বর-গঞ্জের এক ধনী হিন্দুস্থানী ব্যবসায়ীর একটি ছেলে ওকে নিয়ে নৈনীতালে চলে গেছে।

মাস দেড়েক পরেই ফিরল নীলিমা। পাঁচটি হাজার টাকাই গুণে বাবার হাতে দিয়েছিল।

অনাবশ্যক বোধেই এ টাকা কোথা থেকে কেমন ক'রে এল কেউ প্রশ্ন করল না। হাত পেতে নেবার সময় ওর বাবা লাহিড়ীমশাই মাথা হেঁট করেছিলেন কিনা—সে ইতিহাস কেউ জানে না।

শুভবিবাহ নির্বিঘ্নে চুকে গেল, বোন ভগ্নীপতি নিজেদের বাড়িতে গিয়ে উঠল। কিন্তু অষ্টমঙ্গলার দিন বোন ফিরল অন্য মূর্তি নিয়ে।

সে বোমার মতো ফেটে পড়ল যেন।

'ছি ছি ছি! তোর জন্যে শ্বশুরবাড়িতে আমার মুখ দেখাবার উপায় রইল না! কেউ বলছে, ঐ খানকীর ঝাড় জেনেশুনে ঘরে তুললে! কেউ বলছে, বেশ্যের রোজগারের পয়সার জিনিস সব গঙ্গাজলে ফেলে দিয়ে এসো গে। নেহাৎ এর পয়সায় সংসার চলছে বলে শ্বশুর শাশুড়ী কিছু বলছেন না—কিন্তু শাশুড়ী অবিরাম কাঁদছে—বরণ পর্যন্ত নিজে করল না! ইস! এর চেয়ে আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভাল ছিল! এই ভাবে রোজগার করার আগে গঙ্গায় গিয়ে ডুবতে পারলি না!'

নীলিমা যেন পাথর হয়ে গেল। তারপর শান্তভাবে বলল, 'তাহলে তোর বিয়েটা হ'ত কি ক'রে?'

'না হয় না হত! ওর টান থাকলে নিজেই সব খরচ ক'রে বিয়ে করত!'

'এতদিন খেতিস কি? সংসারটা চলত কিসে তা ভেবেছিস!'

'এই খাওয়ার খোঁটা দিচ্ছিস! না হয় উপোস করে মরতুম। সে এর চেয়ে ঢের ভালো।'

'কই, এতদিন সে কথা বলিস নি তো।'

আর কিছু বলে নি নীলিমা, বোনকেও কোন উত্তর দেবার সময় দেয় নি। তখনই একবস্ত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা আমাদের বাড়িই চলে এসেছিল।

সব ঘটনা জানিয়ে ওর দিদিমণিকেই বলেছিল, 'বড়দিমণি—ঈশ্বর জানেন, লজ্জাতেই আপনাকে মুখ দেখাতে পারি নি। অথচ আর কোন উপায়ও যে দেখতে পাই নি। আপনি চিরদিন আমাকে ক্ষমা করে এসেছেন, দয়া ক'রে এসেছেন। আপনিই বলুন আমি এখন কি করব। আত্মহত্যা করতে পারি হাসি মুখেই। কিন্তু ভাবি গত জন্মের পাপে এ জন্মে এই জ্বালায় জ্বললুম—আরও পাপ বাড়াব।'

কমলা তাঁর স্বভাবমতো স্থির হয়ে সব শুনলেন, নীরবেই বসে রইলেন আরও কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'তুই এক কাজ কর্, আমার ছোট ভাই থাকে ভবানীপুরে, তার সঙ্গে সেবা প্রতিষ্ঠানের জানাশুনো আছে। চিঠি লিখে দিচ্ছি, সেখানেই থাকিস কিছুদিন—ভাই তোকে ওখানে আয়ার কাজের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবে। রুগীর সেবা পুণ্যকর্ম—তাছাড়া এখন মজুরীও ঢের বেশি হয়েছে শুনেছি। এক এক বেলায় দশ বারো টাকা পাওয়া যায়। আমি দুশো টাকা দিয়ে দিচ্ছি, যতদিন না কাজ শিখে নিজের খরচ নিজে চালাতে পারিস—এতেই চালিয়ে নিস। নইলে আমার ভাইকে বলিস, সে কিছু মাইণ্ড করবে না। আরও দিতে পারতুম—কিন্তু আমারও রিটায়ার করার সময় হয়ে গেল জানিস তো—হিসেব ক'রে চলতে হবে। তা তোর বাপের কি হবে, কে দেখবে?'

'জানি না। আর কিছু ভাবব না ওসব। ঢের ভেবেছি। আমারও ভবিষ্যৎ আছে, কতদিন বাঁচব তার তো ঠিক নেই।'

সে টাকাটা নিয়ে, আমার স্ত্রীর কাছ থেকে একখানা পুরনো শাড়ি চেয়ে নিয়ে দূর থেকেই প্রণাম ক'রে চলে গেল।

তারপর এই। সে যে আয়ার কাজ করছে, সেটা জেনেছিলুম আমার শালার মুখ থেকে। কাজেই আর খবর রাখার প্রয়োজন বোধ করি নি। করি নি মানে কমলা করেন নি। আমার অত মনেও ছিল না।

আজ যাকে দেখলুম তার চুলের কোণে কোণে পাক ধরার লক্ষণ দেখা দিলেও একেবারে বৃদ্ধায় পরিণত হয় নি। এখনও একটু শ্রী আছে। দেহে মেদের লক্ষণও দেখা দিয়েছে। সবচেয়ে যেটা দেখে চমকে উঠলুম—সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে লোহা—শাঁখা। দু গাছা ক'রে চুড়িও।

কমলারও দু চোখ স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। বললেন, 'বড্ড ভাল লাগছে রে, তোকে যে কোনদিন এ বেশে দেখব—আশা করি নি। বোস বোস। তা জামাই কোথায়?'

'এসেছেন। আমরা একটা হোটেলে উঠেছি। আপনার হুকুম পেলেই নিয়ে আসব। তবে উনি সবই জানেন, কিচ্ছু গোপন করি নি—ভয়ের কোন্ কারণ নেই। আমরা যাচ্ছি বোম্বেতে, সেখানে ওঁর কে বন্ধু আছেন, অনেক ক'রে লিখেছেন। এখানে একদিনের জন্য এসেছি—শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করব বলেই—'

সব কথাই একে একে খুলে বলল নীলিমা।

আয়ার কাজ করতে করতেই শরৎবাবুর সঙ্গে আলাপ। শরৎবাবু বিয়ে করেন নি। ছোট ভাই করেছে। তারা কেউ মাকে দেখত না। মা মারা গেলেই উনি চাকরি ছেড়ে সন্ন্যাস নেবেন এই ছিল প্রতিজ্ঞা। মা না কি গত ত্রিশ বছর ধরেই মরো-মরো হয়ে ছিলেন, কিন্তু চিররুগ্নরাই বেশিদিন বাঁচে। শরৎবাবুই রান্না ক'রে মাকে খাওয়াতেন। সবই করতেন। শেষে যখন একেবারেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়তেন মা—আয়ার দরকার হ'ল। শরৎবাবুর মিশনে যাতায়াত ছিল। ওঁরাই ব্যবস্থা ক'রে বামুনের মেয়ে বলে নীলিমাকে ঠিক ক'রে দেন।

মাস দুই থাকতে হয়েছিল নীলিমাকে। সে দিনেই থাকত। রান্না-বান্না রুগীকে নাওয়ানো-ধোওয়ানো সব করত। সেজন্য কিছু বেশিই দিতেন শরৎবাবু। মার মৃত্যুর পরও শ্রাদ্ধশান্তি পর্যন্ত ধরে রাখলেন।

কিন্তু তারপর আর নীলিমা থাকতে রাজী হয় নি। একটা একানে বাড়ি, ছোট হ'লেও তার ধোওয়া-মোছা আছে। রান্না খাওয়া, অন্য কাজ—শরৎবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আরও অসুস্থ হলেন—খাওয়াটা হোটেলেই সারবার চেষ্টা করছিলেন—সেটা সহ্য হ'ল না। খবর পেয়ে নীলিমাই আগে

এল। ঠিক হ'ল সে আটটার পর এসে রান্না ক'রে দেবে—উনি আপিস চলে গেলে বাড়ির কাজ সেরে নিজে খেয়ে ঘুমিয়ে রাত্রের খাবার ক'রে রেখে সন্ধ্যায় চলে যাবে—বাইরের দোকানদারের কাছে চাবি রেখে। যদি উনি সন্ধ্যের মধ্যে এসে পড়েন—চাও ক'রে দিয়ে যেতে পারে। তবে রবিবার কি কোন ছুটির দিন দুপুরবেলা থাকবে না। উভয়েরই দুর্নামের ভয়। এতেই অন্য আয়ারা অনেক কথা বলত।

শরৎবাবুর কেউ নিকট-আত্মীয়া ছিলেন না। অসুখের খবর পৌঁছতে এক পিসতুতো দিদি এলেন। তাঁরা থাকেন আগ্রায়, খবর পৌঁছতে আর তিনি সময় ক'রে টিকিট ক'রে আসতে অনেকদিন কেটে গেছে। এসে নীলিমাকে দেখে, ওর নিপুণ গৃহিণীপনা ও শরৎবাবুকে যত্ন করা দেখে তিনিই কথাটা পাড়লেন।

'হ্যাঁরে, ওর তো শুনছি আজও বে হয় নি। বামুনের মেয়ে—ওকে বে ক'রে নে, সব ঝঞ্ঝাট চুকে যাক। ওকেও আর এই গু-মুত ঘাঁটার কাজ করতে হয় না—তুইও ভাত জল পাস। কদ্দিন আর এমনভাবে থাকবি।'

শরৎবাবু তবু লজ্জায় কথাটা তুলতে পারেন নি। দিদিই গিয়ে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে ধরে অনুমতি নিয়ে ওকে চেপে ধরলেন। রেজিস্ট্রি বিয়ে হবে—উনিই দাঁড়িয়ে থেকে মাথায় সিঁদুর দিয়ে ফিরে যাবেন।

আর ইতস্তত করে নি নীলিমা, নিজেই সব কথা খুলে বলেছিল। এতদিন পরে যদি বাসা বাঁধার সম্ভাবনা এসে থাকে—মিথ্যার ওপর তা বাঁচবে না। সব শুনে উনি বলেছিলেন, 'তোমার বৃদ্ধ অশক্ত বাবার জন্যে ছোট ভাইবোনের জন্যে যা করেছ—তাকে আত্মদান বলাই উচিত। এতে তোমার কোন পাপ হয় নি নীলিমা।'

আর একটু থেমে বলল, 'উনিও ওঁর অবস্থার কথা খুলে বলেছেন। ওঁরও বিশেষ কিছু রেখে যাবার নেই। বাড়ি নিজের নয়। কখনও ঘর বাঁধবেন তা ভাবেন নি—তাই টাকা জমাবেন কি চাকরিতে উন্নতি করবেন—এ চেষ্টা করেন নি। একটা সামান্য লাইফ-ইনসিওরেন্স আছে, সামান্য কিছু ব্যাঙ্কে। পঞ্চাশ বছর বয়স, আট বছর পরে রিটায়ার করতে হবে। যা পেনসন পাবেন তাতেই চালাতে হবে। উনি যদি বেঁচে থাকেন, ভালো থাকেন—হয়তো আর কোন কাজকর্ম কি ছেলে পড়ানোর কাজ করতে পারেন—মারা গেলে

বিধবার পেনসন ভরসা। সব পরিষ্কার ক'রেই বলেছেন, আমি জেনেই রাজী হয়েছি।'

তারপর ব্যাগ থেকে কিছু টাকা বার ক'রে বলল, 'বড়দিমণি, আপনি যা করেছেন তার ঋণ আপনার জন্যে জীবন দিলেও শোধ হয় না। টাকার ঋণ কিছুটা শোধ ক'রে যাই। এ আমার কোন পাপের টাকা নয়—নিজের খাটুনির দরুন জমানো টাকা—'

কমলা বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক না নীলি—নতুন সংসার পেতেছিস, তোদের কাজে লাগবে। তুই ফেরত দিতে এসেছিস মনে ক'রে—এই তো ঢের।'

'না দিদিমণি, এটা রাখুন। আমারই মতো কোন অভাগীর কাজে লাগতে পারবে।'

কমলা বললেন, 'তোর বাপের খবর রাখিস? এখনও বেঁচে আছে বুড়ো। একটা বাড়ির নিচের তলার ঘরে থাকতে দিয়েছেন এক ভদ্রলোক—তাঁকেই পেনসনের টাকাটা ধরে দেয়—তিনি একবেলা ছুটি খেতে দেন। তোর ছোট ভাইও তো ফেলে পালিয়েছে। স্যাঁতসেঁতে ঘর, তাতে আরও হাঁপানীর কষ্ট—কিছু খেতে পায় না, কেউ দেখে না—অর্ধেকদিন ময়লা মেখে পড়ে থাকে।'

মাথা হেঁট ক'রে নীলিমা বলে, 'শুনেছি দিদিমণি। উনি সে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা ক'রে কথা বলে এসেছেন, মাসে পঁচিশ টাকা ক'রে পাঠাবেন—কাপড়চোপড় কাচা, বিছানা বদলানোর জন্যে একটা ঠিকে ঝি বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন তাঁরা। এর বেশি ওঁর আর সাধ্য নেই। তাহলে আসি আজ দিদিমণি—'

সে প্রণাম করে উঠতে যাচ্ছিল, কমলা বললেন, 'দাঁড়া, আমিও যাই তোর সঙ্গে—জামাইকে নেমন্তন্ন করে আসি। রাত্রে তোরা এখানে খাবি।'

অঘটন

জীবনে এমন নাটকীয় ঘটনা ঘটে—একথা সে বহু বার বহু লোকের কাছে শুনেছে, কাগজেও পড়েছে। কিন্তু তাই বলে তার জীবনে এমন অঘটন ঘটবে, এমনভাবে প্রায়-বুড়ো-বয়সে বেইজ্জৎ হতে হবে তা কখনও ভাবে নি দীপেন।

এতখানি বয়স অবধি বিয়ে করে নি দীপেন তার মার মুখের দিকে চেয়েই। পরপর তিনটি ভাইকে চোখের সামনেই দেখল—বিয়ের পর কত কি ছুতো ক'রে পৃথক হয়ে যেতে—একজনের এতদূর থেকে আপিস করার অসুবিধে, ছেলেমেয়েদের ভাল ইস্কুলও নেই এখানে; আর একজন তদ্বির ক'রে বদলি হয়ে গেল—সে বদলি আর বদলে কখনও কলকাতায় এল না; তৃতীয়টি তো কুৎসিত ঝগড়া বিবাদ করে, এমন কি আপন মা-ভাইয়ের বাপ-মা তুলে গাল দিয়ে চলে গেল—তারপর আর নিজের বিয়ে করতে সাহস হয় নি।

কিন্তু এই চল্লিশ পার হয়ে এসে—যখন নিজেকে নিরাপদ ভাববার কথা —ধার দেনা ক'রে ছোট্ট এই দু-কামরার বাড়িটুকু করতেই বিপত্তি দেখা দিল। মা ক্রমশ অথর্ব হয়ে পড়ছেন ঠিকই—উঠে আর রান্নাবান্না করতেও পারেন না, সে কাজটা দীপেনই চালিয়ে নিচ্ছিল—কিন্তু এমন অসহায় ভাবে একা এই নতুন পরিবেশে নতুন বাড়িতে পড়ে থাকতে তিনি রাজী হলেন না কিছুতেই। বললেন, 'ওখানে তবু অন্য ভাড়াটেরা ছিল, এতকালের আলাপ পরিচয়, তারা দিনে চোদ্দবার খোঁজ খবর নিত, অসুখে সেবা করেছে, সেবার কলঘরে পড়ে গিয়ে উঠতে পারি নি না—চেঁচাতে তারা করাত দিয়ে দোর কেটে আমাকে বার ক'রে ডাক্তার দেখিয়ে তবে তোকে আপিসে খবর দিয়েছে। এখানে এমন ভাবে পড়ে থাকলে কেউ জানতেও পারবে না। ঠিকে ঝি দুবার কড়া নেড়ে চলে যাবে, তাছাড়া সে তো রোজ আসেও না—তুই রাত্তিরে এসে লোকজন ডেকে দরজা ভেঙে ঢুকতে ঢুকতে, আমি মরে কাঠ হয়ে পড়ে থাকব। না, হয় তুই বে-থা কর্, না হয় আমায় কোন অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দে।'

অতএব বিয়ে।

ইঙ্গিতমাত্রে বন্ধুরা সক্রিয় হয়ে উঠল। পাত্রীও যেন যোগানো ছিল। অতসীরও বয়েস হয়েছে, পঁয়ত্রিশের কম না, মোটামুটি সুশ্রী—পাল্‌টি ঘর। তার নিজস্ব কিছু পলিসি আছে—তা বেচে বিয়ের খরচা চালাবে। শুধু একটি শর্ত—সে যা মাইনে পায় তার অর্ধেক বাপের বাড়ি দেবে, তাতে যেন দীপেন আপত্তি না করে।

আপত্তির কোন কারণই ছিল না। দীপেনও মোটামুটি ভাল মাইনে পেত।

শুরু হয়ে গেল তোড়জোড়। দিন স্থির হল, বাজার হাট সব শেষ; গায়ে-হলুদের সব আয়োজন; দীপেন ইচ্ছে ক'রেই অনেক ভাল ভাল কাপড় কিনল; চিঠি ছাপা, নিমন্ত্রণ—মায় আশীর্বাদ পর্যন্ত হয়ে গেল; দীপেনের দাদা টিকলি দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, ওপক্ষ দিলেন বোতাম; বিয়ের ঠিক একটি দিন বাকী আছে, ঠিকে ঝি মালতা এসে জানাল, 'কে একটি বাবু আপনাকে বাইরে ডাকতেছে।'

অনেক কাজ হাতে, একটু বিরক্ত হয়েই দীপেন বেরিয়ে এল। দেখল খুব স্মার্ট চেহারা ও আধুনিকতম পোশাক-পরা একটি ছোকরা বাইরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে শিস দিচ্ছে অর্থাৎ ঠোঁটে শিসের ভঙ্গী করছে একটা।

'আপনি কাকে চাইছেন বলুন তো?'

'আমি আপনাকেই চাইছি। জানি আপনি আজ ভীষণ ব্যস্ত, আমারও কাজ আছে, আমি ভ্যাগাবণ্ড নই—সুতরাং সময় নষ্ট করব না। সোজাসুজি কাজের কথাই পাড়ছি। আপনি যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন আইনত সে আমার স্ত্রী। দু বছর আগে ৬ই জুন আমাদের রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয়েছে। সে বিয়ে নাকচও হয় নি। এই দেখুন—সার্টিফিকেট আমি নিয়েই এসেছি, আর নাকচ যে হয় নি তা আপনি খোঁজ করলেই জানতে পারবেন। চাই কি নিরিবিলিতে পাত্রীকেও জিজ্ঞাসা করতে পারেন। শুনেছি তো এর মধ্যে দু-তিন দিন ফোনে কথাও হয়েছে।' খুব শান্ত, সহজভাবে কথাগুলো বলে সে আবার তেমনি শিসের ভঙ্গী করতে লাগল।

কাগজটা দেখল দীপেন। সার্টিফিকেট মতে লোকটার কথা ঠিকই।

নাম ধাম বিবরণে কোন ভুল নেই। সাক্ষীর মধ্যে ওর পরিচিত ব্যক্তিও আছে।

'তা এতদিনেও ডিভোর্স হয় নি কেন?'

'ইচ্ছে নেই বলে।' সহজ শান্ত উত্তর।

'ও পক্ষও কোন চেষ্টা করেন নি কেন?'

'সেটা ওকেই জিজ্ঞাসা করবেন। আমার তো মনে হয় ইচ্ছে নেই বলেই।'

'তা এখন কি করতে চান?'

'যৎকিঞ্চিৎ অর্থ চাই। খুব ঠেকে পড়েছি। আপনি যদি বলেন, আমি আজই অঙ্গীকার পত্র উকীলকে দিয়ে লিখিয়ে রেজিস্ট্রি ক'রে দিচ্ছি—এই সপ্তাহের মধ্যে আপসে, মানে উভয় পক্ষের সম্মতিতে, বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা ক'রে দেব। কোন লোক-জানাজানি হবে না—কেউ টের পাবে না।'

কঠিন হয়ে উঠল দীপেন এবার। বললে, 'তাতেও কিন্তু এ বিয়েটা বেআইনী হয়ে থাকবে। না—ধন্যবাদ, সময়ে সতর্ক করার জন্যে।'

এইবার যেন ছোকরার সেই বেপরোয়া—ঈষৎ বিদ্রূপের ভঙ্গীটা বদলে যায়। বলে, 'কিন্তু এসব আয়োজন—এত দূর এগিয়ে—খাকতাইয়ে পড়বেন না? লোককে বলবেন কি?'

'কি বলব তা আর ভাববার সময় পেলুম কই। সে যা হয় একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে। ভবিষ্যতের অনেক ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে তো বাঁচব। তা ছাড়া তিনি অপরের বিবাহিতা, এবং এখনও আপনাতে আসক্তা—এ জেনেও তাঁকে বিয়ে করব—আমি এত বেওকুফ নই। বিবাহ বিচ্ছেদ হলেও আপনাদের বিচ্ছেদ হবে না, এটা বুঝেছি।'

'কিন্তু এখন বিয়ে ভেঙে দেবেন—ওরা যদি ব্রীচ অফ কনট্র্যাক্টের মামলা আনে? মেয়ের বাবাও তো অপদস্থ হবেন।'

'আপনার সর্টিফিকেটের নম্বর, তারিখ, কোথাকার অফিসার—সব দেখে মনে মনে নোট করে নিয়েছি। আমার মেমারী যে কত ভাল—তা আমার আপিসের যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন।'

সে এবার সশব্দে ছোকরার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল।

ঝঞ্ঝাট একটু হল বৈকি।

ছুটোছুটি ক'রে যতদূর সম্ভব নিমন্ত্রণগুলো নাকচ করতে হ'ল। ওর দাদা গিয়ে মেয়ের বাবাকে যাচ্ছেতাই ক'রে এলেন। লজ্জা ও বিভ্রাটের শেষ রইল না। খরচও একগাদা হয়ে গেল।

এ নাটকের এইখানেই শেষ হবার কথা, কিন্তু তা হ'ল না।

দিন চারেক পরে দীপেন আপিসে একটা ফোন পেল। অতসীর গলা। ও ছোকরা মিথ্যে বলে নি—সত্যিই দীপেন নিজেই উপযাচক হয়ে, দিন দুই ফোন করেছিল। বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে যাচ্ছে, মেয়েটাকে একটু বুঝে নেওয়া ভাল—এই হিসেবে। এতদিন দীপেনের নিজেরও কতকগুলো অভ্যাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে, অতসীরও হবে এটাই স্বাভাবিক। সেটাই মিলিয়ে নিতে চেয়েছিল। কথাবার্তা মন্দ লাগে নি—তাও স্বীকার করতে বাধ্য দীপেন।

অতসী বলল, 'দেখুন আমার সত্যিই অপরাধের সীমা নেই—তবু আপনার সঙ্গে কথা কয়ে যা বুঝেছি আপনি ভদ্রলোক। সেই ভরসাতেই একটি ভিক্ষা চাইছি, যদি দয়া ক'রে আমাকে মিনিট দশেক সময় দেন কোথাও। আমার দুটো কথা বলে বিদায় নেব। আমি যে কত নিরুপায় সেটাই আপনাকে বুঝিয়ে বলতে চাই।'

'এখন আর এসব নাটক ক'রে কোন লাভ আছে?' তিক্ত কঠিন হয়ে ওঠে দীপেনের কণ্ঠ।

'ঐ যে বললুম, এটা আমার ভিক্ষা। নিজের একটু সান্ত্বনা। প্লীজ।'

'তা কোথায় কখন দেখা করতে চান বলুন?'

'কোন রেস্তোরাঁ কি সিনেমায়? কিংবা কোন পার্কে?'

'না, প্রকাশ্য কোন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা হতে পারে। নিভৃতে কোথাও না। আবার কি ফাঁদ পাততে চাইছেন সেটা তো বুঝছি না।'

একটুখানি নীরবতা।

'বেশ, তাহলে আজ এই ব্র্যাবোর্ন রোডে? আমার আপিসের কাছাকাছি কোথাও?'

'না—বড় ব্যাঙ্কটার সামনে।' দীপেন ফোন রেখে দিল।...

অতসী মাথা নামিয়েই বলল, 'আর মিছে কথা বলব না। তাপসকে আমি সত্যিই ভালবাসি। হয়ত আমার চেয়ে ওর বয়স কম বলেই এতটা দুর্বলতা। সেই জন্যেই—এখনও ঘর বাঁধা যাবে না বুঝে—পাছে হাতছাড়া হয়ে যায় এই ভয়ে রেজেস্ট্রী করেছিলুম। তাপস ভালভাবেই বি. কম. পাস করেছিল। সত্যিই ভাল লেখাপড়া জানে—কিন্তু খুঁটির জোর নেই বলেই কোন ভাল চাকরি পায় নি কোথাও। এখন একটা বইয়ের দোকানে কাজ করে—শ' দুই টাকা মাত্র মাইনে পায়। সেটা ওর হাত খরচেই চলে যায়। আমার যা মাইনে তাতে গরিবের মতো চলে যায় হয়ত—কিন্তু আপনি তো জানেন, আমার বাবাকে অসময়ে পেনসন নিতে হয়েছিল স্ট্রোকটার পরে—সামান্য পেনসন, এখনও আমার ছোট ভাইটা ইস্কুলে পড়ছে। বড় ভাইও সবে চাকরিতে ঢুকেছে লোয়ার ডিভিসান ক্লার্ক হয়ে। কাজেই আমার মাইনের সব টাকা নিজের সংসারে দিলে মা বাবাকে উপোস ক'রে মরতে হয়। জমাতে পারি নি এক পয়সাও। সেইজন্যেই ও বিয়ের কথা বাবাকে বলিও নি। বাবা এত ক্ষুব্ধ হতেন, রেগে যেতেন যে, ওঁর হয়ত আর একটা স্ট্রোক হয়ে যেত—'

'তা এ বিয়েতে রাজী হলেন কেন? জেনেশুনে?'

'বলছি। তাপসটা ওদের পাড়ার একটা বদ ছেলেদের দলে পড়ে গিছল, তারা যে শুধু বদ নয় শয়তান—সেটা একেবারেই বুঝতে পারে নি। তারা রাতে এক জায়গায় জড়ো হয়ে জুয়া খেলে, তাসের জুয়া—নিশ্চয় জুচ্চুরি ক'রে খেলে—মানে প্রথম যারা যায় তারা কিছু জেতে, তারপর নেশা ধরে গেলে ক্রমাগত হারে। দলেরই একজন সেই সময়টা মহাজনের কাজ করে—উদার ভাবে টাকা এগিয়ে দিয়ে বলে, যখন পারিস শোধ করিস। তারপর কিন্তু কিছু দেনা জমে গেলে ভীষণ চাপ দেয়। শুধু বেইজ্জতেরই ভয় দেখায় না, খুনখারাপিও করে। এই যে সব ছেলেরা খুন হচ্ছে—সব পলিটিক্যাল মার্ডার নয়, এসব খুনও আছে। তাপসকেও খুব বিশ্রীভাবে ভয় দেখিয়ে ছিল। একেবারেই মাথায় কিছু থাকে না জুয়ার নেশা ধরলে—যার প্রায় কিছুই আয় নেই, সে চার হাজার টাকা দেনা ক'রে বসে

আছে। আমার যা ছিল সামান্য পুঁজি—দু হাজার টাকা একটা পোস্টাপিসে ছিল—ওকে দিয়েছি, তাতেই মাস দুই সময় পেয়েছে। এই সময় এই সম্বন্ধটা এল। এটা ওরই বুদ্ধি, ব্ল্যাকমেল ক'রে টাকাটা আদায় করা। আমার অবশ্য রাজী হওয়া উচিত হয় নি। কিন্তু এমন ফ্যাকাশে মুখ ক'রে এসে দাঁড়াল, আমি আর এড়াতে পারলুম না। সেই ওকেও বাঁচানো গেল না—মাঝখানে থেকে আমার রুগ্ন বাবাকে এই অপমানটা সইতে হল।'

বলতে বলতে সেই রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েই বেশ কয়েক জোড়া চোখের সামনে যেন আকুল হয়েই কেঁদে উঠল অতসী।

অল্প কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল দীপেন। বোধহয় এ কান্নার কতটা সত্য কতটা অভিনয়, হিসেব করার চেষ্টা করল—তবে তখন আর বেশী সময়ও নেই। সঙ্গে সঙ্গেই মন স্থির করে ফেলল। বলল, 'কথা আছে কাল আমার এক বন্ধু যাবেন আশীর্বাদের জিনিস দুটো বদলাবদলি করতে। আমি বোতাম পাঠিয়ে দেব ঠিকই, কিন্তু টিকলিটা আর ফেরত দেবার দরকার নেই। ওটা এক ভরির ওপর আছে, চেন নিয়ে, বিক্রী করলে দু হাজার টাকা পাবে, তোমার স্বামীকে বাঁচাতে পারবে। তবে—তবে বড় অপাত্রে এতটা প্রেম দিয়েছ, যে এত নিচে নামতে পারে তাকে নিয়ে কোন মেয়েই সুখী হবে না।

সে আর দাঁড়াল না, হতভম্ব অতসী কোন ধন্যবাদ দেবার চেষ্টা করার—কি কথাটা ভাল ক'রে বোঝার আগেই দীপেন ছুটে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে তাতে উঠে বসল।

এর পর বিয়ে করা কিংবা বিয়ের প্রশ্ন ওঠার কথা নয়।

তবুও উঠল। ওঠাই তো স্বাভাবিক। একটি সুপাত্র বিবাহ করতে রাজী হয়েছে জানলে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ—মানে পরিচিত মহল—ব্যস্ত ও ব্যাকুল হয়ে উঠবে বৈকি, নিজের কোন বিবাহযোগ্যা আত্মীয়া না থাকলেও। ওটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে অনেকটা।

সুতরাং চারিদিক থেকেই সে প্রস্তাব আসতে শুরু করল। নানা প্রলোভন দেখানো বা অনুনয় বিনয় কোনটাই বাদ গেল না। দীপেন তবু বহুদিন পর্যন্ত এড়িয়ে গিছল, কিন্তু ওদের আপিসে—বিশেষ ক'রে ওদের

সেকশুনেরই তপনবাবু এসে যখন ওর দুটি হাত ধরে প্রস্তাব পাড়লেন তাঁর ভাগ্নীর জন্যে, তখন আর 'না' বলতে পারল না।

এবং আবারও এক অঘটন ঘটল।

পাত্রীরও বয়েস হয়েছে, বাপ মা মরা মেয়ে, খুব একটা লেখাপড়া শেখে নি বলেই নাকি এতদিন ভাল পাত্র পাওয়া যায় নি। বাবা মা নেই বলেই তপনবাবুর দায়িত্ব বেশি, যার-তার হাতে দিতে পারেন নি।

'দেখতে খারাপ নয়, তবে অবিশ্যি সুন্দরীও নয় তা বলেই রাখছি। ঘরের কাজকর্ম সবই জানে, সত্যিই বলছি, কথার কথা নয়—আর করেও। যথার্থ সংসারী মেয়ে, সংসার ভালবাসে। আপনি যেমন চাইছেন তেমনি। আপনার মাকে দেখতে পারবে, ওর মামীমাকে তো ও-ই খাড়া রেখেছে তোয়াজ ক'রে ক'রে। এ যদি মিথ্যে হয় আপনি মেয়েকে আমার বাড়ি রেখে যাবেন, তার দায় আপনাকে টানতে হবে না।'

মেয়েকে একদিন কৌশল করে দেখিয়েও দিলেন।

ফর্সা নয়, তবে কালোও নয়। মাজা মাজা রঙ। মুখের গঠনটি সুডৌল, বেশ একটি সুকুমার ভাব বা লালিত্য আছে। ঠোঁটের ওপরে ও নাকের ডগায় সর্বদাই সামান্য একটু ঘাম জমে থাকে—তাতে আরও ভাল লাগে। অন্তত দীপেনের লাগল।

দীপেন সত্যি কথাই বলে ফেলল, 'তা এ মেয়ে তো একেবারে রিজেক্ট করার মতো নয়। এর এতদিন বিয়ে হয় নি কেন?'

'লেখাপড়া তেমন শেখে নি, ওদিকে তত মাথাও নেই। কোনমতে টেনেটুনে স্কুল ফাইন্যালটা পাস করেছে। তেমন টাকার জোরও নেই। অথচ ভগ্নিপতি মৃত্যুশয্যায় আমার হাত টেনে নিজের বুকে রেখে বলে গেছেন, আমার এই একটি সন্তান, বড্ড মায়ার শরীর এর, বড় ভাল মানুষ। তোমার জানাশুনো যথার্থ সুপাত্র না পেলে বিয়ে দিও না। কালো বা গরিবের অনাথ মেয়ে বলে না কেউ ঘেন্না করে।'

দীপেন রাজী হয়ে গেল। চাকরি-করা বৌ নয় বলে আর্থিক একটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে রইল বটে—তেমনি যদি সত্যিই সংসারী মেয়ে হয়, সত্যিই মাকে দেখাশুনো করে, তাহলে রাতদিনের একটা ভাল পাকাপোক্ত

লোক রাখার দায় থেকে অব্যাহতি পায়। সে খরচও তো বড় কম হ'ত না।

তবে বিয়ের ফলাফল অন্যত্র যা দেখেছে, তাতে সন্দেহ একটা থেকে যায়ই শেষ পর্যন্ত। কিন্তু উপায়ই বা কি, এ ঝুঁকি তো সব মেয়ের বেলাই থাকে।

আসল কথা—ললিতার কবি ধরনের মিষ্টি মুখখানা ঝুঁকির যোগ্য বলেই মনে হতে লাগল বারবার, সেটাই বড় কথা।

এবার আর বিশেষ কাকেও বলা হ'ল না। চিঠি তো ছাপালই না।

অপিসের কজন, বিশেষ অন্তরঙ্গ যারা—সপরিবার, আর নিকটআত্মীয় কিছু কিছু, দুই দাদার শ্বশুরবাড়িও। মোট পৌনে দুশো লোকের মতো আয়োজন—কন্যাপক্ষ নিয়ে।

দেনাপাওনার কথা কোন পক্ষেই ওঠে নি। তবে বিয়ের রাত্রে দেখল, তপনবাবু একেবারে ফাঁকি দেন নি। মোটামুটি গা-সাজানো গহনা দিয়েছেন—হয়ত ওর মায়েরই সোনা ছিল কিছু—দানের বাসনও—সব খাগড়াই কাঁসার ভারি ভারি, আর সবচেয়ে খুশী হ'ল খাটবিছানা ড্রেসিং টেবিল দেখে। বেশ ভাল জিনিসই দিয়েছেন। দীপেনও ভাল 'গায়েহলুদ' পাঠিয়েছিল। দেখল তপনবাবু সবাইকে ডেকে ডেকে দেখাচ্ছেন। বলছেন, জামাইয়ের উঁচু নজর আছে এতেই বোঝা যায়।

বিয়ের পরের দিন সকালে, কুশণ্ডিকা সেরে—মেয়েলি ব্যাপারগুলো এবং জলখাওয়ার পর্ব চুকে গেলে তপনবাবু দীপেনকে ইশারায় ডেকে অন্য একটা ঘরে নিয়ে গেলেন এবং ওকে বসিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।

'তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে। এবার আর না বললেই নয়। তুমিই বলছি—এবার তো জামাই হলে।'

বুকের মধ্যেটা ধড়াস ক'রে তো উঠবেই। কেমন একটা হিমহিম ভাব অনুভব করল দীপেন।

এবার—নিশ্চয়ই এতদিন অবিবাহিত থাকার আসল গূঢ় রহস্যটা প্রকাশ করবেন তপনবাবু।

তাই করলেন অবশ্য। তবে একটু রকম-ফের ঘটল, এই যা।

বললেন, 'এটা আগে বলি নি বলে হয়তো রাগ করবে, তবে মৃতলোক তোমার শ্বশুরের কাছে বাক্যদত্ত ছিলুম বলেই বলতে পারি নি।

তবে কি ললিতা বিধবা ? না অন্যপূর্বা ? দীপেনের কপালে ঘাম দেখা দেয়।

তপনবাবু একটু কেশে গলাটা সাফ ক'রে বলেন, 'ললিতার কিছু নিজস্ব টাকা আছে। আমার ভগ্নিপতি কেশববাবু অকালেই মারা গিছলেন, তবে নিঃস্ব ছিলেন না। যে সব টাকা ভাল শেয়ারে, অন্য কারবারে লগ্নী করে ছিলেন। আমার বোন মরবার পরই তিনি যেন টের পেয়েছিলেন যে তাঁরও আর বেশিদিন নেই। যেখানে যা ছিল সব বেচে-কিনে ষাট হাজার টাকার মতো ফিক্স্ড ডিপোজিট করেছিলেন মেয়ের নামে। আর পঁচিশ হাজার টাকা আমার ও আমার স্ত্রীর নামে জমা দিয়েছিলেন মেয়ের বিয়ের খরচ বলে। এছাড়া ওর মায়ের কিছু ভারী গহনাও আছে। ললিতা সাবালক হওয়া মাত্র ওর নামে লকার ভাড়া ক'রে রেখে দিয়েছি। ষাট হাজার সুদে আসলে প্রায় পঁচাশি হাজারের মতো দাঁড়িয়েছে। এ পঁচাশিও এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই। কেশববাবুর মনে হয়েছিল টাকার কথা শুনলে অনেক মতলব-বাজ আসবে—তারপর মেয়েটাকে ভুলিয়ে টাকাগুলো হাতে নিয়ে সরে পড়বে, কি এমন নির্যাতন করবে যে ওকে আত্মহত্যা করতে হবে। সেই জন্যেই আমাকে দিয়ে দিব্যি গালিয়ে নিয়েছিলেন যে বিয়ের আগে বরপক্ষকে ঘুণাক্ষরেও যেন টাকার কথা না বলি। অনাথা মেয়ে গরিবের মেয়ে জেনে নেবে যে—তার সঙ্গেই, অবশ্য যতদূর সম্ভব খোঁজ নিয়ে—তার হাতেই যেন দিই। হ্যাঁ, এছাড়া নারকোলডাঙায় ওদের পৈতৃক বাড়িও আছে একখানা—তবে সে নামমাত্র ভাড়ায়; অনেক দিনের ভাড়াটে, আশি টাকা দেয় এখনও। অবশ্য ভদ্র ভাড়াটে তাই তাড়াই নি। সে তুমি যা বোঝ করবে।...এখন জিজ্ঞাস্য বিয়ের দরুন যা টাকা বরাদ্দ ছিল, তা এসব খরচ বা ভবিষ্যৎ তত্ত্বতাবাশের জন্যে কিছু টাকা সরিয়ে রেখেও হাজার এগারোর মতো হাতে আছে। তা মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছিলুম—এতে তোর একটা ভাল ফ্রীজ আর টি. ভি. হয়ে যাবে। তাই কিনে দেব ফুলশয্যের তত্ত্ব হিসেবে ? ললুমা বলেছে, মামা, ওকেই জিজ্ঞেস করবেন, ওঁর যা ইচ্ছে।'...

ফুলশয্যার রাত্রে প্রাথমিক পরিচয়ের পর ললিতাকে কাছে টেনে নিয়ে দীপেন বলল, 'ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে, কথাটা যে কতটা সত্যি তা আজ তোমাকে পেয়ে বুঝছি। না, টাকার জন্যে নয়—এমনি মিষ্টি নরম স্বভাবের স্ত্রীই আমার স্বপ্ন ছিল। ভাগ্যিস ঐ বিয়েটা ভাঙল। না হলে তো এ যোগাযোগ হ'ত না।'

'সত্যিই হ'ত না।' আস্তে আস্তে স্বামীর বুকে মুখটা গুঁজে দিয়ে বলে ললিতা, 'এ বিয়ে কার জন্যে হয়েছে জানেন তো? অতসীদির জন্যেই।'

'অতসীদি!···তোমরা ওকে চিনতে নাকি?'

'আমার মামা যে অতসীদির আপন পিসেমশাই। অতসীদিই এসে মামাকে বললেন, এমন মহাপ্রাণ মানুষ আমি আর দেখি নি, এমন মহাপ্রাণ যে কেউ হয় তাও জানি না। পিসেমশাই, আমি পারলুম না, ললিতা পারবে ওঁকে সুখী করতে। আপনি যা চাইছিলেন ইনি তাই, তার চেয়েও বড়। এমন সুযোগ ছাড়বেন না।'

রজনীগন্ধা

বসন্তপুরের আখড়ার পদ্মাবোষ্টমীর নাম জানিত না এরূপ লোক নিকটবর্তী সাতখানা গ্রামে কেহ ছিল না বলিলেই হয়। তাহার কারণ, এই পনের-ষোল বছরের মেয়েটির উৎপাতে সমস্ত দেশের লোক উদ্‌ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ তাহাকে শাসন করিতেও কাহারও মন উঠিত না, বরং একদিন তাহার গানের শব্দ কানে না গেলে লোকে ব্যস্ত হইয়া খোঁজ লইত তাহার অসুখ করিয়াছে কি-না!

এই মেয়েটিকে বৃন্দাবন দাস বাবাজীর গুরু স্বর্গত গোবর্ধন দাস বাবাজী এক গাছতলায় কুড়াইয়া পান। পদ্মফুলের মতো ফুটফুটে মাস ছয়েকের মেয়েটিকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি কুড়াইয়া লইয়া আসেন এবং অতি কষ্টে অন্যান্য বৈষ্ণবীদের সাহায্যে তাহাকে বাঁচাইয়া তোলেন। তিনি আদর করিয়া নাম রাখিয়াছিলেন রজনীগন্ধা; কিন্তু গোবর্ধন দাস বাবাজী মারা গেলেন যখন, তখন রজনীগন্ধার দুই বৎসর বয়স, বৃন্দাবন দাস আখড়ার

মোহান্ত হইয়া রজনীগন্ধার নূতন করিয়া নামকরণ করিলেন, পদ্মা। কিছুদিন পূর্বে চন্দ্রনাথ দর্শন করিয়া ফিরিবার পথে তিনি ঝড়ের মধ্যে পড়েন, পদ্মার সেই প্রলয়ঙ্করী মূর্তির সহিত দুই বৎসরের মেয়ে রজনীগন্ধার সাদৃশ্যই নাকি ঐ নামকরণের কারণ।

মেয়েটির এখন বয়স পনের-ষোল, সে দেখিতে সুন্দরী, তাহার গানের গলা ভাল এবং সর্বোপরি তাহার মনটি ভাল বলিয়া সে শুধু বৃন্দাবন দাস নয়, গ্রামসুদ্ধ লোকের নয়নের মণি ছিল। সে এক মিনিটও নিজে না হাসিয়া থাকিতে পারিত না, এবং পৃথিবীসুদ্ধ লোক তাহার পাগলামিতে হাসিয়া অস্থির হইত। তাহার উৎপাত যে কখন কোন্‌দিক দিয়া কাহার উপর গিয়া পড়িবে, এই আশঙ্কায় সকলেই সর্বদা সশঙ্কিত হইয়া থাকিত। চঞ্চলা, দুরন্ত এই মেয়েটিকে দেখিয়া অনেকেই বৃন্দাবন দাসের দূরদৃষ্টির প্রশংসা করিতেন।

বেশ ছিল পদ্মা, আখড়ার সেই ছিল কর্ত্রী, সকলের আদরে তাহার দিনগুলি পরম সুখেই কাটিতেছিল। সহসা গোলমাল বাধিল তখনই, যখন বসন্তপুরের জমিদার রাজনারায়ণবাবুর একমাত্র বংশধর কমল এম. এ. পাস করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিল। কমলের মা ছিলেন না, পাছে বাড়িতে থাকিলে মাতৃহীন ছেলে অত্যধিক আদরে নষ্ট হইয়া যায় এই ভয়ে রাজনারারণ-বাবু ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে কলিকাতার বোর্ডিং-এ রাখিয়াছিলেন, কখনো কখনো ছুটিতে বাড়িতে আসিত আবার ছুটি ফুরাইবার দুই-একদিন আগেই কলিকাতায় ফিরিয়া যাইত। সুতরাং পদ্মাকে সে বাল্যকালে দেখিলেও তাহার কথা কমলের বিশেষ মনে ছিল না।

এবার দুই বৎসর পরে দেশে ফিরিয়া সহসা পদ্মাকে দেখিয়া সে যেন অবাক্ হইয়া গেল। কিন্তু তাহার পূর্বে সেই প্রথম দর্শনের বিবরণটি বলা দরকার।

দেশে পৌঁছিবার পরের দিনই ভোরবেলা উঠিয়া কমল গিয়াছিল নদীর ধারে বেড়াইতে, উদ্দেশ্য দ্বিপ্রহরে মাছ ধরিতে বসিবার জায়গাটি বাছিয়া আসা। একটা বটগাছের তলা বাছিয়া চাকর ভোলাকে স্থানটা পরিষ্কার করিবার উপদেশ দিয়া সে রায়েদের বাগানের ধার দিয়া ফিরিতেছিল, সহসা তাহার কানে গেল অতি সুমিষ্ট কীর্তনের সুর, খুব মধুর গলায় কে গাহিতেছে,—

"কবরী ভয়ে চামরী গিরি-কন্দরে,
মুখ ভয়ে চান্দ আকাশ,
হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বর ভয়ে কোকিল,
গতি ভয়ে গজ বনবাস !"

সে বিস্মিত হইয়া চমকিয়া দাঁড়াইতেই তাহার নজরে পড়িল বাঁশ ঝাড়ের বাঁক ঘুরিয়া মূর্তিমতী শ্রীমতীর মতোই এক কিশোরী আসিতেছে। পরনে সামান্য লাল-পেড়ে শাড়ি, হাতে খঞ্জনী, নাকে ছোট্ট একটি তিলক ; কোথাও আভরণের চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু তবুও তাহার দিকে চাহিলে চোখ ফিরানো যায় না। ভাদ্রের নদীর মতোই তাহার দেহের কূলে কূলে যৌবন ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহার আয়ত চোখের চটুল দৃষ্টিতে লাগিয়াছে মাদকতার আভাস।

কমল এই অসামান্য মেয়েটির দিকে চাহিয়া এতই বিস্মিত হইয়াছিল যে শোভনতার কথাও ভুলিয়া গেল—সে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল তাহার দিকে। কিন্তু তাহার বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া পদ্মা সহসা এক কাণ্ড করিয়া বসিল, কোথা হইতে একটা পোয়ারা পাড়িয়া লইয়া খাইতে খাইতে আসিতেছিল, সেই অর্ধভুক্ত পেয়ারাটা ছুঁড়িয়া মারিল কমলের মুখে। দুই ভ্রূর মধ্যে গিয়া আধপাকা পেয়ারাটা লাগিতেই সে 'উঃ' করিয়া খানিকটা পিছাইয়া গেল, তাহার পর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, 'তুমি আচ্ছা বেয়াদব মেয়ে তো!···আমাকে মারলে যে?'

পদ্মা জবাব দিল, 'বেশ করেছি, তুমি অমন বেয়াদবের মতন হাঁ ক'রে তাকিয়ে ছিলে কেন?'

কমল সহসা জবাব দিতে পারিল না; পদ্মা অবশ্য জবাবের অপেক্ষাও করে নাই, সে তাহার উষ্মাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'এই শোন, তুমি কমলবাবু না?'

কমল বিস্মিত হইয়া কহিল, 'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কে?'

হাসিতে ফাটিয়া পড়িয়া জবাব দিল, 'বা রে, আমাকে চিনতে পারলে না? আমি পদ্মা, বৃন্দাবন দাস বাবাজীর আখড়ায় থাকি।

পদ্মা! সেই পদ্মা এমন হইয়াছে?

কমল কহিল, 'তুমি জেনে শুনে আমায় মারলে, তোমার সাহস তো কম

নয়। আমি যদি বাবাজীকে ব'লে দিই? কিংবা আমার বাবাকে?'

ঠোঁট উল্টাইয়া পদ্মা জবাব দিল, 'তবে আমার বড় বয়েই গেল।'

মুখে বলিল বটে কিন্তু কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল, 'বড্ড কি লেগেছে? কই দেখি।'

কমল কহিল, 'আর একটু হ'লে আমার চোখ কানা হয়ে যেত।'

পদ্মা কমলের হাতটা কপালের উপর হইতে সরাইয়া কহিল, 'ইস্, বড্ডই লেগেছে, ফুলে উঠবে এখন।...কালশিরে পড়েছে।'

তাহার দুই চোখে সহসা জল আসিয়া পড়িল, কহিল, 'আমি বুঝতে পারি নি—কিছু মনে ক'র না, বুঝলে? আমি মাপ চাইছি।'

বলিয়া কমলের উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া সে দ্রুত চলিয়া গেল। কমল স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া এই অদ্ভুত মেয়েটির গতিপথের দিকে চাহিয়া রহিল।

এই হইল তাদের পূর্ব-রাগের ইতিহাস। কমল বাড়িতে আসিয়া বাবার কাছে রায়েদের বাঁশ ঝাড়ের দোহাই দিল এবং অপরাহ্নেই বৃন্দাবন দাস বাবাজীর আখড়ায় গিয়া উপস্থিত হইল। ইহার পর কোথা দিয়া এবং কি করিয়া যে তাহাদের আলাপ এত দ্রুত জমিয়া উঠিল, সে কথা তাহারা নিজেরাই বুঝিতে পারিল না। কমল প্রত্যহ রাত্রি দশটা পর্যন্ত আখড়ায় আড্ডা দিতে লাগিল এবং সকালে পূর্ব-ব্যবস্থা-মতো পদ্মার ভিক্ষা করিতে যাইবার পথে পথে অপেক্ষা করিতে শুরু করিল। ফলে পদ্মার ভিক্ষার পরিমাণও দিন দিন কমিতে লাগিল। শেষে এমন হইল যে সকালে লোকে কমলকে যে পাড়ার দিকে যাইতে দেখিত, বুঝিত পদ্মাও সেই পাড়ায় ভিক্ষা করিতে যাইবে।

বলাই বাহুল্য, কথাটা চাপা রহিল না এবং তাহা রাজনারায়ণবাবুর কানেও উঠিল। তিনি একদিন বৃন্দাবন দাসকে ডাকিয়া যথেষ্ট লাঞ্ছনা করিলেন, বলিলেন, 'এমনি ক'রে আরও কত ছেলের মাথা খাচ্ছ তার ঠিক কি?...ফের যদি আমি শুনি যে খোকা ওখানে যাচ্ছে, তাহ'লে তোমার ঐ দুশো বছরের আখড়ায় আগুন লাগিয়ে দেব বুঝলে? সাবধান!'

বৃন্দাবন দাস নত মুখেই বাহির হইয়া আসিতেছিলেন। রাজনারায়ণবাবু

পুনশ্চ ডাকিয়া কহিলেন, 'আর শোন, ঐ মেয়েটার কণ্ঠি-বদলের ব্যবস্থা করো না কেন? তাহলে তো অনেকটা গোলযোগ মিটে যায়।'

বৃন্দাবন কহিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই ব্যবস্থাই করব।'

রাজনারায়ণ কহিলেন, 'তাই করোগে, বরং যদি বিশ-পঞ্চাশ খরচা হয় সে আমি দেব, বুঝলে?'

বৃন্দাবন ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া আসিলেন।

সেই দিনই রাত্রে আহারে বসিয়া রাজনারায়ণবাবু কমলকে বলিলেন, 'দেখ আমি ভেবে দেখছিলুম যে এত বড় জমিদারীটা হাতে-কলমে চালাতে গেলে আইনটা জানা দরকার। তুমি বরং কলকাতায় গিয়ে ল' কলেজে ঢুকে পড়ো। ওখানে ঠাকুরদের ম্যানেজার আমার বন্ধু, ওঁকেও আমি ব'লে দেব, দুপুরের দিকে গিয়ে জমিদারীর কাজ কিছু কিছু শিখবে। সব পেশাই শিখতে হয়—জমিদারী আপনি চলে না।'

কমলের মাথায় যে বজ্রাঘাত হইল, তা রাজনারায়ণবাবু তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন। এইবার তিনি তাঁহার বৃহত্তর অস্ত্রটি নিক্ষেপ করিলেন, কহিলেন, 'কানা-ঘুষো শুনছিলাম তুমি নাকি রোজ বৃন্দাবনের আখড়ায় গিয়ে রাত দশটা পর্যন্ত আড্ডা দাও? তুমি জমিদারের ছেলে, ওসব ভিখারী-বৈষ্ণবের সঙ্গে কি তোমার আড্ডা দেওয়া উচিত? ··এ কথা যেন আর কোনদিন না শুনতে পাই।···'

কমল সেদিন সারারাত ঘুমাইতে পারিল না, পরের দিন ভোরবেলাই কুসুমপুরের রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। সেই পথেই পদ্মার সেদিন ভিক্ষা করিতে যাইবার কথা, কিন্তু বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়াও যখন পদ্মার দেখা পাওয়া গেল না, তখন তাহার প্রথম মনে হইল যে তাহার বাবা বোধহয় শুধু তাহাকে শাসন করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই—ওধারেও কোনও ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দুপুর বেলা একটা বই লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল কিন্তু একটি বর্ণও বুঝিতে পারিল না, শেষকাল পর্যন্ত আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বেলা দুইটার সময় পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া সে আখড়াতেই গিয়া উপস্থিত হইল। আখড়ায় পৌঁছিয়াই ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর

ঘরের দাওয়ায় বসিয়া 'রাসপঞ্চাধ্যায়' পড়িতেছিলেন, তিনি অন্যদিন স-কলরবে অভ্যর্থনা করেন, আজ শুধু তাহার নমস্কারের বদলে একটি প্রতি-নমস্কার করিলেন মাত্র, একটি কথাও কহিলেন না। অন্যান্য দুই-একজন বৈষ্ণব যাহারা সামনে বসিয়া ছিল তাহারাও দুটি-একটি কথা কহিয়াই কাজের অছিলায় উঠিয়া গেল। তখন লাজ-লজ্জার মাথা খাইয়া কমলকে প্রশ্ন করিতে হইল, 'বাবাজী মশাই, পদ্মা কোথায়?'

বাবাজী মাথা না তুলিয়াই বলিলেন, 'ঠাকুরঘরের ভেতর কাজে ব্যস্ত আছে।'

কমল বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, 'আমার সঙ্গে তার দেখা হওয়া কি নিষেধ?'

বৃন্দাবন দাস এবার মুখ তুলিলেন, তাঁহার দুই চোখে জল টল্‌টল্‌ করিতেছিল, তিনি কহিলেন, 'ছোটবাবু, তুমি এখানে আসো এতে যে আমাদের কত আনন্দ হয় তা গোবিন্দই জানেন, তুমি আমাদের সকলেরই বড় প্রিয়। কিন্তু আমার দুশো বছরের আখড়া, আমার পূর্ববর্তী সাতজন গোঁসাইয়ের সমাধি হয়েছে এইখানেই—এ আখড়া যদি নষ্ট হয় তো প্রাণে বড় লাগবে।'

কমল কহিল, বুঝেছি বাবাজী মশাই, বাবা একটা সাংঘাতিক কিছু বলেছেন। কিন্তু আর একটি বার যে পদ্মার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার। তাকে বলবেন যে কাল সকালে দক্ষিণ-খণ্ডে যাবার পথে আমি অপেক্ষা করব—এ ভিক্ষাটি আমাকে দিতেই হবে।'

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বৃন্দাবন দাস কহিলেন, 'তাই হবে বাবু।··· পদ্মার আবার কণ্ঠি-বদলের ব্যবস্থা করতে হবে, শীগগিরই—বড়বাবু আদেশ দিয়েছেন। কোথায় কার কাছে যে দেব অমন সোনার প্রতিমা, তাই ভাবছি।'

এই আঘাতটিই সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক। কমল যখন বাহিরে আসিল তখন তাহার পা টলিতেছে, সর্বশরীর যেন অবশ।

সে কোনমতে নদীর ধার পর্যন্ত গিয়া একটা গাছের নীচে বহুক্ষণ বসিয়া রহিল। এই গাছের নীচে সে আর পদ্মা কতদিন কত গল্প করিয়াছে, পদ্মা কত গান গাহিয়া তাহাকে শুনাইয়াছে, এই গাছের তলায় প্রতিটি তৃণ সুমধুর স্মৃতি মাখানো।

সেইখানে বসিয়া বসিয়া এই সত্যটি সে প্রথম নিশ্চিত ভাবে অনুভব করিল যে সে পদ্মাকে ভালবাসে, পদ্মাকে না পাইলে তাহার সমস্ত জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে।···ঠিক সেই সময় পদ্মাও, চিরআনন্দময়ী পদ্মা বৃন্দাবন দাসের পায়ে মাথা রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল, 'বাবাজী মশাই গো, আমি তাহ'লে বাঁচব না! মরে যাব!'

পরের দিন সকালে কমলকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, ভাল করিয়া সূর্য উঠিবার আগেই পদ্মা আসিয়া দেখা দিল। কিন্তু যে একটি মিনিটও না হাসিয়া থাকিতে পারিত না, আজ তাহারই মুখ আষাঢ়ের মেঘের মতো কালো ও থমথমে। সে নিঃশব্দে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল মাত্র, কথা কহিল না।

কমল কম্পিত কণ্ঠে কহিল, 'পদ্মা, শুনেছ সব?'

সে কহিল, 'শুনেছি।'

কমল কহিল, 'কিন্তু এ কিছুতেই হতে পারবে না। আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না—'

পদ্মা শুষ্ককণ্ঠে কহিল, 'সামনের মাসেই আমার কণ্ঠি-বদল, নবদ্বীপ বৈরাগীর সঙ্গে, মোচ্ছবের খরচা দেবেন তোমার বাবা।'

কমল দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, 'তোমার কণ্ঠি বদল হবে—কিন্তু সে নবদ্বীপের সঙ্গে নয়, আমার সঙ্গে!'

পদ্মাও দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, 'তা হয় না। বাবাজী মশায় জীবনে কখনো যে-সব কথা শোনেন নি, তাই তাঁকে সেদিন শুনতে হয়েছে, আমার জন্যে। তিনি আমাকে এতটুকু বেলা থেকে মানুষ করেছেন, নিজের মেয়ের মতো ভালবাসেন। তুমি কি বলতে চাও, আমার জন্যে তাঁর আখড়ায় আগুন লাগবে, তিনি অপঘাতে মরবেন? তার চেয়ে আমি জন্ম-জন্ম নবদ্বীপের ঘর করব, তাও ভাল!'

কমল কিছুক্ষণ নিঃশব্দে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। সে নিজের বাবাকে চিনিত, তাঁহার জীবিতকালে এ বিবাহ দিবার স্পর্ধা বৃন্দাবন কেন, গ্রামসুদ্ধ কাহারও নাই। সে খানিকটা পরে বলিল, 'তবে চলো, আমরা

আজই কলকাতায় পালিয়ে যাই, সেখানে গিয়ে রেজেস্ট্রী ক'রে বিয়ে হবে আমাদের।'

পদ্মা স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'তারপর? খাওয়াবে কি? আজও তো বাবার মাসহারায় খরচ চলে—'

আহত স্বরে কমল কহিল, 'নিজের খরচা চালাবার মতো সামান্য টাকাও কি আমি রোজগার করতে পারি না ব'লে মনে করো—? আমি এম. এ. পাস তো করেছি!'

পদ্মা একটু লজ্জিত হইল, অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, 'কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি কলকাতায় পালিয়ে গেলেই কি বাবাজী মশায় নিস্তার পাবেন? না তোমারই এই বৃদ্ধ বয়সে বাবার মনে কষ্ট দেওয়া উচিত!'

কমল অসহিষ্ণু-স্বরে কহিল, ওসব কোনও কথা আমি জানি না, তুমি যদি রাজী না হও পদ্মা, আমি এই মুহূর্তে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব, তা ব'লে রাখছি—'

পদ্মার মুখ এতক্ষণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু তবু সে কহিল, 'তুমি ধনীর ছেলে, তুমি লেখাপড়া শিখেছ—আমার মতো জ্ঞাতি-গোত্রহীন ভিখিরীর সঙ্গে এই ভাবে তুমি নিজেকে জড়িয়ে ফেলছ, এতে কি তুমি সুখী হ'তে পারবে? দুদিন পরে আমায় আপদ-বালাই বলে মনে হবে না?'

কমল অভিমানক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল, 'বেশ তো যদি তাই হয়—আমার শান্তির জন্যে, সুখের জন্যে তুমি এইটুকু আশঙ্কাকে দমন করতে পারছ না?'

পদ্মা এইবার তাহার দুটি হাত ধরিল, কহিল, 'তুমি যদি এমন ভাবে জোর না করতে তাহ'লে হয়ত আমাকেই এই নদীর জলে আশ্রয় নিতে হ'ত। তোমাকে হারিয়ে আমি বেঁচে থাকতুম না কিছুতেই। আমি আর কিছু বলব না, তোমার যা খুশি তুমি করো—'

তখন দুজনে প্রায় অর্ধঘণ্টা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে কমল সেই-দিনই রাত্রে কলিকাতায় চলিয়া যাইবে এবং উপার্জনের চেষ্টা দেখিবে, তাহার পর সেখানে একটা বাসা ঠিক করিয়া গোপনে পদ্মাকে লইয়া যাইবে। সেই-খানেই বৃন্দাবনদাস বৈষ্ণব মতে তাহাদের বিবাহ দিবেন।···বৃন্দাবনদাস আগের দিন পদ্মাকে বলিয়াই দিয়াছিলেন, 'তুই যাতে সুখী হোস মা তাই কর্

—আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। গোবিন্দের মন্দির, তিনি পারেন রক্ষা করবেন, নইলে নষ্ট হয় তাও ভাল।'

কমল দুপুরবেলা খাইতে বসিয়া রাজনারায়ণবাবুকে জানাইল, 'আমি আজই সন্ধ্যার ট্রেনে কলকাতায় যাব বাবা।'

বিস্মিত হইয়া রাজনারায়ণবাবু কহিলেন, 'আজই কেন?'

কমল জবাব দিল, 'ল-কলেজে যদি য়্যাডমিশন নিতেই হয়, অনর্থক গড়িমসি ক'রে লাভ কি?'

রাজনারায়ণবাবু বুঝিলেন যে ইহা অভিমানের কথা, কিন্তু তবুও ফলটা শুভই হইবে, এই আশায় তিনি মনে মনে খুশী হইলেন, নানাবিধ উপদেশ দিয়া, জিনিসপত্র গুছাইয়া লইতে বলিলেন।

কমল পরের দিন সকালে কলিকাতায় পৌঁছিয়া এক বন্ধুর বাড়ি উঠিল, সেখান হইতে দুপুরের মধ্যেই একটা ছোট্ট বাসা ঠিক করিয়া ফেলিল। দেশ হইতে পুরাতন চাকর সঙ্গেই আসিয়া ছিল, সে-ই রাঁধিয়া দিবে এবং অন্যান্য কাজ করিবে এইরূপ ব্যবস্থা হইল।

সে জমিদারের ছেলে—এবং কলিকাতায় বরাবর উপযুক্ত চালেই চলিয়াছে বলিয়া তাহার বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না। তাহাদের দুই-একজনকে ট্যুইশনের কথা বলিল; প্রথমটা তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহিল না, পরে বাবার সহিত ঝগড়া করিয়া আসিয়াছে মনে করিয়া মাসখানেকের মধ্যেই প্রায় শতাধিক টাকার গোটা-দুই ট্যুইশন্ ঠিক করিয়া দিল। কিন্তু তাহার উপর ভরসা করিয়া যে গৃহস্থালী পাতা যায় না সে জ্ঞান কমলের ছিল। সে অন্য পথ ধরিল। বাল্যকাল হইতেই তাহার গল্প লেখার ঝোঁক ছিল এবং দেশে যাইবার আগে খান-দুই উপন্যাসও লিখিয়া বাক্সয় বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। এইবার অন্য একটি বন্ধুকে ধরিয়া কলিকাতার বিখ্যাত মাসিকপত্র হিন্দুস্থানের সম্পাদকের কাছে একটা উপন্যাস পাঠাইয়া দিল। পাঠাইবার সময় কমলের নিজের খুব ভরসা ছিল না। কিন্তু সহসা দেখা গেল সম্পাদক বইটি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, তিনি নিজের কাগজে সম্মানজনক মূল্য দিয়া ছাপিতে রাজী তো আছেনই, অন্য এক বড় প্রকাশকের দ্বারা প্রকাশ করিবার ব্যবস্থাও করিয়া দিতে পারেন।

ইতিমধ্যে সে বৃন্দাবন দাসকে একখানা চিঠি দিয়া জানাইয়াছিল যে এখানের সব ব্যবস্থাই প্রায় হইয়া আসিয়াছে, পদ্মা যেন আর একটু ধৈর্য ধরে। বৃন্দাবন দাস তাহার উত্তরে তাঁহার আশীর্বাদ জানাইয়া চিঠি দিলেন। কমল নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু ওধারে তাহারই বুদ্ধির দোষে আর এক বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। রাজনারায়ণবাবুকে সে পৌঁছিয়াই এক চিঠি দিয়াছিল, আর কোনও সংবাদ দেয় নাই। রাজনারায়ণবাবু মাসখানেক কোনও চিঠি না পাইয়া এক দীর্ঘ পত্র লিখিলেন, তাহাতে জানাইলেন যে সে কলেজে ভর্তি হইয়াছে কিনা তাহা যেন পত্রপাঠ মাত্র জানায় এবং মাস খানেকের মধ্যেই বিবাহের জন্য প্রস্তুত হয়, এবং কন্যা তিনি দেখিয়া পছন্দ করিয়াছেন, এখন শুভ দিনের অপেক্ষা।

ঐ চিঠির সহিত তাহার জন্য একশো টাকার একটি মনিঅর্ডারও আসিয়াছিল। কমল মনিঅর্ডারটি ফেরত দিয়া বাবাকে চিঠি লিখিয়াছিল, "আমি অনেক ভেবে দেখলুম যে আইন পড়া আমার দ্বারা অসম্ভব, সুতরাং কলেজে ভর্তি হবার কোনও চেষ্টা করি নি। আপনার কাছ থেকে মাসোহারা নিয়ে এতদিন কাটিয়েছি, ও ইচ্ছা আর নেই, এইবার নিজে উপার্জন করতে চাই। সেই জন্য টাকাটা ফেরত দিলাম। আর বিয়ের চেষ্টাও আপনি করবেন না, যার সঙ্গে আমার সারাজীবন কাটাতে হবে তাকে আমি নিজেই বেছে নিতে চাই। আমাকে ক্ষমা করবেন।"

রাজনারায়ণবাবু চিঠি পড়িয়া প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কমলের যে এতদূর স্পর্ধা হইতে পারে তাহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর। তাঁহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল পদ্মা ও বৃন্দাবন দাসের উপর, তিনি তাহাদের উপর প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্প করিলেন ; এমন প্রতিশোধ লইতে হইবে যাহাতে কুকুর চিরকালের জন্য মরে কিন্তু তাঁহার হাঁড়ি ও লাঠি দুই-ই বজায় থাকে।

পাশের গ্রামের জমিদার তাঁহার বাল্যবন্ধু ; মদ্যপ, লম্পট ও দুর্দান্ত বলিয়াই তিনি সকলের নিকট পরিচিত। তাঁহারই সঙ্গে রাজনারায়ণবাবু গোপনে দেখা করিলেন এবং কী একটা বন্দোবস্তের মূল্য-স্বরূপ একশত টাকার খান-তিনেক নোট তাঁহার হাতে দিয়া আসিলেন।

সেই দিনই শেষ-রাত্রে হৈ-হৈ করিয়া বসন্তপুরের আখড়ায় ডাকাত পড়িল। নিরীহ বৈষ্ণবদের মারিয়া, আখড়ায় আগুন ধরাইয়া শেষ পর্যন্ত পদ্মাকে লইয়া তাহারা চলিয়া গেল। গ্রামের কোনও লোক ভয়ে বাধা দিবার চেষ্টা করিল না—গোবিন্দের পাষাণ মূর্তিও স্থির হইয়াই এই অত্যাচার দেখিল, কোনও রূপ প্রতিকার করিতে পারিল না।

পদ্মা একা অতগুলি লাঠিয়ালের সহিত না পারিলেও সে প্রাণপণে যুঝিয়াছিল। অবশ্য রাখালবাবু পদ্মার রূপের খ্যাতি শুনিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে কেহ জখম করে নাই, কিন্তু যখন লাঠিয়ালের দল নদীর ধারের বাগানবাড়ির দোতলার ঘরে তাহাকে লইয়া গিয়া ফেলিল তখন সে মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে। তাহার দেহের দিকে চাহিয়া রাখালবাবুর মদোন্মত্ত দৃষ্টিও জ্বলিয়া উঠিল, তিনি ইঙ্গিতে সমস্ত অনুচরদের ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া পদ্মার অচৈতন্য দেহই নিজের দিকে টানিয়া লইলেন; ঠিক সেই মুহূর্তে পদ্মার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। তৎক্ষণাৎ নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া সে বিদ্যুৎগতিতে রাখালের হাত ছাড়াইয়া বারান্দায় গিয়া পড়িল এবং কোনও প্রকার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই ঝাঁপ দিয়া পড়িল নিচে নদীর জলে। এরকম সর্বনাশের চেয়ে যে কোনও প্রকার মৃত্যুই ভাল, এই ছিল তাহার চিন্তা।

তখন পরিপূর্ণ জোয়ারে নদী কূলে কূলে ভরা। রাখালবাবু প্রকৃতিস্থ হইয়া লোকজন ডাকিয়া যখন খুঁজিতে গেলেন, তখন পদ্মার আর চিহ্নমাত্রও পাওয়া গেল না। বহুক্ষণ খোঁজ করিয়া সকলে স্থির করিল যে পদ্মা ডুবিয়া গিয়াছে।

পরের দিন বৃন্দাবনদাস কমলকে চিঠি লিখিয়া নিজেদের লাঞ্ছনা ও দুর্দশা এবং পদ্মার শোচনীয় পরিণামের কথা জানাইলেন। সর্বশেষে লিখিলেন, 'সে যে নিজের চরম সর্বনাশ ঘটতে দেওয়ার আগে এমন অবলীলাক্রমে মৃত্যুকে বেছে নিতে পেরেছে, এইতেই মনে হচ্ছে যে সে তোমার অনুপযুক্ত সঙ্গিনী হ'ত না; কিন্তু গোবিন্দের ইচ্ছা যা আছে তাই হবে, আমরা শুধু তাঁর হাতের ক্রীড়নক বৈ তো নয়!'

কমল সংবাদ পাইয়াই দেশে চলিয়া আসিল, কিন্তু নিজের বাড়িতে গেল

না। চারিপাশের গ্রামে দুইদিন ধরিয়া যত রকমে সম্ভব পদ্মার খোঁজ করিল তারপর কোনমতে অবসন্ন দেহ ও মনটাকে টানিয়া লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। বাবাকে চিঠি লিখিল, "আজ থেকে আমাদের মধ্যেকার সম্পর্ক ঘুচে গেল কিন্তু ভগবান জানেন তার জন্য আমি দায়ী নই। আমার যে সর্বনাশ করলেন, আমি তা ক্ষমা করলুম তবে আপনি ঈশ্বরের মার্জনা পাবেন কি ?"

কমল কিন্তু সহজে হাল ছাড়িল না, ইংরাজী বাংলা কাগজে পদ্মার বর্ণনা দিয়া বিজ্ঞাপন দিল এবং আখড়া পুণর্নির্মাণের জন্য বৃন্দাবনদাসকে এক-শত টাকা মনিঅর্ডার করিয়া কুপনে লিখিয়া দিল, 'পদ্মার খোঁজ ছাড়বেন না, খরচ যা লাগে, আমি দেব'—

কিন্তু দিন, সপ্তাহ, মাস কাটিয়া গেল—পদ্মার কোনও খবর পাওয়া গেল না। এধারে কমলের সাহিত্যিক খ্যাতি হু-হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে, যশের নেশায় সে ক্রমে ক্রমে ঐ নিদারুণ আঘাতও সামলাইয়া লইল। ক্রমশ আরও যশ, আরও অর্থ, বন্ধু-বান্ধব-বান্ধবী ও ভক্তের সংখ্যা বাড়িয়া উঠিল। সভা, সমিতি, মজলিস ও বৈঠকে নিমন্ত্রণের সংখ্যা হয় না। মেয়েরা এই যশস্বী এবং রূপবান তরুণ সাহিত্যিকের ফোটো বাঁধাইয়া ঘরে টাঙ্গাইয়া রাখিতে শুরু করিল। ব্যারিস্টার পালিতের কন্যা মীরা পালিত নিজে কবি ; শুধু তাই নয়—অসাধারণ বিদুষী ও রূপসী বলিয়া সর্বত্র তাহার অসাধারণ সমাদর, সেই মীরাই উচ্চ-সমাজে অক্লান্তভাবে কমলের কথা বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, আলাপে আলোচনায় স্তুতিতে তাহার মনে নব প্রেরণা দিল—স্পষ্টই নিজের হীনতা স্বীকার করিয়া তাহাকে গুরুত্বে বরণ করিল। যদিও কমল তাহাকে বন্ধু-রূপেই দেখিত, তবু রূপসী ও বিদুষী মেয়ের স্তুতিতে মাদকতা আছে বৈকি !...

এইভাবে, সাফল্যের অসাধারণ ঘূর্ণাবর্তে বেচারী পদ্মার স্মৃতি কোথায় তলাইয়া যাইবে, ইহাই তো স্বাভাবিক !

নদীর জলে পড়িয়াই পদ্মা প্রথমটা খরস্রোতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিল। তারপর প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া যখন সে কূলে পৌছিল, তখন দুইখানি গ্রাম পার হইয়া একেবারে বাজগাঁয়ে আসিয়া পড়িয়াছে।

তবে ডাঙ্গায় উঠিয়াই সে অপরিসীম শ্রান্তিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

তখন সকাল হইয়াছে, বীজগাঁয়ের বৃদ্ধ বিপিন মোড়ল পদ্মাকে চিনিত এবং ভালবাসিত। সে স্নান করিতে আসিয়া চমকিয়া উঠিল। আত্মহত্যার ব্যাপার মনে করিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া পদ্মাকে ঘরে লইয়া গেল। কিন্তু পদ্মার তখনই জ্ঞান হইল না, সেই মূর্ছা ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর ও বিকার দেখা দিল। বিপিন বৃন্দাবনকেই সংবাদ দিত কিন্তু পরের দিন সকালে রাখালবাবুর বিবরণ শুনিয়া পদ্মার সর্বনাশের ভয়ে সে কাহাকেও কোন কথা জানাইল না। কোনও মতে সেবাশুশ্রূষা করিয়া পদ্মাকে বাঁচাইয়া তুলিল। পদ্মা যখন সুস্থ হইয়া উঠিল তখন দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে; পদ্মার হাতে এক কপর্দকও নাই, বসন্তপুরে ফিরিতেও তাহার ভরসা হইল না। সে বিপিনকে জানাইল যে কমলের কাছেই যাইবে, বলিল, 'ভয় কি, বৈষ্ণবের মেয়ে, নাম গাইতে গাইতে হেঁটে কলকাতায় পৌছব।'

বিপিন প্রশ্ন করিল, 'কিন্তু ছোটবাবুর ঠিকানা জানো তুমি?'

পদ্মা কহিল, 'না, সে বাবাজী মশাই জানেন শুধু।...কিন্তু তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে বিব্রত করতে চাই না। কলকাতায় গিয়ে খুঁজে নিতে আর পারব না? খুব পারব।'

বিপিন আর পদ্মা কেহই কলিকাতা দেখে নাই সুতরাং তাহাদের কাছে কথাটা এমন কিছু অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু দিন-পনেরো পরে ভিক্ষা করিতে করিতে যখন সে কলিকাতায় গিয়া পৌছিল তখন তাহার বুক শুকাইয়া উঠিল। বহু লোকের দৃষ্টি এড়াইয়া, বহু অসৎ লোকের কবল হইতে মুক্ত হইয়া সে গৌড়ীয় মঠে আশ্রয় লইল, এবং নিত্য উৎসুক চোখ মেলিয়া কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু সহস্র চেষ্টাতেও কোথাও কমলের সন্ধান মিলিল না।

ইতিমধ্যে মীরা পালিতের অনুরোধে কমল একটি নাটক লিখিয়াছিল। মীরারই বাবার চেষ্টায় কলিকাতার একটি বড় থিয়েটারে তাহা অভিনয়েরও ব্যবস্থা হইল। মাস-ছয়েক পরে তাহারই উদ্বোধন রজনীর দিন সকালে একটা পোস্টার দেখিয়া পদ্মা চমকিয়া উঠিল। "যশস্বী তরুণ সাহিত্যিক কমলকৃষ্ণ রায়ের নূতন নাটক—"; হয়ত এ আর কোনও কমলকৃষ্ণ রায়।

কিন্তু পদ্মার মনে মনে কে যেন বলিল যে এ-ই সেই, যাহার জন্য তাহার এই নিদারুণ দুঃখের তপস্যা। তাহা ছাড়া সে কমলকে বহুবার বলিতে শুনিয়াছে যে সে বই লেখে।

সে পথের লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া থিয়েটারটা খুঁজিয়া বাহির করিল এবং সেখানে গিয়া বহু লোকের কাছে মিনতি করিয়া কমলের ঠিকানাও সংগ্রহ করিল। গেরুয়া পরিহিতা এই তরুণীর সহিত কমলের কি সম্পর্ক থাকিতে পারে তাহা বুঝিতে না পারিয়া কেহ বা নিজের মনোমত অনুমান করিয়া লইয়া মুচকি হাসিল, কেহ বা কানা-ঘুষা করিল কিন্তু সে-সব কোন দিকে পদ্মার তখন দৃষ্টি নাই, নিদারুণ মানসিক উত্তেজনায় সে তখন বিভ্রান্ত, বাহ্যজ্ঞান-শূন্য।

পদ্মা যখন কমলের বাসার সামনে পৌঁছিল তখন অপরাহ্ন। তাহার কড়া নাড়ার শব্দে বাসার নূতন চাকরটা বাহির হইয়া আসিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল; পদ্মার প্রশ্নের উত্তরে কহিল, 'বাবু নহি হ্যায়, বাহার হো গিয়া। ···মীরা দিদিমণিকো উঁহা গিয়া।'

'মীরা দিদিমণি? সে আবার কে?'

চাকরটা বিরক্ত হইয়া কহিল, 'উহু হাম নহি জান্‌তা।'

তারপর দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

পদ্মার বুকে কে যেন অকস্মাৎ পাষাণের ভার চাপাইয়া দিল, সে টলিতে টলিতে গিয়া অবসন্নভাবে পাশের একটা বাড়ির রকে বসিয়া পড়িল। আজ সারাদিন অনাহারে কাটিয়াছে, তাহার উপর সারা দুপুর রৌদ্রের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, সেই সমস্ত ক্লান্তি যেন তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কতক্ষণ যে সে এইভাবে বসিয়া ছিল তাহা সে নিজেই জানে না, সহসা চমক ভাঙ্গিয়া গেল প্রকাণ্ড এক মোটরের শব্দে। চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল মোটরের সামনের সীটে পাশাপাশি বসিয়া আছে কমল আর একটি রূপসী তরুণী—কি একটা রসিকতায় দুইজনেই হাসিতেছে।···

কমলের সেদিন দ্বিপ্রহরে মীরাদের বাড়ি নিমন্ত্রণ ছিল। কথা ছিল মীরার সহিতই মোটরে করিয়া আসিয়া সে বাসা হইতে কাপড় ছাড়িয়া নাটকের উদ্বোধন দেখিতে যাইবে।

বেচারী পদ্মা এসব কিছুই জানিতে পারিল না ; সে শুধু দেখিল যে কমল শীস দিতে দিতে লাফাইয়া উপরে গেল, এবং মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই বহু-মূল্য বেশে সাজিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার মোটরে বসিল। তরুণীটি নিমেষে গাড়ি চালাইয়া চলিয়া গেল।

পদ্মা কিছুক্ষণ পর্যন্ত বুঝিতেই পারিল না যে আঘাতটা তাহার কতখানি। সে যেন ঘুমের ঘোরে রহিয়াছে। সে ঘুমের ঘোরেই মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে এ ঠিকই হইয়াছে, কমল জমিদারের ছেলে, কমল বিদ্বান, আর সে জ্ঞাতি-গোত্র-হীনা ভিখারিণী—এ মিলন অসম্ভব! কমল এইবার তাহার উপযুক্ত সঙ্গিনী বাছিয়া লইয়াছে!

প্রায় ঘণ্টা-তিনেক সেইখানেই বসিয়া থাকিবার পর সহসা নিজের হাতের দিকে নজর পড়িয়া সে চমকিয়া উঠিল। দু'গাছা লাল সেলুলয়েডের চুড়ি, বহুদিন আগেই কমলই কিনিয়া তাহার হাতে পরাইয়া দিয়াছিল। সেই দু'গাছি আভরণ সে সযত্নে এত দিন রক্ষা করিয়াছে! আর রাখার প্রয়োজন নাই মনে করিয়া আস্তে আস্তে সে চুড়ি দু'গাছি খুলিয়া ফেলিল, তাহার পর কমলের সদরের সামনে রাখিয়া দিয়া সেইরূপ অভিভূতের মতোই একদিকে যাত্রা করিল।

থিয়েটারের অসামান্য সাফল্যের পর ফিরিতে ফিরিতে মীরা জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা নাটক উৎসর্গ করেছেন্—"আমার পদ্মাকে দিলাম"—এ পদ্মাটি কে?'

কমলের মনে হইল যে সমস্ত আনন্দ যেন নিমেষে মরিয়া গেল। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'সে অনেক কথা মিস্ পালিত, অন্য একদিন বলব।'

মীরা তাহাকে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। কমল সদরের সামনে আসিয়া কড়া নাড়িতে যাইবে এমন সময় তাহার পায়ে ঠেকিল ঐ চুড়ি দু'গাছি। অন্য সময় হইলে সে হয়ত অত লক্ষ্যই করিত না কিন্তু সেদিন সহসা নিচের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। চুড়ি দু'গাছি তুলিয়া লইয়া পাগলের মতো চলিল গ্যাসের আলোর কাছে—এবং চিনিতেও এক মুহূর্ত্ত দেরি হইল না। এ চুড়ির প্রতিটি অণু তাহার পরিচিত।

ততক্ষণে চাকর দ্বার খুলিয়াছে—তাহাকে আসিয়া প্রশ্ন করিল, 'কোন্ আয়া থা হিঁয়া, জল্‌দি বোল্—'

চাকর হতভম্ব হইয়া কহিল, 'এঁহা ? কোই নেহি তো !...হাঁ হাঁ আয়ী থী, এক ঔরত। আপ্‌কো বাত পুছ্‌তী থী—'

অসহিষ্ণুভাবে কমল কহিল, 'কাঁহা গয়ী উও আওরাত ? কিধার গয়ী ? কব আয়ী থী ?'

চাকর কহিল, 'হাম্মে কেয়া মালুম উও কিধার গয়ী !'

কমল সহসা ঠাস করিয়া তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া দিল, তাহার পর তিন লাফে উপরে গিয়া বাক্স খুলিয়া যতগুলি টাকা ছিল বাহির করিয়া লইয়া আবার ছুটিয়া বাহির হইল রাস্তায়। প্রথম খানিকটা ছুটিয়াই চলিল পরে সৌভাগ্যক্রমে একটা খালি ট্যাক্সি পাইল। ট্যাক্সিওয়ালার হাতে প্রথমেই একটা দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া তাহাকে উর্ধ্বশ্বাসে চালাইতে বলিল থানায়। থানায় রাত্রে যে দারোগাবাবু চার্জে ছিলেন, তাঁহাকে সংক্ষেপে পদ্মার বর্ণনা ও নিজের পরিচয় দিয়া একমুঠা নোট বাহির করিয়া তাঁহার সামনে রাখিল, কহিল, 'এখনই সমস্ত বীটের কনস্টেবলকে খবর পাঠান যত টাকা খরচ হয় হোক্—যে খোঁজ ক'রে এনে দিতে পারবে তাকে আমি হাজার টাকা বখশিশ দেব !'

সেখান হইতে যখন সে বাহির হইল তখন আকাশে বৃষ্টি নামিয়াছে। কিন্তু তাহারই মধ্যে সে গাড়ি চালাইতে বলিল ; গঙ্গার যতগুলি ঘাট আছে, সেইগুলি আগে দেখিতে হইবে, কারণ যে অপরিসীম অভিমানে সে ঐ দু'গাছি চুড়ি তাহারই দ্বারপথে ফেলিয়া গিয়াছে তাহার একমাত্র পরিণতি আত্মহত্যা !

কিন্তু বিধাতা বিরূপ। ঝড় উঠিল। এবং সে ঝড় দেখিতে দেখিতে এমন প্রবল আকার ধারণ করিল যে, আর গাড়ি চলে না। ভীষণ দুর্যোগ দেখিয়া ট্যাক্সিওয়ালা একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাহাকে নামাইয়া দিল, কিন্তু কমলের তখন অপেক্ষা করার সময় নাই, সে সেই প্রলয়ের ঝড় মাথায় করিয়াই কোনমতে পথ চলিতে লাগিল ; পদ্মাকে সে খুঁজিয়া বাহির করিবে, যেমন করিয়াই হউক—

এমনি ভাবে উন্মত্ত প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে যখন সে বাবুঘাটের সামনাসামনি আসিয়া পড়িয়াছে তখন আর চলিবার ক্ষমতা নাই, সে অবসন্ন হইয়া একটা গাছতলায় বসিয়া পড়িল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তাহার মনে হইল ঝড়ের গর্জনের মধ্যেই কাহার গলার সুর যেন শোনা যাইতেছে। সে প্রাণপণ শক্তিতে চোখ মেলিয়া বিদ্যুতের আলোয় দেখিল গঙ্গার জলের একেবারে কাছে এক রমণী মূর্তি, সে 'পদ্মা' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়াই একেবারে অজ্ঞান হইয়া গেল।

পদ্মা মৃত্যুর পূর্বে জন্মের শোধ একবার গান গাহিয়া লইতেছিল—

"আমারি নাগর যায় পর ঘর, আমারি আঙ্গিনা দিয়া"—

কিন্তু কমলের ডাক তাহার কানে পৌছিল। সে বিদ্যুতের আলোতে কমলের দেহ দেখিতে পাইয়া পাগলের মতো ছুটিয়া আসিল। তাহার মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া আকুল ভাবে ডাকিতে লাগিল, 'ওগো, অভাগীর জন্যে কেন তুমি এমন সর্বনাশ করলে গো? আমার জন্যে যদি তোমার কিছু হয় তো আমি কেমন ক'রে সইব?'

অনেকক্ষণ পরে কমল চোখ মেলিয়া ডাকিল, 'পদ্মা!'

'এই যে আমি, কি বলো!'

'তোমাকে কি পেলাম? আর ছেড়ে যাবে না?'

'না, আর কিছুতে না। কিছুতে তোমায় ছেড়ে দেব না!'

তখন ঝড় থামিয়া আসিয়াছে। পূর্বাকাশে তরুণ সূর্য দেখা দিয়াছেন। তাহারই আলোতে এই তরুণ-তরুণীর আবার মিলন ঘটিল।

অগ্নিপরীক্ষা

সুরেশ বড়লোকের ছেলে কিন্তু ভাল ছাত্র। 'কিন্তু' বলিবার কারণ এই যে, এই দুটি গুণ সাধারণত পরস্পরবিরোধী বলিয়াই মনে হয়—এবং দৈবাৎ এই দুইটি গুণের মিলন ঘটিলে পাত্রটি ইস্কুল-কলেজের ছেলেদের মধ্যে অনায়াসে চাঁই বা কর্তা হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য সুরেশের ভাগ্যেও এ ব্যবস্থার অন্যথা ঘটে নাই—সারাটা স্কুল-জীবন তাহার সর্দারী করিতে করিতেই কাটিয়া

গেছে। কলেজ ইউনিয়ন, ফেডারেশন প্রভৃতি হইতে শুরু করিয়া ডিবেটিং ক্লাব, ফিজিকাল কালচার সোসাইটি প্রভৃতি যেখানে যাহা কিছু সব কয়টিরই সে সেক্রেটারী বা প্রেসিডেন্ট বা ঐরকম কিছু। অর্থ, রূপ, গুণ ও স্বাস্থ্য ভগবান তাহাকে অজস্র দিয়াছিলেন বলিয়া সে বহু ছেলেরই ঈর্ষার পাত্র।

এ হেন সুরেশ সেদিন কী একটা কাজ সারিয়া অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিতেছিল। যে পাড়াটা দিয়া ফিরিতেছিল সেটার খ্যাতি খুব ভাল নয় কিন্তু সেখান দিয়া গেলে প্রায় পনেরো মিনিট সময় বাঁচিয়া যায় বলিয়াই সে সেই রাস্তাটা ধরিয়াছিল। তাহা ছাড়া তাহার নিজের চরিত্র সম্বন্ধে এত সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যে কোন রাস্তা দিয়া চলিতেই তাহার আপত্তি ছিল না, আর তাহার বুকের ছাতিটা দেখিবার পরও যে কোন গুণ্ডা তাহাকে ঘাঁটাইতে সাহস করিবে না, তাহাও সে জানিত।

সে অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে পথ হাঁটিতেছিল, তাই কমলা যখন সহসা তাহাকে প্রায় মরীয়া হইয়াই ডাকিয়া ফেলিল-'শুনুন', তখন পল্লীর অখ্যাতির কথাটা তাহার মনেই পড়ে নাই। সোজাসুজি কোন বিপদ ঘটিয়াছে বলিয়াই সে ধরিয়া লইল এবং বিদ্যুৎ বেগে 'কী হয়েছে' বলিয়া একেবারে তাহার সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কিন্তু তাহার পূর্বে কমলার কথা কিছু বলি—

তাহার বাপ-মায়ের কোন খবর কমলা নিজেও রাখে না সুতরাং তাহার পিতৃ-পরিচয় অজ্ঞাত বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। জ্ঞান হওয়ার পর হইতেই সে নিজেকে ঝিয়ের ঘরে দেখিতেছে, যাহাকে সে প্রথম দেখিয়াছিল তাহাকেই সে মা বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিত যদি না সে সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য আর একজন ঝিয়ের কাছে বিক্রয় করিয়া চলিয়া যাইত। কমলা সেই বয়সেই এটা বুঝিতে পারিয়াছিল যে আর যাহাই হউক আচরণটা ঠিক মায়ের মতো নয়। তাহার পর হইতে আরও দুই-তিন হাত বদল হইয়া সম্প্রতি ক্ষ্যান্ত বাড়িউলির কাছে আসিয়া পড়িয়াছে সে। ক্ষ্যান্ত নিজে বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সম্বলের মধ্যে উপরে নিচে দু-কামরা এই একফোঁটা বাড়ি। সে কমলাকে পাইয়া বাঁচিয়া গেল। কমলার বয়স কম, এবং রূপ ছিল। ক্ষ্যান্ত নিচের ঘরের ভাড়াটেকে তুলিয়া দিল, নিজের ঘর হইতে কিছু

কিছু আসবাবপত্র দিয়া সেই ঘর সাজাইয়া দিল এবং আকারে-ইঙ্গিতে কমলাকে প্রস্তুত হইতে বলিল।

কিন্তু বিপদ বাধিল কমলাকে লইয়া—খাওয়াইয়া পরাইয়া মাজিয়া ঘষিয়া ক্ষেন্তি যখন তাহাকে চলনসই করিয়া লইয়া নূতন ব্যবসা শিখাইতে গেল তখনই সে বাঁকিয়া বসিল। ক্ষেন্তি অনেকদিন এই কাজে থাকিয়া চুল পাকাইয়াছে, সে তখনই তাড়া দিল না, মনে মনে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেও আরও খানিকটা সময় দিল।

কমলা এই সব সংসর্গেই মানুষ হইয়াছে, সুতরাং অন্যায় বলিয়া যে তাহার আপত্তি তাহা নয়—সে বলে, আমার ভয় করে।

ক্ষেন্তি আরও কিছুদিন সময় দিয়া, কখনও বা মিষ্ট ভাষায়, কখনও বা তাড়নায়, অবশেষে তাহাকে রাজী করিল। আজই তাহার প্রথম রাত্রি।

কিন্তু রাজী হওয়া সত্ত্বেও তাহার ভয় যায় নাই। সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল বটে কিন্তু লোকে তাহার দিকে চাহিলেই সে ভয়ে ভিতরে ঢুকিয়া আসিতেছিল! দৈবক্রমে সেই দিনই ক্ষেন্তির কোমরের ব্যথাটা অত্যন্ত বাড়িয়াছিল বলিয়া তাহাকে সন্ধ্যার আগেই শয্যাগ্রহণ করিতে হইয়াছিল, যদিচ তৎসত্ত্বেও সে উপরের ঘর হইতেই মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার দিতে ছাড়ে নাই।

কমলা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল। একবার তো একটা মাড়োয়ারী ঘাড়ের উপরেই আসিয়া পড়িয়াছিল, কমলা ভয়ে কপাটটা বন্ধ করিয়া দিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কিসের ভয় তাহা সে জানে না, শুধু ভয়। অথচ এধারে ক্ষেন্তির আস্ফালন ক্রমশই তীব্র হইয়া উঠিতেছে, অগত্যা তাহাকে আবারও দুয়ার খুলিতে হইল। ঠিক সেই সময়েই সুরেশ সেইখান দিয়া ফিরিতেছিল। গ্যাসের আলো তাহার সুন্দর মুখ ও প্রশস্ত বক্ষের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ কমলার যেন মনে হইল যে এই মানুষটিকে ভয় নাই, যদি কাহারও কাছে আত্মসমর্পণ করিতেই হয় তো ইহার কাছে করাই শ্রেয়।

কিন্তু সুরেশ সে দিকে যায় না যে! ক্ষেন্তি তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল, 'ওরাই উপ্‌জে আসবে'খন, তোকে কিছু বলতেই হবে না। শুধু টাকাটা ঠিক ক'রে নিস।'

তবু এ মানুষটি যে চলিয়াই যায়! সে একরকম মরীয়া হইয়াই ডাকিয়া ফেলিল, 'শুনুন!'

মরীয়া হইয়া ডাকা বলিয়াই বোধহয় কণ্ঠস্বরটা আর্ত শোনাইল। সুরেশ চমকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং ভুল বুঝিল। সে ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, 'কী হয়েছে?'

কমলার তখন যেন গলা শুকাইয়া আসিয়াছিল। সে কোনমতে ইঙ্গিতে তাহাকে ভিতরে আসিতে বলিয়া নীরবে আগে আগে পথ দেখাইয়া তাহার নির্দিষ্ট ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

কিন্তু তখনও সুরেশ ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারে নাই। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'কী হয়েছে, ব্যাপার কী?'

ঠিক এ প্রশ্নের জন্য কমলা প্রস্তুত ছিল না, কি বলিতে হইবে তাহাও বুঝিতে পারিল না। নিঃশব্দে নতমুখে দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল।

ঘরের আসবাব-পত্রের দিকে দেখিয়া এবং কমলাকে নিরুত্তর দেখিয়া এতক্ষণে সুরেশের আসল কথাটা সন্দেহ হইল। সে আরও একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া কঠিন কণ্ঠে কহিল, 'ওঃ, তুমিও বেশ্যা! ছিঃ ছিঃ—আমি ভেবেছিলুম বুঝি তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, কোন বিপদে পড়ে আমাকে ডাকছ। তোমার বয়স কম, তাই বেঁচে গেলে; অন্য কেউ হ'লে এমন একটি চড় কষিয়ে দিয়ে চলে যেতুম যে তিনদিন আর উঠতে হ'ত না। আমাকে ডাকার সাধ ঘুচিয়ে দিতুম।…ভবিষ্যতে যখন কাউকে ডাকবে, লোক দেখে ডেকো—'

সে ঝড়ের মতো বাহির হইয়া গেল। কিন্তু তাহার এই তিরস্কার সত্যকার চাবুকের চেয়েও বেশী জোরে গিয়া যেন কমলাকে আঘাত করিল। সে কিছুক্ষণ কাঠের মতো আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মেঝের উপরেই আছড়াইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাপ-মায়ের স্নেহে মানুষ হওয়া তাহার ভাগ্যে ছিল না, কুৎসিত সংসর্গে মার-ধোর-লাঞ্ছনার মধ্যেই সে এতবড় হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু মানুষের কথা যে এমন করিয়া মানুষকে আঘাত করিতে পারে তাহা সে কোনদিনই অনুভব করিতে পারে নাই। বইয়ের পাতায় সে মান-অপমানের কথা শেখে নাই কিন্তু আজ তাহার মনে হইতে লাগিল যে ইহার চেয়ে মৃত্যুও ঢের ভাল ছিল।

ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিতে লাগিল, উপরে ক্ষেন্তির আস্ফালন ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া আসিতে আসিতে একসময়ে একেবারেই থামিয়া গেল। বোধ করি সে ঘুমাইয়াই পড়িল। কিন্তু কমলার চোখে ঘুম আসিল না। সে তেমনি করিয়াই মাটিতে পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, তাহার সে বুকফাটা কান্না দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যে আজিকার এ শোকাবহ রাত্রিও বোধ করি ফুরাইবে না, এ মর্মন্তুদ রোদনও থামিবে না।

কমলা জ্ঞান হওয়ার পর যাহাকে মা বলিয়া জানিত, সাত বৎসর বয়সের সময় সে যখন মাত্র পঞ্চাশটি টাকার জন্য তাহাকে বিক্রয় করিয়া চলিয়া গেল তখন সে কেমন করিয়া নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়াছিল যে আর যাহাই হউক সে তাহার মা নয়। কে তাহার মা, কোথায় কবে মারা গেল, কোথা হইতে ইহারা তাহাকে সংগ্রহ করিল, এ সব কথা তাহার মধ্যে মধ্যে মনে আসিলেও, সে উহা লইয়া কোনদিনই বিশেষ মাথা ঘামায় নাই। কিন্তু আজ এতদিন পরে অতীতের সমস্ত লাঞ্ছনা যেন নূতন করিয়া তাহার কাছে অসহ্য হইয়া উঠিল, যে মা কী বস্তু তাহা সে জানে না, সেই মায়েরই উদ্দেশে বার বার আকুল কণ্ঠে সমস্ত বেদনা উজাড় করিয়া দিতে লাগিল, 'মা, মাগো, আর যে পারি না।'

ভোরের দিকে প্রথম স্ক্যাভেঞ্জারের গাড়ির শব্দে সহসা সে চমকিত হইয়া উঠিল। সে কিছুতেই এ জীবনযাপন করিতে পারিবে না, কিছুতেই না। জীবনে ঘরকন্না পাতিয়া নারী-জীবনের সাধ-আহ্লাদ মিটাইবার পথ তাহার জন্য চিরকালের মতো রুদ্ধ হইয়া গেছে এ কথাটা কেহ বলিয়া না দিলেও সে বুঝিতে পারিয়াছিল কিন্তু তবু এই স্নেহমায়াহীন সকলকার ঘৃণিত জীবন সে কিছুতেই যাপন করিবে না, বরং আত্মহত্যা করিতে হয় সেও ভাল।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল যে এ ঘরটা যেন চারিদিক হইতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিতেছে। সে একরকম ছুটিয়াই ঘর হইতে—সে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু রাস্তায় বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খানিকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল। আশ্রয় খুঁজিতে হইবে বটে কিন্তু এখান হইতে অনেকটা দূরে গিয়া। একটু পরেই ক্ষ্যান্ত উঠিবে এবং তাহাকে না দেখিতে পাইয়া রীতিমতো খোঁজাখুঁজি

শুরু করিবে নিশ্চয়ই। তাহার ভয় হইতে লাগিল, কী জানি যদি ধরিয়া আনে আবার? সে শিহরিয়া উঠিয়া সোজা দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরিয়া একরকম ছুটিয়াই চলিল।

তখনও ফরসা হয় নাই, রাস্তায় লোকও কেহ ছিল না। অত রাত্রে তাহাকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটিতে দেখিয়া গলির মোড়ে পুলিসে ধরিল, 'কাঁহা যাতী হ্যায়?'

এ বিপদের জন্য বোধ করি সে প্রস্তুত ছিল না, শুধু পিছনের বিপদটা হইতে দূরে সরিয়া যাইবার জন্যই প্রাণপণে ছুটিতে ছিল, কন্‌স্টেব্‌লের সামনে পড়িয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার বিপন্ন দৃষ্টি এবং অশ্রু দেখিয়া কন্‌স্টেব্‌লটা কি ভাবিল কে জানে, প্রশ্ন করিল, 'কারও অসুখ করেছে নাকি?'

কমলাও যেন আঁধারে কূল পাইল, মাথা নাড়িয়া কহিল, 'হ্যাঁ, আমার মায়ের অসুখ, ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।'

সে ছাড়িয়া দিল। কমলা এবার আর না ছুটিয়া, যতটা সম্ভব দ্রুতপদে পথ চলিতে লাগিল। সে ইতিমধ্যেই মন স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল, গায়ে দুই-একখানা অলঙ্কার আছে, সেইগুলি বেচিয়া প্রথমে কিছু টাকা সংগ্রহ করিবে, তাহার পর কোনও দূরদেশে গিয়া যে-কোনও উপায়ে ভদ্রভাবে জীবিকার্জনের চেষ্টা করিবে।…

সকাল হইতে প্রথমেই যে পোদ্দারের দোকান দেখিতে পাইল সেইখানেই ঢুকিয়া পড়িয়া কহিল, 'আমি এই গহনাগুলো বিক্রী করতে চাই, নেবেন আপনারা?'

পোদ্দার একবার তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া হাত বাড়াইয়া কহিল, 'দেখি—'

কমলা একে একে বালা, চুড়ি, তাগা সবই খুলিয়া দিল। কিন্তু সেগুলি হাতে করিয়াই পোদ্দারের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। সে কহিল, 'পীরের কাছে মামদোবাজী করতে এসেছ বাছা? গিল্‌টির গহনা চালাতে এসেছ পোদ্দারের কাছে? এখন যদি পুলিস ডাকি?'

কমলার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কাল সন্ধ্যায় তাহাকে সাজাইবার সময় ক্ষ্যান্ত বাক্স হইতে এইগুলি বাহির করিয়া পরাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু এগুলি

যে গিল্‌টির হইতে পারে এ সম্ভাবনা একবারও তাহার মনে জাগে নাই। তাহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া উঠিল, সে কথার জবাব দিতে পারিল না, শুধু শূন্য-দৃষ্টিতে তাকাইয়া বসিয়া রহিল।

পোদ্দার পাকা লোক। সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইল, 'বাবু বুঝি সোনার গয়না ব'লেই দিয়েছে? তা এ লাইনে এমন বহুৎ ঠক্‌তে হবে।'

আশ্চর্য, পোদ্দারটা পর্যন্ত তাহাকে সোজাসুজি বেশ্যা বলিয়াই ধরিয়া লইল! কমলা লজ্জায় যেন মাটির সহিত মিশিয়া গেল। কিন্তু তবুও তাহাকে যে কথা কহিতেই হইবে। কোনমতে মাথা তুলিয়া কহিল, 'এর মধ্যে কি একটাও সোনার গয়না নেই?'

পোদ্দার ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'না।' তারপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'দেখি বাছা তোমার মাকৃড়ী-জোড়াটা—'

মাকৃড়ী-জোড়া পরীক্ষা করিয়া কহিল, 'হ্যাঁ, এ দুটো সোনার বলেই মনে হচ্ছে, তবে মরা সোনার। বেচবে এ দুটো?'

কমলা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিল। এ দুটা তাহার বাল্যকালের, তাহার দ্বিতীয় আশ্রয়দাত্রীর দেওয়া, সেই হইতেই কানে আছে।

সুতরাং তাহার ওজনও সামান্য। পোদ্দার অনেক ঘষামাজা হিসাব-পত্র করিয়া তাহাকে তিন টাকা এগারো আনা গনিয়া দিল, কহিল, 'তাই তিনটি পয়সা তোমায় বেশি দিলুম বাছা—'

কমলা টাকা ও পয়সাগুলি আঁচলে বাঁধিয়া, নিরাভরণ অবস্থাতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, দাসীগিরি করিয়া তাহাকে খাইতে হইবে যখন, অনর্থক গিল্‌টির গহনা গায়ে চড়াইয়া লাভ কি? দুগাছি কাঁচের চুড়ি ছিল হাতে, সেই দুটিই শুধু রহিল।

দূরদেশে যাইবার আশা তো একেবারেই গেল, এখন তাহার প্রথম চিন্তা হইল কোথায় গিয়া দাসীর কাজ খুঁজিবে? মনে হইল অনেকদিন আগে একবার কালিঘাট গিয়াছিল, সেখানে বহু লোকের বসতি এবং সেটা ক্ষ্যান্তর বাড়ি হইতে অনেকটা দূরও বটে—সেইখানে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সে লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া কালিঘাটের পথেই চলিতে শুরু

করিল। অনভ্যস্ত পদে ধীরে ধীরে হাঁটিয়া যখন কালিঘাটে পৌঁছিল তখন বেলা মধ্যাহ্নের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। আগের দিন সারারাত্রি অনাহারে কাটিয়াছে তাহার উপর অদ্যকার এই পথশ্রমে তাহার গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল, সামান্য কিছু জলযোগের আশায় একটা খাবারের দোকানের সামনে গিয়া দেখিল ভাগ্যদেবতা তাহার সহিত চরম রসিকতাই করিয়াছেন, কে ইতিমধ্যে তাহার আঁচল হইতে সমস্ত টাকা-পয়সা খুলিয়া লইয়া একটা ঢিল বাঁধিয়া দিয়াছে। মধ্যে দুই-তিন বার ভিড়ের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল, সেই সময়েই কে এই কাণ্ডটি করিয়াছে।

কিছুক্ষণ পাষাণের মতো অনড় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত সে আহারের আশা ত্যাগ করিল। রাস্তার ধারের একটা কল হইতে শুধু জল খাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া আবার পথ চলিতে শুরু করিল। হয়ত কিছু খাবার চাহিলে সে পাইত, কিন্তু ভিক্ষা করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

এইবার আরম্ভ হইল তাহার চাকরি খোঁজা। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, কম মাহিনাতে ঝিয়ের কাজ করিতে চাহিলে কাজের অভাব হইবে না। কার্যক্ষেত্রে নামিয়া তাহার সে ভুলও ভাঙ্গিয়া গেল। বহু বাড়িতে সে কাজের জন্য গেল কিন্তু কেহই তাহাকে রাখিতে ভরসা করিল না। পুরুষদের মধ্যে বৃদ্ধেরা বক্রোক্তি করিলেন, যুবকরা অশ্লীল ইঙ্গিত করিল। যেখানে মেয়েদের কাছে গিয়া পৌঁছিতে পারিল সেখানে আরও লাঞ্ছনা। একজন বলিলেন, 'সোমত্ত ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি বাছা, খাল কেটে কি কুমীর ঘরে ঢোকাব?' কেহ বা বলিলেন, 'তোমাদের বাছা বাবুর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ঝিগিরি করতে আসা, আবার মিটে গেলেই কাজ ছেড়ে চলে যাবে।' কেহ বা শুধু বিরস মুখে ঘাড় নাড়িলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আহার নাই, আশ্রয় নাই—এমন কি আশা পর্যন্ত নাই। পথকষ্টে, অনাহারে, হতাশায় তাহার পা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পর বিপদ, সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই ক্ষ্যান্তর চাকরের প্রায় সামনে পড়িয়া গেল। খুব সম্ভব তাহাকে খুঁজিতেই আসিয়াছে; কোন-মতে পাশ কাটাইয়া একটা গলিতে ঢুকিয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করিল বটে কিন্তু

বহুক্ষণ পর্যন্ত তাহার বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। এই অবস্থায় কোথায় রাত কাটায়? পাড়াতে থাকারও বিপদ, ছোকরার দল চঞ্চল হইয়া ওঠে; কেহ বা পিছু লয়, কেহ বা শিস দেয়। শেষকালে মরীয়া হইয়া নকুলেশ্বর মন্দিরের কাছে এক বৃদ্ধ সাধুর আস্তানায় হাজির হইয়া তাঁহার পা ধরিয়া কহিল, 'বাবা, আজকের রাতটা কোনমতে যদি আশ্রয় দাও—আমি বড় অসহায়।'

সাধু ভাগবত পড়িতেছিলেন, চোখ তুলিয়া চাহিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র ঘরেরই একটা কোণ দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, 'ঐখানে থাকো মা, কিন্তু ভোর হ'লেই চলে যেয়ো।'

তাহার পর ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন, 'আমরাই ভগবানের আশ্রয়ে থাকি, এস্থান থেকে 'চলে যাও' বলাটা খুবই অন্যায়, কিন্তু মা আমাদেরও পাঁচজনের ওপর নির্ভর করতে হয়—পুলিস কেস্ হ'লে বড়ই লজ্জায় পড়ব।'

কমলা যেন লজ্জায় মাটির সহিত মিশিয়া গেল। ছিঃ ছিঃ—বৃদ্ধ সাধু পর্যন্ত তাহাকে কী না সন্দেহ করিতেছেন! একবার মনে হইল যে তখনই সে-স্থান পরিত্যাগ করে, কিন্তু বাহিরের কথা মনে পড়িয়া আর সাহসে কুলাইল না। সে সেই ঘরেরই এক কোণে পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল—

সাধুজী সারারাত্রি ধরিয়াই প্রদীপের আলোতে ভাগবত পড়িয়া চলিলেন। একবারও ঘাড় তুলিয়া চাহিলেন না কিম্বা ফিরিয়া দেখিলেন না পর্যন্ত। শুধু রাত্রি শেষে প্রথম কাক ডাকিবার সঙ্গে-সঙ্গেই কমলা উঠিয়া নিঃশব্দে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যখন বাহির হইয়া যাইতেছিল, কেবল সেই সময় একবার ফিরিয়া তাকাইলেন। কহিলেন, 'এদিকে একবার এস তো মা!'

কমলা আসিয়া তাঁহার সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। প্রদীপের যে ক্ষীণ আলো তাহার শুষ্ক পাণ্ডুর মুখে ও রোদনারক্ত চোখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল তাহাতেই তিনি কি দেখিলেন কে জানে, ধীরে ধীরে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া কহিলেন, 'কাল প্রথমটা ভুল বুঝেছিলুম মা, তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, কুমারী —তুমি আমার নমস্যা! যাও মা, তোমার ভাল হবে।...'

কমলা আবার যখন রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল তখন দুর্বল দেহ তাহার বাতাসের মতো কাঁপিলেও মনে তাহার কে যেন নূতন উৎসাহ ভরিয়া

দিয়াছিল। সে ব্রাহ্মণ-কন্যা, কুমারী, বৃদ্ধ সাধুরও নমস্যা! ভগবদ্ভক্ত সন্ন্যাসীর কথা কি মিথ্যা হইতে পারে? কখনও না। অতীতের যত ক্লেদই তাহাকে ঘিরিয়া থাকুক না কেন, তাহার মধ্য হইতে মুক্তি পাওয়া তাহা হইলে তাহার দুরাশা নহে!

সে নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া আবার যাত্রা শুরু করিল। সোজা একটা রাস্তা ধরিয়া দুই ধারের প্রায় সমস্ত বাড়িতেই কাজের খোঁজ করিতে লাগিল কিন্তু সেদিনও সেই পূর্বের অবস্থা। আগের দিনের চেয়ে ভাল ফল সেদিনও হইল না। বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনা—অভদ্র ইঙ্গিত। ক্রমে যখন সে দিনও শেষ হইয়া আসিল, তখন এধারেও তাহার যেমন হাঁটিবার শক্তি চলিয়া গিয়াছিল, মনেও আর যেন কোন জোর ছিল না। তাহার অদৃষ্টে কি সাধুর বাক্যও নিষ্ফল হইয়া গেল! তিনি যে বলিলেন 'তোমার ভাল হবে'—সে কথা কি তাহা হইলে একেবারেই মিথ্যা?

সে ক্লান্তদেহ ও ভগ্নমন লইয়া পথের ধারের একটা গাছতলায় আশ্রয় লইল। পা দুটাকে আর টানিয়া লইয়া যাওয়া যায় না, এইখানেই সে থাকিবে, যাহা হয় হউক। একটা ক্লান্তি, কেমন একটা মোহ যেন তাহার সারাদেহকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে—এই কি তাহা হইলে মৃত্যু? আসুক, আসুক, মৃত্যুই আসুক।

কোনমতে প্রাণপণে চোখ দুটি মেলিয়া একবার উর্ধ্বমুখে চাহিয়া মনে মনে শেষ আকুতি জানাইল, 'ভগবান আমাকে নাও—আর পারি না।'

তাহার পরই অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

ইস্‌লামাবাদের তরুণ জমিদার আলোকনাথ রায় কী কাজে কলিকাতা আসিয়াছিল, সম্প্রতি বাড়ি ফিরিতেছে। আকাশে দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে, দুই-এক ফোঁটা জলও পড়িতে শুরু করিয়াছে দেখিয়া সে গাড়ির স্পীড বাড়াইয়া দিল।

বেহালা ছাড়াইয়া ডায়মণ্ডহারবারের চওড়া রাস্তাটা সে সময় নির্জন, জন-বিরল; মনের আনন্দে হেডলাইট জ্বালাইয়া সে নিজে গাড়ি চালাইতেছিল, অকস্মাৎ একটা বাঁকের মুখে আলোর রেখাটা একটা গাছতলায় গিয়া পড়িতেই

চোখে পড়িল কে একটা মানুষ পড়িয়া আছে, সম্ভবত স্ত্রীলোকই, কারণ শাড়ির চওড়া পাড়টা নজরে পড়িল। এই দুর্যোগে এমন সময়ে কে পড়িয়া আছে?

ঘ্যাঁচ্ করিয়া গাড়ি থামাইয়া, ড্রাইভার নগেনকেও পিছনে আসিতে বলিয়া সে নামিয়া পড়িল। কাছে গিয়া দেখিল একটি ষোল-সতেরো বছরের রূপসী মেয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। যেন সায়াহ্ন বেলার মুদিত কমল, ম্লান কিন্তু অপরূপ সুন্দর!

মুহূর্ত-কয়েক সে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, 'নগেন ধরো দিকিন শীগগির। মেয়েটাকে আপাতত গাড়িতে তুলি—এখনি দুর্যোগ শুরু হবে—দেরি করলে একেবারে মারা যাবে—'

নগেন সঙ্কুচিত ভাবে কহিল, 'বাবু ও বোধ হয় মরে গেছে—'

'পাগল নাকি? দেখছ না নিঃশ্বাসে বুক কাঁপছে, গলার নলি ধুক্-ধুক্ করছে। ধরো ধরো—'

নগেনের কিন্তু এত হাঙ্গামে যাইতে আদৌ ইচ্ছা ছিল না। সে আরও খানিকটা ইতস্তত করিয়া কহিল, 'ও ভিখিরীর মেয়েরা অমন শুয়েই থাকে, কী দরকার বাবু ও সব হাঙ্গামে যাবার? পরের দায় নিয়ে—'

আলোক তরুণ যুবক, য়্যাড্ভেঞ্চারের গন্ধ পাইয়াছে, তখন কোন কথাই শুনিবার মতো অবস্থা তাহার নয়। সে ধমক দিয়া কহিল, 'কী বলছ যা তা, ভিখিরীর মেয়েকে এমন শান্তিপুরের শাড়ি পরতে দেখেছ কখনো? যা বলছি শোন—'

অগত্যা নগেনকে তুলিতে হইল। ধরাধরি করিয়া গাড়িতে তুলিবার সময়ই তাহার আসল অবস্থাটা আলোকের নজরে পড়িল, 'সে কহিল, ইস্ এর পেট দেখেছ? বোধ হয় অনেক দিন কিছু খায় নি, তাইতেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছে—দেখ দিকি এগিয়ে, আমতলায় গিয়ে একটু দুধ যোগাড় করতে পারো কিনা—'

নগেন গাড়ি ছাড়িয়া দিল। ততক্ষণে বৃষ্টি শুরু হইয়াছে। তাহারই ঠাণ্ডা বাতাসে মেয়েটির জ্ঞান হইল। সে চোখ মেলিয়া দেখিল একটি তরুণ যুবক তাহার মুখের দিকে উদ্বিগ্ন ভাবে চাহিয়া আছে, এবং সে একটা মোটরের মধ্যে—

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেই আলোক কহিল, 'উঠবেন না, উঠবেন না, আপনার কোন ভয় নেই—আগে একটু দুধ খান, তার পর সব হবে'খন—'

আমতলা হাটে দুধ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া অলোক আবার গাড়ি ছাড়িয়া দিতে বলিল, 'সোজা বাড়ি চলো—'

আলোকের বাবা গঙ্গানাথবাবু এ অঞ্চলের ডাক্-সাইটে জমিদার ছিলেন। কিন্তু এক বৎসরের কন্যা জ্যোৎস্না ও বছর পাঁচেকের ছেলে আলোককে রাখিয়া তাঁহার স্ত্রী যখন মারা গেলেন তখন শত অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আর বিবাহ করিলেন না। একটি সদ্যোপ্রসূতী দাসী সংগ্রহ করিয়া জ্যোৎস্নার ভার তাহার হাতেই দিয়া তিনি নিজে ছেলেটিকে মানুষ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বৎসর-খানেক পরে একটা অতিশয় দুষ্কর্মের জন্য তিনি যখন সেই ঝিকে তাড়াইয়া দিলেন তখন সে একা গেল না, সালঙ্কারা কন্যাটিকেও লইয়া গেল। গঙ্গানাথবাবু পাগলের মতো হইয়া উঠিলেন, পুলিসের লোক, শৌখীন গোয়েন্দা কেহই বাদ গেল না, এমন কি গঙ্গানাথবাবু দশ হাজার টাকা, বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করিলেন, তবুও তাহার আর খোঁজ পাওয়া গেল না। না ঝি, না জ্যোৎস্না কাহারও কোন সন্ধান মিলিল না, ধরণীপৃষ্ঠ হইতে উভয়েই যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

এত বড় আঘাত গঙ্গানাথবাবু সহিতে পারিলেন না। মাস-ছয়েকের মধ্যেই তিনিও শেষ-শয্যা গ্রহণ করিলেন। তাহার পর হইতে আলোক-নাথ মাসি-পিসী প্রভৃতির কাছেই মানুষ হইয়াছিল, সম্প্রতি বি. এ. পাস করার পর নিজের এস্টেট নিজের হাতে লইয়া ডায়মণ্ড হারবারে নিজের বসবাসের জন্য একটি নূতন বাড়ি তৈরারী করিয়া লইয়াছে। পৈতৃক বাড়ি দখল করিয়া আছেন ঐ মাসি-পিসীর দলই। আলোক কমলাকে সেই ডায়মণ্ড হারবারের বাড়িতেই লইয়া আসিল।

প্রথমটা কমলা খুবই সঙ্কুচিত হইয়াছিল। কিন্তু সে আশ্বস্ত হইল যখন দেখিল যে আলোকনাথ তাহাকে কোনও প্রশ্নই করিল না এবং বাড়িতেও গৃহিণী-স্থানীয়া এমন কেহই নাই যিনি অসংখ্য প্রশ্নে জর্জরিত করিবেন। দুই-

তিনদিন পরে কিন্তু যখন কলিকাতা হইতে মূল্যবান শাড়ি ও সায়া কিনিয়া আনিল, তখন কমলা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে নিজেই অলোককে ডাকিয়া কহিল, 'দেখুন কেন আমার অপরাধ বাড়িয়ে তুলছেন এমন ক'রে? আমার কেউ কোথাও নেই, দাসীর কাজ ক'রেই খাই—আমাকে দয়া ক'রে সেই ভাবেই দেখবেন। বরং শুনছি আপনাদের আর একটা বড় বাড়ি আছে, সেখানে দাসী-চাকরও আছে ঢের, সেইখানে যদি একটা ব্যবস্থা ক'রে দেন তো ভাল হয়—'

আলোক কথাটা বিশ্বাস করিল না, করিবার কথাও নয়। সে 'দেখা যাবে' বলিয়া সরিয়া পড়িল। কিন্তু অসুবিধাটা বুঝিতে পারিয়া সেই দিনই ওবাড়ি হইতে মলিনা বলিয়া এক দূর সম্পর্কের বিধবা ভাগ্নীকে আনাইয়া লইল। মলিনার বয়স অল্প, তাহার উপর লেখাপড়াও কিছু শিখিয়াছিল, সে মামার মুখে সব কথা শুনিয়া কমলাকে বিশেষ কোন প্রশ্ন করিল না। এবং কমলার সহিত তাহার এক মুহূর্তেই ভাব হইয়া গেল। কমলাও একটা সঙ্গী পাইয়া বাঁচিল। সে অবশ্য আরও একবার কাজকর্মের কথা বলিতে গিয়াছিল কিন্তু আলোকনাথ এককথায় তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিল, কহিল, 'তুমি তো মরেই গিয়েছিলে, তোমার প্রাণ দিয়েছি আমি, এখন তোমার সম্বন্ধে যা কিছু ব্যবস্থা আমিই করব। তোমার কি?'

কমলার দিন সুখেই কাটিতে লাগিল। প্রকৃতপক্ষে সে-ই বাড়ির গৃহিণী হইয়া উঠিল। যা করে সে, সকলেই তাহা মানিয়া লয়। ঘরসংসার হইতে শুরু করিয়া আলোকনাথের নিজের ঘরের পর্যন্ত সব ভার তাহার উপর। কিন্তু কিছুদিন কাটিবার পরই আলোকের মনের ভাবটা কমলার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে তাহাকে ভালবাসে, ভালবাসা পাইতে চায়। আলোকের ভালবাসার মধ্যে অসম্মানের কোন সম্ভাবনা নাই এ-ও সত্য কথা, কিন্তু তবু যেন সে মনের মধ্যে সেদিক দিয়া কোন সাড়া পায় না। আলোককে সে শ্রদ্ধা করে খুব, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতারও অন্ত নাই, কিন্তু যে ভালবাসার সঞ্চারে মন দিনরাত প্রণয়াস্পদকে ঘিরিয়া থাকিতে চায়, সে ভালবাসা আলোকের প্রতি তাহার ছিল না। হয়ত তাহার অন্য কারণ ছিল, যে সুদর্শন বলিষ্ঠ যুবকটি তাহাকে সর্বনাশকর পরিণামের মুখ হইতে টানিয়া একদা ঘরের

বাহির করিয়া দিয়াছিল, হয়ত তাহার কথাটা সে আজও ভুলিতে পারে নাই ; সেই মূর্তিটাই মনের মধ্যে অত্যন্ত গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া গেছে।

কিন্তু আলোককেই বা কি বলিবার আছে? বিশেষত এক বাসন্তী সন্ধ্যায় গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গিয়া যখন সে সোজাসুজি বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিল, তখন কমলা একটিও আপত্তির কথা মুখে আনিতে পারিল না। সব দিক দিয়াই আলোকের মতো পাত্র বহু জন্মের তপস্যার বস্তু ; আর সে? সে তো নরকের কীট—তাহাকে যদি তিনি পায়ে স্থান দিতেই চান তো তাহার আপত্তি করিতে যাওয়া তো মূর্খতা। বরং যে ঘরকন্নার স্বপ্ন দেখাও একদা তাহার কাছে দুরাশা বলিয়া ঠেকিয়াছিল আজ যদি সেই স্বপ্নই সার্থক হইতে যায় তাহা হইলে তো তাহার উল্লাস করিবারই কথা।···সে শুধু কহিল, 'আপনি তো আমার কিছুই জানেন না ; কোন পরিচয়ই নেই, আপনি আমায় বিয়ে করলে লোকে কি বলবে?'

আলোক হাসিয়া কহিল, 'আমি তোমাকে জানি, তাই আমার যথেষ্ট। যাঁদের আপত্তি থাকতে পারত, তাঁরা যখন কেউই ইহলোকে নেই তখন তো আমি নিশ্চিন্ত—বাকী যারা আছে, তাদের কথায় আমার ভয়টা কি? ভুলে যেও না যে আমি মস্ত বড়লোক!'

কমলা আর কথা কহিতে পারিল না। তাহার সৌভাগ্যটা যেন সে ভাল করিয়া মনের মধ্যে ধারণাও করিতে পারিতেছিল না। তবে সঙ্গে সঙ্গে যেন কোন্ এক অজ্ঞাত আতঙ্কও তাহার মনের মধ্যে গুর্ গুর্ করিতেছিল।

এক ঝলক দক্ষিণা বাতাসের মতো লঘু পদে বাড়ি ফিরিয়াই আলোক তাহার একমাত্র বন্ধু সুরেশকে চিঠি লিখিতে বসিল। এতদিন কোনও কথাই তাহাকে জানায় নাই, আদ্যোপান্ত সমস্ত adventureটি বর্ণনা করিয়া লিখিয়া দিল, 'তুমি পত্রপাঠ চলে এসো—'

দিন-দুই পরেই সুরেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু আলোক তাহাকে মহা সমারোহে লইয়া গিয়া যখন কমলার সহিত পরিচয় করাইয়া দিল তখন সে যেন নিমেষে পাষাণে রূপান্তরিত হইয়া গেল। মুহূর্তকয়েকের দেখা এ মূর্তি তাহার মনের গভীরতম প্রদেশে ক্ষোদিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা মুছিবার নয়। এই তাহার সেই সর্বনাশের দেবতা, যে একদিন তাহাকে

পথে বাহির করিয়া দিয়াছিল।

তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। কোনমতে বিবর্ণমুখে একটা নমস্কার সারিয়া লইয়া টলিতে টলিতে গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া বিছানার উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িল। আলোক ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল না, লজ্জা বলিয়াই মনে করিল। সুরেশও তাহাকে চিনিতে পারিল না সত্য কথা, কিন্তু কেমন যেন তাহার মনে হইতে লাগিল যে এ মুখ তাহার একেবারে অপরিচিত নহে। কবেকার একটা স্মৃতি ঝাপ্‌সা ধোঁয়ার মতো মনে মনে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সুরেশ সব কথা শুনিয়া মুখে বলিল, 'কিন্তু তোমার তো অন্য অনেক আত্মীয়-স্বজন আছেন। তাঁরা কি এ বিবাহে মত দেবেন?'

আলোক তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, 'ও কথা এখন থাক ভাই— আমার অনেক আত্মীয়-স্বজনের জন্যে কমলাকে আমি হারাতে পারব না।'

কিন্তু সুরেশের মন হইতে খট্‌কাটা কিছুতেই গেল না। গোলমালটা মনের মধ্যে কাঁটার মতো খচ্‌ খচ্‌ করিতে লাগিল। সে দিন আরও কয়েকবার তাহার সহিত কমলার সাক্ষাৎ ঘটিল, প্রত্যেকবারই মনে হইল তাহার চেহারাটার সহিত অত্যন্ত অপ্রীতিকর কী একটা স্মৃতি জড়াইয়া রহিয়াছে। কমলার মুখের পাণ্ডু আভাও যেন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সন্ধ্যার দিকে তাহার অবস্থা দেখিয়া আলোক তো রীতিমতো উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

রাত্রে আহারাদির পর নিজের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিতে গিয়া সহসা সুরেশের কথাটা মনে পড়িয়া গেল। এ সে-ই, নিশ্চয়ই সে। সে বাহির হইয়া আসিয়া আলোকের দ্বারে ঘা দিল, 'আলোক ঘুমিয়েছিস?'

আলোক স্মিত প্রফুল্ল মুখে কপাট খুলিয়া দিয়া কহিল, 'না রে, বিয়ের ফর্দ করছিলুম। শুভস্য শীঘ্রম্—'

কথাটা সুরেশের বুকে গিয়া সজোরে আঘাত করিল। কিন্তু তখন আর সময়ও নাই। বন্ধুর জন্যই বন্ধুকে আঘাত করিতে হইবে; এত বড় সর্বনাশ সে জানিয়া শুনিয়া বন্ধুর ঘাড়ে চাপিতে দিবে না।

সে ঘরে ঢুকিয়া গম্ভীর মুখে আলোককে সব কথা বলিল। আলোক রাগে লাল হইয়া উঠিল, সজোরে মাটিতে পা ঠুকিয়া কহিল, 'এ সব মিথ্যা কথা। এ

আমি বিশ্বাস করি না।'

সুরেশ কহিল, 'অনর্থক তোমার সুখে বাধা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, তুমি বরং ওকেই প্রশ্ন করো—'

আলোকের মনে পড়িয়া গেল কমলার অপরিসীম বিবর্ণতা, তাহার পাণ্ডুর মুখ। তবে কি সুরেশের কথাই ঠিক?...তাহার পায়ের নিচে মাটি দুলিয়া উঠিল, মনে হইল দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিতেছে—

কমলা তখনও জাগিয়াছিল। দুইজনকে একসঙ্গে ঢুকিতে দেখিয়া তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। আলোক ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকিয়াই কহিল, 'এঁর সঙ্গে তোমার এর আগে দেখা হয়েছিল? বলো, মুখ তুলে চেয়ে স্পষ্ট উত্তর দাও!'

কমলা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, 'হ্যাঁ!'

কঠোর স্বরে আলোক কহিল, 'তা'হলে ইনি যা বলছেন তোমার সম্বন্ধে, সমস্তই সত্য কথা!...কিন্তু তুমি আমাকে আগে জানাও নি কেন?'

কী উত্তর দিবে কমলা? একটা অব্যক্ত আকুলতা তাহার বুকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল; অশ্রু পড়িল না কিন্তু তাহারই দুঃসহ বেগে দুই চোখের শিরাগুলি বেদনায় টন্ টন্ করিতে লাগিল। সে নিরুত্তর নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

একবার মনে হইল যেন আলোক আঘাতই করিয়া বসিবে। কিন্তু সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া অসীম ঘৃণাভরে শুধু কহিল, 'ছিঃ! তুমি বেশ্যা! খোলার ঘরের রাস্তার ধারে দাঁড়ানো বেশ্যা। তোমাকে আমি রায় বংশের কুললক্ষ্মী করতে চেয়েছিলুম। ছিঃ!'

বেচারী কমলা। তাহার কত কী বলিবার ছিল, কিন্তু এই নিদারুণ আঘাতের নিষ্ঠুরতার সামনে তাহার কণ্ঠ ভেদিয়া সামান্য স্বরও বাহির হইল না, শুধু যেন মরণ যন্ত্রণায় বিস্ফারিত চোখে একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র।

কিন্তু আলোকের তাহাতেও দয়া হইল না! তাহার মাথায় তখন আগুন জ্বলিতেছিল। সে পকেট হইতে চাবির গোছাটা বাহির করিয়া কমলার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া কহিল, 'এই আমার সেফের চাবি, তুমি সমস্তই জানো। তোমার যা খুশি তুমি নিও, কিন্তু কাল সকালে উঠে যেন

আমি তোমার মুখ না দেখি—'

তাহার পর সে যেমন ঝড়ের মতো আসিয়াছিল সুরেশের হাত ধরিয়া তেমনিই বাহির হইয়া গেল।...

কিন্তু সে রাত্রে দুজনের কাহারও ঘুম হইল না। আলোকের হইবার কথা নহে, কিন্তু সুরেশেরও চোখে নিদ্রা আসিল না। মরণাহত পাখীর চাহনীর মতো কমলার দৃষ্টি তাহার মনকে কেবলই পীড়া দিতে লাগিল। কর্তব্যের খাতিরে যাহা সে এইমাত্র করিয়া আসিল তাহাই কি সত্য? কে জানে সে অবিচার করিল কি না।

শেষ-রাত্রের দিকে হঠাৎ কপাট খোলার শব্দে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, কমলা দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া। সে ঘরে আসিল না কিন্তু ঘরের আলো তাহার মুখে গিয়া পড়িয়াছিল, সুরেশ দেখিল অবিশ্রাম রোদনের ফলে তাহার দুই চোখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কমলার সারা দেহ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল, সুরেশ উঠিয়া কাছে আসিতেই সে বলিয়া উঠিল, 'আপনিই একদিন আমার নিশ্চিত বাসা ঘুচিয়ে দিয়ে পথে ঠেলে দিয়েছিলেন, আজও আবার আপনিই আমার শেষ আশ্রয়টুকুও কেড়ে নিলেন। বেশ্যাবৃত্তিও পাপ, গৃহস্থালীর পথও রুদ্ধ—আমি এখন কি করব? আমার স্থান কোথায় আপনিই তাহ'লে ব'লে দিন।'

কী উত্তর দিতে পারে সুরেশ? সে শুধু বিহ্বল নেত্রে মেয়েটার শবের মতো বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কমলাও মুহূর্ত-দুই নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া উচ্ছ্বসিত রোদনের বেগে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ভোর বেলা দরজা খুলিয়া বাহিরে পা দিতেই আলোক চমকিয়া উঠিল। ঠিক দরজার সামনে মেঝের উপর তাহারই দেওয়া চাবির গোছা, সংসার খরচের হিসাবের খাতা, টাকা পয়সা, যাহা কিছু কমলার কাছে ছিল সমস্ত স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছে। যে দুই-একটি অলঙ্কার ইতিমধ্যেই আলোক জোর করিয়া কমলাকে কিনিয়া দিয়াছিল তাহাও সে খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছে। আর তাহার সহিত রাখিয়া গিয়াছে একখানা চিঠি—

আলোক তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিল। তিন-চার ছত্র মাত্র লেখা, নূতন লেখাপড়া শেখার কাঁচা হস্তাক্ষর, হৃদয়াবেগে কাঁপিয়া গিয়াছে—

তাহাতে লেখা ছিল—

শ্রীচরণেষু—

আমার বাবা-মা কে ছিল তা জানি না, তবে মহাপুরুষের মুখে শুনেছিলাম আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে; সেই বিশ্বাসেই তোমাকে বিয়ে করার কথাতে আপত্তি করি নি; নইলে আমার ভালর জন্যে তোমার সর্বনাশ করতুম না কিছুতেই। বেশ্যার ঘরে মানুষ হয়েছি বটে, কিন্তু আমি আজও নিজে বেশ্যা নই, যদি পার তো বিশ্বাস ক'রো! হিসাব সব মেলেনো আছে, একবার দেখে নিও। বিশ্বাস রাখবার চেষ্টা করেছি প্রাণপণে। অপরাধ ক্ষমা ক'রো। প্রণাম নিও। ইতি—

আলোকের মাথা ঘুরিতে লাগিল। একবার মনে হইল সে চিৎকার করিয়া কাঁদে কিন্তু পারিল না। পাগলের মতো সুরেশের দ্বারে গিয়া করাঘাত করিল, 'সুরেশ তোমার কথা শুনে আমি নারীহত্যা করলুম বোধ হয়! কমলা এক কাপড়ে চলে গেছে, ঐ দেখ একটি আধ্‌লা পর্যন্ত সে সঙ্গে নেয় নি। সে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করেছে!'

সুরেশ বাহির হইয়া আসিয়া সেগুলি দেখিল, কিন্তু সান্ত্বনার একটি কথাও মুখে উচ্চারণ করিতে পারিল না। একটা দারুণ সন্দেহ তখন তাহার মনে তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে, তবে কি সে সম্পূর্ণ নিরপরাধে একটা নারী-হত্যার কারণ হইল!

আলোক তাহার কথা বলিবার অপেক্ষাও করিল না। চাকর-বাকর সকলকে তুলিয়া চারিদিকে পাঠাইয়া দিল, তাহাদের প্রত্যেককে বলিয়া দিল যে কেহ কমলাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে সে-ই নগদ হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে। তাহার পর নিজেও মোটর গাড়ি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। যাইবার সময় সুরেশকে একটা কথাও বলিয়া গেল না কিংবা সঙ্গে লইবার প্রস্তাব-মাত্র করিল না।

সুরেশ নিজেকে যেন অপরাধী মনে করিতে লাগিল। আলোকের

তিরস্কার এবং বিশেষ করিয়া রাত্রে কমলার সেই প্রশ্ন 'আমি তাহ'লে কি করব, কোথায় যাব ?' যেন তাহাকে কাঁটার মতো বিঁধিতে লাগিল। সত্যই তো, সে এত লেখাপড়া শিখিয়াও এক হতভাগিনীকে আশ্রয়চ্যুত করিল, অথচ তাহার পথের কোন সন্ধানই দিতে পারিল না। বেশ্যাদের বেশ্যাবৃত্তি করিতে দেখিলে তাহারা ঘৃণা করে কিন্তু সৎপথে আসিতে চাহিলেও তো তাহারাই দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে।

মলিনা একবার শুষ্কমুখে আসিয়া প্রশ্ন করিল, 'কী হবে সুরেশবাবু ?'

সুরেশ কোন জবাব দিতে পারিল না। অবশেষে ঘরের আবহাওয়া অসহ্য হইয়া পড়ায় সে-ও বাহির হইয়া পড়িল কমলার খোঁজে। আলোকেরই দারোয়ানের একটা সাইকেল সংগ্রহ করিয়া সে দক্ষিণ দিকের রাস্তাটি ধরিল। পথে দুই-একবার আলোকের লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল কিন্তু কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া সে অনির্দিষ্ট পথে একাই চলিতে লাগিল। গঙ্গা যেখানে লোকালয়ের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বনের মধ্যে ঢুকিয়াছে, কি মনে হওয়ায় সুরেশ সেইখানেই সাইকেলটা রাখিয়া বালির চড়ার উপর দিয়া হাঁটিতে লাগিল। খানিকটা গিয়াই দেখিল যে দৈব তাহার সহায়, লোকালয় হইতে অতটা দূরে একেবারে গঙ্গার জল ঘেঁষিয়া একটা কাঁটাগাছের ঝোপের আড়ালে বসিয়া আছে কমলা।

সুরেশ ছুটিতে ছুটিতে কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই সে বিস্মিত, যেন কতকটা ভীত দৃষ্টিতে চোখ তুলিয়া তাকাইল। তাহার পর কণ্ঠস্বরে হতাশা ভরিয়া কহিল, 'এখনও মরতে পারি নি সুরেশবাবু, বড় যেন ভয় করে। কিন্তু আর দেরি হবে না। একটু দাঁড়ান, একেবারে নিজের চোখেই আমার মৃত্যুটা দেখে যান।'

কথা বলিতে বলিতেই সে গঙ্গায় নামিয়া পড়িতে যাইতেছিল, সুরেশ সজোরে আসিয়া তাহার হাতটা ধরিরা ফেলিল, 'ছিঃ, আত্মহত্যা মহাপাপ!'

কমলা সহসা যেন ফণিনীর মতো গর্জিয়া উঠিল, 'আমার বেঁচে থাকাও পাপ, মরে যাওয়াও পাপ, কিন্তু উপায় কি বলতে পারেন ? আমার সমস্ত আশা, সমস্ত আশ্রয় আপনি ঘুচিয়ে দিলেন, এখন মৃত্যুতেও বাধা দেন কেন ? আমি কি করব তাহ'লে ?'

তাহার দুই চোখে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া পর-মুহূর্তেই তাহা জলে ভরিয়া গেল। সুরেশ অপরাধীর মতো মাথা হেঁট করিয়া কহিল, 'আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি—'

কমলার কণ্ঠে করুণ বিদ্রূপ ফুটিয়া উঠিল, কহিল, 'আরও লাঞ্ছনা, আরও অপমান, আরও হতাশার মধ্যে নিয়ে যেতে চান। আমার এত দুর্দশাতেও কি আপনার আশা মেটে নি? আমার আরও কি প্রায়শ্চিত্ত দেখতে চান আপনি?...'

সুরেশ কহিল, 'আলোক তোমার জন্যে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে কমলা, তার সে কষ্ট দেখা যায় না।'

কমলা ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, 'তা জানি, তিনি দেবতা। কিন্তু এ মুখ আমি তাঁকে দেখাব না। কিছুতেই না। আমাকে ছেড়ে দিন সুরেশ-বাবু, মৃত্যু ছাড়া আমার আর কোন পথ কোন, উপায় নেই। আমাকে মরতেই হবে।'

সুরেশ ব্যাকুল হইয়া কহিল, 'এই বারটি আমাকে বিশ্বাস ক'রে দেখ তুমি, আমি তোমার আশ্রয় ঘুচিয়ে দিয়েছি, আমিই আবার তোমার ব্যবস্থা ক'রে দেব। সৎপথে থেকে এখনও যাতে তুমি তোমার জীবনকে কাজে লাগাতে পারো, আমি সে ব্যবস্থা যেমন ক'রেই হোক ক'রে দেব।'

কমলার মন দুলিয়া উঠিল। তাহার এই তরুণ বয়স; বিকাশোন্মুখ জীবন এই বয়সে কে মরিতে চায়? সে সুরেশের সহিত ধীরে ধীরে আবার জীবনের দিকে ফিরিয়া চলিল।

সৌভাগ্যক্রমে লোকালয়ে ঢুকিয়াই তাহারা একটা খালি মোটরবাস দেখিতে পাইল, তাহাতেই অনেক টাকা ভাড়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহারা চড়িয়া বসিল। বাসখানা হু-হু করিয়া কলিকাতার পথে ছুটিয়া চলিল।

আলোকের কথা মনে হইয়া বার বার কমলার চোখে জল আসিয়া পড়িল। কিন্তু তবু আবার তাহার কাছে ফিরিয়া যাইতে কিছুতেই মন চাহিল না।...

কলিকাতায় গিয়া কোথায় কমলাকে রাখা সম্ভব তাহা সুরেশ পূর্বেই

ভাবিয়া রাখিয়াছিল। নিজের বাড়িতে তাহার বাবা-মা আছেন, সেখানে গেলে অনেক জবাবদিহির মধ্যে পড়িতে হইবে। তাহার এক সহপাঠী সম্প্রতি বিবাহ করিয়া একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়া বাস করে, সেই বাড়িতেই অনেকগুলি ফ্ল্যাট খালি আছে। তাহারই একটি ভাড়া লইয়া কিছু কিছু জিনিস-পত্র এবং একটা ঝি ঠিক করিয়া দিলেই আপাতত থাকিতে পারিবে।

সেই ব্যবস্থাই হইল। সেই বন্ধুটির সাহায্যে কিছু কিছু বিছানা ও কাপড়-জামা কেনা হইল, ঝিও একটা সংগ্রহ হইল। সেই বন্ধুকেই দেখাশোনা করিতে বলিয়া সন্ধ্যার পরে অভুক্ত, অস্নাত অবস্থায় সুরেশ যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিল তখন আর আলোককে চিঠি লেখা ঘটিয়া উঠিল না।

পরের দিন সকালে কমলার খোঁজ লইতে গিয়া দেখিল, কমলার প্রবল জ্বর, ভুল বকিতেছে! তখনই ছুটাছুটি করিয়া ডাক্তার নার্স প্রভৃতি ডাকিয়া আনিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিতে করিতেই আরও তিন-চারদিন কাটিয়া গেল। অবশেষে কমলা অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া উঠিতে সে আলোককে বিস্তারিত চিঠি দিল বটে কিন্তু সে চিঠি আলোকের আর হস্তগত হইল না। দুই-তিনদিন ধরিয়া অনবরত খোঁজা সত্ত্বেও যখন কমলার খবর পাওয়া গেল না, তখন উদ্‌ভ্রান্তের মতো আলোক কিছু টাকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল বিদেশ ভ্রমণে। বলিতে গেলে ট্রেনে ট্রেনেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, ম্যানেজারকে মধ্যে মধ্যে দুই-একখানা চিঠি দিতে লাগিল কিন্তু তাহাতে ঠিকানা দিল না।

এধারে সুরেশ উদ্‌গ্রীব ভাবে আলোকের উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহার আশা ছিল আলোক আসিলে দুজনে মিলিয়া কমলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিবে; কিন্তু দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, আলোকের কোন খবরই মিলিল না। অথচ তাহার অপেক্ষায় থাকিতে থাকিতে যত দিন কাটিতে লাগিল ততই কমলা যেন এক নূতন আলোকে সুরেশের চোখের সম্মুখে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার চরিত্রের মাধুর্য, তাহার রূপ, তাহার সেবাপরায়ণতা সমস্ত মিলিয়া সুরেশকে যেন অভিভূত, আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। তাহার সমস্ত ইতিহাসও ইতিমধ্যে সুরেশ সংগ্রহ করিয়াছিল, যে কথা কমলা

আলোককে কোনদিন বলিতে পারে নাই, সেই রহস্যও সে অনায়াসে সুরেশের কাছে উদ্‌ঘাটিত করিল। যে স্ত্রীলোক এক কথায় জীবনের পঙ্কিলতম তলদেশ হইতে উর্ধ্বে উঠিয়া আসিতে পারে—সুরেশ তাহাকে শ্রদ্ধাও না করিয়া পারে না।

আর কমলা? কমলাও যেন এক নূতন নেশায় ভরপুর হইয়া গিয়াছে। সে মুখে মধ্যে মধ্যে তাহার সদগতি করিবার জন্য সুরেশকে তাড়া লাগায় বটে কিন্তু কণ্ঠে তাহার তাগাদা ফোটে না। দিনে রাত্রে যতটা সময় সে সুরেশের সহিত কাটায় সেই সময়টুকুর প্রতিটি মুহূর্ত যেন তাহার জীবনে সার্থক হইয়া যায়, সমস্ত সময়টা যেন এক সুখস্বপ্নের মধ্য দিয়া কাটে। আজকাল সে সহস্র লোকের পদশব্দের মধ্য হইতে সুরেশের পদশব্দ চিনিতে পারে, আর যখন সে থাকে না তখন সে সেই পদশব্দের জন্যই উন্মুখ হইয়া বসিয়া থাকে।

কিন্তু এমন করিয়া দিন কাটা যে উচিত নয় তাহা সুরেশ বোঝে। সে কমলার জন্য এক বৃদ্ধ মাস্টার ঠিক করিয়া দিল। কহিল, 'এখন ইস্কুলে পড়তে গেলে অনেক নিচু ক্লাসে ভর্তি হ'তে হবে, তার চেয়ে বাড়িতেই পড়ে নাও দিনকতক, এরপরে ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দেব।'

আসল কথাটা অন্য ইস্কুলে ভর্তি করিয়া তাহাকে বোর্ডিং-এ দিবার কথা, সেইটাকেই যতটা সম্ভব পিছাইয়া দেওয়া। ক্রমশ সেই আসল কথাটা নিজের মনের কাছে ধরা পড়িয়া সে অত্যন্ত লজ্জিতও হইয়া উঠিল।

অবশেষে একদিন তাহাকে স্বীকার করিতেই হইল যে এমন করিয়া আর বেশিদিন চলে না। সে কমলার কাছে সোজাসুজি প্রস্তাবটা করিয়া বসিল, 'কমলা আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই—আমি দিনও স্থির করেছি।'

হৃদয়যন্ত্রে যে কটা তার ছিল সব কটা যেন এক আনন্দবেদনার আঘাতে ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। পুলক-আবেশে তাহার কপোল দুটি হইয়া উঠিল আরক্ত; কিন্তু যে নিদারুণ অভিমান তাহার বুকে পুঞ্জীভূত হইয়া ছিল তাহাও এতদিন পরে মাথা তুলিল, সে কহিল, 'আপনার অনেক দয়া—কিন্তু সংবাদটা বাবা-মাকে দিয়েছেন কি?'

ঈষৎ লজ্জিত হইয়া সুরেশ কহিল, 'দিই নি, সেটা বিয়ের পরেই দেব মনে

করেছি। তখন হয়ত তাঁরা বাধ্য হয়েই ক্ষমা করবেন, আর তা যদি না-ও করেন তো আমাদের দুজনের অন্নসংস্থান করতে পারব এ ভরসা আছে আমার।'

কমলা ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে কহিল, 'কিন্তু আপনার বন্ধুর পক্ষে যা উচিত ছিল না, তা আপনার পক্ষে উচিত হবে ব'লে মনে করেন কি ?'

সুরেশ কহিল, 'তখন আমি যে কিছুই জানতাম না কমলা, সে অপরাধ তোমার নেওয়া উচিত কি ?'

কমলা নতমস্তকে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিল, 'সে হয় না সুরেশবাবু, তাঁর অবস্থাটা ভেবে দেখুন, এখন যদি আমি ঘর-কন্না পাতি তো সে তাঁর ওপর কত বড় অবিচার করা হবে ভেবে দেখেছেন কি ? তা ছাড়া আমার দুর্ভাগ্য আমার সঙ্গে সঙ্গেই যায়—সুখ আমার অদৃষ্টে নেই। নিজেও সুখী হ'তে পারব না, কাউকে সুখী করতেও পারব না, এই আমার অদৃষ্টলিপি। মিছিমিছি আমার জন্যে জীবন বিড়ম্বিত করবেন না, আমাকে ছেড়ে দিন—'

কিন্তু সুরেশ অনুরোধ, উপরোধ মিনতি করিতে লাগিল। স্বর্গ যদি নিজে হইতেই হাতে ধরা দিতে আসে, মানুষ কতক্ষণ তাহাকে ফিরাইতে পারে ? সুখে ও লোভে, ভয়ে ও বিবেচনায় মন দোল খাইতে লাগিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুরেশের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির কাছেই তাহাকে মাথা নোয়াইতে হইল। সে একসময় অস্ফুটস্বরে কহিল, 'আমি জানি না, আমি কিছু ভাবতেও পারছি না, তুমি যা ভাল বোঝ তাই করো।'

সুরেশ মনের আবেগে তাহার একটা হাত হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল পরম, সুখে তাহার কথা বলিবার শক্তিও যেন চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে সশব্দে দরজা খুলিয়া ঘরে ঢুকিল আলোকনাথ।

আলোক মাসখানেক হইল কলিকাতাতেই আছে। আজই সে সকালে সুরেশের খোঁজ করিতে তাহার আড্ডায় গিয়া একটা প্রচ্ছন্ন কানাঘুষা শুনিতে পায়। তার মন সংশয় ও ঈর্ষায় পূর্ণ হইয়া উঠিল, তবে কি সুরেশই কমলাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে ? অতি কষ্টে ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া সে বাড়িটা খুঁজিয়া বাহির করিল এবং কোনও রকম সাড়া না দিয়াই ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। ঘরে

আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে অগ্নিতে ঘৃতাহুতিই পড়িল।

সে ক্রুর অগ্নিময় দৃষ্টিতে সুরেশের দিকে চাহিয়া কহিল, 'ওঃ, তাই বন্ধুর উপকার করতে চেয়েছিল, না? বেইমান—বিশ্বাসঘাতক!'

প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাইতে সুরেশের বিলম্ব হইল। সে খানিকটা পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল, 'কিন্তু তুমি কি আমার চিঠি পাও নি আলোক?'

আলোক কহিল, 'থাক, আর ন্যাকা সেজো না। চলো কমলা—'

সে কমলার একটা হাত ধরিয়া টানিল।

সুরেশ বিব্রত, ব্যাকুল হইয়া কহিল, 'কিন্তু তোমাকে যে অনেক কথা বলাবর আছে আলোক!'

ব্যঙ্গের সুরে আলোক জবাব দিল, 'সে তখন ধীরেসুস্থে শোনা যাবে এখন আপাতত আমার সময় নেই।'

অগত্যা সুরেশকে কথাটা বলিতে হইল, 'কমলার সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়েছে।'

আলোক কহিল, 'তাই আমার বিবাহে তখন বাধা দিতে গিয়েছিলে। এ মতলব কিন্তু ছাড়তে হবে বন্ধু। আমার দাবি প্রথম, তা ভুলে যেও না।··· আর কমলা, তোমারও লজ্জা হ'লো না একটু? আমি তোমায় একদিন প্রাণ দিয়েছিলুম, সে কথাটাও কি ভুলে গেলে?'

সুরেশ হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, 'কিন্তু তুমিও ওকে একদিন মুখ দেখাতে নিষেধ ক'রে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, তাও ভুলো না!'

আলোক গর্জন করিয়া উঠিল, 'সেও তো তোমারই কুমন্ত্রণায়, পাজী বদমাইশ কোথাকার! চলে এসো কমলা, আমার আর অপেক্ষা করবার সময় নেই। আমি একবার তোমাকে হারিয়েছি,—আর পারব না!'

এতক্ষণে কমলা কথা কহিল, 'আপনারা আমাকে এমন ক'রে টানাটানি করছেন কেন বলুন তো? কে বলেছে আপনাদের যে, আপনাদের দুজনের একজনকে আমায় বিয়ে করতেই হবে! যান—বেরিয়ে যান আপনারা, এসব ঝামেলা আমার ভাল লাগে না।'

সুরেশ ও আলোক দুজনেই হতচকিতের মতো তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কমলা ব্যঙ্গের সুরে, যেন আরও আঘাত করিবার জন্যই,

বলিয়া চলিল, 'আর সত্যি কথা বলতে কি বিয়ে করবার আমার ইচ্ছেও নেই। আপনারা বড়লোকের ছেলে, আপনাদের সুনজরে পড়েছিলুম ব'লে একটু খেলাচ্ছিলুম, আপনাদের ভাল না লাগে আমি অন্য আশ্রয় খুঁজে নিতে পারব'খন। ভুলে যাবেন না আমি বেশ্যা।'

তাহার কথাগুলা ঠিক চাবুকের মতই গিয়া যেন দুজনকে আঘাত করিল। সুরেশ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, 'কী বলছ তুমি, যা নও তা ব'লে কেন নিজেকে অপমান করছ?'

কমলা চিৎকার করিয়া উঠিল, 'দোহাই আপনার সুরেশবাবু, আপনার পায়ে পড়ি, আপনারা বেরিয়ে যান। এমন ক'রে আমি আর পারি না।'

তাহার সেই উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দুজনেই যেন ভয় পাইল। উভয়েই নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিয়া দুইজনে দুইদিকের পথ ধরিল।...

তাহারা চলিয়া গেলে কমলা মাটির উপরে আছড়াইয়া পড়িল। ভাগ্যদেবতার তাহাকে লইয়া এ কী পরিহাস! যতবার পরিপূর্ণ সুখের পাত্র তাহার সম্মুখে আসিবে, ততবারই কি তিনি নিষ্ঠুর ভাবে আবার তাহা কাড়িয়া লইবেন?

বহু রাত্রি অবধি জাগিয়া এবং কাঁদিয়াও সে পথ খুঁজিয়া পাইল না; সুরেশকে সে ভালবাসে এটাও যেমন সত্যকথা, আলোককে আঘাত দেওয়াও যে তাহার পক্ষে অসম্ভব এটাও তেমনি সত্য কথা। অথচ আজ এমন ভাবে তাহারা আসিয়া সামনে দাঁড়াইল যে একজনকে 'যাও' বলা ছাড়া উপায় নাই।...তাহার মনের গভীরতম অন্তস্তল, যতদূর তাহার দৃষ্টি যায়, ততদূরই চাহিয়া দেখিল সেখানে আলোকের জন্য আছে শুধু কৃতজ্ঞতা, শুধু ভক্তি; সেখানে ভালবাসার আসনে বসিয়া আছে সুরেশ একা।

সারারাত্রি কাঁদিয়া ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়া বহুদিন পরে স্বপ্ন দেখিল সেই সাধুকে, সেই যিনি তাহাকে নমস্কার করিয়াছিলেন। সে চমকিয়া উঠিয়া বসিল। এই তো সে পথ দেখিতে পাইয়াছে, সে সন্ন্যাসই লইবে। ছাই মাখিয়া এ রূপ ঢাকিতে না পারিলে কোথাও গিয়া তাহার শান্তি নাই।

সে প্রস্তুত হইয়া লইল। এই ঘর, এই বাড়ি—ক'দিনেরই বা আশ্রয়।

কিন্তু তবুও যেন বিদায়ের কালে এই গৃহই পিছন পানে টানে ; এই গৃহ এবং গৃহের সঙ্গেই বিজড়িত সংসারের স্বপ্ন। সে জোর করিয়া মনকে শক্ত করিয়া লইল। সারাদিন একরূপ উপবাসেই কাটাইয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বাড়ির দারোয়ান রামটহলকে দিয়া একখানা গাড়ি ডাকাইয়া কালিঘাটের উদ্দেশে যাত্রা করিল। ঘরের চাবিও সে রামটহলের কাছেই দিয়া গেল, কহিল, 'সুরেশ-বাবু এলে দিয়ে দিও—'

যাত্রার পূর্বে একবার ভাবিল একখানা চিঠি লিখিয়া রাখিয়া যায়, দু-এক ছত্র লিখিলও—কিন্তু আবার কি মনে করিয়া সমস্ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। সে যখন উহাদের জীবন হইতে বাহির হইয়াই যাইতেছে তখন নিঃশব্দে চলিয়া যাওয়াই ভাল।

কালীঘাটে মন্দিরের কাছে নামিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই সাধুর আস্তানা বাহির করিল। সেই সাধু তেমনিই আছেন এবং সেই ঘরেই। তখন তিনি তাঁহার দেবতার আরতি করিতেছিলেন, আরও লোকজন ছিল বলিয়া সে এক-পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; তাহার পর আরতি শেষ হইলে যখন সকলে চলিয়া গেল তখন ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীর চরণে প্রণাম জানাইয়া কহিল, 'বাবা আমি সন্ন্যাস নেব, আমাকে দীক্ষা দিন।'

সন্ন্যাসী তাঁহার প্রশান্ত চক্ষু দুইটি মেলিয়া বহুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর কহিলেন, 'মা সংসারের আঘাতে বেরিয়ে এসেছ বটে কিন্তু এখনও যে সংসার-যোগ রয়েছে তোমার কপালে। স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সংসার যে তোমাকে পাততেই হবে মা—'

ব্যাকুল কণ্ঠে কমলা কহিল, 'না, না বাবা, সে আমি পারব না। আপনি দয়া ক'রে আমাকে পায়ে স্থান দিন। আমি আর পারছি না।'

তিনি হাসিয়া কহিলেন, 'আচ্ছা মা, তুমি একটু ব'সো। আমার ঠাকুরকে প্রশ্ন না করলে কিছু বুঝতে পারছি না।...'

সুরেশ সমস্ত রাত্রি এবং সারাদিন মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া বুঝিল যে এ অসম্ভব। কমলাকে ছাড়া তাহার জীবন অসম্ভব, কমলাকে চাই-ই। তাহার জন্য যদি বন্ধু-বিচ্ছেদ হয় তো হউক। সে জোর করিয়া কমলাকে কাড়িয়া

আনিবে, এখানে না হয় খুব দূরদেশে গিয়া ঘর-সংসার পাতিবে—কিন্তু কমলাকে ছাড়া তাহার বাঁচা অসম্ভব।

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গেই সে ছুটিল বাড়ির দিকে। কিন্তু সদরের কাছেই রামটহলের সঙ্গে দেখা হইল, সে চাবিটা বাহির করিয়া কহিল, 'বাবুজী চাবি।'

'চাবি? মাইজী কোথা?'

'মাইজী চলে গেলেন, ব'লে গেছেন এই চাবি আপনাকে দিতে।'

সুরেশ উর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি কয়টা ডিঙাইয়া উপরে উঠিল। কপাট খুলিয়া দেখিল সত্যই সে চলিয়া গিয়াছে। এবং এবারেও একবস্ত্রে। প্রত্যেকটি জিনিসই সে রাখিয়া গিয়াছে, এমন কি শাড়িও একখানার বেশি লয় নাই। যদি কিছু চিঠি লিখিয়া রাখিয়া থাকে এই আশায় সে চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল কিন্তু কোথাও কিছু নাই।

সে পাগলের মতো নিচে নামিয়া আসিতেছে এমন সময়ে সিঁড়ির মুখেই আলোকের সহিত দেখা। সব কথা ভুলিয়া গিয়া কহিল, 'আলোক, তাকে আবার হারালুম, সে চলে গেছে।'

'চলে গেছে?' আলোকের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। দুজনেই তখন রামটহলকে খুঁজিয়া বাহির করিল। রামটহল জানাইল, মাইজী কোথা গিয়াছেন কিছুই সে জানে না, তবে আড্ডার গাড়ি, গাড়িওয়ালা হয় তো জানে—

কিন্তু আড্ডায় তখনও সে গাড়ি ফেরে নাই। তিনজনে সেই আড্ডার ধারেই দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা—

সন্ন্যাসী কমলার সমস্ত ইতিহাস শুনিবার পর ধ্যানস্থ হইয়াছেন, আর কমলা অপেক্ষা করিতেছে তাঁহার ধ্যান ভাঙিবার। তাহার কাছে সমস্ত অতীত, সমস্ত বর্তমান যেন ধূসর বর্ণহীন হইয়া গিয়াছে। কিছুই ভাবিবার, কিছুই বুঝিবার নাই। সে যেন কেমন একটা মূঢ়ের মতো বসিয়া আছে—

ক্ষীরি ঝি প্রত্যহ রাত্রে কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিবার সময় বাবাকে প্রণাম করিয়া যাইত। আজও আসিয়া প্রণাম সারিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছিল এমন সময় সহসা তাহার চোখ পড়িল কমলার স্তব্ধ আনত মুখের

দিকে। মানুষ ভূত দেখিলে যেমন বিবর্ণ হইয়া ওঠে তাহারও প্রায় সেই অবস্থা হইল। সে স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলিয়া সন্ন্যাসীরই প্রদীপটি উঠাইয়া লইয়া কমলার মুখের কাছে ধরিল। তাহার পর বহুক্ষণ কমলার বিস্মিত মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, 'আমাকে চিনতে পারছ না? চেয়ে দেখ দিকি—'

এতক্ষণে কমলা তাহাকে চিনিল। এ যে ক্ষীরোদা, এই তো তাহাকে সাত বৎসর বয়সের সময় হরির মার কাছে বিক্রয় করিয়া যায়। সে শুধু অস্ফূট স্বরে কহিল, 'ক্ষীরো মা!'

ঠিক সেই সময় সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি কহিলেন, 'ক্ষীরো, একে চেন?'

ক্ষীরো কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, 'আ আমার কপাল, সাত বছর বয়স অবধি তো আমার কাছেই ছিল বাবা!'

সন্ন্যাসী অসহিষ্ণু হইয়া কহিলেন, 'তুমি ওকে কোথা থেকে পেয়েছিলে বলো তো?'

ক্ষীরো মুহূর্ত-কয়েক ইতস্তত করিয়া কহিল, 'আপনার কাছে মিথ্যে কথা বললে জিভ খসে যাবে বাবা। এক বাগ্‌দী ওকে আমার কাছে দিয়েছিল, তবে তার মুখে শুনেছি ডায়মণ্ড হারবারের দিকে এক বড় জমিদারের মেয়ে ও। কী যেন ওর বাবার নাম, গঙ্গা—হ্যাঁ গঙ্গানাথ রায়!'

কমলা আর্তনাদ করিয়া উঠিল, 'কী, কী বললে? কার নাম করলে?'

কিন্তু আর্তনাদ শুধু একা কমলার কণ্ঠ হইতেই বাহির হইল না, ঘরের বাহির হইতেও একটা অব্যক্ত যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি ভাসিয়া আসিল। সকলে বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল বাহিরে সুরেশ ও আলোক দাঁড়াইয়া আছে। আলোকের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা, ঠোঁট-দুইটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে কিন্তু গলা দিয়া কোন স্বরই বাহির হইতেছে না।

সুরেশ অগ্রসর হইয়া আসিল, সে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, 'তুমি ঠিক জানো? তাহ'লে ওকে ওর বাবার কাছে ফিরিয়ে দিলে না কেন? বিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন তিনি, তা কি শোন নি?'

ক্ষীরি কহিল, 'তা সেই হরি বাগ্দীই বলেছিল, কিন্তু সে বলেছিল যে ও

শুধু ছল, ফেরত দিতে গেলেই ধরে জেলে দেবে। সে মোক্ষদার কাছ থেকে টাকা খেয়ে ওকে নিয়ে পালাচ্ছিল, মোক্ষদাও সঙ্গে ছিল। পুলিসের ভয়ে শেষকালে জঙ্গলে ঢোকে। সেইখানে বাঘে তাড়া করায় হরি মেয়েটাকে নিয়ে গাছে উঠেছিল, কিন্তু মোক্ষদাকে বাঘে খায়। সেই জন্যেই মোক্ষদাকে আর কেউ খুঁজে পায় নি।'

আলোক ততক্ষণে স্বর খুঁজিয়া পাইয়াছে, সে কহিল, 'কোনও প্রমাণ আছে?'

ক্ষীরোদা আবার প্রদীপটা তুলিয়া ধরিয়া কমলার থুতনির কাছে কাটা দাগটা দেখাইল আর কাঁধের খানিকটা অনাবৃত করিয়া দেখাইল একটি ছোট্ট আঁচিল।

আশ্চর্য! তাহারা কি অন্ধ? আলোক কতদিন ঐ কাটা দাগটা লইয়া কমলার সহিত কত পরিহাস করিয়াছে, অথচ একবারও তাহার মনে পড়ে নাই যে গঙ্গানাথবাবু সমস্ত বিজ্ঞাপনেই ঐ দুটি চিহ্নের উল্লেখ করিয়াছিলেন।

আলোক অগ্রসর হইয়া আসিয়া কমলার হাতে ধরিয়া কহিল, 'এবার আর আমাকে তাড়াতে পারবে না বোন—চল, তোমার বাড়িতে নিয়ে যাই তোমাকে!'

কমলার দুই গণ্ড প্লাবিয়া তখন অবিরল ধারায় জল ঝরিয়া পড়িতেছে। সন্ন্যাসী এতক্ষণ মুগ্ধনেত্রে এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন, তিনি এইবার কহিলেন, 'একটু দাঁড়াও বাবা, একটা কাজ সেরে নিই—'

তিনি কমলার বাঁ হাতখানা টানিয়া লইয়া সুরেশের আগ্রহ-কম্পিত দক্ষিণ হস্তের মধ্যে রাখিয়া কহিলেন, 'আর ভুল ক'রো না মা, এই তোমার নিয়তি। তুমি সুখী হও!'

সকলে মিলিয়া সাধুকে প্রণাম করিল। আলোক ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, 'তুই-ই জিতলি সুরেশ।'

সুরেশ কহিল, 'সব দিক দিয়েই—তুই কাল আমায় অনেক গাল দিয়েছিস এইবার প্রাণভরে 'শালা' বলে তার শোধ নেব।'

আলোক তখন তাহার আংটি, বোতাম, ঘড়ি সব-কিছু খুলিয়া ক্ষীরির আঁচলে ফেলিতেছে, সে কথা কহিতে পারিল না। তাহার মুখ হইতে

ম্লান, অতি ম্লান হাসির রেখা তখনো মিলায় নাই বটে, কিন্তু দুটি চোখেই জল টল্‌ টল্‌ করিতেছে।

কাছে যবে ছিল

পুজোর সময় কাশীতে কোন ধর্মশালায় স্থান পাওয়া রীতিমতো সৌভাগ্যের ব্যাপার। বিশেষত পাঁড়ে ধর্মশালায়। এমনিই সেখানে সারাদিন বসে থাকার পর তবে লোক বেলা তিনটে নাগাদ জায়গা পায়—মানে দুন এক্সপ্রেসের যাত্রীরা বেরিয়ে গেলে ; খুব গরমের সময় ছাড়া বারো মাসই প্রায় এই অবস্থা। সুতরাং মিহিরের ইচ্ছা ছিল যে সোজাসুজি একটা ভাল হোটেলে এসেই উঠবে। এটা তাদের যখন ঠিক সাধারণ ভ্রমণ নয়, মুখে কেউ না বললেও আসলে এটা তাদের মধুচন্দ্রমা যাপনে বেরুনো—কারণ মাত্র দু মাস বিয়ে হয়েছে ওদের, আর বিয়ে থেকেই চেষ্টা করছে কোথাও যাবে, ছুটির অভাবেই এই দুটো মাস অপেক্ষা করতে হয়েছে—কাজেই কিছু খরচ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েই মিহির বেরিয়েছে।

ধর্মশালার প্রস্তাবটা সন্ধ্যারই। সে-ই মিহিরকে বুঝিয়েছে যে, 'একবার পাঁড়ে ধর্মশালায় খোঁজ করতে দোষ কি? যদি জায়গা না পাওয়া যায় তখন হোটেলে গিয়ে উঠলেই তো হবে। এ তো আর অন্য ধর্মশালার মতো নয়, শুনেছি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ন-দি বলে দিয়েছে, ওখানের হোটেলে খাবার কথা আগে থাকতে বলে দিবি, তাহলে হোটেলআলা বললে জায়গা পাবার সুবিধে হয়—তা অত কথায় দরকার নেই, সোজাসুজি ঘর পাই পাবো, না হয় তো অন্য জায়গায় গেলেই হবে। মিছিমিছি একগাদা টাকা খরচ তো হোটেলে উঠলেই, এখানে খাওয়াও সস্তা শুনেছি, না হয় দুজনের মতো রেঁধে নিতেই বা কি লাগবে?

আসলে সন্ধ্যার মনে একটি গোপন অভিপ্রায় ছিল, মিহির তার খবর রাখত না। যদি টাকা বাঁচে যাবার সময় একখানা বেনারসী শাড়ি সে কিনে নিয়ে যাবে। সেই উদ্দেশ্যেই সে কাশী আসতে রাজী করিয়েছে মিহিরকে। নইলে ভিড়ের জন্যে এদিকে আসতে মিহির আপত্তি করেছিল, ইচ্ছে ছিল

দেওঘর কি শিমুলতলা কিংবা রাঁচি, এমনি কোথাও যাবে।

শুধু অবশ্য শাড়িই নয়—কাশীর কথা সে এত শুনে আসছে এতকাল ধরে—এত আত্মীয়-স্বজনের মুখে যে—কাশীর একটা কল্পিত ছবি মনে মনে আঁকাই হয়ে আছে, পথঘাট মহল্লা—সব তার মুখস্থ। অথচ সেই কাশী সে নিজে কখনও দেখল না, এই পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত, এ কি কম ক্ষোভ! মিহির নাকি এর আগে বার-দুই এসেছিল কিন্তু তাতে সন্ধ্যার কি? এতদিন এত দুঃখের পর মনের মতো বিয়ে হয়েছে তার, ভাল বর পেয়েছে—সুতরাং যদি মধুচন্দ্রমা যাপনে যেতেই হয় কোথাও তো, কাশীতে গিয়ে বিশ্বনাথের মাথায় জল দিয়েই আসবে সে। যাতে এবার অন্তত সুখে না হোক শান্তিতে ঘর করতে পারে।

যাই হোক—প্রথম দফাতেই সন্ধ্যার জিৎ হয়ে গেল ভাল-মতো। যেতেই বিনা অপেক্ষায় একটা ঘর পেয়ে গেল ওরা। ম্যানেজার সন্ধ্যার মুখের দিকে তাকিয়ে ওদের নূতন বিবাহের কথাটা অনুমান করতে পারলেন কি না কে জানে, একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'তাই তো, আপনারা দুজন—অবশ্য মোট-ঘাট বিশেষ নেই দেখছি—যদি একটু অসুবিধা ক'রে থাকতে পারেন—ছোট ঘর একটা আছে। সাধারণত আমরা একজন লোক এলেই ঐ ঘর দিই—তবে দুজনে থাকতে পারেন না যে এমন নয়। আজকের দিনটা থাকুন, না হয় কাল অন্য ঘর খালি হ'লে দিয়ে দেব।'

মিহির কোন জবাব দেবার আগে সন্ধ্যাই বলে উঠল, 'খুব খুব। ছোট ঘর তা কি হয়েছে। সে আমরা বেশ থাকতে পারব'খন!'

অতএব সেই ব্যবস্থাই হ'ল। ঘর ছোট হোক, ওপরে কোণের দিকে, বেশ নিরিবিলি। কাছাকাছি বাথরুম আছে—সব দিক দিয়েই সুবিধা। ব্যবস্থা ও ঘর দেখে এমন কি মিহিরও খুশী হ'ল।

সন্ধ্যা বিজয়-গর্বে ঘাড় দুলিয়ে বলল, 'দেখলে বোকারাম, তুমি তো আগেই সাত-তাড়াতাড়ি ছুট ক'রে হোটেল ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিলে—। কতগুলো টাকা বেঁচে গেল বল তো। মনে থাকে যেন—এই টাকাটা আমাকে দেবে। আমি শাড়ি কিনব।'

'ও, এই জন্যে তোমার ধর্মশালায় ওঠা! কিন্তু ওগো বুদ্ধিমতী—এখানে

যে তিনদিনের বেশি থাকতে দেয় না—তা জানো কি ?'

'তিনদিন না পাঁচদিন ? সে আমি ঠিক ক'রে নেব'খন। ম্যানেজারবাবু বিশিষ্ট ভদ্রলোক, আমি বললে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই—না হয় একটা অন্য নামে লিখিয়ে নেব।'

দুটো দিন কাটল যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। অন্তত সন্ধ্যার কাছে স্বপ্ন এটা। অনেক দিনের স্বপ্ন যেন বাস্তব রূপ নিয়েছে তার জীবনে। এই দশাশ্বমেধ ঘাট, এই বিশ্বনাথের গলি, এই কালীতলা, এই কেদার, এই চৌষট্টি যোগিনী—এ সবই তার কত পরিচিত, শুধু যা চোখেই দেখে নি—নইলে এর সব কথাই তো তার জানা। এই তো সে রামাপুরা দিয়ে যেতে যেতে জয়নারায়ণ কলেজটা দূর থেকে দেখেই বলে দিয়েছিল—'এইটে জয়নারায়ণ ঘোষালের কলেজ, না ?'

মিহির সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'কী ব্যাপার বলো তো ? তবে যে বলো তুমি কখনও আস নি ?'

'ঠিকই বলি।'

'তবে জয়নারায়ণ কলেজ জানলে কি ক'রে ?'

'ওগো মশাই, সেবার কাকাবাবু আর কাকীমা এসে দুমাস কাশীতে ছিল না ? এই রামাপুরাতেই থাকত তারা। ঐ যে 'নিমাই ধাম' ছাড়িয়ে এলুম, ঐখানে ছিল। কাকাবাবুর বন্ধু শিববাবুর বাড়ি ওটা। কতদিন কাকীমা বলেছে, আমরা শীতের দিন দুপুরবেলা কলেজের মাঠে এসে বসে থাকতুম, পাশেই তো—একখানা বাড়ি পরে। আসতে আসতে পাথরে 'নিমাই ধাম' দেখেই চিনেছি, এ আর শক্তটা কি ?'

অগত্যা মিহিরকেও মানতে হয়—এ এমন একটা কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।

এ দুদিনে ওরা কাশী চষে ফেলেছে—ওদিকে নাগোয়া থেকে এধারে সংকটা, বেণীমাধবের ধ্বজা—কিছু বাকি নেই আর। স্থির হয়েছে তৃতীয় দিনে সকাল ক'রে খেয়ে-দেয়ে বেলা বারোটা নাগাদ সারনাথ রওনা হবে। তাও, সে দিন সকালবেলাটাও ঘুরে এসেছে—গঙ্গাস্নান ক'রে বিশ্বনাথ দর্শন ক'রে একরাশ বাসন কিনে ফিরেছে সন্ধ্যা। তখন এগারোটা বাজে। তখনই

ভাত খাওয়া উচিত কিন্তু মিহিরের চায়ের নেশা প্রবল, সে বললে, 'দাঁড়াও, একটু চা খেয়ে খানিক দম নিই। তবে তোমাকে আর স্টোভ জ্বালাতে হবে না। আমি হোটেলেই বলে দিচ্ছি।'

চা বলতে গিয়ে কিন্তু একটু বেশীই দেরি হল ওর।

ফিরল যেন কাকে সঙ্গে নিয়ে। 'একটু দাঁড়ান' বলে তাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে বেশ একটু কুণ্ঠিতভাবেই ঘরে ঢুকল মিহির। একটু অপ্রতিভ অপ্রতিভ ভাব।

'এই তাড়াহুড়োর সময় আবার কাকে জোটালে?' জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও দরজার বাইরে একটা ছায়া দেখে সামলে নিল সন্ধ্যা। তখনও বিশেষ কোন সন্দেহ হয় নি। এখানে এসে পর্যন্তই তো তুবেলা চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে—সে-ই আরো দেরি হয়ে যায় পথে বেরোলে। ওদের পাড়ার লোকই কত। এই ধর্মশালাতেই তো একগাদা। রাণুদি, মীরারা, ভানুবাবুদের গুষ্টিসুদ্ধু গিজ গিজ করছে। সন্ধ্যার মনে হ'ল তেমনি কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কার কি দরকার—স্টোভের স্পিরিট কিংবা চিনি বা ঐ রকম কিছু—একেবারে সঙ্গে ক'রে জুটিয়ে এনেছে।

প্রশ্নটা করতে না পেরে মুখ তুলে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চাইল সন্ধ্যা। অর্থাৎ 'ব্যাপার কি বল, কি চাই—কাকে আবার জোটালে?'

কিন্তু কাছে এসে উবু হয়ে বসে মিহির চুপিচুপি যা বলল তাতে ওর চক্ষুস্থির।

'কোন জিনিস চাই না, চাই একটু জায়গা।'

মিহিরেরই বয়সী নাকি ভদ্রলোকটি। সামান্য একটি ব্যাগ আর একটি ছোট্ট বিছানা নিয়ে এসেছে। পাস পায়, পাস-এ বেড়াতে বেড়িয়েছে একা—আজ লক্ষ্মৌ থেকে এসেছে, আজই রাত্রের অমৃতসর মেলে চলে যাবে। কোথাও জায়গা পায় নি—হাঁ ক'রে বসে আছে বাইরে। বলছে যে মাল তুটোও যদি কোথাও রাখতে পাই তো সারাদিন না হয় বাইরে বাইরেই ঘুরলুম—সন্ধ্যের তো চলে যাওয়া। এমন শুকনো মুখ ক'রে বসে আছে বেচারী যে মিহিরের মায়া হয়েছে, একেবারে ডেকেই এনেছে সঙ্গে ক'রে। মালটা রেখে বেরিয়ে যাবে—স্নান পুজো সেরে কোথাও খেয়ে নেবে—ওদের

আর ঝঞ্ঝাট কি ?

অনেকক্ষণ সময় লাগল সন্ধ্যার বাক্যস্ফূর্তি হতে। তারপর চাপা গলাতেই বলে উঠল, 'তুমি কি পাগল হ'লে। কোথাকার কে, জানা নেই শুনো নেই—কী মতলবে এসেছে তারও ঠিক নেই, তুমি ঘরে এনে ঢোকাচ্ছ ?'

'অবিশ্যি—' ঢোঁক গিলে মানতে হ'ল মিহিরকে, 'ম্যানেজারবাবুও সেই কথাই বললেন, এমনি একজন জায়গা পাচ্ছে না দেখে এক ভদ্রলোককে দয়া ক'রে থাকতে দিয়েছে, একসঙ্গে দুটো চাবি দুজনের কাছে, একজন ঘুরে এসে এর স্যুটকেস নিয়ে হাওয়া—এরকম কেসও নাকি ধর্মশালাতেই হয়েছে। তা এর মুখ দেখে কিন্তু জেনুইন ব্যাপারই মনে হ'ল। পাসও দেখালে। আর চাবি-টাবি দেবার অত আদিখ্যেতা না করলেই হ'ল। থাক, বাইরে বাইরেই ঘুরুক, তার আমরা কি জানি।'

তবু আপত্তি যেতে চায় না সন্ধ্যার।

'আমরা তো সারনাথ যাব আজ। তার আগেই যদি ওর যাবার সময় হয়!'

'পাগল! আমরা সন্ধ্যের মধ্যে ফিরব না? ওর ট্রেন তো সেই রাত আটটায়।'

'তা একবেলার জন্যে কোন হোটেলে যেতে পারল না?'

'বলছে যে—খোঁজ করেছিল, হোটেলে জায়গা নেই। এখানের হোটেলে মালটা রাখতে চেয়েছিল—ওঁরা আর কার ঐ রকম কড়ারে মাল রেখেছেন—বেশি রাখতে নারাজ। আসলে আমার মনে হচ্ছে ওদিকেও ভাঁড়ে মা ভবানী, পাস পেয়েছে, একদিন ক'রে নেমে নেমে সব দেখে যাচ্ছে। ট্যাঁকের জোর বেশি নেই। থার্ড ক্লাস পাস, হয়তো সামান্য কোন কাজ করে কারখানা-টানায়—'

তবুও ইতস্তত করছে সন্ধ্যা, বাইরে থেকে সে লোকটি একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে বলল, 'থাক গে মিহিরবাবু, মনে হচ্ছে একটু অসুবিধেতেই ফেলেছি। আপনি আর ব্যস্ত হবেন না, আমি বরং স্টেশনেই চলে যাচ্ছি।'

'না না, সে কি কথা, আসুন আসুন ভেতর আসুন। স্যুটকেস নিয়েই আসুন।' অগত্যা বলতে হ'ল বিব্রত মিহিরকে।

বলতে বলতে আড়ে সন্ধ্যার মুখের দিকে একবার চাইল সে। প্রতিক্রিয়াটা কি হ'ল ওধারে, কোন অভদ্রতা না প্রকাশ করে, এইটা বোঝবার জন্যেই চেয়ে ছিল—কিন্তু চেয়ে দেখে অবাক হয়ে গেল। একটু ভয়ও পেল।

সন্ধ্যার সারা মুখটা রক্তশূন্য বিবর্ণ হয়ে গেছে, তার চোখেও একটা কেমন ভয়ার্ত দৃষ্টি।

এ রকম এর আগে সে কখনও দেখে নি তো। কী হ'ল? হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল নাকি? ফিট হবে না তো?

অসংখ্য উদ্বিগ্ন প্রশ্ন মনে দেখা দিল মিহিরের। অতিথি যে ততক্ষণে ঘরে ঢুকে পড়েছে তাও মনে রইল না। সে ব্যস্ত হয়ে সন্ধ্যার গায়ে হাত দিয়ে ঠেলে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হ'ল তোমার? সন্ধ্যা! অসুস্থ বোধ করছ নাকি? কী হ'ল কি, য়্যাঁ?'

বলতে বলতেই কেমন সন্দেহ হ'ল তার। সন্ধ্যার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে অতিথির দিকে চেয়ে দেখল, সেও যেন পাথর হয়ে গেছে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে। তারও মুখে অসীম বিবর্ণতা। কপালে ঘাম ফুটে উঠেছে এরই মধ্যে।

'এ ব্যা-ব্যাপার কি? আপনারা—মানে তোমাদের পরিচয় আছে নাকি?'

অতিকষ্টে প্রশ্ন করে মিহির। তার যেন গলাতে স্বরই ফুটতে চায় না।

শেষ প্রশ্নটা করে নিজের স্ত্রীকে।

এবার কিছুটা সম্বিৎ ফিরে পায় সন্ধ্যা। মাথার কাপড়টা টেনে দিতে দিতে মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলে, 'তুমি ওঁর নামটাও জিজ্ঞাসা করো নি বুঝি?'

'নাম?' আকাশ থেকে পড়ে যেন মিহির, 'নামের সঙ্গে এর কী—মানে নাম তো ওঁর পাস-এই দেখেছি, বিজয় ঘোষ।...ও আই সি!...আরে এটা তো আমি—'

হঠাৎ যেন অকূল আঁধারে আলো দেখতে পায় মিহির।

সেও বিষম বিব্রত হয়ে অসহায় ভাবে চেয়ে থাকে স্ত্রীর মুখের দিকে।

এতক্ষণে সামলে নিয়েছে বিজয়ও। সে মাথা নামিয়ে বলে, 'আমি যাই মিহিরবাবু, মিছিমিছি খানিকটা ট্রাবল দিলুম। যাই হোক, অনেক ধন্যবাদ।

আপনার সৌজন্য আমার চিরদিন মনে থাকবে।'

অকস্মাৎ মিহিরের মুখে একটা কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে। সে খপ ক'রে হাত বাড়িয়ে বিজয়ের স্যুটকেসটা চেপে ধরে বলে, 'দাঁড়ান না মশাই, অত অস্থির হচ্ছেন কেন? অপরিচিত লোককে ঘরে ডেকে আনলুম আর এখন পরিচয় বেরিয়ে গেল—ছেড়ে দেব?' তারপর সন্ধ্যার চাপা তর্জন,—'কী হচ্ছে কী, ছেলেমানুষী?'—সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রেই স্যুটকেসটা নামিয়ে নিয়ে বিজয়ের হাত ধরে টেনে বসাল নিজেদের বিছানায়, 'আপনি অত কিন্তুই বা হচ্ছেন কেন? মেয়েছেলে দুই সতীনে এক হ'লে ঝগড়া করে—আমরা পুরুষ মানুষ, আমরা তা করব কেন? বসুন বসুন, এই যে চা-ও এসে গেছে, ওরে আর এক কাপ নিয়ে আয় রে, দৌড়ে যা। নিন, চা খান। তারপর কাপড়-চোপড় ছাড়ুন। স্নান সেরে নিন—চলুন একসঙ্গে খেয়ে বেরিয়ে পড়ি। আমরা সারনাথ যাচ্ছি, যাবেন আপনি?'

মিহির যেন তার প্রবল উচ্ছ্বাসে এদের সম্ভাব্য সমস্ত আপত্তি নিঃশেষে উড়িয়ে দেয়। হা-হা ক'রে হেসেও নেয় খানিকটা।

আসল কথা সন্ধ্যার এটা প্রথম বিয়ে নয়। দ্বিতীয় পক্ষ। মিহিরেরও তাই। ওদের যোগাযোগটা অদ্ভুত।

এখন সন্ধ্যার কথাবার্তা হাবভাবে যতই শিক্ষিত মনে হোক, আসলে ও লেখাপড়াও বেশি শেখে নি। মাত্র পনেরো বছর বয়সে ওর বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন এই বিজয়ের সঙ্গে। বিজয়েরও তখন মাত্র বাইশ-তেইশ বছর বয়েস, সবে লিলুয়ার কারখানাতে ঢুকেছে। ওরা উদ্বাস্তু, পাকিস্তান থেকে এসে সন্ধ্যাদের পাড়াতে ঘর ভাড়া ক'রে ছিল। ছেলেটি দেখতে ভাল, রেলে কাজ পেয়েছে, আর কিছু খোঁজ করেন নি সতীশবাবু। তাঁর আর্থিক সঙ্গতি কম, কম খরচে হয়ে যাবে মনে ক'রে আত্মীয়দের আপত্তি সত্ত্বেও বঙ্গজ কায়স্থের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু বিয়ের পরই বোঝা গেল যে সতীশবাবু পাত্র নির্বাচনে শুধু পাত্রকেই দেখেছিলেন, তার পরিবারবর্গকে দেখেন নি। সন্ধ্যার শাশুড়ী একেবারে যাকে বলে খাণ্ডারনী মেয়েমানুষ, তার ওপরে অতিপরিমাণে ঈর্ষাপরায়ণা। ছেলেদের

তিনি ছেলেবেলা থেকেই দৃঢ়হস্তে রাশ টেনে রেখেছিলেন, তাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ব্যক্তিগত মতামত কিছুই গড়ে উঠতে দেন নি। তাছাড়া তাঁর নিজের হাতে কিছু টাকাও ছিল, নিজস্ব টাকা। এখনও পর্যন্ত তাইতেই এদের চলে। বিজয় তো সবে কাজে লেগেছে, ওর ছোট ভাই অজয় একরকম বেকারই, কি সব টুকটাক অর্ডার সাপ্লাই-এর কাজ করে, তাতে কোনমতে তার হাতখরচ, বিড়ি-সিগারেট, সিনেমা চলে যায়—জামা কাপড়ের জন্যেই এখনও মার কাছে হাত পাততে হয়।

বিজয়ের মা ছেলেদের ওপর এই অপরিসীম প্রভাব সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিলেন, সে প্রভাব পাছে খর্ব হয় সেজন্য সতর্কতারও অন্ত ছিল না। সন্ধ্যা সুশ্রী—তায় ছেলেমানুষ, উদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরী মাত্র। তাছাড়া তার সর্বদাই একটা হাসিখুশি প্রাণচঞ্চল ভাব, তাকে দেখলে এমনিই ভালবাসতে ইচ্ছা করে। নিস্তারিণীও তা লক্ষ্য করেছিলেন, সেজন্যেই তাঁর আরও ভয়। স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসবে, বিশেষ অল্পবয়সী স্বামী-স্ত্রী, এটা খুবই স্বাভাবিক। তার ওপর স্ত্রী যদি মনের মতো হয় তো কথাই নেই। বিজয় স্বভাবতই সন্ধ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। রকম-সকম দেখে নিস্তারিণী প্রমাদ গুনলেন। প্রথমটা তবু অন্তর-টিপুনির ওপর দিয়ে যাচ্ছিল, ক্রমশ একবারে নিজমূর্তি ধারণ করলেন নিস্তারিণী। লাঞ্ছনা গঞ্জনা গালাগালি তো দিনরাত, শেষে মারধোরও শুরু হ'ল। বিজয় কোন প্রতিকার করতে পারত না, প্রতিকার তার সাধ্যাতীত তা সে স্পষ্টই বলে দিয়েছিল। তার যা আয় তাতে স্বতন্ত্র সংসার পাততে সে পারবে না। সুতরাং ধৈর্য ধরে সহ্য করারই উপদেশ দিত সে।

ধৈর্য ধরেও ছিল সন্ধ্যা অনেকদিন। পুরো এক বছর। তারপর স্বামীর সঙ্গে একত্র শোওয়াও বন্ধ করে দিলেন শাশুড়ী। বিজয়ের সঙ্গে আর দেখাই হ'ত না। ইতিমধ্যে অন্তঃস্বত্বা হয়েছিল সে, শাশুড়ী কি একটা ওষুধ খাইয়ে সেটা নষ্ট ক'রে দিলেন। বোধহয় তাঁর ভয় হ'ল যে ছেলেমেয়ে হ'লে বৌয়ের জোর বাড়বে, বিজয়েরও টনক নড়বে। একেবারে হাতের বাইরে চলে যাবে তাঁর।

সন্ধ্যা আগে বোঝে নি যে এটা ইচ্ছে ক'রে নষ্ট করা হয়েছে, যখন বুঝল

তখন একেবারে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। নিস্তারিণী নিজেই একদিন বলে ফেললেন। এও বললেন, 'হয়েছে কি, তোকেও অমনি শেষ করব তবে আমার শান্তি। ছেলের আবার বিয়ে দিয়ে মনের মতো বৌ আনব।' এতে ভয়ও হ'ল তার। সে একদিন ভোরবেলা আর কেউ ওঠবার আগেই পালিয়ে বাপের বাড়ি চলে এল। এ-পাড়া ও-পাড়া—রাস্তাঘাট চেনা ওর, কোন অসুবিধাই হ'ল না।

সতীশবাবু অবশ্য অনেক তিরস্কার করলেন ওকে, অনেক বোঝালেন। অভয় দিলেন যে নিজে গিয়ে তিনি বেহানকে ভয় দেখিয়ে আসবেন। এমন করলে পুলিসে খবর দেবেন তিনি, একথাও জানিয়ে আসবেন। এই সব বলে অনেকটা রাজী করালেন তিনি সন্ধ্যাকে। কিন্তু সেদিন সে তখনই যেতে রাজী হ'ল না কিছুতেই। ও বাড়িতে তার আশ্রয় কোথাও নেই, দেওররা বৌদির দিকে টানে—এ তাও নয়। ওর দেওরের যেদিন মার কাছ থেকে টাকা আদায়ের দরকার হয় সেদিন সেও মায়ের সঙ্গে মিলে গালাগালি দেয় বরং ওকে।

যাই হোক, পরের দিনই সতীশবাবু মেয়েকে নিয়ে গেলেন ওদের বাড়ি। কিন্তু তিনি নিস্তারিণীকে ভয় দেখাবেন বলে যতই লম্ফ-ঝম্প ক'রে থাকুন নিস্তারিণীর মূর্তি দেখে উনি নিজেই ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। নিস্তারিণী ওদের বাড়ি ঢুকতে দিলেন না, বললেন, ও বৌ কুলত্যাগ করেছে, ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। ওরা স্বচ্ছন্দে থানায় যেতে পারে—তিনি প্রমাণ ক'রে দেবেন যে বৌ ব্যভিচারিণী।

এরপর থেকে সন্ধ্যা বাপের বাড়িতেই ছিল। লেখাপড়া জানত না, এ বয়সে সেদিকে গেলও না। সরোজনলিনী ইস্কুলে সেলাইয়ের কাজ শিখে জামা তৈরী করত কিন্তু তাতে পরিশ্রম বেশি—মজুরী কম। মজুরী কম না হ'লে তাকে দেবে কেন? দরজীর দোকানের চেয়ে অনেক কম মজুরী নিতে হ'ত। অনেক সময় সে টাকাও আদায় হ'ত না। এই ভাবেই বছরর তিনেক যাবার পর একটা ভাল কাজ মিলে গেল তার—পাড়ার একটি বৌয়ের সঙ্গে তার খুব ভাব হয়েছিল, সেই বৌটির বাবা বড় ডাক্তার। মেয়েদের ডাক্তার, তাঁর

চেম্বারে মেয়েছেলে নার্স রাখতে হয়। বৌটি বাবাকে ধরল সন্ধ্যাকে সেই কাজ দিতে হবে। তিনি বললেন, 'ও যে কিচ্ছু জানে না মা।' বৌটি বলল, 'তা জানি না—যা হয় তোমাকে করতেই হবে।' মেয়ের কথা বাবা ঠেলতে পারলেন না। একটা বড় হাসপাতালের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন—সেখানে আয়া হিসেবে সন্ধ্যাকে ঢুকিয়ে দিলেন, নার্সদের বললেন ওকে মোটামুটি কাজ শিখিয়ে দিতে। সন্ধ্যা তাঁর মেয়ের মতো, সেই বুঝে যেন তারা চলে। অন্য ক্ষেত্র হ'লে কেউই কাজ শেখাত না, বরং ওকে তাড়াবারই চেষ্টা করত কিন্তু এক্ষেত্রে সে সাহস হ'ল না। ভালই কাজ শিখল সন্ধ্যা—অন্তত ওঁর কাজ চালাবার মতো। তারপর সেই ডাক্তার নিজের চেম্বারে নিয়ে এলেন। অসংখ্য সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাকে নিত্য দেখে, তাদের সঙ্গে কথা কয়ে সন্ধ্যা অনেক কিছু শিখল, জানল, তারও চাল-চলন বদলে গেল।

সেই ডাক্তারের পরামর্শেই সন্ধ্যা বিবাহ-বিচ্ছেদের দরখাস্ত করেছিল। নানারকম হাঙ্গামা ও ঝঞ্ঝাটের পর, দু বৎসর ধরে ঘোরাঘুরি ও অজস্র অর্থব্যয় ক'রে—এই সবে বছর খানেক আগে ওর বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর হয়েছে। সেই সময়েই আদালতে দু-তিন বার দেখা হয়েছিল ওদের, নইলে বোধহয় আজ চিনতেও পারত না ওরা পরস্পরকে। বিজয়রা ঐ ব্যাপারের পরই দমদম চলে গিয়েছিল। বিজয়ের চেহারা আগে খুব সুশ্রী ছিল, সে যেন এরই মধ্যে কেমন বুড়িয়ে গেছে—আর সন্ধ্যা আগের চেয়ে অনেক ভাল দেখতে হয়েছে—সেদিন সে ছিল কিশোরী, আজ পূর্ণ বয়স্কা নারী—তাছাড়া চাল-চলনেও সেই অনভিজ্ঞ ভীরু মেয়েটি নেই, একেবারে তরুণী হয়ে গেছে।···

মিহিরের সঙ্গে সন্ধ্যার আলাপ হয়েছে এই বছর দুয়েক। সেই বৌটিরই মামা, ডাক্তারবাবুর ছোট শালা। ওরও বিবাহিত জীবন সুখের নয়—একটি বাচ্ছা হয়েছিল তৎসত্ত্বেও দুজনের মনের ব্যবধান জোড়া লাগল না। শেষে দুজনেরই অসহ্য হওয়াতে বৌটি সরে গেছে স্ব-ইচ্ছায়। ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদে দেরি হয় নি, কারণ দুজনেরই সম্মতি ছিল। কিছু নগদ টাকা ছিল মিহিরের, সে মেয়ের খরচ বলে স্ত্রীকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। লেখাপড়া হয়ে গেছে, ওর আর কোন দায়-দায়িত্ব নেই। মেয়েকে দেখতে মধ্যে মধ্যে মেয়ের ইস্কুলে যায়, বাড়ি যেতেও বাধা নেই অবশ্য।

সন্ধ্যার সঙ্গে আলাপ যখন অনুরাগে পরিণত হ'ল এবং মিহির একদিন বিবাহের প্রস্তাব করল তখন সন্ধ্যা বলেছিল, 'আবার ? একবার ভুল ক'রেও চৈতন্য হয় নি, আবার সেই ভুল করতে যাচ্ছ ?'

'আর ভুল হবে না।' জবাব দিয়েছিল মিহির।

'কী ক'রে জানলে ?' সন্ধ্যা শুধিয়েছিল।

'মারোয়াড়ীরা একবার গণেশ ওল্‌টালে মহাজনেরা বেশি ক'রে তাকে ধার দেয়—তা জান ? তার মনে ওর অভিজ্ঞতা বেড়েছে আর ফেল করবে না। এও তাই। আমরা দুজনেই পোড়-খাওয়া, জেনে শুনে বাজিয়ে নিচ্ছি। তাছাড়া আমার তো কোন অভিভাবক নেই, যিনি একরকম অভিভাবকের মতো—জামাইবাবু—তিনি তোমাকে কন্যাবৎ স্নেহ করেন—তবে আর ভয় কি ?'

তবু তখনই রাজী হয় নি সন্ধ্যা। অনেক দেখেশুনে অনেক ঘুরিয়ে তবে সে শেষ পর্যন্ত মত দিয়েছে। ওদের বিয়েও হয়েছে এই দু মাস। এর ভেতর যেটুকু দেখেছে মিহিরকে তাতে মনে হচ্ছে এবার ভুল করে নি, সে সুখীই হবে একে নিয়ে।

সুখীই তো হয়েছিল—কিন্তু চরম সুখের ক্ষণটিতেই কোথা থেকে এ লোকটাকে ধরে আনল মিহির!

এর সঙ্গে যে দুঃস্মৃতি জড়িত আছে—দুঃস্বপ্নের মতোই কষ্টদায়ক স্মৃতি, তাতে একে দেখে যেন ভয় করে তার। তার সুখের সংসারে এ কেন এল ধূমকেতুর মতো!

মিহির যতই জিনিসটা উড়িয়ে দিক, বিজয় বুঝতে পারে যে সন্ধ্যা দারুণ অস্বস্তি বোধ করছে। তারও খুব ভাল লাগছে না ব্যাপারটা। লজ্জাই করছে রীতিমতো।

চা খাওয়া শেষ ক'রে আবারও সে উঠে দাঁড়াতে যায়, 'আমি যাই মিহির-বাবু, সোজা গঙ্গায় চলে যাই, ওখান থেকে স্নান সেরে কোথাও একটু খেয়ে নিয়ে স্টেশনে চলে যাব। বারোটা তো বেজেই গেল—আর কতটুকুই বা।'

'সে কি! পাগল নাকি! ঘরে ডেকে এনেছি এমন ক'রে তাড়িয়ে দেব

বলে ? নিন—এখানেই স্নান সেরে নিন চটপট, আমি একেবারে তিন থালা ভাত দিতে বলি, খাওয়া-দাওয়া সারুন। একসঙ্গেই সারনাথ যাওয়া যাক চলুন।'

সন্ধ্যার ভ্রূকুটি ঘনীভূত হ'ল, কিন্তু সে কোন বাধাই দিতে পারল না মিহিরকে। তার সঙ্গে চোখোচোখি হলেও না হয় কথা ছিল, মিহির যে চাইছেই না এদিকে—

কিন্তু বিজয় অবিবেচক নয়। হাতজোড় ক'রে বলল, 'দোহাই মিহিরবাবু, বাড়াবাড়ি করবেন না। বরং অরিজিন্যাল যা প্রস্তাব ছিল তাই থাক—মাল থাক আপনার কাছে, আমি কাপড় গামছা নিয়ে চলে যাই, এসেছি যখন স্নান-পূজোগুলো সারি—আপনারাও সারনাথ চলে যান, আমি সন্ধ্যার সময় এসে আবার মাল নিয়ে যাব।'

'পাগল নাকি! কিসের এত স্নান-পূজো মশাই আপনার, যে এখনই যেতে হবে। আপনি তো এর আগে কাশী এসেছেন—আসেন নি ? তবে ? এই তো প্রথম নয় যে দর্শন না হ'লে খেতে পাবেন না। হবেই এখন, নিন নিন, স্নানটা সেরে নিন তো। আপনাকে অমনি পথে ছেড়ে দিচ্ছি আর কি। যখন এত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বেরিয়ে গেল আপনি তো আমাদের আপনার জন হ'লেন মশাই, এত সঙ্কোচ করছেন কেন ? বলি আপনার তো কোন বদ মতলব নেই,—তবে ?'

অগত্যা এখানেই স্নান করতে যেতে হয় বিজয়কে।

তারই স্ত্রী, এক-আধদিন নয়, প্রায় দেড় বছর ঘর করেছে। এককালে ওর কাছে কোন লজ্জাই ছিল না, কিন্তু আজ যেন এখানে জামাকাপড় ছাড়তে কেমন বাধ-বাধ ঠেকল। সে অন্য ধুতি আর জামা নিয়ে সবসুদ্ধই কল-ঘরে চলে গেল।

সে অদৃশ্য হ'তেই সন্ধ্যা ফেটে পড়ল একেবারে, 'কী শুরু করেছ বল তো ? তোমার জন্যে কি আমি গলায় দড়ি দেব, না গঙ্গায় ডুবব ? এসব কি হচ্ছে কি ? তুমি কি চাও, আমি এখনই কলকাতায় ফিরে যাই ?···এসব আমার ভাল লাগে না বলে দিচ্ছি—।'

'আহা চটছ কেন ? একটু মজা করছি বই তো নয়। বলি তোমারই বা

অত লজ্জা কিসের? সে তো হয়ে বয়ে চুকে গেছে। আর তো তোমার প্রেম নেই তার সঙ্গে, তবে? অত ভয়ই বা কেন? বাছাধনকে একটু খেলাই, কী অমূল্য রত্ন হাতে পেয়েও হারিয়েছে সেটা বুঝুক হাড়ে হাড়ে, তবে তো। ওর দফা চিরকালের মতো সেরে দিচ্ছি, দাঁড়াও না।'

সে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ায়। ওপর থেকেই শুনতে পায় সন্ধ্যা, হোটেলে যাবার পথে ম্যানেজারকে বলছে—'না ম্যানেজারবাবু, ভয় নেই, আত্মীয়তা বেরিয়ে গেছে ভদ্রলোকের সঙ্গে।' ম্যানেজার বোধহয় বললেন, 'কী রকম?' সেটা ঠিক শুনতে পেল না, আবার শুনল মিহিরের উত্তরটাই, 'হ্যাঁ—আমার স্ত্রীর খুব নিকট আত্মীয়—আমার বড় কুটুম হ'ল আর কি, সম্পর্কে!'

রাগের মধ্যেও হেসে ফেলে সন্ধ্যা আপন মনে। দুষ্টু দেখেছ, প্রকারান্তরে ওকে শালা বলে নিলে।...

বিজয় স্নান সেরে ঘরে ঢুকেই অপ্রস্তুতে পড়ে যায়। মিহির নেই, সন্ধ্যা একা। বিব্রতভাবে বলে, 'মিহিরবাবু—?'

'উনি হোটেলে ভাতের কথা বলতে গেছেন। এখনই আসবেন।' তারপর একটু থেমে, ইতস্তত ক'রে বলে—বলতে হয় সন্ধ্যাকে—'আপনি বসুন না!'

বিজয়ও খানিকটা এদিক ওদিক ক'রে ওর নিজেরই বেডিংটার ওপর বসে পড়ে শেষ পর্যন্ত।

দুজনেই চুপচাপ। সন্ধ্যার দৃষ্টি তার সদ্য-কেনা বাসনগুলোর দিকে। বিজয়ের দৃষ্টি বাসন, দেওয়াল, জানলা ঘুরে এসে সন্ধ্যার ওপরই নিবদ্ধ হয়। সেইটেই স্বাভাবিক। চায় এবং চেয়েই থাকে, চোখ ফেরাতে পারে না। খানিক পরে আবার উশখুশ ক'রে ওঠে, 'এত দেরি হচ্ছে কেন, দেখব নাকি?'

'না, হয়ত ভাত সঙ্গেই নিয়ে আসছেন।' সন্ধ্যা উত্তর দেয়। কেন দেরি হচ্ছে তা সে জানে। দাঁড়াও না, মজা দেখাবে সে।

'বেশ মানুষ কিন্তু। ভারী দিলখোলা ভদ্রলোক। তুমি—তুমি ভালই বেছেছ এবার। এঁকে নিয়ে সুখী হবে।' আপনি বলাই উচিত ছিল কি? মনে মনে ভাবে বিজয়।

সন্ধ্যা চুপ ক'রেই থাকে। কী আর উত্তর দেবে। মনে মনে বলে, 'তুমিই

বোঝ—তুমি কি লোকসান করলে আর আমি কি লাভ করলুম। আমার তো শাপে বর হ'ল।'

কিন্তু এখনও তো আসছে না, সত্যিই।...উঃ, লোকটা কি বদমাইশ। ইচ্ছে ক'রে দেরি করছে, মজা করবার জন্যে।

বিজয় আর একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, 'তোমার চেহারায় কিন্তু অনেক পরিবর্তন হয়েছে, চট ক'রে চেনা শক্ত। আগে—মানে কোর্টেও যা দেখেছিলুম তার চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে।' অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে বলতে গিয়েও সামলে যায় বিজয়।

আর সন্ধ্যা—বলবে না মনে করতে করতেও বেরিয়ে যায় কথাটা, 'আপনার চেহারা কিন্তু খুব খারাপ হয়ে গেছে।'

'আর চেহারা!' ম্লান হাসে বিজয়, 'চেহারা খারাপের আর অপরাধ কি! বারো মাস মেসে খাওয়া—।'

'কেন, মেসে খাওয়া কেন?' কৌতূহলটা যে চেপে রাখতে পারছে না, সেটা বুঝতেও পারে না সন্ধ্যা।

'মা তো মারা গেছেন আজ তিন বছর হ'ল। ছোট ভাই আর আমি তবু একসঙ্গে ছিলুম, সে রাউরকেলায় চাকরি পেয়ে চলে গেল, ওখানেই কোআর্টার পেয়েছে, বৌ নিয়ে গেছে, আমি আর কী ভরসায় বাসা রাখি বলো। আমার তো সামান্য আয় জানই, চাকর রেখে চালাব, সে ক্ষমতা কই?'

এর পরের প্রশ্নটা অসম্বরণীয়, অনিবার্য। সন্ধ্যার সাধ্য নেই যে না ক'রে থাকে।

'তা আর—মানে বিয়ে করেন নি?'

'আবার বিয়ে! তোমাকে দিয়েই আমার চোখ খুলে গিয়েছিল—আর নয়।'

'কেন, দোষটা বুঝি আমারই শাব্যস্ত হ'ল!'

কণ্ঠের উষ্ণতা ও উগ্রতা ঢাকা যায় না কোনমতেই।

'না, আমারই দোষ। সংসার চালাবার যোগ্যতা না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করা কোনমতেই উচিত নয়, সেই চোখটাই তুমি খুলে দিয়েছ। কি অসহায় সেইটে বুঝতে পারলুম। তাছাড়া,' বিজয় চোখটা নামিয়ে নেয়, 'মা সংসার

চালাতেন, আমি যখন কিছুতেই আর বিয়ে করলুম না, মা মনে করলেন তোমায় ভালবাসি বলেই বিয়ে করছি না—এটা তাঁর প্রতি একটা দোষারোপ বলে ধরে নিলেন। তাঁর হাতে যা টাকাকড়ি ছিল মরবার সময় সব ছোট ভাইকে দিয়ে গেছেন। সে চালাক, টালবাহানা ক'রে ছিল, মা বেঁচে থাকতে বিয়ে করে নি। একেবারে মা মরবার পর করলে। অশান্তিও ভোগ করতে হ'ল না, টাকাটাও পেয়ে গেল।'

'তা যার যেমন আয় সে তেমন থাকবে। সবাইকেই যে রাজারাজড়ার মতো থাকতে হবে তার মানে কি?'

'নাঃ—যা আয় হয় তাতে আর একটা পেট চলতে পারে কিন্তু ছেলেপুলে হ'লে তাদের মনের মতো ক'রে মানুষ করতে পারব না—সে বড় বিশ্রী অবস্থা। তার চেয়ে এ ঢের ভাল।'

বাইরে থেকেই মিহিরের গলা শোনা গেল, 'কী গো, আলাপ-পরিচয় হ'ল?'

সন্ধ্যা কুট ক'রে জবাব দেয়, 'হ'ল বৈ কি। হওয়াবার জন্যেই তো তুমি ওৎ পেতে আড়ি পেতে ছিলে, ইচ্ছে ক'রে দেরি করলে—আর হবে না? না হ'লে তো তোমাকে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হ'ত।'

'এ-এসব কি য়্যাস্‌পারসান্‌স্‌।' মিহির অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। এই প্রথম অপ্রতিভ হ'ল সে।···

খাওয়া-দাওয়ার পরও যেন সারনাথ যাওয়ায় তেমন গা দেখা গেল না মিহিরের। সন্ধ্যা তাড়া দিলে বলে, 'হচ্ছে হচ্ছে দাঁড়াও না—ভাতটা একটু পেটে তলাক। এত তাড়া কি? এখন শুনেছি মডার্ন সারনাথ হয়েছে, প্রাণপণে সরকার একটি প্রমোদকানন তৈরি করছেন। তার আর কী এত দেখবে!'

আসলে বিজয়ের সঙ্গে গল্প করারই উৎসাহ যেন বেশি।

ঠিক কী কাজ করে, কী রকম আয়, কোথায় থাকে—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয় সে। একা মেসে থাকে শুনে হঠাৎ যেন একটু চমকে ওঠে।

'আপনি—আপনি আর বিয়ে করেন নি?'

'না, আবার বিয়ে!'

'আবার বিয়ে মানে? একবার যখন করেছিলেন তখন আর একবার করতে আপত্তি কি?'

সন্ধ্যার মনে হয় একটু বেশী কৌতূহলী হয়ে উঠছে মিহিরের কণ্ঠ।

'তখন মা-র কথায় বিয়ে ক'রে ফেলেছিলুম। অত বুঝতুম না। এখন আর সাহস নেই—যা সামান্য আয়—বিয়ে ক'রে কি শেষে বিপদে পড়ব?'

'কী মুশকিল, আরও সামান্য আয়ে তখন বিয়ে করেছিলেন—আর এখন সাহস হচ্ছে না? এ তো বড় নতুন কথা শোনাচ্ছেন মশাই। না না, ওভাবে থাকবেন না, বিয়ে ক'রে ফেলুন। চাপ পড়ে, আয় বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করবেন—।'

'সে চেষ্টাটা কি ভাবে হবে—চুরি ডাকাতি?' ঈষৎ বিদ্রূপের সুর বিজয়ের কণ্ঠে।

'চুরি-ডাকাতি কেন? চাকরি আর চুরি-ডাকাতি—এছাড়া আর পথ নেই নাকি?' উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মিহিরের কণ্ঠ; 'কত কি পথ আছে মশাই, দালালী আছে, ছোটখাটো অর্ডার সাপ্লাই-এর কাজ আছে, নিদেন ইন্সিওরেন্স-এর এজেন্সী আছে। একটা জোয়ান পুরুষ মানুষ যদি খাটে তো তার টাকার অভাব হয়?'

বিজয় চুপ ক'রে থাকে—কথাটা তার পছন্দ হ'ল কি না তা বোঝা যায় না।

সন্ধ্যা তাড়া লাগায়, 'নাও গো—ছটো বাজে, আর কত বক্তৃতা করবে?'

তার ভয় এধারে দেরি হয়ে গেলে যদি ও লোকটা ট্রেন না পায়! আবার হয়ত রাত্রেও থাকতে চাইবে এই ঘরে, মাগো!

'দাঁড়াও দাঁড়াও, একটা মতলব মাথায় এসেছে—' এই বলে, মতলবটা খুলে বলবার আগেই হো হো ক'রে হেসে ওঠে মিহির। তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে বলে, 'তোমার এই প্রাক্তন এঁকে আমার সেই প্রাক্তন তাঁর কাছে নিয়ে গেলে কি হয়? আলাপ পরিচয় করিয়ে দিই যদি? ইনিও একাকী,—তিনিও একাকী, যদি গেঁথে যায় তো মন্দ কি?'

সন্ধ্যার মুখটা যেন হঠাৎ কেমন হয়ে যায়। বলে, 'তোমার যত আজগুবি কথা—'

'না না—মশাই, ঠিক হয়েছে। দেখুন আমারও একটি প্রাক্তন তিনি আছেন—শুনেছেন কিনা জানি না, তিনিও এ পর্যন্ত আর এ পথে যান নি, তাঁর নাকি কাউকে পছন্দ হচ্ছে না তেমন। চলুন একদিন আপনাকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিই। তাহলে আর উপার্জনের জন্যে ভাবতে হবে না। তাঁর হাতে দু পয়সা আছে, সম্প্রতি একটি চাকরিও পেয়েছেন মাঝারি মাইনের—দেখুন, যদি গেঁথে তুলতে পারেন—এক ঢিলে দুই পাখি বধ!'

'কী যে বলেন।' বিজয় হেসে ফেলে ওর কথার ধরনে।

কিন্তু সন্ধ্যার মুখে যেন কেমন একটা ছায়া পড়ে। সে বলে, 'তুমি তার এত খবর জানলে কি ক'রে—যাওয়া-আসা করো নাকি এখনও?'

কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা ও তিক্ততা—চাপবার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও চাপা থাকে না।

মজা করবার উৎসাহে মিহির এতক্ষণ বকে যাচ্ছিল, অতটা অগ্রপশ্চাৎ ভেবে দেখে নি। এখন সন্ধ্যার কণ্ঠস্বরে সে সচেতন হয়ে উঠল।

'তা মেয়ের কাছে তো যাই-ই।—' একটু ঢোঁক গিলে বলে সে।

'সে তো ইস্কুলে যাও শুনেছি। যদি যাওয়া-আসা না থাকে তো হুট ক'রে একজনকে নিয়ে যাবে কী ক'রে? আর কী মাইনের চাকরি, কবে পেয়েছে —পাঁচ বছরের মেয়ের তো জানবার কথা নয়!'

'সে বুঝি আমার জানবার আর উপায় নেই—বা-রে। তাছাড়া কথার কথা বললুম বলেই কি অমনি নিয়ে যাচ্ছি সত্যি সত্যিই?'

কথাটা কি ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে মিহির?

'না—সে সম্ভাবনা মনে না থাকলে কি আর কথাটা অমন মাথায় আসে!'

খুব শীতল শোনায় সন্ধ্যার কণ্ঠটা। অস্বস্তিকর রকমের শীতল।

আবহাওয়া ভাল নয় দেখে বিজয় একেবারে উঠে দাঁড়ায়।

'ইস, ছুটো যে বেজে গেল ওধারে। আর দেরি নয় কোনমতেই। চলুন মিহিরবাবু, আমরা বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। ও তৈরী হয়ে নিক। সন্ধ্যা, চটপট নাও, আর দেরি ক'রো না।'

একটা দিক সামলাতে গিয়ে বিজয়ও যে আর একটা ভুল ক'রে বসল,

তা তার মাথায় গেল না। ঈষৎ ভ্রূকুটি দেখা দিল মিহিরের ললাটে, এত অন্তরঙ্গ ডাকটা পছন্দ হ'ল না। কিন্তু সে আর কথা বাড়াল না, বিজয়ের সঙ্গেই বাইরে এসে দাঁড়াল।

দুজনে এরা সাইকেল্ রিক্সা ক'রে যাবে এই কথা ছিল—কিন্তু তিনজন হয়ে পড়ায় বাস-এ যাওয়াই স্থির হ'ল। মিহির একবার ট্যাক্সি নেওয়ার প্রস্তাবও করেছিল কিন্তু সন্ধ্যা ঘোরতর আপত্তি করল, 'না না, একগাদা টাকা মিছিমিছি নষ্ট করতে হবে না, বাস যখন আছে তখন আবার কেন ?'

ওখানে যেতে যেতে এবং সারনাথে পৌঁছে ঘুরতে ঘুরতে মিহির ও সন্ধ্যা দুজনেই অনেকটা প্রকৃতিস্থ হ'ল। হাসিখুশি গল্পগুজবে হাল্‌কা হয়ে গেল কিছু-পূর্বের মেঘটা।

কিন্তু ফেরবার পথে এক বিভ্রাট বাধল।

ওদের পৌঁছতে যথেষ্ট দেরি হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তাড়াতাড়ি করা দরকার সে সম্বন্ধে সচেতনই ছিল ওরা। মিউজিয়ামটা ওরা যথেষ্ট দ্রুতই সারল—অতগুলো ঘর ও অত জিনিস, খুব দ্রুত অবশ্য সারাও যায় না। মোটামুটি চোখ বুলিয়ে চলে গিয়েও ওরা যখন বেরোল তখন দরজা বন্ধ করার সময় হয়ে গিয়েছে। চৌকিদার এক রকম ঠেলেই বার করে দিলে ওদের।

এরপর আছে বাইরের এক্সক্যাভেশান এবং হাল আমলের মন্দির প্রভৃতি। এগুলো বন্ধ করার প্রশ্ন নেই বলে অনিচ্ছাতেও ওদের গতিটা বোধহয় একটু মন্থর হয়ে গিয়েছিল, তাছাড়া জায়গাও অনেকটা, হেঁটে ঘুরতেও বেশ সময় লাগে। ফলে ওরা যখন বাসে চাপল শেষ পর্যন্ত, তখন হাতে সময় একেবারে মাপা।

বিজয়ের দোষ নেই, সে অনেকক্ষণ ধরেই তাড়া লাগাচ্ছে। বাসে চেপেও খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল, 'একেবারে গোনা-গাঁথা মিনিট, একটু এদিক ওদিক হলেই গেছে—'

মিহিরই ওকে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছে বরাবর, 'আরে মশাই, আপনার তো বিছানাটা খোলাই হয় নি, যেমন বাঁধা ছিল তেমনি আছে, ভিজে কাপড়টা

শুকোচ্ছে, সেইটে শুধু পুরে নেওয়া—এক মিনিটও লাগবে না—। তবে যদি সন্ধ্যার কাছে বিদায় নিতে দেরি হয়ে যায়, সে আলাদা কথা—উ হু-হু!'

সন্ধ্যার প্রবল চিমটিতে চুপ ক'রে যেতে বাধ্য হয়।

'কী হচ্ছে কি আদিখ্যেতা!' চাপা গলায় বলল সন্ধ্যা।

মিহির ঘড়ি দেখে বলে, 'পাঞ্জাব মেল আর হবে বলে মনে হচ্ছে না—বেনারসটাই ধরবেন এখন, কী আর করা যাবে।'

'তা-ই হ'লে হয়।' চিন্তিত মুখে বিজয় বলে, 'বাসটাও যে ছাড়তে দেরি করল।'

সন্ধ্যা বলে, 'এত হিসেব করা সময় নিয়ে বাপু আসা উচিত হয় নি। অন্তত ওঁকে না নিয়ে এলেই হ'ত।...সেই তাড়াহুড়ো ক'রে দেখা হ'ল না সব—'

'নাও, আর কি ক'রে দেখবে? তুমি তো আর আর্কিওলজীতে রিসার্চ করছো না, মোটামুটি একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া, ঐ ঢের হয়েছে। দেশে গিয়ে দেখেছি বলতে পারলেই হ'ল তো তোমার!' মিহির সান্ত্বনা দেয়।

কিন্তু ডোবাল বাসটাই। গোড়াতেই হয়ত গণ্ডগোল ছিল কিছু, সেই জন্যেই ছাড়তে দেরি করেছিল—খানিকটা এসে আরও বৃহত্তর গণ্ডগোল বাধল—সামনের একটি চাকা ফেটে গেল।

বাস কণ্ডাক্টর অবশ্য সান্ত্বনার ত্রুটি করল না, 'কোই ফিকির নেহি, আপলোক ঘাবড়াইয়ে মৎ, অভি ঠিক হো জায়গা।'

তখন অন্ধকার হয়ে গেছে, পথে ওদিকটায় আলো নেই, কারণ তখনও কাশী নগরপালিকার আওতায় পৌঁছয় নি ওরা। দেখা গেল টর্চও নেই কারুর কাছে। দেশলাই জ্বেলে জ্বেলে আর কতকটা আন্দাজে চাকা খোলা ও লাগানো। তাতে অনেক দেরি হয়ে গেল।

ওরা তখনও আশা করছে যে যদি অন্য বাস এসে পড়ে ইতিমধ্যে অথবা চলতি খালি রিক্সা পাওয়া যায়—কিন্তু তখন বাসের সংখ্যা কমে এসেছে, পরের বাস অনেক পরে ছাড়বে শোনা গেল, আর সাইকেল রিক্সারও এ সময় খালি আসার কথা নয়। যা এসেছে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থাতেই এসেছে,

সেই সব সওয়ারী নিয়েই ফিরে যাচ্ছে তারা।

অগত্যা বাস-এর চাকা লাগানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'ল। ফলে ওরা যখন গোধুলিয়া পৌঁছল তখন বেনারস এক্সপ্রেস ধরবারও সময় নেই!

বিজয় যথেষ্ট কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। মিহির তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'নিন কী আর করা যাবে, এ বাবা বিশ্বনাথেরই কারচুপি। আপনার হাতের জল না নিয়ে আপনাকে ছাড়বার মতলব নেই তাঁর। কালই যাবেন, আপনার আপিস তো সেই পরশু—।'

বলল বটে কিন্তু ঠিক আগের হাসি-খুশি ভাবটা যেন আর রইল না। একটু অন্যমনস্ক, একটু গম্ভীর হয়ে রইল। সন্ধ্যা অনুযোগ করাতে বলল, 'মাথাটা বড্ড ধরেছে।'

'ধরবে না, মাথার আর অপরাধ কি! সকাল থেকে রোদে ঘোরা হচ্ছে টো টো ক'রে—তার ওপর তুমি যা বকছ! একটা বড়ি খাও না, মাথা ধরার—আমার ব্যাগে আছে।'

'যাক, দেখি আর একটু—।' নিতান্ত নিরুৎসুক কণ্ঠে বলে মিহির।

মিহিরের উৎসাহের অভাবটা কিন্তু সন্ধ্যা পুরিয়ে দিল। সে কলরব ক'রে স্টোভ জ্বালল, চা করল, নিচে গিয়ে খাবারের কথা বলে এল এবং সর্বক্ষণ কলকল ক'রে বকতে লাগল। তার মেজাজ হঠাৎ এমন ভাল হয়ে উঠল কেন কিছুতেই ভেবে পেল না মিহির। ওর মেজাজ কিন্তু উত্তরোত্তর বিগড়ে যেতে লাগল। তার কারণ সে চোখ বুজে শুয়ে ছিল, হঠাৎ একবার চোখ খুলে দেখল, সন্ধ্যা হেঁট হয়ে চা ঢালছে গেলাসে আর বিজয় একদৃষ্টে চেয়ে আছে সেদিকে। 'ক্ষুধার্ত দৃষ্টি' কথাটা সে শুনেছিল বটে কিন্তু দৃষ্টিতে সত্যিই যে এমন ক্ষুধা প্রকাশ পায় তা তার জানা ছিল না। ওর মনে হ'ল বিজয় দুই চোখ দিয়ে লেহন করছে সন্ধ্যাকে—

খাবার সময়ও ভাল করে খাওয়া হ'ল না—মিহিরের হঠাৎ মনে হ'ল সন্ধ্যা বড় বেশি মনোযোগ দিয়ে খাওয়াচ্ছে বিজয়কে। এত বাড়াবাড়ির কি দরকার পড়ে গেল ওর?

রাত্রে শোবার সমস্যাটা মিহির ও সন্ধ্যা দুজনের মনেই ছিল কিন্তু কেউই

মুখ ফুটে তুলতে পারছিল না কথাটা। ওদের সে অস্বস্তি থেকে বাঁচিয়ে দিল বিজয়ই। খাওয়া শেষ হ'তেই সে নিজের বিছানাটা তুলে নিয়ে বলল, 'আমি এই বাইরে বারান্দাটায় শুচ্ছি মিহিরবাবু, এত গরমে চাপা ঘরে শুতে পারব না, তাছাড়া অসুবিধেও তো হবে—'

মিহির দু'একবার ক্ষীণ আপত্তি করল, 'না, না, হয়ে যেত কিন্তু—এই তো এপাশে জায়গা ছিল', কিন্তু যে-রকম প্রবল আপত্তি ও আদিখ্যেতা আশঙ্কা করেছিল সন্ধ্যা, সে-রকম কিছু করল না।

সে রাত্রে দুজনের বিশেষ কথা হ'ল না, প্রেমালাপ তো নয়ই। তার প্রথম কারণ, দরজার বাইরেই বিজয় শুয়ে, দ্বিতীয় কারণ দুজনেই ক্লান্ত। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল প্রায়। অন্তত সন্ধ্যা পড়ল। মিহিরের কথা সে জানে না।

পরের দিন সকালে উঠে চা করতে করতে হঠাৎ সন্ধ্যা বলল, 'আমাদের ঘরে লেবু নেই কিন্তু—।'

'লেবুর কী দরকার পড়ল হঠাৎ ?' মিহির বুঝতে পারল না কথাটা।

'না, একটা কথা মনে পড়ে গেল কিনা।' সন্ধ্যা একটু অপ্রতিভ ভাবে হাসল, 'উনি—মানে বিজয়বাবু আগে সকালে দুধ দেওয়া চা খেতেন না, লেবু-চা করতে হ'ত।'

বিজয়বাবু নামটা চট ক'রে মুখ দিয়ে বেরোয় না ওর আজও।

'ন্ না—সে অভ্যেস বহুদিনই ছাড়তে হয়েছে। কে করবে বলো ? মা থাকতেই বন্ধ হয়ে গেছে, শেষের দিকে এত রকম আর পেরে উঠত না মা।'

তারপর একটু থেমে কেমন একরকম অদ্ভুত গলায় বিজয় বলল, 'আশ্চর্য, এতদিনের কথা তোমার মনে আছে এখনও—?'

মিহিরের মনে হ'ল—ক্ষোভ, হতাশা, অনুশোচনা ও উদগ্র ঈর্ষা—একই গলায় এতগুলো ভাব ফুটে ওঠা—এর আগে আর কখনও শোনে নি সে।

সে খানিকটা চা খেয়ে গেলাসটা নামিয়ে রেখে বলল, 'কী বিশ্রী চা করেছ !'

'কেন ?' বিজয় বিস্মিত হয়ে তাকাল, 'চা তো খারাপ হয় নি।...আপনি আরও কড়া চা খান বুঝি—'

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে মিহির যেন কেমন ছট্‌ফট্‌ ক'রে উঠে দাঁড়াল, 'তোমরা বসো— আমি একটু ঘুরে আসি—'

'ওমা, কোথায় যাবে এই সাত-সকালে ? বসো না, আমিও বেরিয়ে পড়ি। উনি তো এখনি যাবেন—আমি একা থাকব ?'

'ও, উনি গঙ্গায় যাবেন বুঝি ?' খুব কোমল কণ্ঠে বলে মিহির, কিন্তু 'উনি' শব্দটার ওপর যে অস্বাভাবিক জোর দিল—তা বিজয়বাবু বা সন্ধ্যা কারুরই কান এড়াল না, 'আমি তো তা জানি না !···তা হোক, একটু থাকলেই না হয় একা।···না হয় উনিই একটু দেরি ক'রে বেরোবেন। আমি একটু ঘুরে আসি। আমার আর ভাল লাগছে না বসে বসে—'

আবারও 'উনি' শব্দটার ওপ্র অস্বাভাবিক জোর পড়ে। 'আর' শব্দটাতেও—

বিজয় উঠে দাঁড়িয়ে আলনা থেকে তার কাপড় আর গামছা টেনে নিতে নিতে বলে, 'না, আমার আর দেরি করা সম্ভব নয়। সাতটা বেজে গেছে, স্নান পূজো সেরে খেয়েদেয়ে দশটায় রওনা হতে হবে। আপনাদের পাল্লায় আর পড়ছি না। মোগলসরাই থেকে জনতা ধরতে হবে আমাকে। আজকাল বারোটায় ছাড়ে।'

'জনতায় যাবেন—তুনে নয় ?'

'না। কাল সকাল আটটায় আপিস। জনতা যদি ঠিক সময় যায় তো আপিস হবে, নইলে লেট্‌। কাল না গেলেই চলবে না। তুনে গিয়ে আপিস করা তো অসম্ভব প্রায়, ঠিক সময়ে গেলেও হয়ে উঠবে না।···আপনারা যদি ও সময়ের মধ্যে না ফিরতে পারেন তো—আমি বরং মাল দুটো নিয়েই চলে যাই, গঙ্গায় ঘাট-পাণ্ডার কাছে রাখা যাবে না ? কিংবা যদি একটু বলে দেন, নিচের দারোয়ানরা রাখতে রাজী হবে না—?'

'আপনি কটায় ফিরবেন ?'

'সাড়ে নটা ধরুন, পূজো সেরে একেবারে খেয়ে আসব, তখনই বেরিয়ে পড়তে হবে।'

'আপনি যান—আমরা আছি। তাড়াতাড়ি যান—আর দেরি করবেন না। কালকের মতো না হয়।'

বিজয় চলে গেলে মিহির বসে পড়ে বলে, 'আর এক কাপ চা করো দিকি! চা-টা তখন জুৎ করে খাওয়া হ'ল না।'

মুখ টিপে হেসে সন্ধ্যা বলে, 'এখন আর তত অসহ্য লাগছে না বসে থাকাটা তাহলে—?'

তারপর স্টোভ জ্বালতে জ্বালতে আবারও বলে, 'বাছাধনকে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়ানো গেল—কী বলো?'

'হুঁ! বলে মুখ গোঁজ করে শুয়ে পড়ে মিহির, 'ভাগ্যিস জনতাটা এগিয়ে দিয়েছে আজকাল!'

শেষ বিস্ময়

প্রশান্তর কাছ থেকে সহজ বা স্বাভাবিক আচরণ কেউই আশা করে না এটা ঠিক, তবু এবার যেন মাত্রাটা একটু ছাড়িয়েই গেল। কবির ভাষায় যাকে বলে 'বিস্ময়েরে বিস্মিত করিয়া'—প্রশান্ত এবার সেই ভাবেই বিয়েটা ক'রে ফেলল।

বাপ-মা মারা গেছেন শৈশবেই কিন্তু তার জন্যে লেখাপড়া করাটা আটকাত না, কারণ নিঃসন্তান কাকা-কাকী যত্ন ক'রেই মানুষ করতে চেয়েছিলেন ওকে।

প্রথম বাড়ি থেকে পালায় প্রশান্ত দশ বছর বয়সে, মাসখানেক পরে ঘুরে এসে আবারও বইখাতা নিয়ে পড়তে বসে। কিন্তু বারো বছরে পালিয়ে বছর খানেক পরে যখন ফিরে এল তখন আর কিছুতেই ও-কাজে তাকে রাজী করা গেল না। সে বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতেই হাত-পা নেড়ে বললে, 'আবার? মাপ করো কাকী, সরস্বতীর সঙ্গে এইখানেই আমার সম্পর্ক শেষ।'

নাটকীয় হতেই পারে ভাবভঙ্গী। কারণ এবার বাড়ি থেকে পালিয়ে ও গিয়েছিল বোম্বাই—বিনা টিকিটে। সেখানে এক রেস্তোরাঁতে কাপ-ডিস ধোয়া চাকরি পেয়ে মাস-তিনেক টিকে ছিল। তারপর বোম্বাই যখন পুরনো হয়ে গেল, তখন এক ভ্রাম্যমাণ পার্শী থিয়েটারের দলে ঢুকে প'ড়ে বাকী আট-ন মাসে ভারতের প্রায় দশ-বারোটি বড় বড় শহর ঘুরে বেড়িয়েছে।

সেখানে কাজ করতে হ'ত অনেক, শহরের দেওয়ালে যারা পোস্টার মারে তাদের 'লেই'-এর বালতি এবং কাগজের গোছা বওয়া, সকালে-বিকেলে চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডবিল বিলোনো, ফিরে এসে চা তৈরী করা, দরকার হ'লে রান্না করা—এবং মধ্যে মধ্যে ছোটখাটো ভূমিকায় রঙ্গাবতরণ—এগুলো হ'ল মোটামুটি কর্তব্যের মধ্যে। এ ছাড়াও কিছু কিছু ছিল বৈ কি, অপ্রকাশ্য।

কাকী প্রশ্ন করতেন, 'ফিরে এলি যে বড় ?'

'কোম্পানীই যে অক্কা হয়ে গেল। অবিশ্যি আমাকে একজন দিল্লীতে চাকরি দিতে চেয়েছিল কিন্তু বামুনের ছেলে, ভদ্দরলোকের ছেলে হয়ে চাকরের কাজ করব ? ছো···ওটা যা করেছিলুম দেশ বেড়াবার জন্যে। তা দেখেছি খুব, জানো কাকী, দিল্লীতে বরফের মধ্যে গর্ত ক'রে আঙুরের থোলো রেখে ছায়, আর ঠেলাগাড়ি ক'রে সেই আঙুর বেচে—ছে-ছে আনা পাও। মানে দেড় টাকা সের। কী মজা!···আবার রাজকোটে'—ইত্যাদি।

বছর পনেরো-ষোল যখন বয়স তখন কাকা একদিন বললেন, 'কিছুই তো শিখলি নে, তা বরং আমার ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডারীটা শিখে নে। যেমন তেমন ক'রে মাসে পঞ্চাশ-ষাট টাকা রোজগার করতে পারবি।'

চট ক'রে জবাব দেয় প্রশান্ত, 'তা আর জানি না! ভাল ডাক্তারখানায় ঢুকতে পারলে মাসে তিন-চারশ টাকাও হতে পারে। এ আমি অনেকের কাছেই শুনেছি। দামী ইঞ্জেকশন রোজ দু-একটা সরাতে পারলেই তো লাল!'

কাকা দমে গেলেন। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তা সে হাতটা আর আমাকে দিয়ে পাকিও না বাবা! তাহ'লে বরং এটা থাক।'

'ক্ষেপেছ মেজকাকা, তোমার এই পাড়াগাঁয়ের একরত্তি ডাক্তারখানা, কী আছে যে ঝাড়ব ? না—আমি সে আখেরের কথা বলছিলুম।'

মাস তিনেক কাজ শেখার পর একদিন মেজকাকাকে এসে বললে, 'কাকা, এবার আমার মাইনেটা তাহ'লে যা হোক একটা ঠিক ক'রে দাও।'

কাকা তো অবাক্!

'মাইনে ?'

'ওমা—মাইনে দিতে হবে না ? প্রথম দু'মাস না হয় আনাড়ি ছিলুম,

এখন তো দস্তুরমত খাটছি। না হয় বুড়ো শিববাবুকে তাড়াও, সব কাজ আমি করতে রাজী আছি। মাইনে না পেলে আমার চলবে কিসে? বড় হয়েছি, হাতখরচা তো আছে? নেশা-ভাঙ করতে শিখব ক্রমশ, খরচ আছে বৈ কি!'

'আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে। নিস আসছে মাসে দশটা টাকা।'

প্রশান্ত তখন আর কিছু বলল না। এর মাস-খানেক পরে যখন পালাল তখন দেখা গেল যে, এই এক মাসেই ও স্থানীয় ডাকঘরে একশো সাত টাকা জমিয়েছিল, তার মধ্যে একশো টাকা নিয়ে হাওয়া হয়েছে। টাকাটা কিসে এল তাও জানতে বেশি দেরি লাগল না—মাথাধরার ওষুধ আর পেটখারাপের সাল্‌ফা ওষুধ একেবারে হাজার দরে কেনা থাকত—তার বোতল খালি হয়ে গেছে।

এর জন্য যদি কেউ ভেবে থাকেন যে, প্রশান্ত অপ্রতিভ হবে তাহ'লে সেটা তাঁরই নির্বুদ্ধিতা। মাস-দেড়েক পরে বেশ হাসিমুখেই বাড়ি ঢুকল প্রশান্ত, তেমনি দাপট তেমনি হাঁকডাক। কিন্তু ক'দিন পরেই একটু গম্ভীর হতে হ'ল, কারণ দেখা গেল অনাথ ভাইপোকে বাড়ি ঢোকা বন্ধ করতে না পারলেও ডাক্তারবাবু তাঁর ডিস্‌পেনসারীতে আর ঢুকতে দিতে রাজী নন। সেদিকে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

প্রশান্ত বেগতিক দেখে কাকীকে গিয়ে একদিন বললে, 'বা রে, তাহ'লে আমার চলবে কিসে? এর মধ্যে আবার সিগারেট ধরেছি, সিনেমা-ফিনেমা আছে—'

'ডাক্তারখানাটা বাদ দাও না বাবা। পৈতৃক জমিজমাগুলো পাঁচ ভূতে লুটে-পুটে খাচ্ছে, সেগুলো দেখাশুনো করলে তো তবু দুপয়সা আসে।'

'হ্যাঁ—আমি এই হেঁটোর ওপর কাপড় তুলে মাঠে-মাঠে আলে-আলে ঘুরে বেড়াই। আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই তো!···না, ওসব আমি পারব না। বরং কাকাকে একটা চাকরি-বাকরি দেখে দিতে বলো—'

'কী চাকরি করবি তুই? কী শিখেছিস যে কাজ করবি?'

'আর কিছু না হোক কারখানায় তো লোহা পিটতেও পারব? হাতের গুল্লিটা দেখছ?'

এই ব'লে সে নিজের বলিষ্ঠ দেহের মাংসপেশীগুলো একবার প্রসারিত করে। এদিক দিয়ে সত্যিই সে ভাগ্যবান—কোন রকম চেষ্টা-যত্ন না ক'রেই ওর দেহটা যা গড়ে উঠেছে তা দেখবার মতো।

কাকা ওর প্রস্তাব শুনে বললেন, 'আচ্ছা, ওকে আমি মাসে দশটা ক'রে টাকা হাতখরচ দেব এখন—ওকে বলো দয়া ক'রে আর কিছু করতে হবে না। বাজার-হাটগুলো ক'রে দিলেই ঢের। আমি একা মানুষ, পেরে উঠছি না—'

প্রশান্ত বললে, 'তা মন্দ নয়—হাট-বাজার দোকানদানী থেকেও কোন্ না রোজ গেলে চার গণ্ডা পয়সা আসবে। তাই হোক—'

কাকী অবাক্ হয়ে গালে হাত দিয়ে বলেন, 'অবাক্ করলি যে তুই, বাড়ির বাজার থেকে পয়সা চুরি করবি?'

'কেন করব না? অপরকে দিলে সে করত না? পর না পেয়ে ঘরের লোক পেলে বুঝি বুক টাটায়?'

কাকা শুনে বললেন, 'যাক গে। ওতেই যদি খুশি থাকে তো থাক্।'

প্রশান্তও বললে, 'পাড়ায় থিয়েটার ক্লাবটা তো প্রায় উঠে যেতেই বসেছে, দেখি যদি বাঁচিয়ে তুলতে পারি।'

বছর দুই-তিন এইভাবেই কাটল। তারপর হঠাৎ একদিন সে বললে, 'না, কাকা, এবার আর তো চাকরি-বাকরি না করলে চলছে না! একটা তো খুঁজে নিতে হয় কিছু।'

'কেন রে, কি হ'ল?'

'বড় হয়েছি। বেকার থাকলে কি চলে? আখেরের চিন্তা নেই?'

বার-কতক বললে কাকাকে। কাকা সেই একই উত্তর দেন, 'আমি পাড়াগাঁয়ে ব'সে কী দেখি বল্ দিকি তোর জন্যে?'

'তবে কিছু টাকা দিন—শহরে গিয়ে চেষ্টা করি।'

'হ্যাঁ, তোমার হাতে টাকা দেবো। বলে—একমাত্র পোকে ডাইনের হাতে সমর্পণ। দুদিনে ফুর্তি ক'রে সব উড়িয়ে দিয়ে দাঁত বার ক'রে এসে দাঁড়াবে। তোমাকে আমি চিনি না!'

প্রশান্ত উত্তর দিলে না। সে কথার লোক নয়—কাজের লোক। দিন-

দশেক পরে কাকার পকেট থেকে প্রায় সত্তরটা টাকা নিয়ে পুনশ্চ উধাও হ'ল।

মাস-খানেক পরে হাজারীবাগ থেকে এক চিঠি এল—'আপনাদের আশীর্বাদে এখানে এক কারখানায় কাজ পাইয়াছি—দেড় টাকা রোজ, রবিবার বাদ। তা মন্দ কি এ বাজারে?'

বছর-খানেক কাজ করল সেখানেই। কাকাকে কিছু টাকাও পাঠিয়েছিল মধ্যে—কাকীকে লোক মারফত তুখানা ছাপা শাড়ি। তারপরই হঠাৎ একদিন আবার এসে হাজির, 'চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলাম মেজকাকা, ও আর পোষাল না।'

'কেন রে, কী হয়েছিল?'

'যা হয়। অসৎসঙ্গ তো—এধারে কাজ দেখে বাবুরা খুশি হয়ে ন'সিকে রোজ ক'রে দিলেন—কাঁচা পয়সা হাতে পড়তে লাগল। শনিবারে শনিবারে বেশ মদ আর জুয়োর চকড়বা বসতে শুরু হ'ল! বেগতিক দেখে পালিয়ে এলুম। শেষকালে কি মদের নেশা ধ'রে যাবে? তাহ'লেই তো সর্বনাশ! তা ছাড়া ব্যাপারগতিক যা দাঁড়িয়েছিল—মেয়েমানুষও হয়ত জুটত এসে। না—না—ও কোন কাজের কথা নয়। নইলে চাকরি তো ভালই ছিল—যুদ্ধের বাজার, চড়-চড় ক'রে উন্নতি হ'ত এখন!'

কাকা কথা কইলেন না—কথা কওয়া ছেড়েই দিয়েছেন বহুকাল।

কিন্তু ভাইপোর অবাক করে দেওয়ার ক্ষমতা তখনও শেষ হয় নি। দিন-কতক পরে তিনি আবারও বিস্মিত হলেন যখন উপযুক্ত ভাইপো এসে বললে, 'কাকা, জমিজমাগুলো এবার আমাকে আলাদা ক'রে দিলে হ'ত না?'

'সে কি?'

'কেন, এতে অবাক্ হবার কি আছে? পৈতৃক জমি, আমার হিস্‌সে তো একটা আছেই।'

'তা তো আছে। কিন্তু আমরা মলে সবই তো তোমার বাবা!'

'সে এখন ঢের দেরি। মানুষের পরমায়ু কিছু কি বলা যায়? তা ছাড়া তুমি গেলেও কাকী থাকবে। সে কাকে কি দিয়ে যায়—আর অতদিন আমার চলবে কিসে?'

কৌতূহলী কাকী প্রশ্ন করে, 'জমিজমা নিয়েই বা করবি কি, চাষ তো করতে চাস না।'

'রামচন্দ্র। চাষ করব কে বললে। ভাগ হয়ে গেলেই জমি বেচে দেব। আমাকে তো যা হোক একটা কিছু করতে হবে। কাকা তো মূলধন দেবে না, ব্যবসা-পত্তর করি কি দিয়ে?'

'তা ব'লে জমিজায়গাগুলো সব খোয়াবি? এরপর যে ভিক্ষে ক'রে খেতে হবে।'

'শুভ কাজের গোড়াতেই অমন ক'রে টুকো না কাকী—ভাল হবে না বলছি। খোয়াব কেন? যুদ্ধের বাজার, ব্যবসাতে যে যা করছে—সোনা ফলে যাচ্ছে।···আমি মনে করছি ছোটখাট একটা কারখানা খুলে লোহার লণ্ঠন তৈরী করব। এ কাজ আমি নিজে করেছি ওখানে, হাড়হদ্দ সব জানি।'

কাকা পাড়ার মাতব্বরদের ডেকে জমি ভাগ করালেন। তারপর বললেন, 'তা বেচতে হয় তো আমাকেই বেচে দে। পরকে দিবি কেন?'

'জরুর। আমার তাতে আপত্তি নেই। তবে সালিশরাই দাম ঠিক ক'রে দিক। ঢের খেয়েছি তোমার—তুমি যদি দুপয়সা কমও দাও তো আপত্তি নেই।'

একটি বৃদ্ধ টিপ্পনি কাটলেন, 'ছোকরার ধম্মজ্ঞান কিন্তু খাসা!'

যুদ্ধের বাজার তখন, জমির দাম চড়েছে। প্রবীণরা হিসেব ক'রে বললেন, 'বাড়ি আর জমি মিলিয়ে আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত পেতে পারে ও!'

আড়াই হাজার!

প্রশান্তর চোখ জ্বলে উঠল। সে যে ঢের টাকা!

'ব্যবসা এখন থাক।' প্রশান্ত তার বন্ধু জগন্নাথকে বললে, 'আপাতত কিছুদিন বোম্বে ঘুরে আসি।'

'বোম্বে? হঠাৎ?'

'দ্যাখ, সেবার যখন বাড়ি থেকে পালিয়ে বোম্বে গিয়েছিলুম তখন তাজমহল হোটেলের দিকে তাকিয়ে থাকতুম আর নিশ্বেস পড়ত। শুনেছি

অমন হোটেল আর কোথাও নেই এদেশে—রাজা-মহারাজারা এসে ওখানে থাকে। তখন থেকেই শখ একবার ওখানে গিয়ে উঠব। মানে হাজার খানেক টাকা বাজে খরচ করব আর কি। শুনেছি কুড়ি-পঁচিশ টাকা রোজ নেয় ওখানে—'

'কুড়ি-পঁচিশ?' জগবন্ধুর চোখ কপালে ওঠে।

'সেটা কি খুব বেশি হ'ল?' তাচ্ছিল্যের সুর প্রশান্তর কণ্ঠে, 'তোরা তো এ গ্রাম ছেড়ে নড়লি না কোথাও, দুনিয়ার হাল-চাল কি বুঝবি?…হ্যাঁ—ঐ যা বলছিলুম, পঁচিশ টাকা রোজ হ'লেও কুড়ি দিনে পাঁচশো টাকা মোটে—তা ছাড়া যাওয়া-আসা গাড়িভাড়া আছে, নিদেন যাবার সময়টা তো সেকেণ্ড ক্লাসে যেতে হবে, আসবার সময় না হয় ইণ্টারেই হ'ল, থার্ড ক্লাসেও আপত্তি নেই!…তারপর ভাল কাপড়-জামা কিছু করাতে হবে, দু-একটা স্যুট, নইলে ওখানে মানাবে না। ভাগ্যিস গরম কাল, নইলে শীতের পোশাক করাতে গেলেই তো ফতুর।…তাছাড়া মোটামুটি বকশিশ—ট্যাক্সিভাড়া, পাঁচশো টাকায় কুলোলে হয়! অবিশ্যি হাজারের বেশি আমি খরচ করব না—না হয় দু-একদিন কমই থাকব। তবে কি জানিস, বড় বড় লোক তো ওখানে থাকে, তেমন-তেমন কারুর নজরে পড়ে গেলে তো আখের গুছিয়েই নিলুম, বুঝলি না? মুখটা যে আমার তত সাকারা নয়—নইলে ফিল্ম লাইনে ওখানে বিস্তর পয়সা। চেহারা তো এদিকে ভালই, দেখি সেদিকেও ট্রাই নেব একবার!'

প্রশান্ত জগন্নাথকে কলকাতা পর্যন্ত টেনে নিয়ে এল। বললে, 'তুই আমাকে বোম্বে মেলে তুলে দিয়েও সাতটার গাড়ি পাবি। রাত নটায় বাড়ি পৌঁছবি, ভয় কি অত?' রঙীন সিল্কের লুঙ্গির ওপর আদ্দির পাঞ্জাবি প'রে পাইপ ধরিয়ে সেকেণ্ড ক্লাসে পাতা বিছানাটার ওপর যখন প্রশান্ত জাঁকিয়ে বসল তখন জগন্নাথকেও মনে মনে মানতেই হ'ল যে, বাবুয়ানি করতে জানে বটে শান্ত, দিব্যি মানিয়েছে!

বোম্বেতে কুড়িদিন শুধু নয়—এদিকে-ওদিকে আরও মাস খানেক কাটিয়ে প্রশান্ত যখন কলকাতাতে ফিরল তখন তার আড়াই হাজারের আর বিশেষ

কিছু নেই। তবে সুবিধের মধ্যে কলকাতাতে পা দিয়েই শুনলে দিনতিনেক হ'ল মেজকাকা মারা গেছেন। তখনই গঙ্গায় গিয়ে চান ক'রে কাছা গলায় দিয়ে বাড়ি ফিরল। বাড়িতে পা দিয়েই বললে, 'নাগপুরে যে মেজকাকা স্বপ্ন দিলেন—বললেন, তোকেই ছেলের মতো মানুষ করেছি, কাছে তো রইলি না, এখন গিয়ে শ্রাদ্ধটা অন্তত কর্।'

সকলেই বিশ্বাস করল কথাটা। সত্যিই তো, নইলে নাগপুরে ব'সে খবর পাবেই বা কি ক'রে? আর ছেলের মতো মানুষ করার কথাটাও ঠিক। স্ত্রী মুখাগ্নি দিয়েছিলেন, তাঁর হাত থেকে নুড়ো নিয়ে প্রশান্ত শ্রাদ্ধ করল। কান্নাকাটিও করল প্রচুর।

তারপর পনেরো দিন কোন পক্ষেই কোন কথা উঠল না। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশান্ত বাড়িতে আছে আর খাচ্ছে। এরই মধ্যে সহসা একদিন এসে বললে, 'না, মেজকাকার স্বভাবটা আর বদলালো না দেখছি!'

সবাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

সকলের মুখের ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'তা নইলে আমার কাছ থেকে একটা বিড়ি চেয়ে নিয়ে খেলেন!'

'সে কি রে?' অন্নদা পিসী সভয়ে ন'খুড়ীর কোল ঘেঁষে বসেন।

'আর কি, ঐ গাঙ্গুলী-বাগানটার মধ্যে দিয়ে এখন আসছি, দেখি সামনে মেজকাকা, পুকুরের বাঁধানো চাতাল থেকে উঠে এসে বললেন, শান্তু, বিড়ি আছে রে একটা, দেখি—!'

সকলের মুখে-চোখেই একটা অবিশ্বাস ফুটে উঠল, প্রশান্ত হঠাৎ উবু হয়ে ব'সে প'ড়ে কাকীকে ছোঁবার মতো ভঙ্গী ক'রে বললে, 'মাইরি কাকী, এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি। মরা মানুষকে নিয়ে মিছে কথা বলব!'

কাকী জানতেন যে ইদানীং ডাক্তারবাবু চাঁদনী রাত হ'লে যাওয়া-আসার পথে সাইকেল থেকে নেমে নির্জন গাঙ্গুলী-বাগানের ঐ বাঁধানো চত্বরে ব'সে থাকতেন খানিকটা ক'রে। কিন্তু সেটা তো প্রশান্তর জানবার কথা নয়! তাঁর মুখ শুকিয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'দানে তোরা সব জিনিসই দিলি বাবা, গোটা কতক বিড়ি যদি দিতিস। কাল বরং কোন বামুনকে ডেকে—'

এর দিন কতক পরেই পাড়ার দীনু চাটুয্যের বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ করতে

এল। মেয়ের বিয়ে। প্রশান্ত জিভ কেটে বললে, 'আমার যে কালাশৌচ এক বছর। নাই বা হ'ল নিজের বাপ, মানুষ তো করেছে। তা ছাড়া যখন শ্রাদ্ধ করেছি আমিই। তবে যাবো এ কথা ঠিক। কিন্তু খেতে বলবেন না কিছু।'

প্রশান্ত যখন পৌঁছল তখন এক পংক্তি লোক খেতে বসেছে বাইরের বড় দালানটায়। হাসিহাসি মুখে সে পেছন দিকে এসে কতকটা তদ্বির করার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েই হঠাৎ যেন আর্তনাদ ক'রে উঠল, 'মেজকাকা!'

সকলে চমকে উঠল একেবারে।

'কী কী শান্ত, ব্যাপার কি?'

'আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না? ঐ যে অমর কাকার ঠিক পিছনে বসে।...ঐ যে উঠে চ'লে যাচ্ছেন।'

'কে যাচ্ছেন শান্ত, কার কথা বলছ?'

'আবার কে, মেজকাকা! খেতে-দেতে বড্ড ভালবাসতেন তো!'

যে বিশ্বাস করে না তারও মুখ শুকিয়ে উঠল, কারণ অমরবাবু ডাক্তারের সব চেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিলেন, আর ভোজনপ্রিয়তার কথাটাও ঠিক!

সবাই উপদেশ দিলেন, 'গয়া করাও।'

এর দিন-কতক পরেই আর এক সন্ধ্যাবেলা বেড়িয়ে ফিরে প্রশান্ত হঠাৎ কাকীকে ডেকে প্রশ্ন করলে, 'মেজকাকী, তুমি নাকি ডাক্তারখানাটা চালাবার মতলবে আছ?'

চমকে উঠলেন মেজকাকী, 'কে বললে রে তোকে?'

কাউকেই তো বলেননি তিনি—শুধু ভাবছেন কথাটা ক'দিন থেকেই।

'আবার কে বলবে, মালিক স্বয়ং। আজ আবার সেই গাঙ্গুলী-বাগানের পথে দেখা। বললেন, তোর মেজকাকী মতলব করছে যে তোকে দিয়ে ডাক্তারখানাটা চালাবে, কোন নতুন ডাক্তার বসিয়ে। সে সব দুর্বুদ্ধি না করে। তোকে তো চিনি, তুই যথাসর্বস্ব দুদিনে উড়িয়ে দিবি—নয়ত কোথাও সরে পড়বি। তার চেয়ে যা পায় বিক্রী ক'রে দিয়ে টাকাটা ব্যাঙ্কে পুরে ফেলতে বল্।...তা আমি বললুম তুমি নিজে বললেই হ'ত—তার জবাবে বললে, আমি এখন সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তোর মেজকাকী ভয় পেয়ে যাবে—চেঁচা-

মেচি কান্নাকাটি করবে, হয়ত একটা ব্যামো দাঁড়িয়ে যাবে ভারী রকম! তুই-ই বলগে যা—তাতেই হবে।'

কথাটা মেজকাকীর বিশ্বাস হ'ল। প্রথমত, এ মতলবের কথা সত্যিই কাউকে তিনি বলেন নি, তা ছাড়া প্রশান্ত কিছু আর নিজের গুণ নিজে অমন ক'রে ঢাক পিটুতে পারে না, তার সম্বন্ধে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ওর মেজকাকা সেটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি—কিন্তু সেটাও তাঁরই কথা নিশ্চয়!

মেজকাকী যেন খুব একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেলেন এই ভাবে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সাগ্রহে বললেন, 'তবে বাবা, একটা খদ্দের ছাখ।'

খদ্দের দেখা হ'ল। প্রশান্তর মারফতই দেখাশুনা দরদস্তুর চলল—অবশেষে এক নতুন-পাস-করা ডাক্তার তেরশ' টাকা মূল্যে সমস্ত ডিস্‌পেনসারী মায় সাজপাট সমেত কিনে নিলেন। সেই টাকাটা যেদিন পাবার কথা প্রশান্ত কাকীকে বলেছিল, তার আগের দিনই সেটা বুঝে নিয়ে বোধ করি পঞ্চমবারের মতো আবার ডুব মারলে।

এর পর বছরদুই কোন খবর ছিল না আর। তারপর একেবারে এই বিয়ে।

একটি চিঠি এল মেজকাকীর নামে, 'আমি যে অপরাধ করিয়াছি, তাহার ক্ষমা নাই। তবে এই একটা কথা—টাকাটা অপব্যয় করি নাই, ব্যবসায় করিয়া একরকম দাঁড়াইয়াছি। আরও উন্নতি হইত, যুদ্ধটা ফস্ করিয়া থামিয়া গেল. তাই। সে যাহা হউক শ্রীচরণে এক্ষণে নিবেদন এই যে আমি আর একটি দুষ্কার্য করিয়াছি। আমি বিবাহ করিয়া বসিয়াছি। মেয়েটি বৈদ্যের, খুব সুশ্রী এবং গুণবতী। যদি অভয় দেন তো বধূকে সঙ্গে করিয়া প্রণাম করিতে যাই।'

যাই করুক না কেন ও—ছেলের মতো মানুষ করেছিলেন এটা ঠিক। অজাত বিয়ে করেছে, তা অমন তো আজকাল হামেশাই হচ্ছে। তা ছাড়া বৈদ্য এমন কিছু খারাপ না—মেজকাকী চিঠি লিখলেন, 'তুমি যখন বিবাহ করিয়াছ তখন তিনি আমার পুত্রবধূ। অবশ্য লইয়া আসিও।'

দিন-তিনেক পরেই প্রশান্ত বৌ নিয়ে এসে হাজির হ'ল। বেশ সুশ্রী মেয়েটি, কিছু কিছু লেখাপড়াও জানে ব'লে মনে হ'ল। দু-চারখানা গহনাও

ওর বাবা দিয়েছেন। নিভৃতে এক সময় বৌকে কাছে বসিয়ে মেজকাকী সস্নেহে পিঠে হাত বুলোতো বুলোতে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার বাবা তো এখনও আছেন শুনছি। তা তিনি যে বিয়ে দিলেন ও কি রোজগারপাতি করে, কোথায় কি আছে-টাছে, কিছু খোঁজ করেছিলেন ?'

'উনি বাবাকে বলেছিলেন যে পাতিপুকুরের কাছে কোথায় ওঁর একটা লোহার কারখানা আছে। হঠাৎ পথে আলাপ। কথাবার্তায় ওঁকে ভারী পছন্দ হয় বাবার—একেবারে বাড়িতে ডেকে আনলেন। তারপর কী চোখে যে দেখলেন বাবা, কোন খোঁজ-খবরই করেন নি। বিয়ে, বৌভাত, ফুলশয্যা পর্যন্ত তো আমাদের বাড়িতে থেকেই হ'ল—উনি বললেন, অজাতে বিয়ে করেছি; আত্মীয়-স্বজন তো কেউ আসবে না। আমি কারখানারই একদিকে থাকি, সেখানে বৌ নিয়ে গিয়ে তুলব কোথায় ?'

'সে কারখানা তারপর কেউ দেখেছে ?'

আরও মাথা নিচু ক'রে বৌ উত্তর দিলে, 'বিয়ের পর তো একদিনও কোথাও যান নি। কেউ আসেও নি ওঁর কাছে। তাইতেই সন্দেহ হয় যে—। দাদা একদিন ঠিকানাটা চেয়েছিলেন তাও পান নি। বাবা খুব কান্নাকাটি করছেন ক'দিন, দাদা রাগারাগি করছেন—তাই তো এখানে চলে এলেন।'

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মেজকাকী বললেন, 'আমিও তাই ভেবেছি মা, নইলে এখানে আর ও আসত না।'

পরের দিন প্রশান্ত হঠাৎ প্রস্তাব ক'রে বসল, 'এখানে তো তাহ'লে একটা ভোজটোজ দিতে হয়—এতদিন পরে যখন বিয়ে করলুমই। ছেলেরাও ধরেছে খুব।'

কাকী একটু কঠোর কণ্ঠেই বললেন, 'টাকাটা কোথা থেকে আসবে শুনি ?...তোর লজ্জা করে না ওসব কথা মুখে আনতে ? চিরকাল ধাপ্পা আর জুচ্চুরির ওপর চললি—তা সে আমাদের সঙ্গে যা করেছিস করেছিস, আবার একটা ভদ্দরলোকের মেয়েকে এর সঙ্গে জড়িয়ে সর্বনাশ করলি কেন তার ?'

'বা রে। তুমি কি ভাবছ আমার সব ধাপ্পা। আমার ব্যবসাপত্তর কিছু নেই ?'

'হ্যাঁ বাবা, তাই ভাবছি। এই পষ্ট ক'রেই ব'লে দিলুম।'

খানিকটা গুম্ খেয়ে থেকে 'হুঁ' ব'লে সেখান থেকে চ'লে গেল শান্ত।

এর দিন-দুই পরে ভোরবেলা উঠে রেবার দিকে চেয়ে মেজকাকী অবাক্ হয়ে গেলেন। গায়ে গহনা বলতে শুধু দু'গাছি বালা আর তিনি যে সোনা-বাঁধানো লোহা দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন তাই—আর কোথাও কিছু নেই।

'বৌমা, তোমার গয়না সব কি হ'ল? চুড়ি, হার, আর্মলেট?'

রেবার মুখ নিমেষে বিবর্ণ হয়ে উঠল, 'সে কি, আপনার কাছে দেন নি সব? তবে যে কাল বললেন, চারদিকে চোরের ভয় ব'লে আপনিই বলেছেন খুলে দিতে—সিন্দুকে তুলে রাখবেন! তখন তো রাত নটা, হাতে ক'রে আপনার ঘরের দিকেই তো গেলেন—আবার তো তখনই ফিরলেন—'

'দ্যাখো দ্যাখো, গেল কোথায়! ঘরে আছে?'

'না তো। আজ খুব ভোরেই উঠেছেন।'

কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না প্রশান্তকে। তখনই স্টেশনে লোক পাঠানো হ'ল, গুট্‌কে সাইকেল ক'রে বড় জংশনে গেল—কোথাও না। যেন এই এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সে উবে গেল পৃথিবী থেকে।

মেজকাকী হায় হায় করলেন খানিকটা। গালাগালি অভিসম্পাত অনেক কিছু দিলেন উদ্দেশে। কিন্তু রেবা স্থির হয়ে বসে রইল। সন্ধ্যার দিকে কাকীর পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'আপনি ভাববেন না মা, আমাকে অত সহজে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবে—এমন মেয়ে আমি নই। তার খোঁজ আমি বার করবই।'

রেবা সাত-আটখানা চিঠি লিখলে। বাক্স খুলে যৌতুকের কটা টাকা বার ক'রে গুট্‌কে আর জগন্নাথর হাতে দিয়ে কতকগুলো জায়গায় খোঁজ-খবর নিতে ব'লে দিলে। অসতর্ক মুহূর্তে কতকগুলি লোকের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা ব'লে ফেলেছিল প্রশান্ত—রেবা তা ভোলে নি।

মাস-খানেক ওয়াল্‌টেয়ারে একটা নামী বিলিতী হোটেলে কাটিয়ে প্রশান্ত সোদপুরে এক বন্ধুর বাসায় এসে উঠল প্রায় এক বস্ত্রে।

'যা হয় একটা কাজকর্ম জুটিয়ে দাও ভাই নির্মল, নইলে তোমারই ঘাড়

ভেঙে খাবো।’

‘তুমি কি পারবে কারখানায় কাজ করতে?’ সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করল নির্মল।

‘খুব পারব। এর আগে তো করেছি দেখেছ, নইলে তোমার সঙ্গে আলাপটা হ’ল কিসে?’

‘তুমি না বিয়ে করেছ?’

‘হ্যাঁ—শখ ছিল, দিন-কতক মিটিয়ে নেওয়া গেল আর কি!’

‘দিন কতক মিটিয়ে নেওয়া গেল!…তারপর? সে বৌ কোথায়?’

‘কাকীর ঘাড়ে ফেলে রেখে এসেছি। তারও তো ছেলেপুলে নেই। হাতে দু’পয়সা আছে। না, তাড়িয়ে দেবে না সে।’

নির্মল কাজ যোগাড় ক’রে দিলে একটা ওরই কারখানায়—সবসুদ্ধ মাসে পঁয়ষট্টি টাকা পাবে। একটা ঘরও খুঁজে দিলে কাছাকাছি।

একদিন শনিবার ওভারটাইম ক’রে সন্ধ্যের আগে বাসায় ফিরে প্রশান্ত রান্নার যোগাড় করছে, একটা সাইকেল-রিক্সা এসে থামল ওর দোরগোড়ায়। নিশ্চয়ই ঠিকানা ভুল ক’রে এসেছে কেউ—তবু কৌতূহলী হয়ে শান্ত উঁকি মেরে দেখলে প্রশান্তমুখে রেবা নামছে রিকশা থেকে। সঙ্গে একটি ছোট পুঁটলি—

‘এ কি, তুমি?’

‘হ্যাঁ। তুমি ওয়াল্‌টেয়ার থেকে ফিরে এখানে কাজ নিয়েছ শুনেছি, শুধু বাসাটা পাও নি ব’লে অপেক্ষা করছিলুম। বাসাও যখন পেয়ে গেলে তখন আর দেরি ক’রে লাভ কি?’

‘তা—তার মানে?’

‘মানে কাকা-কাকীকে যত সহজে ভাঁওতা দেওয়া যায় আর ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায়, স্ত্রীকে তত সহজে ঠিক যায় না। এই মানে, আর কি!’

‘তুমি—তুমি এখানে থাকবে নাকি?’

‘ওমা, তা থাকব না? স্বামীর আশ্রয় ছাড়া স্ত্রীর গতি কি? আমাকে আর তুমি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কোথাও পালাতে পারবে না—এইটে যত শিগ্‌গির বুঝতে পারো ততই ভাল। মন দিয়ে কাজকর্ম করো। আর ওসব

হঠাৎ-নবাবীর মধ্যে যেও না।'

'এখানে এইটুকু একখানা ঘরে থাকবে কোথায়? এসব মতলব দিলে কে?'

'মতলব দেয় প্রয়োজনে। আর তুটি তো প্রাণী। না কুলোবার আছে কি? কী রাঁধছ, সরো আমি দেখছি—'

প্রশান্ত অবাক্ হয়ে তাকিয়েই রইল ওর মুখের দিকে। এতদিন সে অপরকে বিস্মিত ক'রে এসেছে, এবার ওর নিজেরই বিস্মিত হবার পালা।

পুনর্মিলন

খুশীমনেই স্ত্রীকে খবরটা দিতে গিয়েছিলেন তমোনাশবাবু। আর খুশী হবারই তো কথা। এই বাজারে এত কম টাকায় মেয়ের বিয়ে ঠিক করা কি সহজ কৃতিত্ব? মাত্র পাঁচশো এক টাকা নগদ, দশ ভরি সোনা চেয়েছেন তাঁরা —পাত্রপক্ষরা। আর কিছুই দাবি-দাওয়া নেই—যা পারবে সাধ্যমতো।

ছেলেটিও ভালো। একই কারখানায় কাজ করেন তাঁরা, কাজেই কী মাইনে কত ওভার-টাইম তা জানতে বাকী নেই তাঁর। বয়সও এমন কিছু বেশি নয়। পঁচিশ-ছাব্বিশ কি সাতাশ হবে বড়জোর। ছেলের বাবা এখনও কাজ করছেন। তু ভাই—এইটি বড়। ছোটটিও ঢুকে পড়েছে কাজে। সচ্ছল সংসার। স্বভাব-চরিত্রও—যতদূর জানেন, আর নিত্যই তো দেখছেন —বেশ ভালো। পান-সিগারেট ছাড়া কোনো নেশা নেই। তা ও-নেশা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। তমোনাশবাবুর নিজেরও তো প্রত্যহ এক বাণ্ডিল বিড়ি ছাড়া চলে না।

সুতরাং এহেন পাত্র যদি এত সস্তায় যোগাড় করতে পেরে থাকেন তো সেটা তাঁর বাহাতুরি বৈকি!

সেই বাহাতুরি নিতেই হাসি-হাসি মুখ ক'রে বলতে গিয়েছিলেন তিনি, 'খুকুর বিয়ে প্রায় ঠিক ক'রেই এলাম।'

চমকে উঠল তাপসী।

'ঠিক ক'রে এলে? তার মানে? কার সঙ্গে? কোথায়? তারা মেয়ে

দেখল না—বিয়ে ঠিক হ'ল ?'

'ও মেয়ে তাদের দেখা। ছোটবেলা থেকেই দেখছে। আমাদের দুঃখহরণ-বাবু গো, কতবার আমাদের বাড়িতে এসেছে, মনে নেই ? বিল-সেক্‌শ্যনে কাজ করে—? দুঃখহরণ বাঁড়ুয্যে ? তারই ছেলে যতীনের সঙ্গে কথাবার্তা কইছিলাম। হয় কি না-হয় ভেবে এতকাল বলিনি। তা আজই পাকা কথা নিয়ে এলাম ব্যানার্জিদার—লোকটা ভালো। কিছুই চাপ দেয় নি বলতে গেলে। যা চেয়েছে তার কমে আর আজকাল ভিখিরির মেয়েও পার হয় না বোধ হয়।'

আপন মনেই নিজের আনন্দে বকে যান তমোনাশবাবু। স্ত্রীর মুখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন না। দেখতে পান না যে আপাত-শান্ত স্ত্রীর মুখের রেখাগুলি ক্রমশ কী রকম কঠিন হয়ে আসে।

তমোনাশবাবু নিঃশ্বাস নেবার জন্যে একটু থামতেই তাপসী প্রশ্ন করে, 'ছেলে কি পাস ?'

'পাস ?' একটু যেন থতমত খেয়ে যান তমোনাশ।

'পাস-টাসের কথা তো কই—। না, মানে, পাস বোধ হয় তেমন কিছু করে নি। ইস্কুলে পড়েছিল আর কি। তবে কাজ ভালোই করে। এখনই ধরো সবসুদ্ধ—বলি আমার সেক্‌শ্যনেই তো সকলের টিকি বাঁধা—তা সবসুদ্ধ সওয়া শো টাকার মতো পায়। মানে এ মাসেই পেয়েছে একশো তেইশ। ছেলে খাটিয়ে আছে—ফাঁকিবাজ নয়, সে খবরও আমি নিয়েছি ওদের ফোরম্যানের কাছ থেকে। সে বলেছে আর চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই যতীনও অন্তত য়্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান হয়ে যাবে।'

মুখ আশায় আনন্দে কৃতিত্বের গর্বে আবার উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তমোনাশবাবুর।

এইবার তাপসী কথা বলে, বেশ শান্ত অনুত্তপ্ত কণ্ঠেই বলে, 'ও ছেলেকে আমি মেয়ে দেব না।'

'দেবে না ? তার মানে ?' অবাক হয়ে যান তমোনাশবাবু, 'দেবে না মানে কি ? ওরকম ছেলে কি পথে-ঘাটে পড়ে আছে তুমি ভাব—না তুমি দয়া ক'রে মেয়ে দিচ্ছ ! তোমার ক্ষমতা কি ? তোমার চেয়ে ঢের বেশী পয়সা

দিয়ে অনেক ভালো মেয়ে পায়ে ধরে নিয়ে যাবে ওদের ঘরে। তিন বাপ-ব্যাটা মিলে অন্তত পাঁচ ছশো টাকা ঘরে তোলে—তা জান? দুটো কোয়ার্টার—গরু-বাছুর নিয়ে হাত-পা মেলে বাস করে!…তোমার মেয়ের ভাগ্যি ভালো যদি ঐ ঘরে পড়ে। এ ছাড়া দেশেও—মেদিনীপুরের দিকে কোথায় যেন দেশ—জমি-জায়গা আছে শুনেছি। এখানে তো আছেই, নদীর ধারে সাত বিঘে জমি কিনেছে দুঃখহরণবাবু, সম্বচ্ছরের চাল বাঁধা।'

শান্ত সহিষ্ণুভাবে শোনে তাপসী। এই রকমই অভ্যস্ত সে। কিন্তু নরম হয় না। তমোনাশের কথা শেষ হ'তে বলে, 'ভালোই। খুব ভালো ছেলে মানছি—কিন্তু তবু আমি মেয়ে দেব না।'

'দেবে না—কেন?' কতকটা বিহ্বল ভাবেই বলেন তমোনাশ। এখনও যেন কথাটা বুঝতেই পারেন না তিনি।

'আমি বি.এ. পাস ছাড়া কোনো ছেলের হাতে মেয়ে দেব না।'

'কেন, বি.এ. পাস যারা করে না—তারা মানুষ নয়?'

'কেন মানুষ হবে না—অনেক বড় বড় মানুষও আছে বৈকি, যে কিছুই পাস করেনি। কিন্তু আমার মেয়ে আমি দেব না—এর ওপর কথা আছে?'

'কে তোমার জন্যে বি. এ. পাস ছেলে এনে বসিয়ে রেখেছে তাই শুনি? কটা বি. এ. পাস ছেলে আছে এখানে? কে কোথায় খবর নিতে যাচ্ছে, কটা পাত্তর পেয়েছ আজ পর্যন্ত?'

'না পাই না পেলুম। মেয়ে আমার ঘরে থাক্।'

'বি.এ. পাস ছেলের আজকাল কত খাঁই হবে জানো?'

'যা হয় হবে। দিতে পারি মেয়ের বিয়ে দেব—নইলে দেব না। না হয় জমিজমা বেচেও দেব। একটা মেয়ে আমার—আমি যেমন করে হোক বিদ্বান পাত্রে দেব।'

'ওঃ, যেমন ক'রে হোক দেবে! জমিজমা বেচবে? তারপর? খাবে কি? দক্ষিণহস্তের ব্যাপার চলবে কিসে? তোমার পেয়ারের মেয়ের জন্যে কি আমায় পথে বসতে হবে নাকি? একগাদা ছেলে নেই?'

'তারা পুরুষ মানুষ, মোট বয়ে হোক, মজুরি খেটে হোক—খাবে। মেয়ের ভাগ্য চারদিকে বাঁধা। একটা পাসও করাতে পারলাম না যে দরকার

হ'লে নিজের ব্যবস্থা নিজে ক'রে নিতে পারবে। ওর দায়িত্ব বেশি।'

'তুমি দেবে না তার মানে কি? আমি কেউ নই মেয়ের? আমার অধিকার নেই? আমি ভদ্রলোকদের কথা দিয়ে এসেছি তা জানো? আমি দেব ঐ পাত্রে। আলবাৎ দেব।'

তমোনাশবাবু রেগে ওঠেন এবার।

'বেশ, দাও। তার আগে ঐ মেয়েকে খুন ক'রে আমি নিজে পুকুরে ডুবে মরব—তা বলে দিলুম। ঢের সয়েছি, মুখ বুজে সয়েছি; তোমাদের সংসারে এসে পর্যন্তই সইছি, কখনও কোনো কথা বলি নি। কিন্তু এবার আর চুপ করে থাকতে রাজী নই—সাফ্ বলে দিলুম। খেতে পাক না-পাক—লেখাপড়া জানা ছেলের হাতে ছাড়া মেয়ে আমি দেব না, দেব না।'

স্তম্ভিত হয়ে যান তমোনাশবাবু।

তাপসীর এই মূর্তি একেবারে নতুন, অপরিচিত। সত্যিই তাপসী অনেক সয়েছে এ বাড়িতে এসে। কিন্তু কোনোদিনই কিছু বলে নি সে। ধৈর্য আর সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি বলেই সকলে জানে ওকে। সে যে কোনোদিন কিছু বলবে, কোনোদিন তাঁর এতখানি বিরুদ্ধাচরণ করবে—প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবে নিজের অধিকার—এ যেন তমোনাশবাবুর স্বপ্নেরও অগোচর।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন তিনি। অপেক্ষা করলেন তাপসীর মুখের ঐ কঠিন রেখাগুলি কেমল হয়ে আসার জন্য, তার কণ্ঠে অনুতাপের সুর আসার জন্য। তারপর যখন সে-দুটো ঘটনার কোনোটাই ঘটল না, তখন আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি মুখ্খু, আমার হাতে পড়ে তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে—তাই তুমি মেয়েকে আর মুখ্খুর হাতে দিতে চাও না—কেমন? তাহ'লে কি বুঝব এ-ই তোমার মনের কথা? তাহ'লে তুমি এতদিন মনে মনে আমাকে ঘেন্নাই ক'রে এসেছ?'

'তা যা বোঝ। কিন্তু তোমার মনে আঘাত লাগবার ভয়েও আমি আমার প্রতিজ্ঞা থেকে নড়তে রাজী নই।'

তাপসী বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। যায় তার সংসারের প্রাত্যহিক অসংখ্য কাজের মধ্যে। কিন্তু তমোনাশবাবু আর নড়তে পারেন না—বলতেও পারেন না কাউকে কোনো কথা। চুপ ক'রে পাথরের মতো বসে থাকেন শুধু।

ছেলেগুলো ও-ঘরে আলোর সামনে ব'সে পড়া উপলক্ষ্য ক'রে হল্লা জুড়ে দিয়েছে—এখান থেকেই কানে আসছে সেটা। অন্যদিন হ'লে ওদের প্রচণ্ড ধমক দিতেন, গিয়ে হয়তো দু-চার ঘা লাগাতেন সব কটাকে—মন দিয়ে পড়তে শুরু করত ওরা। কিন্তু আজ আর কিছুই করতে পারেন না।

ঝড় তাপসীর মনেও উঠেছে। প্রচণ্ড ঝড়। এমন আলোড়ন বোধহয় বহুদিনের মধ্যে দেখা দেয় নি তার মনে। এমন দুঃসাহস যে তার হবে—এ তারও স্বপ্নের অগোচর। বোধহয় বহুদিনের বহু অতৃপ্ত কামনা, বহু হতাশা বহু ব্যর্থতা কোথায় অসহ্য দুঃখে পীড়িত হচ্ছিল—তারাই আজ বিদ্রোহ করেছে। নইলে এ সাহস তার হবার নয়।

অনেক কাজ পড়ে আছে সত্য কথা—তবু তখনই কোনো কাজে মন দিতে পারল না তাপসী। রান্নাঘরে গিয়ে দেখল ভাতটা হয়ে এসেছে। সেটা নামিয়ে কড়ায় খানিকটা জল জল চাপিয়ে মেয়ে তৃষ্ণাকে ডেকে বলল, 'তুই আন্দাজ করে খানিকটা ডাল চাপিয়ে দে তো, খুকু—আর ফুটে উঠলে হলুদ-নুনটাও দিয়ে দিস। একটু লক্ষ্য রাখবি, সেদ্ধ হ'লে বলিস—আমি এসে সাঁতলাবো এখন।'

তৃষ্ণা অবাক হয়ে বলে, 'কেন, তুমি কোথাও যাচ্ছ এখন ?'

'যাইনি কোথাও। এই বাইরেই বসছি একটু। মাথাটা বড্ড ধরে উঠেছে। অন্ধকারে খানিকটা চুপ ক'রে বসলে কমে যাবে হয়তো—'

সত্যিই অন্ধকারে এসে সে বসে চুপ ক'রে—বারান্দায় পাতা বেঞ্চিটার ওপর। চওড়া বড় বেঞ্চি, এইখানে তার শ্বশুর শুয়ে থাকতেন সন্ধ্যাবেলা—অনেক রাত পর্যন্ত। যতক্ষণ না খাওয়ার ডাক পড়ত।

অন্ধকার। উপন্যাসের ভাষায় যাকে বলে সূচীভেদ্য, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

সামনে পিছনে দু'পাশে—চারিদিকেই অন্ধকার। অনেকটা তাপসীর জীবনের মতোই। অন্ধকার বৈকি। ছেলেরা ? না, ওদের ওপর ভরসা নেই তার একটুও। এই যে সামনে আমগাছ দুটোর মধ্যে দপদপ ক'রে জোনাকি জ্বলছে—এর চেয়ে বেশি আশার আলো বহন করে না ওরা। শুয়ারের পাল, আটটি ছেলে। পেট ভরে খেতে দেবারই ক্ষমতা নেই, তা ভালো করে লেখা-

পড়া শেখাবে। গুণ্ডা তৈরি হবে ওরা এক-একটি তা তাপসী ভালো করেই জানে। সাইকেল-রিকশা টানবে, বিড়ি পাকাবে, নয়তো বড়জোর ঐ কারখানায় গিয়ে লোহা পিটবে।

সামনের দিকে প্রাণপণে চেয়ে থাকে সে। দেখবার চেষ্টা করে।

ওদের বাড়ির সীমানা ছাড়িয়েই মাঠ, নদী—ওপারে আবার মাঠ, বন—দূরে সার সার পাহাড়। অপূর্ব দৃশ্য—যে আসে কলকাতা থেকে সে-ই অবাক হয়ে যায়, প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। তাপসীও প্রথম এসে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, মাকে লিখেছিল, 'তুমি ঐ নীলকণ্ঠ ঘোষ লেনের গলিতে বসে কিছুতে ভাবতে পারবে না এমন দিগন্ত-জোড়া মাঠ, নদী, পাহাড় সত্যি-সত্যিই কোথাও আছে, মানব-বসতির ধারে-কাছে কোথাও। বিশেষ ক'রে হাত বাড়িয়েই ধরা যায়—এত কাছে। সত্যি, মা—এ যদি স্বর্গ না হয় তো—স্বর্গ কী রকম তা জানি না।'

কিন্তু এমনই ওর ভাগ্য—তারপর থেকে এই স্বর্গেই আটকে পড়েছে সে, এখানেই দীর্ঘকাল আছে—তবু সামনের দিকে আর চেয়ে দেখা হয় নি কত কাল, কত বছর। সময় হয় নি তার, মুখ তুলে তাকাবারই সময় হয় নি।

এখন প্রাণপণে দেখবার চেষ্টা করে সে, পাহাড়গুলো ঠিক তেমনই আছে কিনা। কিন্তু কিছুই নজর চলে না—অন্ধকারে সব লেপে মুছে একাকার হয়ে গেছে। আসলে ঐগুলোই বুঝি মায়া, ওর জীবনে এই অন্ধকারটাই সত্য।

আশ্চর্য! কী দেখে যে তার বাবা এখানে বিয়ে দিয়েছিলেন! শুধু এই প্রকাণ্ড বাড়িটা—বাগান-পুকুর-ফটকওলা বাড়ি দেখেই চোখ ধেঁধে গিয়েছিল তাঁর। যে বাড়ি এখন সারাবারও পয়সা নেই ওদের, পাঁচিলগুলো তো ভাঙতে আরম্ভ করেইছে, ঘরগুলোও শুরু হবে এবার; যে বাড়ির অধিকাংশ ঘর এখন পুজোর সময় ভাড়াটেদের ছেড়ে দিতে হয়, তাদের অসংখ্য অত্যাচার এবং অজস্র বাঁকা কথা সহ্য ক'রে কোনোমতে সঙ্কুচিত হয়ে দু-তিনখানা ঘরে আবদ্ধ থাকতে হয় আশ্বিন থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত—এই বাড়ি দেখে গিয়েই নীলকণ্ঠ ঘোষ লেনের সেই সামান্য একফালি বাড়ির অধিবাসী স্থির থাকতে পারেন নি।

অবশ্য শুধু বাড়ি নয়, বাগান-পুকুর, ধানজমি—ছিলও বিস্তর। তার ওপর শ্বশুর এখানে কারবার করতেন। সেই কারবার ক'রেই এতসব করেছেন

তিনি। এক ছেলে তাঁর, এককালে সেও এই কারবারেরই মালিক হবে—পয়সার অন্তত অভাব হবে না কোনো কালে। এসব কথাও ভেবেছিলেন বৈকি তাঁরা। আর সেই ভেবেই তাঁদের লরেটোয়-পড়া রবীন্দ্রসঙ্গীত-শেখা আই. এ. পাস মেয়েকে তমোনাশের হাতে দিতে ইতস্তত করেন নি সেদিন তাপসীর বাবা-মা।

তাপসী তাঁদের খুব দোষ দিতেও পারেন না।

নিজের জীবনের এ অভিজ্ঞতা না হ'লে তাপসীও হয়তো এমন পাত্র লুফেই নিত। এমন কি যতীনের মতো পাত্র পাওয়াও সৌভাগ্য মনে করত।

বাড়িঘর জমিজমা বিস্তর, সচ্ছল সংসার, বিরাট কারবার—তারই ভাবী মালিক ঃ এ ছেলের আবার লেখাপড়ার প্রশ্ন ওঠে কোথায়? তা ছাড়া, ওর বাবা খোঁজ নিয়েছিলেন ভালো ক'রেই—লেখাপড়া বেশি করে নি বটে তমোনাশ, তাই বলে অসচ্চরিত্রও নয়।

অসচ্চরিত্র যে নয় তা তাপসীও স্বীকার করে।

কখনও অন্য কোনো স্ত্রীলোকের দিকে তাকাতে দেখে নি সে—নেশাভাঙও নেই। সেসব কিছু থাকলে তাপসী বাঁচত। এই বারো-তেরোটি সন্তান বহন করবার দুঃসহ দুর্দশা থেকে রেহাই পেত। মরে হেজে গিয়েও নটা। এক এক সময় শুধু ওদের দিকে চাইলেই মাথা খারাপ হয়ে যায় তার।···

কিন্তু—তমোনাশের দিদি কমলা যা বলে—এ কি ওরই ভাগ্য নয়?

এবারেও শ্বশুরের বার্ষিক শ্রাদ্ধের সময় কমলা এসে বলে গেল—'তা নাকে কাঁদলে কি হবে বল্ বৌ, এ তোরই ভাগ্য। তা নইলে বাবার জাজ্বল্যমান সংসার এমন ক'রে ছিতিচ্ছান্ হয়ে যাবে কেন? লোকে কথায় বলে, বৌ আসে তার আয়-পয় নিয়ে—তা তুই এমনই পয় ফলালি যে দেখতে দেখতে সব যেন ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেল। এই বনদেশে বসে কী পয়সাটা বাবা উপায় করেছিল বল্ দিকি! আমার বিয়ের কথা তো ছেড়েই দে—সেরকম ঘটার বিয়ে এদেশে কেউ কখনও দেখে নি—তোর বিয়েতেই তো পাঁচ-ছ'হাজার টাকা খরচ করেছে ঘর থেকে। তাহ'লে কত পয়সা উপায় করত ভেবে দেখ্ একবার। অথচ তখন কী-ই বা ছিল এদেশে, কটা লোক আসত? সেই দোকান আজ দশগুণ বড় হবার কথা—উল্‌টে, মূলেই লোপাট!'

কমলার একটা কথারও জবাব দিতে পারে নি তাপসী।

কারণ তার প্রত্যেকটি কথাই সত্য। নির্ঘাত সত্য।

সব যেন উড়ে গেল—সে এসে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে।

ওর বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই হঠাৎ শ্বশুরমশাইয়ের ব্লাডপ্রেসার বাড়ল, একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়লেন। মাস ছয়েক ভুগে যদি বা একটু বেরোতে শুরু করেছিলেন—বাতে পঙ্গু হয়ে পড়লেন আবার। চৌরঙ্গী বাত। সে বাতও সারল তাঁর—আশ্চর্য, পরবর্তী জীবনে তাঁর না ছিল বাত, না ছিল ব্লাড্‌প্রেসার, শুধু যেন ওদের সর্বস্বান্ত করবার জন্যই রোগদুটি এসেছিল—সুস্থ হয়ে প্রায় দেড় বছর পরে যখন আবার গদীতে গিয়ে বসলেন তখন দেখলেন যে তাঁর অমন সোনা-ফলানো কারবারের আর কিছুই নেই।

তমোনাশ অসচ্চরিত্র নয়, সত্য কথা—কিন্তু অপদার্থ।

মদ খায় নি, মেয়েমানুষ করে নি—এমন কি অন্য নেশাভাঙও করে নি—অথচ পোকাতে-খাওয়া কৎবেলের মতোই অন্তঃসারশূন্য ক'রে ফেলেছে ব্যবসাটাকে। দু'পাশে দুটি মারোয়াড়ী এসে বড় বড় দোকান করেছে—তমোনাশ এই কৈফিয়ত দিয়েছিলেন সেদিন—খদ্দের সব ওখানে চলে গেছে, কিন্তু তাতে ওঁর মালগুলো হাওয়া হয়ে গেল কী ক'রে সে-কথাটা কিছুতেই বোঝাতে পারেন নি। খাতাপত্র দেখলেন কিরণবাবু—ওঁর শ্বশুরমশাই—দু'হাতে ধার দিয়েছেন তমোনাশ। সবচেয়ে ধার দিয়েছেন চেঞ্জারদের, যারা হয়তো আর দশ-বারো বছরের মধ্যে এদিকে উঁকি মারবে না—হয়তো ইহ-জন্মেই নয়। কে আর এক জায়গায় বছর বছর আসে।

অনেক ভাবলেন কিরণবাবু, অনেক হিসেব করলেন। দেখলেন এই মুমূর্ষু ব্যবসাকে আবার নতুন ক'রে বাঁচাতে গেলে যে অমানুষিক পরিশ্রম তাঁকে করতে হবে সে শক্তি আর তাঁর নেই। তা ছাড়া পরমায়ুই বা ক'দিন বাকী আছে ঠিক কি? যদি এর মধ্যেই একদিন তাঁর ডাক আসে? এখন এ দোকান নতুন ক'রে সাজাতে গেলে বিস্তর মাল দরকার। দেবে হয়তো মহাজনরা—তাঁকে ঠিকই দেবে। কিন্তু তিনি যখন চোখ বুজবেন তখন? সব মাল নিঃশেষ ক'রে দেবে ছেলে অথচ মহাজনের দেনা শোধ হবে না। সেই দেনার দায়ে ঘরবাড়ি সব যাবে।

সব দিক ভেবে তিনি কারবার বেচে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। মহাজনের দেনাপত্তর, লোকের মাইনে সব চুকিয়ে যা বাঁচল—তার কিছু তিনি নগদ হাতে রাখলেন, বাকী টাকায় আরও বিঘে-পাঁচেক জমি কিনলেন।

আশ্চর্য, তার পরও দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন কিরণবাবু, সুস্থ হয়েই বেঁচে ছিলেন। তবে তিনি কোনো পশ্চাত্তাপ করেন নি। বরং তাপসীকে প্রায়ই বলতেন, 'এ ভালোই হ'ল, বৌমা, ওর মাপের কাজ ও পেয়ে গেল। নইলে আমি যদ্দিন বাঁচতুম—দোকান চলত, টাকাও হয়তো থাকত—তাতে ফল হ'ত আরও খারাপ। মরবো তো একদিন ঠিকই, তখন কি করত? আবারও তো এক বছর দেড় বছরের মধ্যে সব ফুঁকে দিত। তারপর? সে একেবারে পথে বসা তো? তখন চোখে অন্ধকার দেখত। চাই কি দোকান বাঁচাতে ঘরবাড়িও বেচে খেত। তার চেয়ে ও এখন থেকে দুঃখ সওয়াটা অভ্যাস ক'রে নিক, দুঃখ আর গায়ে লাগবে না।'

কারবার চলে যেতে তমোনাশ কী করবেন সমস্যা দেখা দিল। প্রথমটা তমোনাশ নতুন কোনো ব্যবসা করতে চেয়েছিলেন।

কিরণবাবু বললেন, 'ব্যবসা করতে তুই পারবি না। নইলে ছেলেবেলা থেকে এ কারবারের মধ্যে থেকেও রাখতে পারলি না, দেড় বছরে ফুঁকে দিলি সব!...চাকরিই দেখি—।'

চাকরি বলতে এখানকার কারখানার চাকরি। কিন্তু তমোনাশ বললেন, 'লোহা পিটতে আমি পারব না। যদি অফিসে কিছু হয় তো করতে রাজী আছি।'

অনেক বোঝালেন কিরণবাবু, 'তুই ম্যাট্রিকটা পাসও করিস নি। কী চাকরি করবি—তোকে দেবেই বা কেন? অফিসের কোন্ কাজে আসবি তুই? তার চেয়ে কারখানায় ঢুকে পড়্—যদি লেগে থাকতে পারিস—এক-কালে ফোরম্যান হয়ে যেতে পারবি।'

কিন্তু তমোনাশ কিছুতেই রাজী হলেন না।

অগত্যা কিরণবাবুকে অফিসে ঢোকাবার চেষ্টাই দেখতে হ'ল। তিনি দীর্ঘকাল এদেশে আছেন, অনেকের সঙ্গেই জানাশুনো, তাই শেষ পর্যন্ত অসাধ্যসাধনই করলেন, তমোনাশকে অফিসেই ঢুকিয়ে দিলেন। অবশ্য সেটা

যুদ্ধের মুখ—তবু নন-ম্যাট্রিক বলে গোড়াতে ডেসপ্যাচ-ক্লার্ক হিসেবেই ঢুকতে হয়েছিল। এখন অবশ্য এতকাল পরে লেজারে গেছেন, কিন্তু মাইনে—এই বাজারেও সবসুদ্ধ একশো সত্তরের উপরে উঠতে পারে নি। অথচ তমোনাশের সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় তার পিসতুতো ভাইকে কিরণবাবু কারখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, সে এখন সাড়ে-চারশো টাকার মতো পাচ্ছে। সেদিনও তার বৌ নতুন চুড়ি দেখিয়ে গেল তাপসীকে।

আর তাপসী ?

শ্বশুরের কারবার উঠে যাওয়ার পর থেকে তার জীবন দীর্ঘ একটানা দারিদ্র্য ও সংগ্রামের ইতিহাস।

বছরের পর বছর সন্তান ধারণ করতে হয়েছে তাকে—সচ্চরিত্র তমোনাশের চরিত্রগৌরব বজায় রাখতে, আর তার মধ্যেই করতে হয়েছে সব কাজ—জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত। প্রথম প্রথম তবু বাসন মাজবার জন্যে একটা ঠিকে-ঝি ছিল—এখন তাও নেই। কুয়ার জল তোলার কাজটা তবু তমোনাশ ক'রে দিতেন। এখন ছেলেরা করে—তা ছাড়া সবই করতে হয়েছে, এখনও হয়। বারোমাস তিনশো পঁয়ষট্টি দিন। শুধু মধ্যে মধ্যে যখন আঁতুড়ে ঢোকে সেই সময়টা ছাড়া। আগে সে-সময়টা পিতাপুত্রে চালাতেন—এখন ছেলে-মেয়েরাই যা পারে করে।

একটা ঝি পর্যন্ত রাখা সম্ভব হয় নি তাদের—আশ্চর্য!

কম আয়, খরচ বেশি।

ধান সব বছরে সমান হয় না। যে বছর কম হয়, সে-বছরে সংসার চালাতে দেনা হয়ে যায় বাজারে। পরের বছর কিছু বেশি ফসল হ'লে তাই বেচে দেনা শোধ হয়।

কিরণবাবু বার বার বলে গেছেন, 'দেখো মা, এমন দেনা কখনও করো না, যা এই জমি থেকেই শোধ হবে না। কেননা তাহ'লেই জমি বেচতে হবে, আর এখন যা জমি আছে তা থেকে যদি দু-বিঘেও বেচ তাহ'লে ডান হাত মুখে ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে, মনে রেখো।'

সে উপদেশ মেনে এসেছে তাপসী—প্রাণপাত ক'রেও।

দু'একবার দেনা ক'রে তাপসীর চিকিৎসা করাতে বা লোক রাখতে

চেয়েছিলেন তমোনাশ, তাপসী রাজী হয় নি। তবু ছেলেমেয়েদের ভারী ভারী অসুখে, শ্বশুরমশাইয়ের শেষ বড় ব্যারামটায় বাড়তি টাকা যোগাড় করতেই হয়েছে, কিন্তু জমি বন্ধক দিতে দেয় নি তাপসী—নিজেরই সেই বিয়ের সময়ের যা-কিছু সামান্য সামান্য গহনা ছিল—একটার পর একটা খুলে দিয়েছে। আজ সেদিক দিয়েও সে প্রায় নিঃস্ব।

তৃষ্ণা এসে পাশে বসে পড়ল; 'কী করছ মা তুমি? অন্ধকারে একা বসে বসে? কত ডাক ডাকছি, শুনতেই যে পেলে না!'

চমকে ওঠে তাপসী। যেন ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে সে।

'ডাল সেদ্ধ হয়ে গেছে?'

'ও হরি—তুমি কোথায় আছ! ডাল নামিয়ে তরকারি চাপিয়েছিলুম—সেও তো নেমে গেল। অম্বলটা চেপেছে—হয়ে গেলেই উনুন ফেলে দেব। তোমাকে আর ওদিকে যেতে হবে না।'

ওঃ, বেঁচে গেল তাপসী। এখন আর ঐ ঘরে গিয়ে ঢোকার কথা ভাবাই যাচ্ছে না।

'বেশ করেছিস, মা। মাথাটা এখনও যেন ছাড়ছে না।'

'আমি কিন্তু এবার একটু ছবিদের ওখানে যাব, মা—তা আগে থাকতে বলে রাখছি।'

'ছবিদের ওখানে অত কি?' ভ্রূ কুঁচকে ওঠে তাপসীর। অন্ধকারে সেটা দেখতে পায় না তৃষ্ণা।

ছবি হ'ল ওদেরই বার-বাড়ির ভাড়াটের মেয়ে। মাস দুই হ'ল ওরা এসেছে। বড় ঘন ঘন ওদের ওখানে যাচ্ছে খুকু। এবার একটু শাসন করতে হবে। ছবির দাদাটা যেন কেমন কেমন—অত বড় ছেলে শুধু দিন-রাত ঘরে বসে লুডো খেলে আর সিগারেট খায়। হাটে পর্যন্ত যেতে চায় না। বিশ্ব-কুঁড়ে ছেলে। একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, পা-জামা পরনে—মুখে খালি অষ্টপ্রহর গান, নয় শীষ। যা দু'চক্ষে দেখতে পারে না তাপসী তা সবগুলোই আছে ওর। চাউনিটাও ভালো নয়—যেন কেমন কেমন ভাবে চায় তৃষ্ণার দিকে।

ভাবল, কিন্তু বারণ করা হ'ল না। তৃষ্ণা উঠে গেল রান্নাঘরের দিকে। শুধু হেঁকে বলে দিল তাপসী, 'দেখিস, দোর-জানলা সব বন্ধ ক'রে যাস, বেড়াল না ঢোকে।'···

শুধু কি দারিদ্র্যের জন্যই তাপসীর এই বিদ্রোহ?

না। তার ব্যথা অন্যত্র। মেয়েকে সে সত্যিই বিদ্বান পাত্রে গাছতলাতেও দিতে পারে।

তাকে যে এই ভূতের মতো খাটতে হয়—তার জন্য একটুও দুঃখিত নয় তাপসী। শুধু যদি তাকে এমন জীবন্ত সমাহিত হয়ে থাকতে না হ'ত!

একটু যদি লেখাপড়ার চর্চা থাকত এদের বাড়িতে! দুখানা ছেঁড়াখোঁড়া পুরনো বইও থাকত! কিছুই নেই—স্বামীর ছেলেবেলায় ইস্কুলে পড়বার বইও এক আধখানা ছিল না। হাঁপিয়ে মরেছে তাপসী. ছটফট করেছে একখানা বইয়ের জন্যে। ভবানীপুরের কলেজে-পড়া মেয়ে সে, এ জীবন কল্পনাই করে নি কখনও। তখন লাইব্রেরিও হয় নি এখানে যে, বই আনবে। এখন হয়েছে বটে—কিন্তু এখন আর অবসরও নেই, মেজাজও নেই। সে-মন মরে গেছে। তার জীবন্ত সমাধি ঘটেছে এখানকার এই সংসারে।

অথচ এককালে শুধু লেখাপড়াতেই নয়—গানবাজনায়, নাচে, অভিনয়ে—সব দিক দিয়েই তার খ্যাতি ছিল। এখন মধ্যে মধ্যে যখন কলকাতা থেকে ভাড়াটেরা এসে নিজের মেয়েদের কৃতিত্ব দেখাতে চেষ্টা করেন, তখন তাপসীর হাসি পায়। কিছুই জানে না এরা, কিছুই শেখে নি। তাইতেই এত গর্ব। যদি তার মতো শিক্ষা পেত তা'হলে না জানি কী করত!

তাকে পাড়াগেঁয়ে জংলী ভূত-ই ভাবে এখন ঐসব মেয়েরা। কত কী বড়াই করে—বোঝাবার চেষ্টা করে এক-একজন, আধুনিক জীবনের অত্যাশ্চর্য রহস্য সব।···

এই অপমানটাই বড় বেশী লাগে তাপসীর। এই মৃত্যুটাই বড় বেশি বাজে।

মেয়েকে ইস্কুলে দিতে পারে নি, কিন্তু যতটা সম্ভব সে নিজে পড়িয়েছে তাকে। নিজের প্রায়-ভুলে-যাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখিয়েছে যত্ন ক'রে। বোনা, ছুঁচের কাজ—কিছুই শেখাতে কার্পণ্য করে নি। নিজের মরে-যাওয়া

সমস্ত আশা সে একমাত্র কন্যার মধ্যে মুকুলিত দেখতে চায়। যে সাধ-আহ্লাদ ওর মিটল না—কোনোদিনই মিটবে না আর, সেগুলো যেন মেয়ের অন্তত মেটে, ওর জীবন যেন সফল আর সার্থক হয়—এ-ই এখন একমাত্র কামনা তাপসীর।

তাই ছেলেরা নয়—মেয়েটিই এখন ওর একমাত্র অবলম্বন। তৃষ্ণা শিক্ষিত মার্জিতরুচি কোনো সৎপাত্রে পড়ল দেখে সেই মুহূর্তেই মরে যেতে পারে সে অনায়াসে। মেয়ের সম্বন্ধে ওর এই অতিরিক্ত দুর্বলতা নিয়ে অনেক অনেক ঠাট্টা করেন—স্বয়ং তমোনাশবাবুও, তাপসী তার প্রতিবাদ করে না, মেনেই নেয়। বলে, 'হ্যাঁ, দুর্বলতা একটু আমার আছে। মানছি। পাঁচটা নয় সাতটা নয়—এক মেয়ে আমার। ছেলেরা যা হবে তা তো বুঝতেই পারছি—বিশকর্মার বেটা বিয়াল্লিশকর্মা। যদি মেয়েটাকে সুখী করতে পারি তাহ'লেই আমার ঢের!'

প্রতিবাদ সে কখনও কারুর কথাতেই করে না। কোনো কারণেই নয়। ভাগ্যকে তার মতো মেনে নিতে বোধহয় কেউ কখনও পারবে না। চিরকাল মুখ বুজেই কাটিয়ে দিল সে। কখনও একটা অনুযোগ পর্যন্ত করে নি ভাগ্যের কাছে। অতিবড় দুঃখেও না। সেইজন্য শ্বশুর তাকে অত ভালবাসতেন। মৃত্যুর আগে ছেলের জন্যে, নাতিদের জন্যে দুঃখ করেন নি—করেছেন ওরই জন্য। বলেছেন, 'এনে এস্তক তোকে দুঃখই দিলুম, মা—একটা দিনের জন্যেও সুখ পেলি না। কী বলব, তোর দিকে চাইলেই আমার মাথা কাটা যায় লজ্জায়—কী মেয়েকে কোথায় নিয়ে এলুম, কার হাতে তুলে দিলুম!'

তিনি দুঃখ করেছেন কিন্তু তাপসী করে নি।

আজ এই ওর প্রথম প্রতিবাদ; এই প্রথম মুখ ফুটল ওর।

সম্ভবত সেই জন্যেই তমোনাশবাবুর অত আঘাত লেগেছে। কিন্তু তাপসীও নিরুপায়। কারুর জন্যেই তার এই অবশিষ্ট ক্ষীণ আশাটিকে নির্মূল করতে পারবে না সে। স্বামীর জন্যেও না।

অনেক দুঃখে মেয়ের নাম রেখেছে তৃষ্ণা। ওর মনেরই সমস্ত তৃষ্ণা যে মূর্তিমতী মেয়ের মধ্যে!

ছেলেরা পড়া শেষ ক'রে লাফাতে লাফাতে এল।

'মা, ভাত দেবে না? অনেক রাত হ'ল যে! ছোট খোকা তো কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।'

সত্যিই তো। চমকে উঠল তাপসী।

'কত রাত হ'ল রে?'

'দশটা বাজে, মা। কারখানায় ভোঁ বেজে গেল শোন নি?'

'এত রাত হয়েছে? তোর দিদি কোথায়?'

'তা আমরা কেমন ক'রে জানব? বা রে! ঘরে নেই দিদি?'

'না। তাহ'লে বোধহয় ছবিদের ঘরে গেছে। ডাক্ তো কেউ।'

কিন্তু কেউ ডাকবার আগে তৃষ্ণা নিজেই আসে ছুটতে ছুটতে। সম্ভবত ছুটে আসার জন্যই পরিশ্রমে আরক্ত হয়ে উঠেছে মুখ। আর দেরি করে আসার লজ্জাতেই চোখ তুলে তাকাতে পারছে না মার দিকে।

'এত রাত অবধি পরের ঘরে বসে আড্ডা দাও কেন খুকু? শোভনতা অশোভনতা বলে একটা কথা আছে তো! আর কবে শিখবে এসব!'

তাপসীর পক্ষে একটু অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই বলে কথাগুলো।

উত্তর দিতে গিয়ে গলা যেন জড়িয়ে আসে তৃষ্ণার। বলে, 'মাসীমার অসুখ বলেই তো—আমি বুঝি শুধু শুধু—বেশ তো!' ...তারপর সে হঠাৎ-ই আবার বলে ওঠে, 'আর ওরা তো পরশুই চলে যাচ্ছে।'

'পরশুই চলে যাচ্ছে! কই, বলে নি তো একবারও!'

'বাবাকে বুঝি বলেছে। দেবুদার টিউশ্যনি নষ্ট হয়ে যাবে সব—আর বেশী দিন কামাই করলে। আর ওদের এ-মাস শেষও হয়ে যাবে পরশু—তাই।'

তৃষ্ণা কিন্তু আর দাঁড়ায় না। অকারণে ছুটোছুটি ক'রে ভাইদের জায়গা করে, জল দেয়, এটা-ওটা এগিয়ে দেয় মার হাতের কাছে। এতক্ষণের অনুপস্থিতির প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করে যেন।

তমোনাশবাবু এসে খেতে বসেন সহজ ভাবেই। কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে তাপসী বুঝতে পারে যে গত তিন-চার ঘণ্টায় যেন তাঁর ওপর দিয়ে একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। মুখের সেই চির-প্রশান্তি নষ্ট হয়ে গেছে

একেবারে। আজ এই মুহূর্তে যেন বুড়োই দেখাচ্ছে তাঁকে।

মায়া হয় খুব—তবু মনকে শক্ত করে সে।

না, না, না। নিজের জীবনে যা হয়েছে মেয়ের জীবনে তা হ'তে দেবে না সে, কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না তার জীবন।

এতকাল সত্যকথা শুনতে হয় নি তমোনাশবাবুকে, সেই তো ঢের। এবার শুনুন।...

রাত্রে একই ঘরে ছু'দিকের ছুটো চৌকিতে শোবার ব্যবস্থা। ছোট ছুটো ছেলে নিয়ে তাপসী এদিকে শোয়—ওদিকে তমোনাশবাবু তাদের ওপরের ছুটোকে নিয়ে।

কিন্তু তাতে কথা কওয়ার কোনো অসুবিধা হয় না। ও-বিছানা থেকেই বেশ গল্প করা যায়। বিশেষত তমোনাশবাবু বেশির ভাগ একাই বকে যান—তাপসীকে শুধু ছু'একটা হাঁ-হুঁ ক'রে যেতে হয়। তমোনাশবাবু কথা কইতে একটু ভালবাসেন! যা-খুশি উপলক্ষ ক'রে আপন মনে বকে যান তিনি—চাযের কথা, সংসারের কথা, অফিসের কথা—যাদের চেনে না তাপসী, যে-কথা সে কিছুমাত্র বোঝেনা—সব কথাই শুনে যেতে হয় তাকে। আজ কিন্তু তমোনাশবাবু নীরব একেবারে। এসেই শুয়ে পড়লেন আলো নিভিয়ে। শুধু রাত্রি পর্যন্ত নাক ডাকার শব্দ কানে না যেতে বোঝা গেল যে তখনও তিনি ঘুমোন নি।

খুবই কষ্ট হচ্ছে তাঁর—কথা বলতে না পেরে, তা বুঝেও তাপসী কঠিন হয়ে রইল। তাঁর দিকই তো চিরকাল তিনি দেখে এলেন, ওর দিক কখনও তাকিয়ে দেখেছেন কি?

সে-ও প্রাণপণে চোখ বুজে ঘুমোতে চেষ্টা করতে লাগল।

এরপর অবশ্য কথা কইতেই হ'ল। বয়স্ক লোক বলতে মাত্র ছুজন অতবড় সংসারে, কথা না বললে চলে না। কিন্তু বেশ বোঝা গেল ছুজনের মনের মধ্যেকার পাঁচিল এতটুকু ভাঙে নি কোথাও।

দারুণ আঘাত পেয়েছেন তমোনাশবাবু।

যে স্ত্রীর সঙ্গে তিনি গত বাইশ বছর ঘর করছেন, যে তাঁর এতগুলি

সন্তানের জননী—সে এতকাল ধরে তাঁকে ঘৃণা ক'রে এসেছে, অবজ্ঞা ক'রে এসেছে, এই চিন্তাটা মাথায় ঢোকার পর থেকে যেন একেবারে ভেঙে পড়েছেন তিনি। লেখাপড়া শেখেন নি, কিন্তু ভদ্রপরিবারে জন্মে ও লালিত হয়ে এ অপমানটুকু বোঝবার মতো ক্ষমতা তাঁর হয়েছে। এই সংস্কার তাঁর সহজাত। যেটাকে তিনি শান্ত-স্বভাব মনে করতেন, যেটাকে মনে করতেন আদর্শ সহিষ্ণুতা—আসলে সেটা নিদারুণ ঘৃণা। ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণা। আজ সেইটে বোঝবার পর থেকেই এতদিনের মানসিক শান্তি ও স্থৈর্যের প্রাসাদ তাঁর ভেঙে পড়েছে।

তাঁর এ মনোভাব তাপসী বোঝে। কিন্তু তার ফলে সে মনে মনে আরও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে দেখে প্রশ্নের বিপরীত দিকটা।

এতকাল তো সব সয়ে এসেছে সে। নীরবে, নতমুখে। এখন যদি এই একটা বিষয়ে বিদ্রোহী হয়ে থাকে—সেটা তার এতই অপরাধ হ'ল? সে কি এ-সংসারের কেউ নয়? তার ছেলেমেয়ের বিয়েতে তার একটাও কথা বলবার অধিকার নেই? তার মত নেবে না কেউ? কেন—কেন উনি তাকে একবার জিজ্ঞাসামাত্র না ক'রে কথা দিয়ে আসেন? কেন? কেন? সে কে তাহ'লে? শুধুই এ-সংসারের দাসী-বাঁদী?

অনুচ্চারিত এ তর্কের কোনো মীমাংসাই হয় না। শুধু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার ব্যবধানটা ক্রমে দুস্তর হয়ে ওঠে।...

এই ভাবেই সাত-আটদিন কাটবার পর হঠাৎ একদিন সকালে উঠে তৃষ্ণাকে পাওয়া গেল না।

প্রথমটা অত উদ্বিগ্ন হয় নি কেউ। এক-একদিন নদীর ধারে বেড়াতে যায় সে এমনি একা-একা।

তমোনাশবাবু তো গ্রাহ্যই করেন নি। সকালে অফিস তাঁর—তিনি যথারীতি বেরিয়েই যাচ্ছিলেন। তাপসীই লাজলজ্জার মাথা খেয়ে এসে তাঁকে আটকাল।

'তুমি—তুমি এখন যেয়ো না।'

'কেন বল তো?' তমোনাশবাবু একটু অবাক হন। সেদিনের পর থেকে

এমন অন্তরঙ্গ অনুরোধ তাপসীর তরফ থেকে এই প্রথম।

'খুকু—'

নামটা উচ্চারণ ক'রে আর কিছু বলতে পারে না তাপসী, ঝর-ঝর ক'রে কেঁদে ফেলে।

'ওকি—মানে—তুমি কি ভাবছ?…এমনি হয়তো কোথাও গেছে—এখনই আসবে। মিছিমিছি অফিসটা—'

'না না। আমার মনে বড় কু গাইছে। একবার নদীর ধারটা ছাখো দিকি! ওকে নিয়েই আমাদের মধ্যে অশান্তি এটা ও ক'দিন বুঝতে পেরেছে। কেমন একটা মুখ শুকিয়ে-শুকিয়ে মন গুমরে বেড়াচ্ছিল। আমি কথাটা ভালো বুঝছি না। কাল রাত্রে যখন খেতে এসে বসল তখন চোখে জলের দাগ—বোধহয় কাঁদছিল তার আগে।'

মাথা ঘুরে গেল তমোনাশবাবুর। লোককে বয়স যাই বলুন, কুড়ি বছরের মেয়ে তাঁর। কোথায় গেল?

ছুটলেন নদীর ধার। কেলেঙ্কারি হবার ভয়ে আর কাউকে জানালেন না, কিন্তু বড় তিনটে ছেলেকে পাঠালেন তিন দিকে।

তুপুর পর্যন্ত বিস্তর খোঁজাখুঁজি ক'রেও কোনো খবর পাওয়া গেল না। নদীতে ডুবে মরার মতো যথেষ্ট জল এখন নেই। এমনি নদীর ধারে এদেশে অনেকে আত্মহত্যা করে বটে—কিন্তু এদিক-ওদিকে তু-মাইল পর্যন্ত প্রতি ইঞ্চি জায়গা তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজেছেন তমোনাশবাবু—কোথাও নেই।

অবশেষে বেলা একটা নাগাদ শ্রান্ত অবসন্ন হয়ে ফিরল সবাই। আর কোথাও খুঁজতে বাকী নেই সম্ভাব্য স্থানগুলোয়।

আর সেই মুহূর্তেই ডাকের চিঠিটা এল। তৃষ্ণার চিঠি।

কাল রাত্রে যাবার সময় পথে পোস্ট-অফিসে ফেলে দিয়ে গেছে সে।

তাপসীর চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে—সে কিছুই পড়তে পারল না। তমোনাশবাবুই পড়লেন। যা পড়লেন তার মর্ম এই:

বাপ-মায়ের সকল সমস্যার সমাধান ক'রে দিয়ে তৃষ্ণা বিদায় নিচ্ছে। দেবুদা বিকালের গাড়িতে এসে স্টেশনে অপেক্ষা করছে—ওকে নিয়ে যাবে বলে। তার সঙ্গেই সে রাতের গাড়িতে চলে যাচ্ছে। কলকাতা পর্যন্ত

যাবে না—পথেই নামবে। কোথায় তা এখন জানাতে পারবে না সে, পরে জানাবে। দেবুদা ছাড়া ওর জীবন সম্ভব নয়। তাকে না পেলে ও আত্ম-হত্যাই করত। দেবুদা মহৎ—সে পরিণতি থেকে ওকে বাঁচাল। তারা আগামীকালই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে (অর্থাৎ আজ)। দেবুদা চাকরি-বাকরি করেন বটে, তবে টিউশ্যনি ক'রে পঞ্চাশ-ষাট টাকা রোজগার করে। আরও খাটবে বলেছে সে। আর করুক না-করুক—তার সঙ্গে গাছতলাতে বসে ভিক্ষা করাতেও তৃষ্ণার সুখ। সেও ঢের শান্তি। দরকার হয় তো, সে-ও অপরের বাড়ি ঝি বা রাঁধুনীর কাজ ক'রে সংসারে সাহায্য করবে। এ বিষয়ে সে মার আদর্শ, মার শিক্ষা ভোলে নি। তাঁর পতিভক্তি, তাঁর ধৈর্য, তাঁর সহিষ্ণুতা—তাঁর খুকু আশা রাখে যে, নিজের জীবনেও সম্ভব করতে পারবে। ইত্যাদি—

চিঠির মর্মার্থ জানবার পরই তাপসী বিছানায় গিয়ে মুখ গুঁজে পড়েছিল—আর ওঠে নি। তমোনাশবাবু বাইরের বারান্দায় যেখানে ব'সে চিঠি পড়েছিলেন, সেইখানেই চিঠিখানা হাতে ক'রেই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা। যেন পাথর হয়ে গেছেন তিনি।

ছেলেরা তাঁদের ভাবগতিক দেখে খাওয়া-দাওয়ার কথা তুলতে সাহস করে নি। বড় দুজনই যা পেরেছে ক'রে নিয়েছে—তাদের অভ্যাস আছে এসব করা, খুব অসুবিধা হয় নি। কিন্তু মা-বাবাকে ডেকে খাওয়ার কথা তুলতে ভরসায় কুলোয় নি। ঠিক কী হয়েছে, দিদি ঠিক কী করেছে—তা না বুঝলেও, একটা ভয়ানক কিছু যে হয়েছে এটা ওঁদের মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছে তারা।

এই ভাবেই সারা দিন কেটে গেল। অফিস থেকে সকালে পিওন এসে জেনে গেছে পেটের অসুখ হয়েছে তমোনাশবাবুর। সুতরাং কেউ খবর নিতে আসে নি এ-বেলা। এ-সময় ভাড়াটের সংখ্যাও কম। বাইরের কৌতূহলী চোখ ও রসনার হাত থেকে অনেকটা অব্যাহতি মিলেছে।

দিন কেটে অপরাহ্ণ এল, অপরাহ্ণ পরিণত হ'ল সন্ধ্যায়।

শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদ একবার পশ্চিমের ইউক্যালিপটাস গাছটার মাথায় উঁকি মেরেই অস্ত গেল।

এবার নামল রাত্রি। অন্ধকার, দুঃসহ রাত্রি।

বাড়িতে ঝাঁট পড়ল না, সন্ধ্যাদীপ জ্বলল না। চৌকাঠে জল দেওয়া হ'ল না। এগুলো তৃষ্ণাই করত। ছেলেরা এসব তত পারে না—মনেও পড়ল না তাদের। কোনোমতে একটা লণ্ঠনে খানিকটা তেল ভরে নিয়ে তারা পড়তে বসল।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার রাত্রি। মাঠ পাহাড় নদী সব একাকার করা অন্ধকার।...

অনেক রাত্রে তমোনাশবাবু উঠলেন। ঘরে এসে বিছানায় স্ত্রীর পাশে বসে আস্তে আস্তে তার মাথায় হতে রাখলেন। সে স্পর্শে তাপসী যে শিউরে উঠল তা টের পেলেন তিনি। একটু পরে ঈষৎ গাঢ়স্বরে বললেন, 'আর কেঁদো না, ওঠো। তোমার এত কান্নার যোগ্য নয় সে। আসলে তোমার মেয়ে নয়, শত্রু এসেছিল পেটে। এই মনে ক'রেই মন শক্ত করো।'

এবার হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে উঠল তাপসী, তমোনাশবাবুর দুটো পায়ে মুখ গুঁজে বললে, 'ওগো, আমাকে মাপ করো। ওকে উপলক্ষ্য ক'রেই তোমাকে অপমান করেছি, তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি—তাই ওকে দিয়েই এমন চরম মার ভগবান আমাকে দিলেন। চিরদিনের জন্য মুখ ডুবিয়ে দিলেন। আমি তার কথা ভাবছি না—তোমার কথাই ভাবছি শুধু সেই থেকে। কেমন ক'রে তোমার কাছে মুখ দেখাব।'

'ছিঃ। তুমি কি পাগল হয়েছ? তুমি আমার এত দিনের এত অপরাধ যদি মাপ করতে পেরে থাকো—আমি তোমার একটা সামান্য অপরাধ মাপ করতে পারব না।...ওঠো, শান্ত হও।'

তৃষ্ণাকে নিয়েই যে দেওয়ালটা উঠেছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, তৃষ্ণাই তা ভেঙে দিয়ে গেল। অনেকদিন পরে তাঁরা দুজনে দুজনকে পেলেন নিবিড়, অন্তরঙ্গ ভাবে।

জিম্মা

ভূত দেখলে নাকি মানুষ ভয়ে বিহ্বল হয়ে যায়—নড়তে কি ছুটে পালাতে পারে না, মুখ দিয়ে শব্দও বেরোয় না। এ কথাটা শোনাই ছিল ভূতেশ-বাবুর। ঠিক বোধগম্য হয় নি এর আগে। আজ নিজেকে দিয়ে বুঝলেন। তাঁর ঠিক ঐ অবস্থাই হয়ে গেল রাঙীকে দেখে।

ভূত নয় অবশ্য, বরং বিশেষ পরিচিত এবং মানুষই। ওঁদেরই ভূতপূর্ব দাসী। বাড়ি ওদের উড়িষ্যার পশ্চিম প্রান্তে, আধা-আদিবাসী। পর পর কয়েক বছর অনাবৃষ্টিতে চাষের জমি রুক্ষ মরুভূমি হয়ে উঠল, ঘরে অন্ন বা অন্ন কেনার মতো কিছুই রইল না। তখন একদিন ওর বর ধনিয়া প্রায় পাগল হয়ে মেয়েসুদ্ধ স্ত্রীকে বিক্রি করে দিতে উদ্যত হয়েছিল—মাত্র সত্তর টাকায়।

টাকাটা বরের হাতে পড়া পর্যন্ত শান্তভাবে অপেক্ষা করেছিল রাঙী, তারপর এক রকম চোখের নিমেষে মেয়েটাকে কোলে নিয়ে দৌড়তে শুরু করল রাঙী, প্রায় খরগোশের মতোই লঘু পায়ে, অদৃশ্য হয়ে গেল নেংটি ইঁদুরের মতো। এদিকের ঝোপঝাপ, পাহাড়ের খাঁজ গর্ত ওর সব জানা। কোথায় লুকোলে কেউ খুঁজে পাবে না তাও জানে। অদৃশ্য হতে বেশি সময় লাগবেই বা কেন?

ক্রেতা বিহারী একজন। ঘুঘু প্রকৃতির লোক, এই কাজ করেই খায়। স্বাস্থ্যবতী মেয়ে, চড়া দামে বিক্রি হবে, এই আশাতেই সে এতগুলি টাকা গুনে দিয়েছে, কিন্তু তার অর্থলোভ যত, তত অভিজ্ঞতা নেই। এ সব পাহাড়ে-জঙ্গলের পথে আত্মগোপনের যে সব জায়গা আছে, সে সম্বন্ধে ওর কোন ধারণাও ছিল না। তাই অনেক ছুটে, অকারণেই এক পথে বারবার ঘুরে নিজেই থকে গেল, মাল পেল না।

ফিরে এসে অবশ্য ধনিয়াকে চেপে ধরেছিল টাকাটার জন্যে। মারধোরও দিয়েছিল যথেষ্ট—বোকা বনে যাবার আক্রোশে আরও—কিন্তু টাকা বার করতে পারে নি। সে টাকা তখন ধনিয়া তার মহাজনকে জমা দিয়ে দিয়েছে—

ভবিষ্যতে তিন-চার বস্তা ধান পাবে এই প্রতিশ্রুতিতে। নারী-ব্যবসায়ী লোকটির পুলিসে যেতে সাহস হয় নি।

রাঙী্র সাহস অপরিসীম। এখন কিছুকাল বাড়ির দিকে যাওয়া যাবে না, এটুকু বুদ্ধি তার ছিল। সেদিন প্রায় সমস্ত রাত হেঁটে ভোরের দিকে একটা ট্রেন ধরে—মধ্যে ট্রেন বদলে একেবারে কলকাতা চলে এসেছিল। ভাগ্যক্রমে গাড়িতে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে তার দুঃখের কথা জানাতে তিনি সঙ্গে করে এনে এই পাড়ার কালী মন্দিরের পূজারীর জিম্মা করে দিয়েছিলেন। পূজারীও বয়স্ক—ভদ্রলোকের পরিচিত। তাঁর কাছে ওর ইতিহাস বলে, বলেছিলেন, 'মেয়েটার তেজও আছে, বুদ্ধিও আছে—তবে কলকাতা তো তেমনি গুণ্ডা বদমাইশের সমুদ্দুর, দেখবেন ভাজনা-খোলা থেকে আগুনে গিয়ে না পড়ে।'

সেই থেকেই এ পাড়ায় আছে রাঙী। পূজারী আশ্রয় দিয়েছিলেন, খেতেও দিতেন, তবে বলেছিলেন, 'নগদ টাকা আর দিতে পারব না। দুজনকে খেতে দিচ্ছি, তা ছাড়া দিনকাল খারাপ, মন্দিরে যা পেন্নামী পড়ে আজকাল, তাতে এত খরচ টানা যাবে না। তুই কি না কি জাত—তোকে দিয়ে পূজোর কাজ কি রান্না তো হবে না, যা ঐ ধোওয়া মোছা—এঁটো বাসন মাজা। ঢের সময় হাতে থাকবে, তুই বরং অন্য এক বাড়িতে ঠিকে কাজ ধর্ —যা মাইনে পাবি নিজেদের কাপড়-জামা চলবে, চাই কি দু'টাকা এক টাকা দেশেও পাঠাতে পারবি।'

সেইমতোই ঠিকে কাজ ধরেছিল রাঙী, এক বাড়ি নয়, দু'বাড়িতে। তার মধ্যে ভূতেশবাবুরাও এক মনিব। দু'বাড়ি মিলিয়ে গোড়ায় ত্রিশ টাকার মতো পেত, দশ টাকা হাতে রেখে বাকী সবটাই দেশে পাঠাত। সেখানে বর আছে, দুটো ছেলে আছে—তারা কি খাচ্ছে ভেবে নিজের মুখে ভাত উঠত না।

তবে বছর তিন পরে কাজটা এই এক বাড়িতেই ঠেকেছিল। তার কারণ ভূতেশবাবু হঠাৎ একেবারে একা পড়ে গেলেন। তাঁর রান্নার কাজ, ঝাড়া-মোছা সবই রাঙীর ওপর পড়ল। ভূতেশবাবু মাইনে অনেক বাড়িয়ে দিলেন

বলে অন্য বাড়ির কাজ ছেড়ে দিল। সেখানের মনিব ভাল নয়—বড্ড টানাটানি করে—রাঙীও সে কাজ ছেড়ে বেঁচে গেল।

একা হয়ে পড়লেন—মানে ভূতেশবাবুর স্ত্রী ওঁকে ছেড়ে চলে গেল। পাড়ার একটি ছোকরা নাকি তাকে লোভ দেখিয়েছিল, সে বোম্বে গিয়ে বড় বড় স্টুডিওতে পরিচয় করিয়ে দেবে—সেই লোভে স্বামীকে বলে-কয়ে, জানিয়ে, অনেক কটু কথা শুনিয়ে একদিন বোম্বে মেলে চড়ে বসল। ভূতেশবাবু বাধা দেন নি, বরং যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। তারপর সে স্ত্রীর কি হয়েছিল তা তিনি জানেন না, জানার চেষ্টাও করেন নি।

দোষটা অবশ্য ভূতেশবাবুরই। নিজে পাত্রী দেখতে গিয়ে সুন্দরী মেয়ে দেখে মা-বাবাকে কোন খোঁজখবর করার অবসর দেন নি, তখনই সম্মতি জানাতে এক রকম বাধ্য করেছিলেন।

বিয়ের পর নিজের নির্বুদ্ধিতা বুঝতে পেরেছিলেন অবশ্য—দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই—কিন্তু তখন আর চারা ছিল না। দেখা গেল মেয়েটি যেমন অকর্মণ্য তেমনি বদ-মেজাজী। তার অশান্তির চোটে বাবা হাত জোড় ক'রে ছেলেকে বললেন, 'তুমি অন্য বাসা ক'রে চলে যাও—আমাদের অব্যাহতি দাও। এমন চলতে থাকলে তোমার গর্ভধারিণী হয়ত কোনদিন ট্রাম লাইনে গিয়ে মাথা দেবেন।'

অশান্তিটা রাত্রেও কম হত না—ভূতেশবাবুও অস্থির হয়ে উঠেছিলেন ক'দিনেই। তিনি শান্তির জন্যেই আরও এই ছোট্ট বাড়িটা ভাড়া ক'রে চলে এসেছিলেন। নিচে একটা দোকান ঘর, ওপরে দু'টি ঘর। ফ্ল্যাটের মতোই, অথচ একানে বাড়ি, এটা ভাগ্য বলেই মনে হয়েছিল। নইলে স্ত্রী যা মুখরা ও প্রখরা—পাশের ফ্ল্যাটের লোকরা দুদিন বাদেই নোটিস দিত হয়ত।

রাঙীর তত্ত্বাবধানে বলতে গেলে অনেকদিন পরে একটু সুখের মুখ দেখলেন ভূতেশবাবু। রান্না খুব ভাল নয়—কিন্তু সে ত্রুটি যত্নে ও আন্তরিক চেষ্টায় পুষিয়ে যেত। সময়ে সব পেতেনও, আগের মতো বিশৃঙ্খলায় দিন কাটত না। জিনিসপত্র কাপড়-জামা সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখত রাঙী।

এ অনেক সুখ, অনেক শান্তি। বাবা মা ছোট ভাইয়ের কাছে গোরখপুরে

চলে গেছেন, তাঁদের এনে আবার একটা বড় বোঝা ঘাড়ে চাপাতে ইচ্ছে হ'ল না। বিশেষ বছর খানেকের মধ্যেই যখন মা মারা গেলেন, তখন নিজের বুদ্ধির তারিফই করলেন মনে মনে। আর বিয়েও করলেন না। ঝুঁকি নিতে ইচ্ছে হ'ল না—তার চেয়ে এ জীবন বড় আরামের।

ইতিমধ্যে রাঙীর মেয়ে ফুলো একটু বড় হয়েছে বৈকি। এমন কিছু নয়, তবু মাকে টুকটাক্ সাহায্য করার পক্ষে যথেষ্ট। এইভাবেই সেও কিছু কিছু কাজ শিখে নিল। কিছুদিন পরে তাকে এ বাড়িতেই রেখে মন্দিরে কাজে যেত রাঙী। ভূতেশবাবু এসে দেখতেন—মায়ের মতো নয়, বরং আরও পরিপাটি ক'রে ঘরদোর বিছানা পরিষ্কার ক'রে সাজিয়ে রেখেছে। চা জলখাবার দেয় বেশ গুছিয়ে। ভোরবেলা পাঁচটায় উঠে প্রতিদিন চা দেয়। ভূতেশবাবুর কিছুই দেবার কথা নয়—তিনি খুশী হয়েই ওকে মাসে আট টাকা মাইনে বরাদ্দ করে দিলেন।

কিন্তু হঠাৎ আবার একটা ছন্দপতন ঘটল ভূতেশবাবুর নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাত্রায়।

ফুলো যখন এগারো বছরের—দেশ থেকে তার দাদা আকুড় চিঠি দিল, মানে কাউকে দিয়ে লেখাল। তার বাবা ধনিয়ার পক্ষাঘাত হয়েছে। দেখার কেউ নেই, ওরা দু'ভাই চাষবাস দেখে। সুতরাং মা যেন পত্রপাঠ চলে আসে—বাবার সেবা করাও দরকার। তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করাও।

খবরটা শুনে চোখে অন্ধকার দেখারই কথা, কিন্তু রাঙী ওঁকে বাঁচিয়ে দিল। বলল, 'বাবু, তুমি ভেবো না কিছু। ফুলোকে তোমার কাছে রেখে যাবো। ওকে নিয়ে গিয়ে কি হবে—অত নজর রাখতে পারব না, কে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে। তা ছাড়া ও শহরে মানুষ। সেখানে গিয়ে কোন কাজেই লাগবে না, বরং আমাকে যেটা দিতে, সেটাই মাসে মাসে আমার নামে পাঠিও, তাতে ঢের উপকার হবে। রোগা মানুষটা, তাকে খাওয়াতে হবে, ডাক্তার বদ্যি যদি ডাকি, সেও তো টাকার খেলা। ও সব কাজই তো শিখে গেছে—আমার চেয়ে ভাল রাঁধে এখন—তোমার কোন কষ্ট হবে না।'

যাবার সময় ভূতেশবাবুর দুটো হাত ধরে বলে গেল। 'তোমার জিম্মে

ক'রে দিয়ে গেলুম বাবু, তুমি ধম্ম ভেবে ওকে দেখবে—বড্ড ভালো মেয়েটা, কেউ না নষ্ট করে ওকে—সেইটে দেখো।'

তারপর ভূতেশবাবুর মায়ের এনলার্জ করা ছবিটার দিকে দেখিয়ে বলল, 'তোমার মরা মায়ের দিব্যি রইল—ওকে নিজের মেয়ের মতো দেখবে। গরিব বলে, দুঃখী বলে আমার দিব্যি উড়িয়ে দিও না।'

তারপর প্রায় সাত বছর কেটে গেছে। রাণ্ডীর আর কলকাতায় আসা হয় নি। বুড়ো শয্যাশায়ী বরকে কে দেখবে, সে না থাকলে? ছেলের বিয়েতে ওদের অনেক টাকা লাগে। নিজেদের জমি নেই। পরের জমিতে চাষ করে যা পায়—তাতে বাড়তি টাকা জমে না। বিয়ে দিলেও বৌ কি শ্বশুরের সেবা করবে? আরও সেই ভেবেই অত চাড় করে নি রাণ্ডী ছেলেদের বিয়ের।

ভূতেশবাবুরও সে জন্য কোন মাথাব্যথা নেই। ফুলো সেবায় স্বাচ্ছন্দ্যে ওঁকে অভিভূত করে রেখেছে। এত আরাম এর আগে কখনও পান নি, কাউকে পেতেও দেখেন নি। এমন ভাবে কোন মেয়ে একটা মানুষের জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করতে পারে, এ কখনও কল্পনাও করতে পারেন নি তাই।

সারাদিনই খাটে বলতে গেলে। ধোপার পাট চুকে গেছে। ওঁকে দিয়ে জোর ক'রে একটা ইস্ত্রি আনিয়েছে, কাপড়-জামা কেচে 'কলপ' দিয়ে ইস্ত্রি ক'রে রেখে দেয়—ভূতেশবাবু আজকাল প্রতিদিনই ধোপদস্ত জামা পরে আপিসে যান।

খাবার করতেও শিখেছে অনেক রকম। চপ, কাটলেট, সিঙাড়া, মিষ্টি। আশপাশের বাড়ির গিন্নীদের কাছে গিয়ে শুনে আসে—কোন্‌টা কি ভাবে করতে হয়। মন দিয়ে শোনে, দ্বিতীয় বার আর কিছু জিজ্ঞেস করতে হয় না। প্রথম প্রথম এক আধ দিন হয়ত ঠিক তেমন হয় না—তার পর নিজেই নিজের ত্রুটি শুধরে নেয়। যাঁদের কাছে শিখেছে, তাঁদের চেয়েও ভাল করে। ফলে আজকাল ভূতেশবাবু মধ্যে মধ্যে আপিসের বন্ধু দু'চার জনকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেন—তাঁরা সকলেই ওঁর এই অভাবনীয় সৌভাগ্যে অভিনন্দন জানান কিন্তু মনে মনে যে যথেষ্ট ঈর্ষিত হন, সেটা বুঝে ভূতেশবাবুর আনন্দ ও গর্বের সীমা থাকে না।

কিন্তু আর একটা তথ্য—এতদিন চোখের সামনে থাকলেও, অথবা চোখের সামনে তিলে তিলে পূর্ণ ও প্রকট হয়েছে বলেই ভূতেশবাবুর চোখে পড়ে নি।

হঠাৎ-ই একদিন পড়ল।

এগারো আর সাতে আঠারো, ফুলো এবার যুবতী হয়ে উঠেছে।

এবং—

ওর মুখশ্রী তত ভাল না হ'লেও আদিবাসিনীর স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ওর দেহকে যৌবন-সম্পদে সমৃদ্ধ করে তুলেছে, এক অবিশ্বাস্য লাবণ্যে পরিপূর্ণ করেছে।

চোখে পড়ল, বিস্মিত হলেন—তবে মনের কোন ভাবান্তর তখনই বুঝতে পারলেন না।

মনে যে একটা অবোধ্য চাঞ্চল্য, দেহে যে একটা অননুভূতপূর্ব অস্বস্তি বোধ করছেন—তার সঙ্গে এই আকস্মিক উপলব্ধির কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগও বুঝতে পারেন নি।

ওকে দেখতে ভাল লাগছে, হঠাৎ বোধ করছেন বড্ডই খাটছে মেয়েটা ওঁর জন্যে, সে তুলনায় মাইনে খুবই কম দিচ্ছেন, ভাল কোন কাপড়জামাও দেন নি কোনদিন। এই পর্যন্ত, এর বেশি কিছু নয়।

সে মাস থেকে রাঙীর মণি অর্ডারে দশ টাকা যোগ ক'রে দিলেন। এক দিন একটা সিল্কের ও একটা ভয়েলের জামা কিনে দিলেন, মাস কাবারে টাকা পেয়ে একখানা ভাল শাড়িও কিনে আনলেন।

ফুলোর খুশির সীমা রইল না। অকারণে সৌজন্য করতে শেখে নি, খুশি গোপন করতেও না। তাই শিক্ষিতা মেয়েদের মতো—'কেন আবার এত খরচ করতে গেলেন'—এ কথা বলল না—আনন্দে সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মতোই হয়ে উঠল ওর অনতিশ্রী মুখখানা, চলনে-বলনে খুশি উপ্‌চে পড়তে লাগল।

তারপর একদিন ভূতেশবাবু অফিস বেরোবার সময়, টিফিনের খাবারে কিছু বিস্তৃত আয়োজন ছিল বলে একটু দেরি হয়ে গেছে, তাড়া করতে হয়েছে খুব—ফুলো আগুনের মতো কচুরি টিফিন-বাক্সে ভরে যখন ওঁর বেরিয়ে যাবার মুখে দিতে এসেছে—হঠাৎ-ই একটা কি মনে হ'ল, ভূতেশবাবু পকেট

থেকে রুমালখানা বার ক'রে ওর কপাল-গাল-গলার ঘাম মুছে দিলেন।

এতেও ফুলো খুশী হ'ল, লজ্জিত হ'ল না বিশেষ। বোধ হয় সে জ্ঞানই ওর নেই। শুধু বলল, 'রুমালখানা নষ্ট হয়ে গেল যে! দাঁড়াও, আর একটা এনে দিই।'

'না না, কিচ্ছু দরকার নেই। নষ্ট আবার কি, ভিজেছে, এই তো। তাতে আর কি, একটু পরেই তো ভিজত—রোজ ট্রামে উঠেই তো মুছতে হয়।' বলে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন ভূতেশবাবু।

এর পর এ ঘটনাটা প্রায়ই ঘটতে লাগল। আজকাল যেন উনি রুমাল হাতে ক'রেই বসে থাকেন। হাতটা এক আধ দিন গলা থেকে কিছু নিচেও নামতে লাগল। ফুলো বাধা দেয় না, একদিন শুধু বলেছিল, 'এত আদর দিচ্ছ, এর পর আমি যদি আরও পেয়ে বসি। মানুষের আশা বেড়ে যায়, জানো।'

'তাতে কি আমি ভয় পাই। তুই কত খাটিস আমার জন্যে, তোকে আদর দোব না।' বলেছিলেন ভূতেশবাবু, তবে বলে ফেলেই কেন কে জানে, যেন একটু লজ্জিত হয়েও পড়েছিলেন। তারপর দু'একদিন নিজেকে কিছুটা সংযত বা উদাসীনও রেখেছিলেন।

তবে ক'টা দিন যেতে দেখা গেল, আগের ব্যবস্থাতেই বেশি আনন্দ। ক্ষেত্রও ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে লাগল। হাত ও রুমাল কখনও কখনও জামার মধ্যেও গিয়ে পড়ে।

ফুলো কিছুতেই বাধা দেয় না। তেমনি কোন আগ্রহ কি ঔৎসুক্যও প্রকাশ করে না। অনুরাগও নেই, বীতরাগও নেই—খুব সহজ স্বাভাবিক-ভাবেই এটা নেয় সে, মনিবের এ আচরণ। যেন তিনি ভালবাসবেন, আদর করবেন—এটাই নিয়ম, অসঙ্গত কিছু করছেন না।

কিন্তু ফুলোর আগ্রহ বা ঔৎসুক্য না থাক, ভূতেশবাবুর থাকবে না কেন?

ক্রমশঃ সেটা বেড়েই যায়। একদিন সে আগ্রহ বা আবেগ সামলাতেও পারেন না, বুকের মধ্যে টেনে নেন, বুকে চেপে ধরেন—মুখটা তুলে ধরে চুমো খান। তাতেও বাধা দেয় না ফুলো, তেমনি কোন আকাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়াও জাগে না। নির্বিকার থাকে। তবে, সেই বাধা বা লজ্জা বা

সুখের চিহ্ন না দেখে ভূতেশবাবুই যেন চমকে উঠে, নিজের এই দুর্বলতায় লজ্জা পেয়ে যখন মুখটা সরিয়ে নেন—তখনও দেখা যায় ফুলোর মুখটা তেমনি ওঁর মুখের দিকে তোলাই থাকে প্রায় মিনিটখানেক। মনে হয় যেন চুম্বনটা দীর্ঘতর হবারই প্রত্যাশায়।

একে যেন চিনতে পারেন না ভূতেশবাবু। এ কি পাথর, না কাঠ? নাকি আদিম মানুষদের স্বভাবই এই—মঙ্গোলদের মতো মনের ভাব মুখে প্রকাশ পায় না।

তা হোক, তাতে পরিণত বয়সের নবজাগ্রত আবেগ ও ঈপ্সা বেশিদিন সংযত থাকে না।

দিন দুই পরে আবারও একদিন ফুলোকে আকর্ষণ করেন ভূতেশবাবু। সেদিনও বাধা দেয় না সে। সহজ ভাবেই ওঁর বিছানায় ওঁর পাশে শোয়।

কিন্তু, সেই চরম মুহূর্তেই একটা কাণ্ড হয়ে যায়—সশব্দে মায়ের এনলার্জ করা ছবিখানা ওপর থেকে পড়ে যায়। কাচ ভেঙে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে।

প্রচণ্ড রকম চমকে ওঠেন ভূতেশবাবু, ধড়মড় ক'রে উঠে বসেন। ফুলোও অর্ধ-উন্মোচিত জামায় বোতাম দিতে দিতে উঠে দাঁড়ায় একেবারে। সহজ ভবেই বলে, 'তুমি এখুনি উঠো না বাবু, চারদিকে কাচ, আমি এই বিছানা-ঝাড়া ঝ্যাটা দিয়ে এদিক থেকে ঝাঁট দিয়ে নিচ্ছি। তারপর দেখো। নইলে পা কাটবে।'

ভূতেশবাবু কিন্তু কেমন অন্যমনস্ক, বিহ্বল হয়ে গেলেন। দড়ি নয়, পেতলের শৌখিন শেকল দিয়ে টাঙানো ছিল ছবিখানা, এমন ভাবে ছিঁড়ে পড়ার তো কথা নয়। বেশিদিন হয়ও নি। অত দামী মজবুত ফ্রেম, তাও এমন ক'রে, এই সাত-আট ফুট উঁচু থেকে পড়ে ভাঙে কি করে?

তবে কি—

তবে যা মনে আসছে, মনে মনেই তাকে দূরে সরাবার প্রবল চেষ্টা করলেন ভূতেশবাবু, কিন্তু পারলেন না। সেটা স্পষ্ট ও প্রবল হয়ে উঠল।

রাঙীর শেষ কথাগুলো যেন উচ্চকণ্ঠে কানের কাছেই উচ্চারিত হচ্ছে তার গলা? না, তাও তো না। এ যেন কতকটা ওঁর মার গলার মতোই। "তোমার মরা মায়ের দিব্যি রইল, ওকে নিজের মেয়ের মতোই দেখবে,

গরিব বলে, দুঃখী বলে আমার দিব্যি উড়িয়ে দিও না।"

এই সংশয়, আশঙ্কা সামলে নিতে আরও দু'দিন সময় লাগল। এ নিতান্তই কাকতালীয়, বোধ হয় চেনটাই মজবুত নয়, আপন নিয়মেই তাই ভেঙে পড়েছে। তার জন্যে ঠোঁটের কাছে আসা মধুর পাত্র ত্যাগ করা মূর্খতা।

যে রাত্রে মনস্থির করলেন, তার পরদিন সকালেই রাঙীর আবির্ভাব।

সে গড় হয়ে ওঁকে প্রণাম ক'রে যা জানাল তা এই—ওঁদের পাশের বাড়িতে যে ছেলেটি ভাড়া থাকে, তারও দেশ উড়িষ্যায়, বলাঙ্গীরে, তবে বহুদিন এখানে আছে। ইলেকট্রিক সাপ্লাইতে কাজ করে—এখনই সাড়ে চারশোর মতো পায়। দেশে বিধবা মা আছে, তেমনি বিঘে পাঁচেক জমিও আছে। সে ফুলোকে বিয়ে করতে চায়, ফুলোরও নাকি তাকে খুব পছন্দ, সে-ই দেশের ঠিকানা দিয়েছে। ছেলেটি, অক্রূর নাম, সে এক পয়সাও নেবে না, উল্‌টে ফুলোকে তিনখানা গহনা দেবে। এছাড়াও রাঙীর যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া, তার ওপর আরও একশো টাকা ধরে দেবে। রেজেস্ট্রি ক'রে বিয়ে হবে—সে কাগজ রাঙীর কাছেই রেখে দেবে, কোন তঞ্চকতা; কি সহজে ত্যাগ করতে পারবে না। এখন বাবু ভরসা। ফুলোকে তিনি নিজের মেয়ের মতোই তো দেখেন, সেইভাবে একটু খোঁজখবর ক'রে দাঁড়িয়ে বিয়েটা দিয়ে দিন।

তবে, এ ভরসাও দিল রাঙী, বাবু কোন অসুবিধেয় পড়বেন না, যতদিন না আর একটা মনের মতো লোক পাওয়া যায়—রাঙীই থাকবে এখানে। বুড়োকে ক'মাস দেখাশুনো করার একটা লোকও ঠিক ক'রে এসেছে, ওরই এক মাসী, সেও খেতে পায় না—খেতে পেয়ে বর্তে গেছে। ইত্যাদি—

ভূতেশবাবুর শেষের এই কথাগুলো যে কানে গেল তা বোধ হ'ল না। তিনি ভাবছিলেন অন্য কথা। মার ছবিটা আবার বাঁধাতে দিয়েছিলেন, সেটা ফিরিয়ে আনতে হবে। ও ছবি ঘরে আর রাখবেন না, একটা কোন ছুটির দিন গঙ্গায় দিয়ে আসবেন।

একটা কি গালভারি নাম নিশ্চয়ই আছে, তবে সেটা এখন বোধ হয় কলেজের খাতায় আর আপিসের দপ্তরে সীমাবদ্ধ। ডাক নাম তাম্নু, তাম্নু বলেই জানে সকলে।

তাম্নুর অন্নসমস্যা ও জীবনসমস্যা এমন একসঙ্গেই মিটবে, তা কেউ আশা করে নি। তাম্নু তো নয়ই।

হায়ার সেকেণ্ডারী পাস ক'রে বছরখানেক কলেজেও পড়েছিল, কিন্তু তারপর সেও বুঝল এবং অভিভাবকরাও যে, লেখাপড়া আর তার হবে না। ঐ একটা পাসই অনেক কষ্টে দিয়েছে কোনমতে—তবু পাস করার গৌরবটা আছে, এ পরীক্ষায় ফেল ক'রে আর বদনাম কিনে লাভ কি। বাবার আপিসের অবস্থা ভাল নয়, যে কোন সময় উঠে যেতে পারে, এ বয়সে নতুন চাকরি কোথাও পেলেও এ মাইনে পাবেন না—সেদিকটাও ভাবা দরকার।

সুতরাং তাম্নু ও-পাট চুকিয়ে নিশ্চিন্ত হল। এ ক্ষেত্রে যা করা সহজ, পাড়ায় একটা টাইপ স্কুলে ভর্তি হল আর একে-ওকে, নিহাৎ কর্তব্য হিসেবেই, 'একটা কাজকর্ম দেখে দিন না' বলে আবেদন জানাতে লাগল।

এত সহজে আজকাল চাকরি হয় না—তাম্নুরও হ'ল না। হ'ল যা, পাড়ায় দু'-একটা টিউশানী, দুটো মিলিয়েও মাসে ষাট টাকার বেশি ওঠে না, তাতে কোনমতে সিগারেট আর সিনেমার খরচটা চলে। প্যাণ্ট কি শার্টের দরকার হলে এখনও মাকে দিয়ে বাবার কাছে দরবার জানাতে হয়।

এই যখন অবস্থা—বন্ধু দিব্যেন্দুর বিয়েতে গিয়ে একটি মহিলার সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেল। ওরা কজন বন্ধু বাসর জাগবে বলে ধরে পড়েছিল, দিব্যেন্দুর শ্বশুরমশাইও বিশেষ আপত্তি করতে সাহস করেন নি। এরা চারজন, মহিলারা প্রায় জনা ছয়েক—ফলে রাত্রের হুল্লোড় খুব জমেছিল। তার মধ্যে সে মহিলাও ছিলেন, দিব্যেন্দুর বৌয়ের মামাতো বোন, এঁদের দলে ওঁরই বয়েস একটু বেশি, প্রথমটা সেইমতো গাম্ভীর্য নিয়েই ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রথম যৌবনের এই উল্লাসতরঙ্গে তিনিও গা ভাসিয়ে দিলেন।

তার মধ্যে, 'কি ছিল বিধাতার মনে', তান্নুর ঐ মহিলাটিকে বেশ ভাল লাগল, সে মহিলা মন্দিরারও ভাল লাগল তান্নুকে। সেটা প্রকাশ পেল— তান্নু বিয়ের পরদিন নববধূ রত্নাকে যখন একটু পরে পরেই বার তিনেক প্রশ্ন করল, 'তোমার সেই দিদি—কী যেন—মন্দিরা না কী যেন? তিনি আসবেন তো?' (একটু আগেই যে প্রশ্ন করেছে সে কথা ভুলেই গেছে—আগ্রহে ও ব্যস্ততায়) এবং ফুলশয্যার রাত্রে মন্দিরা প্রায় এসেই শুধোল, 'হ্যাঁরে রত্না, তোর বরের সেই বন্ধুটি—কী যেন, তান্নু না কি বলে যেন ডাকছিল—খুব ইয়ার্কি করছিল অসভ্য-অসভ্য; সে আসে নি?'

রত্নার মজা লাগবে সে তো স্বাভাবিক। সে উত্তর দিল, 'সে আবার আসবে না! বলে তোমার জন্যে সে হন্যে হয়ে ঘুরছে। তার নাকি আর কিছু ভাল লাগছে না। এর মধ্যে একশো আট বার জিগ্যেস করা হয়ে গেছে—তিনি আসবেন তো? তোমার নাম জপমালা হয়ে উঠেছে।'

'যা যা! ফাজলামি করিস নি। আমি তার দিদির বয়িসী।'

কিন্তু বলতে বলতেই উৎসুক চোখ খুঁজে বার করল।

তান্নুও কুটুম-বাড়ির ভিড়ের মধ্যে বোধহয় উৎসুক ভাবে তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। দেখা মাত্র ভিড় ঠেলে এসে বলল, 'এই যে, বাব্‌বা, আসতে পারলেন? আপনি তো কাছেই থাকেন, আগেই তো চলে আসতে পারতেন।'

মন্দিরা বলল, 'কেন আসব? আজ এটা নিয়মের ব্যাপার, আমি কন্যা-পক্ষের আমন্ত্রিত—একসঙ্গে দল বেঁধে আসতে হবে না? বাস ভাড়া হয়েছে, সবাই আসবে, আমি একাই বা আসব কেন?'

'তা বাসই বা এত দেরি করল কেন?'

মন্দিরা হাসি চাপার চেষ্টায় একটু ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'মশাই বুঝি কখনও কোন বিয়ে বাড়ির ব্যাপার দেখেন নি! বাস এলে তবে মেয়েদের সাজ করার কথা মনে পড়ে। আর তত্ত্বও আসবে এই গাড়িতে—সেও তো সাজাতে তুলতে বড় কম সময় লাগে না।'

এ-ই শুরু।

এর পর তান্নুও মন্দিরার পরিচয়ের জন্য ব্যস্ত হল। মন্দিরাও অর্ধ-উদাসীনভাবে রত্নার কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তান্নুর পরিচয়, বিদ্যা এবং

আর্থিক অবস্থা কি, সব জেনে নিল।

মন্দিরার বয়স বর্তমানে ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ, অর্থাৎ তান্নুর থেকে প্রায় বছর দশেকের বড়। একটা বড় ব্যাঙ্কে কাজ করে, মাসে দেড় হাজার টাকা মাইনে পায়। বিয়ে হয়েছিল, স্বামীর বিলেত যাবার ঠিক আগে। তিনি সেখান থেকে আর ফেরেন নি, সেই কারণেই সেপারেশন হয়ে গেছে, তিনি সেখানে নাকি একটা লিবিয়ান মেয়ে বিয়ে করেছেন। মন্দিরার একটি মেয়ে আছে—বছর পনেরো বয়স, হোস্টেলে থেকে পড়ে,—মন্দিরা এই দিবুদের পাড়াতেই একখানা এক-ঘরের সরকারী ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে। একটি ঠিকে ঝি আছে—একা থাকে বলে দিনরাতের লোক রাখতে সাহস হয় না, সে ছু'বেলা এসে রান্না ও অন্য কাজ ক'রে দিয়ে চলে যায়।

মন্দিরাও তান্নুর সংবাদ কিছু কিছু সংগ্রহ করল বৈকি। কিছুই করে না বলতে গেলে, ছুটো একটা ছুটকো টিউশানী ভরসা—তাও একটা পাস অবধি বিদ্যে, কে আর বেশী মাইনে দেবে? সত্তর আশি টাকার মতো মাত্র পায়। চাকরি-বাকরি কোথাও জোটাতে পারে নি। টাইপ শিখেছে, কিন্তু তাতেই বা কি চাকরি কে দেবে? বয়েসও হয়ে গেল ঢের!

'ও মা, সে কিরে! তাহলে বিয়ে-থা করবে কবে?'

'কি করে করবে বলো মালাদি। চাকরি না হলে বিয়ে দেবেই বা কে, করবেই বা কি সাহসে?'

তখনকার মতো চুপ ক'রে গেল মন্দিরা। কিন্তু দিন তিনেক পরে একদিন আপিসের ফেরত গলদ্‌ঘর্ম অবস্থায় এসে রত্নাকে বললে, 'এই, তোর বরের সেই বন্ধু তান্নুবাবুকে বলিস তো কাল যেন অবশ্য অবশ্য আমার সঙ্গে আপিসে দেখা করে। এই নাম, সেকশান—কি বলে খোঁজ করতে হবে—সব লিখে এনেছি, এই কাগজখানা ওকে দিয়ে দিস। দেখলে তো মনে হয় স্মার্ট—খুঁজে নিতে পারবে ঠিক।'

রত্না আপত্তি করে, বলে, 'ওমা, সে যে থাকে অনেক দূরে, ও কখন ফিরবে, কখন খবর দেবে, ওরই যদি ফিরতে রাত হয়?'

'তা হোক, বলিস। বন্ধুকৃত্য করতে না হয় একটু কষ্টই করল। একটা লীভ্ ভেকান্সী আছে, টাইপিস্টেরই—কিন্তু কালই চাই। নইলে খদ্দের

ঢের, অন্য কেউ তার ক্যাণ্ডিডেট ঢুকিয়ে দেবে। আমি এজেন্টকে অনেক ক'রে বলে-কয়ে রাজী করিয়েছি।'

সে চাকরি হয়ে গেল। তার দেড় মাস পরে আর একটা। এটা প্রায় দিন কুড়ির কাজ। ভাল মাইনে, এ রকম মাইনে তান্নুর স্বপ্নাতীত। তারপর আর একটু তদ্বির, ধরাধরি, মিষ্টি হাসি, যথাস্থানে কলকাতা থেকে কেনা বর্ধমানের সীতাভোগ পৌছে দিয়ে হেড আপিসেও ক'দিনের কাজ জুটিয়ে দিল।

কোন মহিলা যদি একটু সুশ্রী দেখতে হন এবং মিষ্টি ক'রে হাসার অভ্যেস থাকে—তাহ'লে কী না করতে পারেন? বছর দুইয়ের মধ্যেই বহু 'বাধায় বিন্ধ্যাচল' ডিঙিয়ে তান্নুর একটা টেম্পোরারী য়্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দিল মন্দিরা। ভরসাও দিল, 'মনে হয় টিকেই যাবে।'

এর মধ্যে, স্বভাবতই, দুজনের মন স্থাণু হয়ে নেই। ঘনিষ্ঠতা বেড়েই গেছে, চাকরি যখন থাকে তখন তো বটেই, যখন থাকে না তখনও ছুটির সময় নাগাদ আপিসে চলে আসে—আগে আগে দুর্বল এবং চিরপুরাতন কৈফিয়ত দিত, 'এই এদিকে একটু এসেছিলুম' কিংবা 'অমুক আপিসে একটু দরকার ছিল'—এখন আর সে চেষ্টাও করে না। ছুটির পর মন্দিরার সঙ্গে ঘুরে বাজার ক'রে দেয়, সে বাজার পৌঁছতে ওর ফ্ল্যাট পর্যন্ত যায়—সেখানে চা খায়, কোনদিন মন্দিরা নিজে হাতে কিছু খাবারও ক'রে দেয়—তারপর অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়ে রাত নটা-দশটা নাগাদ বাড়ি ফেরে।

শোভনতার খাতিরে, পাড়া-ঘরে পাশের ফ্ল্যাটের অরবিন্দর মা কি মনে করবেন কিংবা রামবাবুরা—এই জন্যেই তাগাদা দেয় মন্দিরা। বেশী রাত হলে তান্নুর বাবাও বকাবকি করেন। সুতরাং নটা সওয়া নটার বেশি কোন-মতেই থাকা যায় না। রাত্রের টিউশানী অনেক দিনই ছেড়ে দিয়েছে, নইলে এতক্ষণও থাকা যায় না। এখনও সকালে একটা করে, তবে বেশীদিন আর করতে হবে না—মন্দিরার কাছে সে আশ্বাসও পেয়েছে।

আসক্তিটা কি শুধুই এই চাকরির জন্যে—বা মন্দিরা যে দামী দামী উপহার দেয়, বহুমূল্য প্যান্ট-শার্ট, আমদানী করা ঘড়ি—তার জন্যে? না, মন্দিরার দিক থেকে তো খাঁটি বটেই, প্রবল উদ্দাম হয়ে উঠেছে যেটা প্রায়—তান্নুর

দিক থেকেও কৃত্রিম নয়, সেটা মন্দিরা অনেক ক'রে বাজিয়ে দেখেছে। সে পোড় খাওয়া মেয়ে—বহু আত্মীয় তার, আপিসেও এতকাল চাকরি করছে—মানুষের মনের প্রধান রহস্যগুলো তার মোটামুটি জানা হয়ে গেছে। আবেগ কোন্‌টা সাচ্চা আর কোন্‌টা অভিনয় তা বুঝতে পারে বৈকি!

কথাটা অবশ্য প্রথম তানুই তুলল।

'এই—এবার আর তো বর পুষতে হবে না, ঘর-জামাইয়ের মতো—এসো আমরা আসল কাজটা সেরে ফেলি!'

বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। কোনমতে টেনে টেনে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'সে আবার কি? আসল কাজ!'

'বিয়ে! আর কি। আর কতকাল এমন ক'রে রাত নটায় বাড়ি ফিরব?'

'বিয়ে? যাঃ! কী বলছ? আমি তোমার চেয়ে বয়সে কত বড় তা জানো, অন্তত—'

ওর মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে তানু বলে ওঠে, 'কি হবে জেনে, মাস বছর তারিখের নির্ভুল অঙ্কটা? ভালবাসা ওসব হিসেব ধরে মেপে-জুপে হয় না। পৃথিবীর সব দেশেই বেশী বয়সের কনে অল্প বয়সের বরকে বিয়ে করার রীতি ছিল, এই ভারতবর্ষেরও অন্য সব দেশে, কেবল বাংলাদেশ ছাড়া। এখানেও এখন প্রচুর হচ্ছে। বলো হিসেব দোব, আমার হাতের মধ্যেই সাত-আটটা নাম আছে। এক ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ চব্বিশ বছর বয়সে চল্লিশ বছরের মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর চেয়ে মা কস্তুরবা বড় ছিলেন, বিলেতে আমেরিকায় তো হামেশা হচ্ছে। আমাদের মুদী মাতাপ্রসাদ তার দাদা লছমীপ্রসাদের বিধবাকে বিয়ে করল, ওর চেয়ে দশ বছরের বড়—তারও ছেলে হয়েছে, সে-ই এখন পেয়ারের বৌ। আর অত কথা কেন—দ্রৌপদী কি নকুল সহদেবের চেয়ে বড় ছিল না?'

'এঃ! হল শুরু যত তোমার বাজে বকুনি আর চ্যাংড়ামি কথা!'

মনে বল এসেছে এতক্ষণে, আনন্দের জোয়ারে হৃদয়-পদ্মটি টলমল করছে—মন্দিরা কৃত্রিম কোপের সঙ্গে ধমক দেয়। তারপর বলে, 'ছাখো, এখনটাই তো সব নয়, আজ থেকে দশ বছর পরে তুমি ছোকরাই থেকে

যাবে, আমার চেহারাটা কি দাঁড়াবে ভেবেছ ?'

'কিছুই বলা যায় না। পক্স্ হয়ে কিংবা একটা স্ট্রোক হয়ে আমিই বুড়ো পঙ্গু হয়ে যেতে পারি অকালে। তুমি কি তখন আমাকে ছেড়ে যাবে ? আর ছ্যাখো, এখনটাই ভোগ করে নাও না। অত পরের কথা না-ই ভাবলে ! একবার তো অনেক হিসেব ক'রে ভাল পাত্র দেখে তোমার বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন, যথাসর্বস্ব খরচ করেছিলেন তোমার ভবিষ্যৎ ভেবেই তো। কী লাভ হল ? "ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে মর ফিরে" !'

রাজী হতেই তো চায় মন্দিরা। অনেকদিন ধরেই তো চাইছে। মন মনের ভিতর চিৎকার করছে—'আমি বেঁচে যাই তুমি যদি আমাকে নাও, আমার এতদিনকার স্বপ্ন সাধ সার্থক হয়।'

শুধু কর্তব্য হিসেবেই এইটুকু বলা।

সে হাসি হাসি মুখে, প্রায় সজল চোখে তান্নুর চোখের দিকে চেয়ে রইল শুধু। তান্নুর কাছে সে সম্মতি পৌঁছতেই বা দেরি হবে কেন, সে এবার যেন স্বাধিকারেই ওকে সজোরে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিল।

মায়েরা চিরদিনের অবুঝ, তান্নুর মা রাগ ক'রে বলেন, 'না, ওসব ছিষ্টিছাড়া বিয়ের ব্যাপার এ বাড়িতে চলবে না। করতে হয় রেজেস্টারী ক'রে করো—তারপর যেখানে হয় গিয়ে ওঠো। আর ঘর তো ঠিকই আছে—সেই মাগীরই তো ঘর আছে শুনেছি।'

তান্নু শুষ্ক স্বরে বলল, 'সেই মতটাই শুনতে এসেছি। তারপর কোথায় থাকব—সে আমাদের মতো আমরা ঠিক করে নেবো। বাবার তো ফাইন্যাল নোটিশ হয়ে গেছে, তিন মাসের মাইনে দিয়ে বিদেয় করবে, আর যা ঐ ফাণ্ডের কটা টাকা। এ সতেরশো টাকার মতো মাইনে পায়—বাড়িতে এলে সুবিধে কি অসুবিধে হবে সেটাই ভাবো না। এত মেজাজ কিসে চলবে এর পর !'

ওর বাবা দুজনকেই ধমক দিয়ে উঠলেন, 'তুই কি এতকাল খাইয়ে পরিয়ে এসেছিস, না সেটা চলছে কিসে তার খবর নিয়েছিস। চাকরি যায়—দুটো পেট টিউশানী ক'রে হোক যে ক'রে হোক চালিয়ে নিতে পারব।' স্ত্রীকে

বললেন, 'একটা ছেলে, সে যাকে নিয়ে সুখী হয় হোক না, তোমার এত কথা বলার কি আছে। অজাত কুজাত নয়, অন্য ধর্মেরও নয়, বিয়ে করবে—নিজের বাড়ি থাকতে বৌয়ের ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠবে, সেইটেতেই তোমার মুখ উজ্জ্বল হবে? না না, এখানেই নিয়ে আসবে বৌমাকে। তবে, বিয়ে কিভাবে হবে —'

তানু বললে, 'সে হয়েই গেছে। আমাদের রেজেস্ট্রী বিয়ে। বন্ধু-বান্ধব দু-চারজনকে নিয়ে হোটেলে পার্টি দেব। তার আগে তুমি একটা ভাল দিন ঠিক ক'রে দাও, সেদিনই পার্টি দিয়ে সেখানকার ফেরত এখানে এসে উঠব। ফুলশয্যার মতো যা হয় এখানে হবে। ঘটা করার কিছু নেই।'

তানুর বাবাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। ষোল-সতেরো বছরের সন্তানের মাকে টোপর পরে মালা বদল করে বৌ-ভাত দিয়ে যে বিয়ে করার প্রস্তাব করে নি ছেলে—এইটেই বাঁচোয়া।

এর পর সুখেই দিন কাটছিল। পুত্রবধূ যথেষ্ট বিনত, শাশুড়ীকে সমীহ ক'রে চলে, আপিস যাবার সময় তাঁকে প্রণাম ক'রে যায় রোজ—মাস কাবারে হাজারটি টাকা এনে তাঁর হাতেই তুলে দেয়। তিনি গলে প্রায় জল হয়ে গেছেন।

এর মধ্যে ওরা দু জায়গায় বেড়িয়ে এল, প্রথম কোডাইকানাল গেল হনিমুন করতে, তারপর আগ্রা, দিল্লী—আপিসের টাকাতেই।

বছর দুই পরে একটা সমস্যা দেখা দিল। মন্দিরার মেয়ে স্তুতি বাইরের হোস্টেলে থাকত। ছুটিতে মার কাছে আসত, মার ঘরেই থাকত। মার বিয়ের পর একটা বড় ছুটি এড়িয়ে গেছে পড়ার নাম ক'রে, আর একটা ছুটিতে সোজা কাশী চলে গিছল ওর দিদিমার কাছে। তিনি বিস্মিত এবং বিপন্ন হলেও নাতনীর সঙ্কোচ এবং লজ্জার কারণ বুঝে 'না' বলতে পারেন নি। তিনি একখানা ঘরে থাকতেন, কিছু টাকা তাঁর হাতে ছিল, কিছু তাঁর মেয়েও পাঠাত। স্থানাভাবটাই বড় কথা।

কিন্তু বি. এ. পরীক্ষার মুখে তার জন্য একটা স্থায়ী আশ্রয় চিন্তা করার প্রয়োজন হল। কথাটা সকলকার সামনেই পাড়ল মন্দিরা। তানুর মা বললেন, 'ওমা, উ কি কথা। তোমার মেয়ে তোমার কাছেই থাকবে। এ কি

তুমি পরের বাড়ি বাস করছ। আমরা থাকতে তুমি অত চিন্তা করছ কেন?'

মন্দিরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। পরীক্ষার পর একেবারে হোস্টেলের পাট চুকিয়ে ওকে নিয়ে এল এখানে। চিরদিনই বলতে গেলে বাইরে হোস্টেলে থাকা মেয়ে, এখানে এসে মানিয়ে চলতে পারবে কিনা—এঁদের একটু আশঙ্কা ছিল, মেয়ে স্তুতি আসার দিন দশেক পরে এঁরাও নিশ্চিন্ত হলেন। ভারী মিশুকে মেয়ে। শ্যামলা রঙ, তবে তার মধ্যেই শ্রী অপরিসীম—আর তেমনি প্রাণচঞ্চলা, হাসিখুশী। তানুর বাবা, মা সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

মাস তিনেক পরে মন্দিরাকে ছ মাসের জন্যে শিক্ষক হিসেবে ব্যাঙ্কেরই এক ট্রেনিং সেন্টারে যেতে হল। সে প্রস্তুত হয়েছিল মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, মেয়েটা তো তার সঙ্গ পেলই না বলতে গেলে, এখনই আবার সম্পূর্ণ অপরিচিতদের মধ্যে রেখে যাবে! তানুও বলেছিল, 'তুমি নিয়েই যাও, নইলে এখানে ওর হয়ত খুব খারাপ লাগবে!'

কিন্তু স্তুতিই বেঁকে বসল, 'বারে, এতকাল পরে কলকাতায় এলাম, আবার আমি যাই সেই রঘুনাথগঞ্জ না কোন্ ধাধ্ধাড়া গোবিন্দপুর। আমি দিদার কাছে বেশ থাকব'খন।'

দাদাও বললেন, 'থাক না বাপু। তোমরা দুজন চলে যাবে, তানু আপিসে থাকবে—আমাদের এ বাড়ি যেন গিলতে আসবে।'

মন্দিরা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে জানাতে সুখী ও নিশ্চিন্ত মনে বিদেশ চলে গেল।

খুব দূরে নয় জায়গাটা। মধ্যে একটা পরপর তিন দিন ছুটি পড়ায় বাড়ি এসেছিল মন্দিরা। দেখল মেয়ে বাড়ির বাইরে বিশেষ যেতে চায় না, এর মধ্যে একদিন শুধু থিয়েটার গিছল তানুর সঙ্গে—বাড়িতেই দিনরাত হইচই করে কাটায়। খুনসুড়ি ঠাট্টা ইয়ার্কিটা তানুর সঙ্গেই বেশি, তানু যতক্ষণ থাকে—তার সান্নিধ্য ছাড়তে চায় না।

বেশী সময় হাতে ছিল না, চলে যেতেই হ'ল। কিন্তু এবার গেল বেশ একটু অশান্তি নিয়ে—চিন্তিত মনেই। ঠিক এই ধরনের অন্তরঙ্গতা ও প্রীতির

জন্যে প্রস্তুত ছিল না সে। এর আগে বরং আশঙ্কাই ছিল অন্য, তান্নু সম্বন্ধে বিদ্বেষ না হোক বিরূপতা বোধ করবে, কঠিন হয়ে থাকবে। এতটা সৌহার্দ্য বন্ধুর মতো—স্বাভাবিক নয় মোটেই। সে বহুদর্শী, তার শ্বশুর-শাশুড়ী যা দেখতে পান না, সে তা পায়।

দিন পনেরো কোনমতে কাটাল, আর থাকতে পারল না। অস্থির হয়ে উঠল ভেতরে ভেতরে। ওখানের যিনি কর্তা, তাঁকে মেয়ের অসুখের অজুহাত দিয়ে সপ্তাহের মাঝামাঝি একটা দিনের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সকালের গাড়িতে সেখান থেকে বেরোল, বেলা চারটেয় কলকাতা পৌঁছবার কথা। পৌঁছলও তাই, তবে তখনই বাড়ি গেল না। খানিকটা এখান ওখান ঘুরে কাটিয়ে ঠিক সন্ধ্যা হয় হয় সময়ে বাড়ি এল। অনেক হিসেব ক'রেই সে এ সময়টার কথা ভেবেছে। বাবা পাড়ায় এক ঠাকুর-বাড়িতে পাঠ শুনতে যান, ঝি কাজ সেরে চলে যায়, মা রান্নাঘরে খুটখাট কাজে ব্যস্ত থাকেন। ছেলের জন্যে জল খাবার করা, কুটনো কোটা, এইসব। একটা ভয় ছিল, ঝি চলে যাবার পর যদি মা দরজা বন্ধ করে দিয়ে থাকেন। তবে সেটা প্রায়ই হয় না। তান্নু কখন আসে ঠিক নেই, সে জন্যে ভেজানোই থাকে।

আজ খোলাই ছিল। নিঃশব্দে দরজা খুলে জুতোটা সেখানেই রেখে খালি পায়ে ওপরে উঠে গেল।

একেবারে নিজের ঘরে গিয়ে দেখল—তান্নু হয় আজ আপিস যায় নি কোন অজুহাতে, অথবা অনেক আগে এসে গেছে—ওদের খাটে তান্নু ও স্তুতি গভীর আলিঙ্গনে বদ্ধ।

বাকী যা, ঠিক কতখানি কি, কি হচ্ছে—আর দেখতে পারল না সে। ঘরে আলো নেই, সন্ধ্যার আবছায়াতে সব দেখাও যায় না। তবে যেটুকু দেখেছে, সেটুকুই যথেষ্ট। শুধু আর্তকণ্ঠে একটা 'খুকী' উচ্চারণ ক'রে প্রায় ঝড়ের বেগে নিচে নেমে গেল। নামবার সময় শাশুড়ী দেখেছেন, তিনি বোধ হয় ডাকতেও লাগলেন, কিন্তু সে কোন কিছুই ওর মাথাতে গেল না।

সে রাতটা এক বন্ধুর বাড়ি রইল। পরের দিন সকাল থেকে সারাটা দিন ঘুরে তিন হাজার টাকা সেলামী ও দুশো টাকা ভাড়ায় একটা ঘর ঠিক ক'রে

ফেলল। তার পরের দিন কিছু কিছু মাল কিনে মোটামুটি বসবাসযোগ্য করে নিয়ে বিকেলের দিকে সেই বান্ধবীকে নিয়েই বাড়ি গেল। ইতিমধ্যে আপিসে টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছে মেয়ে খুব অসুস্থ বলে। এর চেয়ে সত্য আর কি হতে পারে।

যাবার সময় তানুর সঙ্কোচে আশঙ্কায় পাণ্ডুবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে বেশ শান্ত কণ্ঠেই বলে এল, 'দোষ আমার মেয়েরই বেশি, কিংবা আমারই মানুষ করার দোষ, নিজের কাছে না রেখেই অন্যায় করেছি। কিন্তু সে যাই হোক, ঘর বাঁধা আমার অদৃষ্টে নেই। তুমি যদি অন্য বিয়ে করতে চাও, সেপারেশনের ব্যবস্থা করো, সে খরচপত্র আমিই দোব। আর যদি পারো অপেক্ষা করো, এই মেয়ের বিয়ে নয় চাকরি—একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে গেলে আমি আবার ফিরে আসব।'

বাচা-মরা

বাস যাদবপুর স্ট্যাণ্ড থেকে ছেড়ে এসে প্রথমে যেখানে দাঁড়ায়, যেখানটায় একটু আলো-আঁধারির মতো আছে বরাবরই। পথের আলো জ্বললেও সেখানটায় ভালো ক'রে দেখা যায় না কিছু।

সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল লোকটি। ছেঁড়া ধুতির কোঁচাটা গায়ে জড়ানো। খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি গোঁফ—একটা অসহায় দীন ভঙ্গী—এ ছাড়া কিছু চোখে পড়ে নি প্রথমটায়। একটু থেমে থেমে কুণ্ঠিতভাবে ভিক্ষা চাইছিল। মনে হ'ল এখনও অনভ্যস্ত, 'বাবু কিছু দেবেন দয়া ক'রে? আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বড় কষ্টে পড়েছি—কিছু সাহায্য করবেন?'

সাধারণত এ সব অনুনয়ে কান দিই না, দিলে চলে না, কিন্তু আজ কেমন যেন মায়া হ'ল—যা হাতে উঠল একটা পাঁচ নয়া পয়সাই দিয়ে দিলাম। আর একটি অল্পবয়সী ছোকরা বোধ হয় কিছু দিল, আর কেউই তার অর্ধ-ব্যক্ত অনুনয়ে কর্ণপাত করল না। সময়ও ছিল না বেশি, বাস ছেড়ে দিল দাঁড়াবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

আমি বাইরেই ঝুলছিলাম, একেবারে পাশ দিয়ে যাবার সময় ওদিকের একটা গাড়ির আলো এসে পড়তে লোকটির মুখখানা দেখতে পেলাম।

আরে, এ যেন চেনা চেনা না? খুবই পরিচিত মনে হচ্ছে। আরে—!

খুবই পরিচিত—তবু তখনই ঠিক মনে পড়ল না। মনে পড়ল অনেকক্ষণ বাদে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে। সমস্তক্ষণই মনে না পড়ার অস্বস্তিটা পীড়া দিচ্ছিল বলে চিন্তাটা যায় নি, অবশেষে মনে করতে পেরে যেন বাঁচলুম।

বিধু! বিধু চাটুজ্জে!

একসময় মার্চেন্ট আপিসে খুব যাতায়াত ছিল। তখন আমি ছাপার অর্ডার সাপ্লাই করি, বিল, মেমো, লেটার হেড, ভাউচার ইত্যাদি ছাপার অর্ডার নিয়ে বাইরের প্রেস থেকে ছাপিয়ে সরবরাহ করতুম। সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেকার কথা—৪২ সাল পর্যন্ত কারবার চালিয়েছিলুম। দু পয়সা থাকতও—কিন্তু লড়াই জোর হ'তে যখন পয়সা উড়তে শুরু হ'ল বাতাসে, প্রতিযোগীর সংখ্যাও বাড়ল। বিশেষ উত্তর-পশ্চিম ভারতের একদল কারবারী ঘুষের মাত্রা এমন বাড়ালেন—'ইন ক্যাস য়্যাণ্ড ইন কাইণ্ড,' এনি কাইণ্ড, যে—আমাদের মতো লোক আর টিকতে পারল না, পিছু হঠল।

সেই সময়ই বিধুর সঙ্গে পরিচয়। একটা বড় আপিসে পিওনের কাজ করত। ব্রাহ্মণ ও ভদ্রবংশের ছেলে এটা জানতুম, ম্যাট্রিক পাসও—অত্যন্ত দরিদ্র বলে, আর সুপারিস ধরার লোক না থাকায়, ঐ কাজ নিতে বাধ্য হয়েছিল।

সেই বিধুর এই হাল! বেচারা! চাকরিটা গেছে নিশ্চয়, বয়েস হয়েছে—হয়ত রিটায়ারই করিয়ে দিয়েছে। কিছুই জমাতে পারে নি, এখন ভিক্ষে ছাড়া আর গতি কি? কত লোককে যে নিত্য এই পথে নেমে আসতে হচ্ছে!

মনটাকে যতই দার্শনিক করার চেষ্টা করি না কেন, বিধুর চিন্তাটাকে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলতে পারি না। ঘুরে ফিরে ওর অসহায় লজ্জাহত মুখখানা মনে পড়ে।

কারণও আছে একটু। সে সময়ে বিধু আমাকে খুব সাহায্য করেছিল; কতকটা নিঃস্বার্থভাবেই করেছিল। ওদের এক বড়বাবু অপর একজনের কাছ থেকে কিছু কাঞ্চন-প্রতিশ্রুতি পেয়ে—প্রায় আদা-জল খেয়ে লেগেছিলেন আমাকে উদ্বাস্ত ও উদ্ব্যস্ত করার জন্যে। আমার নিজস্ব ছাপাখানা নেই, পাঁচ

জায়গা থেকে কাজ করাই। ফলে ছাপার স্ট্যাণ্ডার্ড থাকে না। এইটেই তাঁর প্রধান যুক্তি। তাছাড়া ছোটখাটো কামড় তো অজস্র। কোথায় একটা ভাঙা 'এফ' পড়েছে, শেষের হরফটায় কালি পড়ে নি—নিত্যই একটা না একটা খুঁত বার করতেন। তাতেও যখন উৎখাত করতে পারলেন না, তখন বাঁধানো প্যাডের মধ্যে থেকে কয়েকখানা ক'রে পাতা সরিয়ে নিয়ে সাহেবের কাছে প্রমাণ করতে লাগলেন যে আমি প্যাড পিছু কুড়ি শীট কম দিয়ে পুরো একশো শীটের দাম নিচ্ছি।

সে যাত্রা বিধুই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। কে পিছনে লাগছে আমি জানতে পারি নি। বিধুই নাম বলে দিলে। শুধু তাই নয়, আমার পাওনা বিলের শতকরা এক টাকা কবুল ক'রে তাঁকে নীরব করার ব্যবস্থাও করল সে-ই। তার পর থেকে বেশ নিরুপদ্রবেই কেটেছিল ক'বছর, ঐ বিয়াল্লিশ সাল পর্যন্ত। ততদিনে সে বড়বাবুর রিটায়ার করার সময় হয়ে গিছল। সে জায়গায় যিনি এসেছিলেন তাঁর রাঘব বোয়ালের 'হাঁ' আর সে হাঁ ভরাবার লোকেরও অভাব রইল না, অগত্যা আমাকেই রণে ভঙ্গ দিতে হ'ল।

সেই বিধুর এই দুর্দশা মনের মধ্যে কাঁটার মতো খচখচ করতে লাগল। একটু দেখা হ'লে ভাল হ'ত। যদি কাজকর্ম করার মতো শরীরের অবস্থা থাকে এখনও, হয়ত সে চেষ্টাও কিছু করতে পারি। কিন্তু থাকে কোথায় কিছুই তো জানি না। ঐখানে যখন ভিক্ষা করছিল, নিশ্চয় ঐ পাড়াতেই থাকে। কিন্তু যাদবপুর জায়গাটাও তো এতটুকু নয়—কোথায় খুঁজব জনৈক বিধু চাটুজ্জেকে! আবার এও মনে হ'ল, যে পাড়ায় থাকে, ভদ্রসন্তান—সে পাড়ায় নিশ্চয় ভিক্ষা শুরু করবে না। অন্য কোথাও থাকে। কিন্তু সে-ই বা কোথায়?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎই মনে পড়ল, আচ্ছা, ওর আপিসে গিয়ে খোঁজ করলেই তো হয়। নিশ্চয় ওর চেনা লোক—অন্য পিওন চাপরাশী বা কেরানী বাবুরাও কেউ কেউ আছে—ঠিকানাটা কি কেউ বলতে পারবে না? রিটায়ার করলেও এমন বেশীদিন করেনি যে সবাই ভুলে যাবে তার কথা।

সদিচ্ছা যথেষ্ট থাকলেও সময় পাওয়া গেল না কদিন। হপ্তা দুই পরে একদিন আপিস অঞ্চলে গিয়ে কথাটা মনে পড়ল। আপিসটা এখনও সেখানেই আছে, খুঁজতে হবে না। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে প্রথম যার সঙ্গে দেখা হ'ল—সে শ্রীমান বিধু, যথারীতি আপিসের খাকী উর্দি পরে গেলাসে ক'রে নিচের তলার ক্যান্টিনে চা আনতে যাচ্ছে কোন বাবুর।

'আরে, বিধু তুমি! তোমার চাকরি আছে এখনও? তবে যে—'বলতে গিয়েও থেমে গেলুম। আশপাশে অনেক লোক, তাছাড়া যদি আমারই দেখায় ভুল হয়—? বিধুই বা কি মনে করবে?

কিন্তু বিধু আমার অনুক্ত প্রশ্নটা বুঝল। তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম সেরে নিয়ে মাথা হেঁট ক'রে প্রায় চুপিচুপিই বলল, 'বুঝেছি বাবু। আপনি ভুল দেখেন নি সেদিন, আমিও আপনাকে চিনতে পেরেছিলুম, বাঁ হাতে লাঠি ধরা ছিল আপনার—পুরনো অভ্যেস। দয়া ক'রে নিচে চলুন—রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলার সুবিধে হবে।'

আমার কৌতূহল আর ধৈর্য মানছিল না। নেমে রাস্তায় পড়েই প্রশ্ন করলুম, 'তার পর? বলো তো কী ব্যাপার? চাকরি আছে, মাইনেও তো এরা কম দেয় না—তবে?'

'হ্যাঁ বাবু, চাকরি আছে মাইনেও পিওনের কাজ হিসেবে ভালই দেয় বৈকি, কেটেকুটে নিয়েও দুশো তিন টাকা হাতে পাই। গোবিন্দপুরে যা হোক একটা মাথা গোঁজার চালাঘরও আছে। ভাড়া দিতে হয় না। তবে সাত বছর টেক্স দেওয়া হয় নি, কর্পোরেশন নালিস ক'রে যদি নিলামে তুলে দেয় তাহলে অবশ্য সেটুকুও থাকবে না। কিন্তু বাবু কী বাজারটা পড়েছে তা দেখছেন তো, ছখানা রেশনকার্ড, সপ্তাহে ষোল-সতেরো টাকার রেশনই লাগে—সাড়ে চার হপ্তায় মাস—হিসেব করুন না। এছাড়া বাড়তি চাল, চিনি, তেল, নুন, মশলা, ডাল, কয়লা, ঘুঁটে, বাজার, কাপড় জামা, ছেলেমেয়েদের খরচা—সবগুলো ধরুন, কোথায় দাঁড়ায়? বুড়ো মা, আশি বছর বয়স প্রায়, ভীমরতি ধরেছে, দিনরাত খাইখাই করছে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার পাট চুকে গেছে—আর আমার ক্ষ্যামতা নেই। কিন্তু একটারও তো কোন চাকরিবাকরি ক'রে দিতে পারি নি। অথচ তারা ডাগর হয়েছে, পেট বেড়েছে,

প্রমাণ সাইজের পোশাক লাগে—হাত খরচাও দরকার। ফী বছরই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে ধার করতে হয়, আমি মলেও এরা বিশেষ কিছু পাবে না। তার মধ্যে আমার পরিবার খেটে খেটে আর না খেয়ে—চায়ে তাও একটু হুধ জোটে না—র চা গুড় গুলে খাওয়া—এমন য়্যানিমিক হয়ে পড়ল—গত শ্রাবণ মাসে যমে-মানুষে টানাটানি। হাসপাতালে নিয়ে গেলুম—মিশন হাসপাতাল, তাও ফ্রী বেড নেই, হাতে পায়ে ধরে কিছু কম হ'ল এই পজ্জন্ত। কিন্তু ওষুধ? তাতেই যা যেখানে ছিল, ঘটি বাটি সুদ্ধ বিকিয়ে গেছে। এখন বাড়িতে এনেছি, ডাক্তাররা বলছে নড়তে দিও না, ভাল ভাল খাওয়াও, রক্ত হয় এমন সব ওষুধ দাও। এখন আমি কী করি বলুন তো? সেই জন্যেই সেদিন ঐ চেষ্টা আমি করছিলুম। এমন দৈব, ঠিক সেইদিনই—'

তখনও লজ্জায় মাথা হেঁট করল বিধু।

'তা হ'ল কিছু?'

'কিছু না। সেই বলে না—জাতও গেল পেটও ভরল না, তাই—সাকুল্যে সাতাত্তর নয়া পয়সা। অথচ দেখুন, সেই চেনা লোকের সামনেই পড়ে গেলুম। আর তাও, সময়ই বা কোথায় বলুন, সকাল থেকে বাজার রেশন ডাক্তার সবই তো করতে হয়—রাত্রে হেঁটে বাড়ি ফেরা—অনেক দেরি হয়ে যায়। মেয়েটা একা—রান্নাকরা বাসন মাজা, রুগী সামলানো, পেরে ওঠে না, তাকেও সাহায্য করতে হয়। সেইদিনটা রবিবার ছিল বলেই—'

আর দাঁড়ানোর সময় ছিল না। পকেট থেকে দশটা টাকা বার ক'রে ওর হাতে দিয়ে বললুম, 'এটা রাখো—তোমার স্ত্রীকে একটু ফলটল কিনে দিও। কী আর বলব?'

'এক মিনিট বাবু—' বিধু বলল, একটু ইতস্তত ক'রে, 'বাবু, আপনার তো অনেক বইটই বাজারে বেরিয়েছে—আপনাকে অনেকে চেনে-জানে—আমার হুখানা নাটক লেখা আছে—একটা কিছু গতি হয়? হাসবেন না। একজন খান হুই বই নিয়ে নিজের নামে যাত্রায় চালিয়ে ছিল, পঁচিশ টাকা হিসেবে দিয়েও ছিল, যাত্রায় বেশ জমেওছে—কেউ এমনও নেয় না? নামে দরকার নেই, যদি দশ-কুড়িটা টাকাও দিত—খুব উপকার হয়, সত্যি বলছি বাবু!'

দুরাশা

শশধর ঘাট হইতে উঠিয়া আসিয়া নীলকণ্ঠের দোকানে বোঝাটা নামাইয়া রাখিল, তারপর একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিয়া চোখ বুজিয়া কহিল, 'একটু তামাক খাও সেনের পো, আজ রোদ্দুরটা বড় লেগেছে। আমি আর টিকে ধরাতে পারব না।'

নিচে পারঘাটা, ঠিক উপরে মোটরবাসের আড্ডা। এইখান হইতে বিভিন্ন গ্রামে যাইবার বাস ছাড়ে। সেই উপলক্ষে গুটি-দুই চায়ের দোকান, একটি খাবারের দোকান এবং একটি মুদীর দোকান গড়িয়া উঠিয়াছে। পারঘাটের হিন্দুস্থানী মাঝির দল, বাসের কণ্ডাক্টার এবং ড্রাইভারের দল ও বিবিধ পণ্য বিক্রয়ার্থীর দল মিলিয়া এই ছোট ছোট দোকানগুলিকে দিনরাত সরগরম করিয়া রাখে।

এই দোকানগুলিরই পিছনে ছোট্ট একটি চালায় শশধর থাকে, তাহার জন্য ঘাটের ইজারাদারকে মাসিক এক টাকা ভাড়া দিতে হয়। সে প্রতিদিন একটা বড় ঝুড়িতে নানারকম শৌখিন জিনিস সাজাইয়া গ্রামান্তরে ফেরি করিতে যায়,—জাপানী গেঞ্জি, কাচের বাসন, গিল্টির গহনা, এমনি নানা জিনিস। সপ্তাহে একদিন ওপারে গিয়া শহর হইতে পাইকারী দরে জিনিস-গুলি কিনিয়া আনে, কোন কোন দিন আবার শহরেও ফেরি করিতে যায়।

শশধর কোথা হইতে আসিয়াছে তাহাও যেমন কেহ জানে না, তাহার কোনও কুলে কেহ আছে কি না, তাহাও কারও জানা নাই। তাহার বয়স বোধ করি চল্লিশের কাছাকাছি হইবে, দীর্ঘ কৃশ দেহ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং একটি চক্ষু কানা, সহসা দেখিলে বিতৃষ্ণাই জন্মে, কিন্তু দীর্ঘকালের পরিচয়ে সে এই আড্ডার প্রায় প্রত্যেকেরই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

নীলকণ্ঠ কাহাকে বাতাসা ও মোণ্ডা বিক্রয় করিতেছিল, শশধরের গলার শব্দ পাইয়া কহিল, 'এখনও তো খেয়া আসে নি, কিসে এলে শশধর?'

চোখ না খুলিয়াই শশধর জবাব দিল, 'ঘাটে এসেই দেখলুম খেয়া ছেড়ে দিয়েছে; এপারে এসে ফিরে যেতে অনেক দেরি দেখে এক বেটা খোট্টার

নৌকোয় চড়ে চলে এলুম। চারটে পয়সা দিতে হ'ল।'

কণ্ডাক্টার শশী কহিল, 'তা তোমার এত তাড়াই বা কিসের, বাড়িতে তো কেউ নেই যে, দেরি হলে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবে।'

এইখানটায় শশধরের বড় ব্যথা ছিল, এবং শশী তাহা জানিয়াই কথাটা বলিয়াছিল। শশধর নিমেষে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, 'ছাখ্ সব সময়ে ইয়ার্কি ভাল লাগে না শশী, মানুষের শরীরে ভালমন্দ আছে।'

কথাটা চাপা দিবার জন্য নীলকণ্ঠ কলিকাতে ফুঁ দিতে দিতে কাছে আসিয়া বসিয়া কহিল, 'আজ কি গস্ত করলি শশধর?'

শশধর বোঝার উপরের কাপড়টা সরাইয়া দিয়া কহিল, 'আজ গোটাকতক দার্জিলিংয়ের পাথরের মালা পেয়েছি হে নীলকণ্ঠ—মোটা দামে বিক্রী করব বাবুদের বাড়ি।'

ড্রাইভার সুরেশ চায়ের কাপটা তাড়াতাড়ি নামাইয়া রাখিয়া হুমড়ি খাইয়া আসিয়া পড়িল, 'কই দেখি কি রকম মালা, মাইরি আমাকে একটা নিতে হবে বোয়ের জন্য। কাল সকাল ক'রে আমায় বাড়ি ফিরতে বলেছিল, কিন্তু শঙ্করদের ওখানে তাস খেলতে বসে এমন জমে গেলুম, ফিরতে একেবারে রাত একটা বাজল। সেই রাগে কাল সারারাত মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়ে রইল, একটা কথা পর্যন্ত কইলে না।'

কথা কহিতে কহিতেই সুরেশ মালা কয়গাছি ঘাটিয়া একটা মালা টানিয়া বাহির করিল। কহিল, 'এটা কত নেবে শশধরদা?'

যে মালাটি সুরেশ বাহির করিয়াছিল, বাস্তবিক সেইটাই সর্বাপেক্ষা ভাল দেখিতে। শশধর খপ করিয়া মালাটি তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া কহিল, 'কিছু মনে করিস নি ভাই সুরেশ, এটা দিতে পারব না, এটা রায়েদের বাড়ি দেব বলে এনেছি।'

সুরেশ বিস্মিত হইয়া কহিল, 'কেন বাপু, তুমি দাম যেটা সেখানে বেশি পাবে সেটা আমার কাছ থেকেই নাও না—

শশধর কহিল, 'না না, দামের কথা নয়, ভাল জিনিস দিলে ভাল খদ্দের বজায় থাকে, তা জানিস।'

সুরেশ ক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু সে দিন তাহার কিছু একটা লওয়া প্রয়োজন

বলিয়া রাগ করিতে পারিল না, আর একটা মালা বাছিয়া লইয়া আট আনা পয়সা শশধরের হাতে দিল।

শশী সুরেশের কথার জের টানিয়া কহিল, 'তা যাই বলো ভাই, ও-বিষয়ে আমি তোর চেয়ে ভাল আছি। যত রাত্তিরেই বাড়ি ফিরি না কেন, মুখ-হাত ধোবার জল, গামছা এগিয়ে দিয়ে তবে অন্য কথা। আর ভাত খাবার সময়েও পাখাটি নিয়ে বসা চাই, তা—কে জানে শীত, কে জানে গরম! ঝগড়া করে বটে, রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে—'

সুরেশ বিড়ি ধরাইতে ধরাইতে জবাব দিল, 'সেবা কি আর আমার বৌ-ই করে না? এই তো সে দিনের কথা, বেজার পাল্লায় পড়ে মাল খেয়েছিলুম বলে বৌ দু'দিন কথা কয় নি। যখন দেখলুম বেগতিক, তিনদিনের দিন ছোট বোনটাকে ডেকে বললুম, শরীর বড় খারাপ লাগছে বিন্দি, বোধ হয় আর বাঁচব না। সে তো বুঝলে কচু, বৌ একেবারে কেঁদে কেটে অনর্থ। কোথায় বা গেল রাগ, আর কোথায় বা গেল কি!'

নীলকণ্ঠ মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল, 'আমার আবার ঠিক বিপরীত, আমিই মাঝে মাঝে রাগ করে খুকীর মায়ের সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রে দিই, সে কেঁদে, পায়ে ধরে কথা বলায়। গত বছর পুজোর সময়—'

শশধর ইহাদের কথাগুলি হাঁ করিয়া শুনিতে ছিল। সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'চললাম হে নীলকণ্ঠ, একটু গড়িয়ে না নিলে শরীরটা জুত লাগছে না।'

নীলকণ্ঠ ব্যস্ত হইয়া উঠিল, 'আরে তামাকটা খেয়ে যাও—'

শশধর বোঝাটা মাথায় তুলিতে তুলিতে কহিল, 'সে তখন রাত্তিরে খাওয়া যাবে—'

দোকানগুলি রাস্তার উপরেই, কিন্তু শশধরের চালাটা রাস্তা হইতে খানিকটা নামিয়া যাইতে হয়। সুতরাং তাহার ঘরটি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই লোকচক্ষুর অগোচর।

শশধর দাওয়ায় উঠিয়া বোঝাটা নামাইয়া রাখিল। তাহার পর চাবি খুলিয়া ঘর হইতে গাড়ু-গামছা বাহির করিয়া মুখ হাত ধুইয়া মাথায় খানিকটা জল থাব্‌ড়াইয়া দিল। এই গাড়ুটি সে প্রত্যহ সকালবেলা মাজিয়া জল

ভরিয়া রাখিয়া যায়, গামছাখানিও পাট-করা অবস্থায় গাড়ুর নলে ঝোলানো থাকে। যেন কেহ তাহারই আগমন প্রতীক্ষায় সাজাইয়া রাখিয়াছে—

শশধর মুখ মুছিতে মুছিতে হাঁকিয়া কহিল, 'কই গো, তামাক দিয়ে যাও!'

বলা বাহুল্য কেহই তামাক দিয়া গেল না, তাহাকেই সাজিতে বসিতে হইল। কিন্তু এটি তাহার বহুকালের অভ্যাস। শশধরের বিবাহ হয় নাই—হওয়া অসম্ভব বলিয়া নয়—ব্যবস্থা করিয়া বিবাহ দিবার মতো আত্মীয়-স্বজন কেহ ছিল না বলিয়াই হয় নাই। গ্রামের লোকেরাও কেহ চেষ্টা করে নাই, কতকটা সেই দুঃখেই সে বিদেশে এই নির্বান্ধব স্থানে বাস করিতেছে।

কিন্তু বিবাহের ইচ্ছা শশধরের প্রবল এবং এখনও সে সে-আশা রাখে। শুধু তাহাই নয়, সে মধ্যে মধ্যে কল্পনা করিবার চেষ্টা করে যে, তাহারও বৌ আছে এবং সেবা করিতেছে।

তাহারই খেয়াল-খুশির মুখ চাহিয়া একটি তরুণীর প্রতি দিন-রাত্রি কাটিতেছে, এই কথাটা কল্পনা করিয়া তাহার সমগ্র দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে এবং সেই কল্পনার আনন্দেই সে প্রত্যহ ভাত রাঁধিয়া নিজেই থালায় বাড়িয়া, আসন পাতিয়া রাখিয়া একবার বাহির হইতে খানিকটা পায়চারি করিয়া আসে—যাহাতে বসিবার সময় মনে হয় কেহ বুঝি তাহারই অপেক্ষায় সাজাইয়া রাখিয়াছে।

শশধর তামাক খাইয়া হুঁকাটা যথাস্থানে রাখিয়া দিল, তাহার পর ডালা হইতে সেই পাথরের হারটা বাহির করিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার অস্থাবর সম্পত্তি বলিতে ছিল তক্তাপোশের নিচে একটা ভাঙা জলচৌকীতে বসানো বহুদিনের জরাজীর্ণ তোরঙ্গ একটি, সেইটিকেই সে এখন টানিয়া বাহির করিল। বাক্স খুলিতেই দেখা গেল উপর দিকে খানকতক কাপড় জামা, খান দুই বটতলার বই এবং একটি গানের খাতা; শশধর সেগুলি নামাইয়া মেঝেতে রাখিল। তাহার নিচে রকমারি জিনিস—একছড়া গিল্টির নেকলেস, রুপার সিঁদুরকৌটা, একটা দামী আয়না, কয়েক শিশি এসেন্স, এক বোতল সুবাসিত নারিকেল তৈল; এমনি আরও কত কি। সে বারকতক সেগুলিকে নাড়াচাড়া করিয়া মালাছড়াটিও সেই সঙ্গে রাখিয়া দিল, তাহার পর কাপড়চোপড়গুলি তুলিয়া বাক্সটি আবার যথাস্থানে ঠেলিয়া সরাইয়া রাখিল।

কাজকর্ম সারিয়া পুনরায় সে দাওয়ায় আসিয়া খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিল। বিবাহ তাহার নিশ্চয়ই হইবে এবং খুব শীঘ্রই, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সে তাহার পরের অবস্থাটা মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিল। তাহার বৌ যেদিন সকাল করিয়া বাড়ি ফিরিতে বলিবে সেদিন সে ইচ্ছা করিয়াই অন্যত্র দেরি করিবে। বৌ তাহাকে অন্য দিনের মতোই পা ধুইবার জল ভাত প্রভৃতি দিবে বটে, কিন্তু কথা কহিবে না; রাগ করিয়া মেঝেতে মাদুর পাতিয়া শুইবে। তখন সে বৌয়ের হাতে পায়ে ধরিয়া মাপ চাহিবে, তাহাতেও যখন রাগ পড়িবে না, তখন সে জামার পকেট হইতে বাহির করিবে শৌখীন কোন জিনিস, এসেন্স কিংবা কোন অলঙ্কার। বৌ তখন ফিক্ করিয়া হাসিয়া তাহার গলা-জড়াইয়া ধরিবে—

বহুক্ষণ এইভাবে বসিয়া থাকিবার পর শশধরের চমক ভাঙিল। সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলিয়াছে, সন্ধ্যার আর বেশি বিলম্ব নাই। সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে আয়না ও ক্ষুর বাহির করিয়া কামাইতে বসিল। তাহার পর পরিপাটি করিয়া টেরি কাটিয়া জামাটা কাঁধে ফেলিয়া রাস্তার উপর উঠিয়া আসিল।

রাস্তায় পড়িতে প্রথমেই নজরে পড়িল সাধু হন্ হন্ করিয়া পারঘাটের দিকে চলিয়াছে। সে সাধুকে ডাকিয়া কহিল, 'কি হে সাধুচরণ, অবেলায় পারঘাটের দিকে কেন?'

সাধু যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল; কহিল, 'এই একবার বাজারের দিকে যেতে হচ্ছে শশধরদা।'

শশধর বিস্মিত হইয়া কহিল, 'এমন সময় বাজার? ব্যাপার কি?'

সাধু মাথা চুলকাইয়া জবাব দিল, 'একখানা শাড়ি কিনতে হবে।...অনেক দিন ধরে বৌকে বাক্যিদত্ত আছি একখানা ডুরে শাড়ি, তা পয়সার অভাবে হচ্ছে না কিছুতেই। আজ তিনটে টাকা এক জায়গা থেকে হাওলাত নিয়ে চলেছি—'

শশধর ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, 'চল্, আমিও ওপারেই যাব।'

বাজারের বিখ্যাত কাপড়ওয়ালা গহর শেখ, তাহারই দোকানে গিয়া দুইজনে বসিল। নানা রকমের ডুরে শাড়ি বাছিতে বাছিতে সহসা একখানা

আশমানী রঙের ফরাসডাঙার শাড়ির উপর সাধুর দৃষ্টি পড়িল। তাহার চোখ যেন নিমেষে জ্বলিয়া উঠিল, সে কহিল, 'এটা কত শেখের পো?'

গহর শেখ পাকা ব্যবসাদার, সে শাড়িখানা পেট্রোম্যাক্স আলোর নিচে বেশ করিয়া মেলিয়া ধরিয়া কহিল, 'তিন টাকা পাঁচ আনা পড়বে গো।'

'তিন টাকা পাঁচ আনা!'

সাধুর মুখ শুকাইয়া উঠিল, কিন্তু লুব্ধ দৃষ্টি কিছুতেই শাড়ির দিক হইতে ফিরাইতে পারিল না। বার দুই জিব দিয়া ঠোঁট দুইটা ভিজাইয়া লইয়া কহিল, 'এ যে বেজায় দর বলছ গহর শেখ, কিছু কম হবে না?'

গহর কহিল, 'তোবা! তোমার সঙ্গে কখনও দর করেছি ভাই সাধু? তিন টাকা তিন আনা আমার খরচা, দুটি গণ্ডা পয়সা লাভ নেব। এর কম পারব না।'

সাধু একবার শশধরের মুখের দিকে আর একবার শাড়িখানার দিকে চাহিল, 'তাহার পর কহিল, পুরোপুরি তিন টাকায় হবে?'

গহর কহিল, 'পাগল! আমি তোমার সঙ্গে মিছে কথা কইছি?'

সাধু বহুক্ষণ শাড়িখানার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল. তাহার পর শশধরকে প্রশ্ন করিল, 'গণ্ডা-চারেক পয়সা হবে দাদা?'

শশধর এতক্ষণ চুপ করিয়া কাপড়টার দিকেই চাহিয়া বসিয়া ছিল। সাধুর প্রশ্নে যেন চমকাইয়া উঠিল, মাথা নাড়িয়া কহিল, 'পয়সা কোথায় পাবো ভাই? গেঁজে ঘরে রেখে বেরিয়েছি যে!'

সাধু তখন একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'তবে আজকের দিনটা ধরে রাখো গহর শেখ, কাল এমনি সময়ে আমি নিশ্চয় এসে নিয়ে যাবো। কাউকে বেচো না, বুঝলে? লক্ষ্মী দাদা আমার!'

গহর কহিল, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো গে, ও কাপড় আমি আর কাউকে দেখাবোই না।'

সাধু দোকান হইতে নামিয়া শশধরকে প্রশ্ন করিল, 'এখন কোথায় যাবে শশধরদা?'

শশধর কহিল, 'তুমি বাড়ি যাবে তো? আমি একটু বাজারেই ঘুরব, কাজ আছে।'

সাধু চলিয়া গেল। শশধরও খানিকটা পথে পথে ঘুরিয়া অবশেষে আবার গহরের দোকানেই ফিরিয়া আসিল। তখন দোকান নির্জন, গহর একা বসিয়া তামাক খাইতেছে।

সে কহিল, 'শশধর, কি মনে করে?'

শশধর ঢোঁক গিলিয়া কহিল, 'ঐ শাড়িখানা বেচবে আমাকে?'

গহর বিস্মিত হইয়া কহিল, 'তুমি আবার শাড়ি নিয়ে কি করবে? তাছাড়া ওটা সাধুকে দেব বলে কথা দিয়েছি যে?'

শশধর কহিল, 'আমি সাড়ে তিন টাকা দেব, ছাখ! সাধুকে বরং আর একটা আনিয়ে দিও না হয়—'

গহর তখন ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, 'তোমার শাড়ির কি দরকার হে! খামকা সাধু বেচারার মনে কষ্ট দিয়ে—'

শশধর কহিল, 'আমার একটু বিশেষ দরকার আছে। দাও তো বলো—। তিন টাকা দশ আনা পর্যন্ত দিতে রাজী আছি—'

গহর কি বুঝিল কে জানে। একটু মুচকি হাসিয়া শাড়িখানা বাহির করিয়া দিল। শশধর দামটা মিটাইয়া দিয়া কোঁচার খুঁটে কাপড়খানাকে বেশ করিয়া মুড়িয়া লইয়া কহিল, 'সাধুকে যেন কথাটা ব'লো না গহরদা! অন্য কারুর নাম ব'লো, বুঝলে?'

গহর মাথা নাড়িয়া কহিল, 'তুমি নির্ভয়ে থাকো গে—'

পারঘাটের কাছাকাছি আসিয়া শশধর অন্ধকারে কাপড়খানাকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

সাহিত্যিকের মৃত্যু

সুকুমারের সাহিত্যিক জীবনের গোড়ার ইতিহাসটা আমাদের জানা নাই। কোন্ শৈশব হইতে সে হোমটাস্কের খাতার মধ্যে গোপনে কবিতা লিখিতে শুরু করিয়াছিল—কিংবা কবে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়িবার সময় এক মাসিক পত্রের অফিসের ঠিকানায় একটি গল্প লিখিয়া পাঠাইয়াছিল, স্ট্যাম্প থাকা

সত্ত্বেও যাহা প্রেরকের ঠিকানার অভাবে ফিরিয়া আসিতে পারে নাই—এ সমস্ত তথ্যে আজ আমাদের প্রয়োজনও কিছু নাই; তাহার সেই জীবনের পরিসমাপ্তিই আমাদের আজিকার আলোচ্য।

কাজটা সে করিয়া ফেলিয়াছিল অতিরিক্ত অভাবে পড়িয়াই—মুহূর্তের দুর্বলতায়। মা দেশ হইতে চিঠি দিলেন, 'বৌমার টাইফয়েড—টাকা না পাইলে বাঁচানো শক্ত' অথচ ঠিক সেই সময়টায় তাহার হাতে একটি কানাকড়িও ছিল না। সে মেসে থাকিয়া টুইশন করিয়া কোনো রকমে নিজের খরচ চালাইত এবং কদাচ কখনও দেশে দুই এক টাকা পাঠাইতে পারিত। তাহার গল্প তখন দুই-একটি করিয়া বিভিন্ন সাপ্তাহিক এবং মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইতে শুরু করিয়াছে বটে, কিন্তু তখনও গল্প লিখিয়া টাকা পাইবার মতো খ্যাতি হইতে অনেক দেরি। বাংলাদেশে যে গল্প লিখিয়া সহজে টাকা পাওয়া যায় না তাহা সুকুমার জানে, এবং তাহাতে সে দুঃখিত নয়। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে একদিন সকলে তাহার লেখার আদর করিবেই এবং তখন টাকার অভাবও তাহার থাকিবে না।

কিন্তু এখন কি উপায়?

তাহার স্ত্রী ঠিক মানসী নয়; উহাকে উপলক্ষ করিয়া কোনও সাহিত্যিকই সহস্র কল্পনার ইন্দ্রজাল রচনা করিতে পারিবে না, কিন্তু তবুও সে তাহার বিবাহিতা পত্নী। স্বপ্ন না থাক্—তাহার দায়িত্ব আছে—আর এই নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে বধূটিরই একমাত্র অলঙ্কার বিক্রির টাকায় তাহাকে কলিকাতায় প্রথম চার মাস কাটাইতে হইয়াছে—একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং টাকা কিছু চাই-ই, যেমন করিয়াই হউক।

কিন্তু টাকা যে কোথাও হইতে ধার পাইবার উপায় নাই, একথাও সত্য। মেসে তো নয়ই—মেসে কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না—দুই-একজন বন্ধু যা তাহার আছে, তাহাদের কাছেও বহুপূর্বেই কিছু কিছু ধার সে করিয়া রাখিয়াছে; এখন চাহিতে গেলে কিছু মিথ্যাভাষণ কিংবা অপ্রিয় সত্য শুনিতে হইবে।...তাহার কাছেও কিছু নাই; ঘড়ি, কলম বা ঐ ধরনের এমন কোনও জিনিস নাই, যাহার বিনিময়ে কোথাও কিছু টাকা পাওয়া যায়।

বহুক্ষণ ভাবিয়া অবশেষে সে তাহার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি লইয়াই পথে

বাহির হইয়া পড়িল। এই উপন্যাসটি সে দেশ হইতেই লিখিয়া আনিয়াছিল, তাহার পর এখানে আসিয়া অলস দ্বিপ্রহরের দীর্ঘ অবসরে আবার বইখানির আদ্যোপান্ত সংশোধনও করিয়াছে। তাহার বিশ্বাস বইখানি সত্যই ভাল। প্রকাশকদের কাছে গছাইবার চেষ্টা সে যে ইতিপূর্বে করে নাই তাহা নহে ; কিন্তু কোনও প্রকাশকই বইটি পড়িয়া দেখিতে পর্যন্ত রাজী হন নাই। ভদ্র যাঁহারা, তাঁহারা সময়াভাবের নজীর দিয়াছেন ; অভদ্ররা বিদ্রূপ করিয়াছেন এবং নিতান্ত শুভানুধ্যায়ী যাঁহারা—তাঁহারা নাম-করা মাসিকে আগে প্রকাশ করিবার সৎপরামর্শ দিয়াছেন। সে অবস্থার এখনও কোন পরিবর্তন হয় নাই, আজও কোনও ফল হইবে না—তাহা সুকুমার জানিত, তবুও সে বাহির না হইয়া থাকিতে পারিল না।

সেদিনও প্রায় সব জায়গাতেই পূর্ব ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিল, যদিচ এখন সামান্য একটু পরিচয় তাহার হইয়াছে—অনেকের কাছেই নামটা একেবারে অজ্ঞাত নয়, তবু আগ্রহ করিয়া দীর্ঘ একটা উপন্যাস লইয়া ছাপা চলে—এমন লেখক এখনও সে হয় নাই। সুতরাং কেহ হাসিলেন কেহ বা উপদেশ দিলেন ; অবশেষে সন্ধ্যা যখন রাত্রির দিক ঘেঁষিয়া গেল, তখন এক প্রকাশক প্রসন্ন হইলেন। কহিলেন. 'দেখুন মশাই, সত্যি কথাই বলছি ; নতুন লেখকের বই টাকা খরচ করে ছাপবার সাহস আমার নেই।···ওসব বিলিতি ব্যাপার এদেশে চলতে এখনও ঢের দেরি আছে। তবে যদি টাকার আপনার খুব বিশেষ দরকার হয়ে থাকে, তাহলে একটা সাহায্য আপনাকে করতে পারি। আপনার অথরশিপ বিক্রি করবেন ?'

বিস্মিত হইয়া সুকুমার প্রশ্ন করিল, 'তার মানে ?'

তিনি একটু হাসিয়া জবাব দিলেন, 'মানেটা আর বুঝতে পারলেন না ? এক ভদ্রলোক আপনাকে কিছু টাকা দিয়ে দেবেন, তারপর তিনি নিজের নামে এই বই ছেপে বাজারে চালাবেন। লোকে জানবে তিনিই লেখক। দেখুন, রাজী আছেন ?'

প্রথম কিছুক্ষণ সুকুমার স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর সে মনে মনে রাগিয়া উঠিল—এ কি অন্যায় কথা ! তাহার এত যত্নের এত পরিশ্রমের ধন, এতদিনের চিন্তা ও রাত্রিজাগরণের ফল, একটা লোক সামান্য ক'টা টাকার

বিনিময়ে ভোগ করিবে?...তাহার চেয়ে রাস্তায় বসিয়া ভিক্ষা করাও ভাল।... কিন্তু প্রথম আবেগটা কমিয়া আসিতেই তাহার মায়ের চিঠির কথা মনে পড়িল; কঠিন ব্যাধি, এখনই চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। একটা লোকের জীবনের কাছে তাহার এ আত্মাভিমানের মূল্য কতটুকু?

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'আমি রাজী আছি। কিন্তু টাকাটা কি এখনই পাওয়া যাবে?'

তিনি কহিলেন, 'তা হয়ত যেতে পারে। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, আপনি এখনই চলে যান—'

ঠিকানাটা লইয়া সে তখনই বাহির হইয়া পড়িল। ভবানীপুরের এক বড় উকীল, তাঁহার নামটা এমন কি সুকুমারেরও পরিচিত। সুকুমার তাহার পকেটের শেষ ছয়টি পয়সা কণ্ডাক্টরের হাতে গণিয়া দিয়া একখানা ভবানীপুরের টিকিট লইল। টাকা যদি না পাওয়া যায় তাহা হইলে ফিরিবার সময়ে এই দীর্ঘ পথ হাঁটিয়াই ফিরিতে হইবে।...

সুকুমারের সৌভাগ্যক্রমে উকীলবাবু বাড়িতেই ছিলেন। চিঠিখানি পড়িয়া তিনি মক্কেলদের ফেলিয়াই উঠিয়া পড়িলেন; সুকুমারকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'আমাদের ভূপালবাবু কি কপিটা পড়েছেন?'

মুহূর্তখানেক ইতস্ততঃ করিয়া মিথ্যা কথাটাই সে বলিয়া ফেলিল, 'পড়েছেন বৈকি! না হলে আর চিঠি দেবেন কেন?'

তিনি নীরবে পাতা-দুই পাণ্ডুলিপি পড়িয়া ফেলিলেন, তারপর কহিলেন, 'তা আপনি কত চান?'

সুকুমার এবার বিব্রত বোধ করিল। কহিল, 'এসব ব্যাপারের যে কি মূল্য হয় তা তো আমার জানা নেই; তবে একশোটি টাকার আমার বিশেষ প্রয়োজন—এইটুকু বলতে পারি।'

উকীলবাবু প্রায় চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, 'বলেন কি? আমি এর আগে একজন নামকরা লেখকের বই মাত্র পঞ্চাশ টাকায় পেয়েছি। এ বই যে কি হবে, তা তো বুঝতেই পারছি না—'

অকস্মাৎ যেন প্রচণ্ড একটা রক্তস্রোত সুকুমারের মাথায় প্রবেশ করিল,

ইচ্ছা হইল এই মুহূর্তে খাতাটা সে লোকটার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া বেশ কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। তবে সে মুহূর্ত কয়েক মাত্র। তাহার যে বড় গরজ। তাই সে কোনমতে নিজেকে সামলাইয়া লইল। কিন্তু সেই প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মদমন করিতে গিয়া তাহার কণ্ঠস্বর করুণ হইয়া উঠিল। সে কহিল, 'দেখুন নিতান্ত দায়ে পড়েই এ কাজ আমাকে করতে হচ্ছে; নইলে এ যা জিনিস, হাজার টাকা দিলেও এর পুরো দাম দেওয়া হয় না—'

উকীলবাবু একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিলেন, 'দেখুন, দর-কষাকষি করার আমার সময় নেই; ষাট টাকা পর্যন্ত আমি দিতে পারি। যদি হয় তো টাকা নিয়ে রসিদ দিয়ে যান, নইলে আমায় ছেড়ে দিন। ওখানে অনেক লোক বসে আছে।'

ইহার পর আর একটিমাত্র পথই সুকুমারের খোলা রহিল। ষাট টাকা গণিয়া লইয়া উকীলবাবুর কথামতো একটা দীর্ঘ এবং জটিল রসিদ লিখিয়া দিয়া সে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর সারা পথ সে নিজেই মনকে প্রবোধ দিতে দিতে আসিল যে তাহার মতো নবীন লেখককে কেহ পাঁচটা টাকাই দিতে চায় না, সে ক্ষেত্রে ষাট টাকা তো কুবেরের ঐশ্বর্য। তাহার ক্ষোভের কিছুমাত্র কারণ নাই।

পরের দিন ভোরের ট্রেনেই সে দেশে চলিয়া গেল।

ইহার পর দুইটা মাস তাহার যে কোথা দিয়া এবং কেমন করিয়া নিরবিচ্ছিন্ন ঔষধ, ইন্‌জেক্‌শন, ছানার জল এবং বার্লির মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল, তাহা সে টেরই পাইল না। যমের সঙ্গে এই অমানুষিক যুদ্ধ করিয়া যখন স্ত্রীকে সে ফিরাইয়া আনিল তখন তাহার সে ষাট টাকা তো নাই-ই, ঘরের ঘটি-বাটি বলিতে যাহা কিছু ছিল সবই অন্তর্হিত হইয়াছে। সুতরাং স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিবার আগেই টাকা-পিছু মাসিক এক আনা সুদে গয়লা-বৌ-এর কাছ হইতে পাঁচ টাকা ধার করিয়া তাহাকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হইল।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া স্নানাহার পর্যন্ত করিবার পূর্বে সে যেখানে ছেলে

পড়াইত তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে গেল। তাঁহাদের কাছে নিজের অবস্থা জানাইয়া চিঠিলি খিয়াছিল বলিয়া তাঁহারা অন্য মাস্টার রাখেন নাই; গিয়া শুনিল যে তাহার চাকরীটি আছে, ইচ্ছা করিলে সেইদিন হইতেই সে পড়াইতে পারে।

যাক্—। উদরের দুর্ভাবনা হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া সে মন্থর গতিতে মেসের দিকে ফিরিতে লাগিল। বহুদিন পরে কলিকাতায় আসিয়াছে, শহরের কোলাহল এবং জনস্রোত বড় ভাল লাগিতেছিল; সে একটুখানি এই আব্‌হাওয়াটা অনুভব করিতে চায়। ঘুরিতে ঘুরিতে কলেজ স্কোয়ারের মোড়ে আসিয়া স্টলে দাঁড়াইয়া কাগজগুলি উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। অকস্মাৎ একটি মাসিকের বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠা চোখে পড়ায় সে চমকিয়া উঠিল। তাহার সেই বইটি ইতিমধ্যেই ছাপা হইয়াছে। ঐ তো অর্ধপৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপন তাহারই সেই বইএর—"বর্তমান শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'রজতরশ্মি'—জনপ্রিয় ব্যবহারজীবী শ্রীপতি চৌধুরীর বিস্ময়কর সৃষ্টি।"

বিজ্ঞাপনটির দিকে চাহিয়া তাহার সর্বাঙ্গ শির শির করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি কাগজখানা রাখিয়া দিয়া একটা বড় বই-এর দোকানে ঢুকিয়া পড়িল, 'হ্যাঁ মশাই—রজতরশ্মি আছে?'

একটি লোক জবাব দিল, 'হ্যাঁ, বোধ হয় পাঁচ কপি কাল জমা দিয়ে গেছে—দাও তো হে একখানা বার ক'রে।'

সুকুমার বইটি তাহার হাত হইতে প্রায় কাড়িয়াই লইল। বাঃ—চমৎকার ছাপা, মোটা য়্যান্টিক কাগজ, সুদৃশ্য বাঁধাই, আগাগোড়া ঝক্-ঝক্ করিতেছে। দেখিলে যেন চোখ জুড়াইয়া যায়। পড়িয়া দেখিল—এক লাইনও বদলানো হয় নাই, বেশ নির্ভুল ছাপা; যেমন করিয়া সে সাজাইতে চাহিয়াছিল, তেমনি করিয়াই সাজানো হইয়াছে—

একমনে সে পড়িয়া যাইতেছিল। সহসা দোকানের একটি ছোকরার ঈষৎ রূঢ় কণ্ঠে তাহার চমক ভাঙিল, 'বইটা কি আপনার চাই?'

বইটা? পাতা উল্টাইয়া দাম দেখিল দেড় টাকা, একটু ইতস্তত করিয়া দেড়টি টাকাই সে বাহির করিয়া দিল। তাহার পর বইখানা সযত্নে একটা প্যাকিং কাগজে মুড়িয়া লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়া স্নানাহার শেষ করিয়াই আবার গোড়া হইতে পড়িতে শুরু করিল।

বইটা যখন শেষ হইল, তখন সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বিছানার নীচে লুকাইয়া রাখিয়া চোখ বুঝিয়া পড়িয়া রহিল। এ বই নিশ্চয়ই লোকের ভাল লাগিবে, না লাগিয়া পারে না। এতদিনে সাহিত্য সম্বন্ধে অন্তত এতটুকু বোধ তাহার নিশ্চয়ই হইয়াছে—

কিন্তু এ ভাল লাগার ধাক্কা যে একদা কী প্রচণ্ডভাবে তাহারই বুকে গিয়া লাগিবে তাহা সে তখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। কিছু বুঝিতে পারিল তখনই, যখন রবিবারের এক সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকে রজতরশ্মির এক-কলমব্যাপী সমালোচনা চোখে পড়িল। সমালোচক বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, সমস্ত চরিত্রগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, লেখকের দূরদৃষ্টি, চিন্তাধারার নবীনতা ইত্যাদির স্তুতিগান করিয়া লিখিয়াছেন যে বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বই—এই রজতরশ্মি! গত দশ বৎসরের মধ্যে এমন একখানা বই বাংলা ভাষায় বাহির হয় নাই।

অকস্মাৎ যেন সুকুমারের বুকের ভিতরটা জ্বালা করিয়া উঠিল। মনে হইল সমস্ত হৃৎপিণ্ডে কে নির্মমভাবে মোচড় দিতেছে। অথচ এতবড় সংবাদটা সে কাহাকেও না শোনাইয়া পারিল না; তাহার প্রতিভা লোক মানিয়া লইয়াছে, না থাক তাহার নাম, তবু তাহারই চিন্তাশীলতা, তাহারই সাহিত্যদৃষ্টির স্তুতি এই সমালোচকের প্রতিটি কথায় প্রকাশ পাইয়াছে, একথা কাহারও সহিত আলোচনা না করিয়া কি থাকা যায়? সে ভূপতিবাবুকে ডাকিয়া কহিল, 'দেখেছেন ভূপতিবাবু, একখানা খুব ভাল নতুন বই বেরিয়েছে—'

ভূপতিবাবু জবাব দিলেন, 'ঐ রজতরশ্মির কথা বলছেন তো? ইংরিজি গোঁসাইবাজার কাগজখানাও খুব লিখেছে; এই যে, দেখুন না!'

সাগ্রহে কাগজখানা টানিয়া লইয়া সুকুমার দেখিল কথাটা সত্য, এ কাগজেও কম লেখে নাই। তাহারই সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, বহুদূরপ্রসারী চিন্তা-শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, সেই প্রসংসার চন্দনতিলক সমালোচক ব্যক্তিগত-ভাবে বিখ্যাত আইনজীবী শ্রীপতি চৌধুরীর ললাটে পরাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতিভার এতবড় একটা দিক এতদিন আত্মগোপন করিয়া ছিল বলিয়া

আপসোস করিয়াছেন।

হয়ত সবটা সত্য নয়, হয়ত ইহার মধ্যে অনেকখানি বন্ধুপ্রীতি লুকানো আছে—কিংবা শ্রীপতি চৌধুরীর অর্থের জোর—কিন্তু কথাগুলি তো মিথ্যা নয়; বহুকালের সাধনা এবং পরিশ্রমের ফলে সুকুমারের কলম হইতে যাহা বাহির হইয়াছে, এ প্রশংসা তাহার প্রাপ্য!

সুকুমার কাগজটা ঠেলিয়া দিয়া শুষ্কমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভূপতিবাবু কহিলেন, 'আর একটু বসুন না সুকুমারবাবু—'

সুকুমার জবাব দিল, 'মাথাটা বড্ড ধরেছে, শরীরটাও ভাল নেই—। যাই এখন।'

স্নানাহারের পর আবার সে বইটি বাহির করিয়া আগাগোড়া একবার পড়িল। নাঃ—প্রশংসার একটি কথাও অতিরঞ্জিত নয়, তাহার বুকের রক্ত দিয়া লেখা এ বই-এর আরও অনেক, ঢের বেশী প্রশংসা পাওয়া উচিত।...

আরও বেশী প্রশংসা শীঘ্রই আসিল, আকস্মিক, অপ্রত্যাশিতভাবে!

হপ্তা-দুই পরে কয়েকখানা বাংলা মাসিকপত্রে রজতরশ্মির দীর্ঘ সমালোচনা অর্থাৎ স্তুতি বাহির হইল এবং তাহারই কয়েকদিন পরে শুরু হইল কলিকাতার পথে মাঠে ঘাটে—সর্বত্র, প্রশংসার কলগুঞ্জন। এমন বই আর হয় নাই! আশ্চর্য, অপূর্ব বই!!

বড় বড় সাহিত্যরথীগণ ইতিমধ্যে বইটির উপর দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলেন। বোলপুর হইতে সুদীর্ঘ পত্র আসিল—আরও বহু চিঠি আসিবে এরূপ আভাস পাওয়া গেল। হাওড়ায় ইহারই মধ্যে একটি সভা করিয়া শ্রীপতি চৌধুরীকে অভিনন্দিত করাও হইয়া গেল।

সুকুমার ইতিমধ্যে আর একটি টুইশন পাইয়াছিল, অর্থাৎ টাকার অভাব কিছু কমিয়াছে, কিন্তু লেখাপড়া তাহার একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে সারারাত ছট্‌ফট্ করে, ঘুমাইতে পারে না, মনে হয় তাহার বুকের পাঁজরে কে যেন হাতুড়ির ঘা দিতেছে। দিনের বেলায় সে সর্বদা লোকচক্ষুর আড়ালে পলাইয়া বেড়ায়, পাছে রজতরশ্মির প্রশংসা তাহাকে শুনিতে হয়। অবশেষে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া সে একদিন সারারাত জাগিয়া রজতরশ্মির একটা দীর্ঘ সমালোচনা লিখিল; প্রাণ ভরিয়া লেখককে গালি দিল, প্রতিটি চরিত্রকে

ব্যর্থ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিল, এবং বার বার বোঝাইতে চেষ্টা করিল যে বইটা আর যাহাই হউক সাহিত্য হয় নাই। তাহার পর অলোচনাটি একটা বিখ্যাত কাগজের অফিসে স্ট্যাম্প খরচ করিয়া পাঠাইয়া দিল।

দিন তিনেক পরেই সেটা ফেরত আসিল। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "সমালোচনা অকারণ বিদ্বেষপ্রসূত বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে ফেরত পাঠাইলাম। আলোচ্য বইটি আমরা পড়িয়া দেখিয়াছি, আমাদের মনে হয় বইখানি যথার্থই উচ্চ প্রশংসার যোগ্য।"

সেদিন রবিবার; সকলে ভূপতিবাবুর ঘরে সমবেত হইয়াছিলেন, সেইখানেই চাকর আসিয়া সুকুমারকে চিঠিখানা দিয়া গেল। রাখালবাবু প্রশ্ন করিলেন, 'কিসের চিঠি এল মশাই ?'

তখন অকারণ কি এক পুলকানুভূতিতে সুকুমারের সারা মন টলমল করিতেছে, সে হাসিয়াই জবাব দিল, 'ঐ আপনাদের রজতরশ্মিকে গালাগাল দিয়ে এক সমালোচনা লিখেছিলুম, সম্পাদক ফেরত দিয়েছেন। লিখেছেন যে—যে বই সত্যিই ভাল হয়েছে তাকে গালাগাল দিলে ছাপতে পারব না।'

রাখালবাবু একটু উষ্ণভাবে কহিলেন, 'আপনারও তো সত্যিই অন্যায় সুকুমারবাবু! জানেন, যে গত পঁচিশ বছরের মধ্যে এরকম একটা বই আর বোরোয় নি! শুধু শুধু গায়ের জ্বালায় গালাগাল করেন কেন ? পারেন তো ঐ রকম একটা লিখুন—'

ভূপতিবাবু তাঁহাকে থামাইয়া কহিলেন, 'রাখালের একটু বাড়াবাড়ি করা স্বভাব; ওসব কিছু নয়, তবে হ্যাঁ—বইটা যে ভাল হয়েছে সত্যি, তাতে তো সন্দেহ নেই। সুতরাং সত্যিকারের সাহিত্য যে সৃষ্টি করতে পারে তাকে গালাগাল দেবার চেষ্টা না ক'রে প্রশংসা করাই উচিত। নইলে ওতে নিজেরই নীচতা প্রকাশ পায়।'

বোমা-ফাটার মতো অকস্মাৎ সুকুমার গর্জন করিয়া উঠিল। পাগলের মতো চিৎকার করিয়া কহিল, 'কে বলেছে আপনাদের যে বই ভাল হয়েছে ? সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে ? ছাই হয়েছে!...কি বোঝেন আপনারা সাহিত্যের ? মাথামুণ্ডু, আবোল-তাবোল কতকগুলো বকে গেলেই মনে করেন যে, খুব ভাল সাহিত্য হয়েছে।...যত সব ইডিয়টের দল—'

তাহার পর বেগে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া নিজের বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িল। একজন কহিলেন, 'হ'ল কি লোকটার? হঠাৎ ক্ষেপে গেল কেন?'

রাখালবাবু মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, 'হিংসে, আবার কেন! সাপ্তাহিকে দুটো গল্প ছেপে ভায়া আমার একেবারে মহা-সাহিত্যিক হয়ে উঠেছেন!... আমরা সব ইডিয়ট আর উনি সাক্ষাৎ রবীন্দ্রনাথ!'

সেদিন সুকুমার উঠিল না, কিছু খাইলও না। চাকরকে কহিল, 'শরীরটা ভাল নেই।'

বিকালের দিকে এক সময় সকলের অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া পড়িয়া ছাত্রের বাড়ি উপস্থিত হইল। সামনে পরীক্ষা, রবিবারেও পড়ানো দরকার। কিন্তু সেখানে ঘরে ঢুকিয়াই প্রথমে যাঁহার সঙ্গে দেখা হইল তিনি ছাত্রের পিতা, হাতে একখানা রজতরশ্মি লইয়া মনোযোগ দিয়া পড়িতেছেন; শিক্ষককে দেখিয়া হাসিয়া কহিলেন, 'আসুন মাস্টার মশাই, আপনি তো শুনেছি গল্প-টল্প লেখেন—লিখুন দেখি এম্নি একটা বই! খাসা বই লিখেছে ভদ্রলোক—'

বিবর্ণমুখে সুকুমার কহিল, 'দেখুন শরীরটা বড় খারাপ লাগছে, তাই বলতে এলুম, আজ আর পড়াবো না।'

তিনি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, 'তাই বটে, শরীরটা আপনার খুবই কাহিল দেখাচ্ছে, তা আপনি আবার কষ্ট করে খবর দিতে এলেন কেন?'

সেখান হইতে বাহির হইয়া নিতান্ত উদ্দেশ্যহীনভাবে সে পথ হাঁটিতে লাগিল। আজ তাহার চারিদিক হইতে সমস্ত অবলম্বন যেন খসিয়া পড়িয়াছে, সমস্ত আশা তাহার মৃত—

কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীটের উপর ভূপালবাবুর বইয়ের দোকান। তিনি রবিবারেও দোকানে বসিয়া কি একটা হিসাব দেখিতেছিলেন, সুকুমারকে রাস্তা দিয়া হাঁটিতে দেখিয়া অকস্মাৎ চেঁচামেচি শুরু করিয়া দিলেন।

—'আসুন, আসুন সুকুমারবাবু—একটু পায়ের ধুলো পড়ুক।'

অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুকুমারকে ঢুকিতে হইল। একটু অপ্রস্তুত মুখে

ভূপালবাবু কহিলেন, 'ইস্—বরাত দেখেছেন লোকটার? আর আমাদেরও দুরদৃষ্ট, নইলে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলব কেন? যাই হোক্—দিন দেখি অমনি একখানা বই আমাকে লিখে, একবার কোমর বেঁধে লাগি—'

অত্যন্ত নিস্পৃহকণ্ঠে সুকুমার কহিল, 'বই-টই লেখা আমি ছেড়ে দিয়েছি; বই আর লিখব না।'

জোর করিয়া হাসিয়া ভূপালবাবু কহিলেন, 'হ্যাঁ, তাই নাকি একটা কথা হয়। আরে একটা গেছে, আর একটায় আবার নাম হবে।···হ্যাঁ, ভাল কথা, শ্রীপতিবাবু আপনার জন্যে একখানা বই রেখে গেছেন, অনেক দিন।'

একটি মুহূর্ত—তখনও ভূপালবাবুর হাসি মিলায় নাই; সুকুমারকে বুইটি দিতেই সে বইটা মুঠা করিয়া ধরিয়া সবেগে বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং কোনও দিকে না চাহিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া আসিল। সেখান হইতে একেবারে সোজা হাওড়া স্টেশন।

শেষ ট্রেনে বাড়ি পৌঁছিয়া যখন সে মাকে ঠেলিয়া তুলিল তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়াছে। তিনি বিস্মিত হইয়া কহিলেন, 'এ কি রে, এমন অসময়ে? কি ব্যাপার?'

সুকুমার কহিল, 'কলকাতায় আমার শরীর একেবারে ভাল থাকছে না মা। সেখানে আর থাকব না; চৌধুরীবাবুরা তাঁদের স্কুলে মাস্টারি করার কথা একবার তোমাকে বলেছিলেন না? কাল সকালে গিয়ে তুমি তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে সেই ব্যবস্থাই করো। আমি আর ফিরে যাব না—'

—'তুই কি একেবারে চলে এলি?'

—'হ্যাঁ।'

তিনি আরও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, 'তা তোর জিনিসপত্তর?'

—'সে থাকগে! ওতে আমার দরকার নেই।'

অভাবনীয়

সকাল বেলাটা কনকের কাটে নিরন্ধ্র অনবসরে। নিশ্বাস নেবার সময় থাকে না বললেও সামান্য অত্যুক্তি হয় মাত্র। ঠিক পাঁচটায় ওঠে ও। মিনিট-দশেকের মধ্যে তৈরী হয়ে নিয়ে উনুনে আঁচ দেয়। ঠিকে ঝি শুধু বাসন মাজে, বাটনা বাটে এবং ঘর মোছে—এসব কাজ সে করে না। স্ত্রী কৃষ্ণা একে আনাড়ি তায় তার কোলে কচি ছেলে, সে এত ভোরে উঠতে পারে না। সুতরাং এ কাজটা না করলে এখন চা এবং পরে ভাত পাওয়ার সম্ভাবনাই থাকবে না। এতেও মিনিট পাঁচ সাত চলে যায়। তারপর বসে সে খাতা দেখতে। শিক্ষকের জীবনে এই খাতা দুরদৃষ্টের মতোই নিত্যসহচর। অনতিক্রমনীয় ও অপ্রতিষেধনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা; ইস্কুলের হাফ্‌ইয়ার্লি কোয়ার্টার্লি এবং য়্যানুয়াল; তারপর আছে মধ্যে মধ্যে মাসিক পরীক্ষা—সাপ্তাহিক হোমটাস্ক। খাতা ছাড়া শিক্ষকের জীবনে আছে কি? খাতার অন্তহীন স্রোত—কুৎসিত হাতের লেখা এবং ভুলে ভর্তি—অমনোযোগ ও বিতৃষ্ণার ছাপ তাদের সর্বাঙ্গে, প্রতিটি পংক্তিতে। তবু দেখতেই হবে। এর হাত থেকে রেহাই নেই, এড়ানো যাবে না।

পৌনে ছটা নাগাদ উনুন ধরে গেলে সে চায়ের জল চাপিয়ে কৃষ্ণাকে ডেকে দেয়। অবশ্য এক এক দিন ছোট খোকাটার উৎপাতে কৃষ্ণা আগেই উঠে পড়ে। সেইদিন ঐ দুটো মিনিট তবু বাঁচে। এরপর শুধু চা এক কাপ খেয়ে ছোটে সে পটুয়াটোলা, সেখানে দুটি ছাত্র একই বাড়িতে। সুতরাং দেড় ঘন্টার কম হয় না। সওয়া ছটা থেকে পৌনে আটটা সেখানেই বেজে যায়, কোন-কোন দিন আটটা। তারপর বাগবাজারে পাড়ি—পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে আট। দশটা পর্যন্ত পড়ানো উচিত কিন্তু পৌনে দশটাতেই উঠতে হয়—সেখান থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরে এসে স্নান ক'রে খেয়ে পৌনে এগারোটায় ক্লাসে আসা এক দুশ্চর তপস্যা। সে সময় আবার অফিস টাইম—বাস ধরাই দায়, কোনমতে ঝুলতে ঝুলতে আসারও যেদিন সুযোগ মেলে না, সেদিন দু-পাঁচ মিনিট দেরিই হয়ে যায়। ওর প্রথম ঘন্টাতেই ক্লাস,—

তাও নাইন। হেড্‌মাস্টার অপ্রসন্ন মুখে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘আপনাদের সুবিধের জন্যেই সাড়ে দশটা থেকে পোনে এগারটা করলুম, তবু আপনারা ঠিক সময়ে আসেন না। ছেলেরা মাইনে দিয়ে ইস্কুলে পড়ে— তাছাড়া ঐ তো মোটে পঁয়তাল্লিশ মিনিট ক’রে পিরীয়ড, ওরা এই সময়টুকু পুরো পড়বে ওদের গার্জেনরা এটুকু তো এক্‌স্‌পেক্ট করে।’

তেতোবড়ির মতোই বকুনিটুকু গলাধঃকরণ ক’রে কোনমতে খাতায় একটা সই ক’রে সে ছোটে তেতালার সিঁড়ি ভেঙে ক্লাস নাইনে (এ) তে। হাঁপাতে হাঁপাতে ও ঘামতে ঘামতে এসে পাখার নিচে বসে সুস্থ হ’তেই আরও পাঁচটা মিনিট কেটে যায়। প্রকৃতপক্ষে সেই ভোর থেকে উঠে এই প্রথম একটু অবসর মেলে।

সুতরাং—সকালে বাজার করার সময় হয় না। বিকেলে ইস্কুলের পরে ইস্কুল বাড়িতেই একটা কোচিং নেয়। সেটা শেষ হয় সাড়ে পাঁচটা পোনে ছটায়। এরপর আর একটি মাত্র টিউশ্যনী আছে—সেখানকার ছাত্রটি সওয়া সাতটার আগে বাড়ি ফেরে না।—এই ঘণ্টা দেড়েক সময় হাতে পায় ও দিনে রাতে। এই সময়টাতেই কনক সংসারের দিকে মন দেয়। ইস্কুল থেকে বেরিয়ে বাজার করে—তারপর কয়লা ডাল মশলা এ সব সংগ্রহ ক’রে বাড়ি ফিরে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে জলখাবার ও চা খায় বেশ ধীরে-সুস্থেই। আহার্যের চেয়ে অবসরটাই যেন উপভোগ করে সে। ছেলেমেয়েরা ঘিরে বসে, ছোটটা কোলেই থাকে। ওর পরোটায় ভাগ বসায় সবাই। জল-খাবার খেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সাংসারিক আলাপ সেরে পড়াতে যায় আবার। সেটা এই পাড়াতেই, যাতায়াতে বিশেষ সময় যায় না। নটা নাগাদ যখন ফেরে তখন একগাদা প্রুফ অপেক্ষা করে ওর জন্য। এক বিখ্যাত প্রকাশকের প্রুফ দেখে সে। অর্থ-পুস্তক ও পাঠ্য পুস্তক—দুয়েরই প্রুফ দেখতে হয়। সন্ধ্যার পর ওদের লোক এসে দিয়ে যায়—যত রাতই হোক্ সেগুলো দেখে রাখতে হয়—তার পরদিন সকালে এসে সেই লোকটিই আবার দেখা-প্রুফ চেয়ে নিয়ে যায়।

•

কিন্তু গত কাল সব ওলট পালট হয়ে গেল একটা ব্যাপারে। খবর এল

ভগ্নিপতির অসুখ—খুব বাড়াবাড়ি। সামান্য কী একটু জ্বর হয়েছিল—ডাক্তারে বুঝি কি ইঞ্জেকশন্ দেয়, তার ফলে হিতে বিপরীত ঘটেছে, বাঁচার আশাই নাকি কম। ইস্কুল থেকে ফিরে সেই খবর পেয়েই ছুটেছিল সেখানে—রাত এগারোটায় বাড়ি ফিরেছে ; রাত্রের টিউশ্যনী তো হয়ই নি—তা না হোক্—বাজারও হয় নি। আর সে কথাটা মনেও ছিল না। রাত্রে প্রুফ দেখা হয় নি। সকালে উঠে জরুরী প্রুফগুলো নিয়েই বসে ছিল ; চায়ের জল চাপিয়ে নিত্যকার অভ্যাস-মতো স্ত্রীকে ডেকে আবার প্রুফে মন দিয়েছে, এমন সময় কৃষ্ণা প্রচণ্ড শব্দে একটা হাই তুলে উঠে বসে বললে, 'তা হ্যাঁ গা—বাজারের কি হবে ?'

'বাজার ?' খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে কনক, প্রশ্নের ফলে মুখের যে ফাঁকটা—সেটা ফাঁক হয়েই থাকে।

'ওমা তা বাজার করতে হবে না ? রাঁধব কি ?'

'বাজাব কখন যাবো।...ডালটাল নেই ?'

'শুধু একমুঠো ডাল পড়ে আছে—তারপর ?'

'খিচুড়ী ক'রে নাও—'

'সে রকম ডাল নেই। তাছাড়া নিলক্ষ্যে খিচুড়ী কি ক'রে খাবে ?...পরশু আলু আনো নি, ঘরে একটা আলুও নেই।'

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কনক বললে, 'ওপরের রঞ্জুকে বললে—'

'রঞ্জু তো নেই, সে মামার বাড়ি গেছে পাঁচ-ছ'দিন। ওরাই একে-ওকে ধরে বাজার করাচ্ছে।'

'অ।' গলার স্বর কেমন যেন নৈর্ব্যক্তিক হয়ে আসে কনকের, 'তা দাও থলিটা আর সিকে-পাঁচেক পয়সা—দেখি নিদেন একটু আলু আর মাছ যদি কিনে দিয়ে যেতে পারি।'

কৃষ্ণা আশ্বাস দেয়, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওতেই হবে। যেমন ক'রে হোক চালিয়ে নেব। একটু বার্লি এনো কিন্তু, আর একটা পাতিলেবু—হ্যাঁ—এধারে তো ঘর খালি, ছেলেদের কী খাওয়াবো ? পাউরুটি একটা যাবার সময় কিনে দিয়ে যেতে পারবে ?'

প্রুফের অক্ষরগুলো যেন তাল পাকায় চোখের সামনে। একটা দীর্ঘশ্বাস

ফেলে বলে, 'এখন দয়া ক'রে একটু চা দিতে পারো কি না ছাখো দিকি। আর ফরমাস বাড়িও না—'

কৃষ্ণা একটু ক্ষুব্ধই হ'ল। কলঘরের দিকে যেতে যেতে শুধু বলে গেল, 'ফরমাস সব আমার জন্যেই করি কিনা—'

কোনমতে চা খেয়ে জামাটা গলাতে গলাতেই দৌড়ল। কিন্তু মোড়ের মনোহারী দোকান তখনও খোলে নি—আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তবে রুটি মিলল। ফিরে এসে সেটা জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়ে যেতেও দশটা মিনিট অপব্যায়। এত কাণ্ড ক'রেও পটুয়াটেলায় পৌঁছে দেখলে ছাত্রদের তখনও খাবার খাওয়া হয় নি। অসহিষ্ণু ভাবে দশটি মিনিট বসে থাকার পর তাদের দেখা মিলল। বিপদের ওপর বিপদ—কর্তা স্বয়ং আজ এ ঘরেই এসে বসলেন খবরের কাগজ আর চায়ের কাপ নিয়ে, খুব তাড়াতাড়ি ওঠবার চেষ্টা করলেই ঘড়ির দিকে তাকাবেন।

তবু কনক পৌনে আটটাতেই উঠে পড়ল। অনাবশ্যক কৈফিয়তের সুরে বললে, 'আজ উঠি এখন, বাড়িতে অসুখ কিনা।'

নিমেষে খবরের কাগজ সরে গেল মুখ থেকে, কর্তা ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন, 'কী অসুখ, কার অসুখ, মাস্টারমশাই ? কোন খারাপ অসুখবিসুখ নয় তো ?'

অর্থাৎ আরও ছুটি মিনিট অপব্যয়। বাজারে তেমনি ভীড় তখন, অন্যদিন সন্ধ্যাবেলা বাজার করে, ভীড়ের অভিজ্ঞতা কম। কোনমতে ধাক্কা খেয়ে গুঁতো খেয়ে আলু আর মাছ সংগ্রহ করার পর মনে পড়ল, আলু অন্য দিনের মতোই নিয়েছে— মোটে দেড় পোয়া, তাতে ছুবেলা কুলোবে না। তখন অগত্যা বেগুন, কুমড়ো, উচ্ছে—ছু একটা আনাজ কিনতে হ'ল। তারপর বার্লি, লেবু এসব তো আছেই—

এমনি ক'রে একরাশ বাজার নিয়ে পড়ি কি মরি ছুটতে ছুটতে যখন বাড়ি এসে পৌঁচেছে তখন সর্বাঙ্গ ঘামে ভেসে যাচ্ছে, জামাটা লেপ্‌টে গেছে গায়ের সঙ্গে—অবস্থা শোচনীয়। তবু ততক্ষণে সাড়ে আটটা বেজে গেছে— বাগবাজার যাওয়ার কথা চিন্তা করতেই পা যেন ভেরে পড়ছে। অথচ যেতেই হবে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই কৃষ্ণা সংবাদটি দিলে, 'ওগো তোমার একটা চিঠি আছে। কই—কোথায় ফেল্‌লুম আবার—ও, এই যে।' নিজেই দেয় এগিয়ে।

খামে চিঠি। বড় চৌকো নীল খাম, দামী। এরকম খামে তো কেউ তাকে চিঠি দেয় না। ওরই মধ্যে একটু অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে কনক। এ আবার কে দিলে? এমন খাম যেন কতকাল দেখে নি ও। মনেও পড়ে না।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় হাতের লেখাটা যেন খুব অপরিচিত নয়। কোথায় যেন কার লেখা সে দেখেছিল এর আগে, অনেকটা এই রকম। বিস্মৃতির পরপার থেকে যেন অশরীরী একটা স্পর্শ পায় ওর চেতনা।

কিন্তু কাব্য করবার সময় কই?

চিঠিখানা পকেটে ফেলে সে আবার ছোটে। এবার বাগবাজার। ঊর্ধ্বশ্বাসেই ছোটে একরকম—

কৃষ্ণা কড়ায় ফোড়ন দিতে দিতে প্রশ্ন করে, 'কার চিঠি গো?'

'কে জানে, আমার কি এখন পড়বার সময় আছে?'

যেতে যেতে উত্তর দেয় সে।

এর পর চিঠিটা পড়বার আর সময় হয় না—মনেও থাকে না। বাগবাজার থেকে ফিরতেই পৌনে এগারটা বেজে যায়, স্নান না ক'রেও দশটি মিনিট লেট, সেদিন আবার সন্ধ্যাতেও সময় ছিল না। কোচিং ক'রে ভগ্নিপতির খবর নিতে গিয়েছিল, সেখান থেকে বাজার ক'রে নিয়ে ফিরতেই রাত্রের টিউশনীর সময় হয়ে গেল। একেবারে মনে পড়ল সেই ছাত্রকে একটা অঙ্ক কষতে দিয়ে যখন অন্যমনস্ক ভাবে পকেটে হাত দিয়েছে তখন—খামখানা হাতে খড় খড় করে উঠল।

কী এটা? চিঠি? ও, তাইতো। সকালের সেই চিঠিখানা। মনে পড়ল ওর। কৌতূহলও হ'ল বৈকি। একান্ত অনবসরে মানবমনের এই প্রবল বৃত্তিটা চাপা পড়েছিল এই মাত্র,—এখন প্রবলতর হয়ে উঠল।

এখানেই খুলবে নাকি? ছাত্রের সামনে? দোষ কি? তাছাড়া ও তো অঙ্ক কষছে। সে খামখানা খুলে ফেলল।

ভেতরেও দামী চিঠির কাগজ। খামের মতোই নীল রঙ। কোন সম্বোধনও নেই, স্বাক্ষরও নেই। মেয়েলি হাতের লেখা। অল্প কয়েক ছত্র।

"আপনার যা চেহারা হয়েছে তাতে চিনতে পারবার কথা নয়—তবু দূর থেকে ট্রামে ক'রে যেতে দেখেই সেদিন চিনতে পেরেছি। তারপর বিভ্রাট বাধল ঠিকানা নিয়ে। এই তিন দিন ধরে প্রায় চল্লিশটা টেলিফোন ক'রে ঠিকানা সংগ্রহ করেছি। একবার আসুন না। সত্যি কতদিন দেখি নি বলুন তো। প্রায় চার বছর হতে চলল। একবারটি আসুন—যে কোন দিন যে কোন সময়, লক্ষ্মীটি!"

আর সংশয় নেই। অনুমানেরও প্রয়োজন নেই। জীবনে তিন-চারখানা মাত্র চিঠি পেয়েছে সে অসীমার কাছ থেকে—তবু হাতের লেখা ভুলে যাওয়া তার উচিত হয় নি। নিহাত জীবনের এই ঘূর্ণাবর্তে বহুদূরে সরে এসেছে বলে তাই—

অসীমারই চিঠি। ঠিক তেমনি সংক্ষিপ্ত—অথচ বিপুল সম্ভাবনায় পূর্ণ। সম্বোধনও নেই—স্বাক্ষরও নেই। অসীমা কোনদিনই করে না তার চিঠিতে। একদিন কারণটা খুলে বলেছিল সে কথায় কথায়—'কী বলে সম্বোধন করবো বলুন তো! আমি তো ভেবে পাই না। যা ব'লে পাঠ লিখতে ইচ্ছা করে তা প্রকাশ্যে লেখা বে-আইনি। স্বাক্ষরের আগেই বা কি লিখব? আমি যে আপনার কে তা আজও জানি না।...না, ওসব হ্যাঙ্গামে দরকার নেই। তার চেয়ে এই ভাল। কি পাঠ যে লিখতে চাই তা তো আপনি জানেন অন্তত। বুঝে নেবেন।' এই ক'টি কথায় সেদিন কনকের চিত্ত কী উদ্বেলিত হয়েই না উঠেছিল। অলিখিত পাঠের শব্দসমষ্টি মনের চোখে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠে যে আনন্দ সে পেয়েছিল—আজও তার স্মৃতি ওর সমস্ত স্নায়ুকে মাতাল ক'রে তোলে।

বহুদিনের কথা কি?

মনে হচ্ছে যেন হাজার বছর পার হয়ে এসেছে কনক সে-সব দিন থেকে।

আচ্ছা, অসীমার সঙ্গে ওর প্রথম পরিচয় হয়েছিল যেন কবে?...হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি! বালিগঞ্জে তখন ওরা থাকে—পাশের বড় বাড়িটায় ভাড়া এল অসীমারা। ওর বাবা কোন্ যেন-এক নেটিভ স্টেটের ম্যানেজার ছিলেন,

সেখানেই থাকতেন। এখন মহারাজার কলকাতার ব্যবসা দেখবার দরকার হ'তে এখানে বদলি হয়েছেন। বড়লোকদের ব্যাপার—ওদের প্রথমটা সঙ্কোচই ছিল কিন্তু অসীমার মা নিজে থেকে একদিন ওদের বাড়ি বেড়াতে এলেন আর তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সহজেই সংশয়ের বেড়াটা গেল ভেঙে।

কনক তখন ক্লাস নাইন-এ পড়ে। অসীমা আরও ছোট। তবু অসীমার সঙ্গে কেমন ক'রে ওর খুব ভাব হয়ে গেল। প্রথম প্রথম অসীমা আসত গল্প শুনতে ও গল্প করতে। কিন্তু কিছুদিন পরেই কি খেয়াল হ'ল, বই-খাতা নিয়ে ওর ঘরে এসে বসল। বললে, 'আপনার কাছে পড়ব কনকদা।' ওর মাও সস্নেহে বললেন, 'পাগলী মেয়ে! তা পড়ুক না বাবা, এমনি তো বই ছুঁতেই চায় না। যদি তোমার এখানে বসে একটু পড়ে তো পড়ুক না! ··অবিশ্যি তোমার যদি ক্ষতি হয় তো সে আলাদা কথা—'

'না না—ক্ষতি আর কি! কতটুকুই বা পড়ে ও!' গলায় জোর দিয়ে বলেছিলেন কনকের মা।

এরপর বছরখানেক পরেই সেই মহারাজার নিজের একটা বাড়ি বিনা-ভাড়ায় পেয়ে অসীমার বাবা পার্ক স্ট্রীটে উঠে গেলেন। মনে হ'ল সম্পর্কেরও বুঝি এইখানে শেষ হয়ে গেল। কারণ কনকরাও তার মাস-কতক পরে শ্যামবাজার অঞ্চলে চলে এল।

কিন্তু সম্পর্ক অত সহজে শেষ হ'ল না।

তখন বোধ হয় কনক বি. এ. পড়ছে। ফোর্থ ইয়ার। হঠাৎ একদিন চাপরাশীর হাতে অসীমার বাবার একখানা চিঠি এল, 'বাবা কনক, সময়মতো একবার আসবে?'

পার্ক স্ট্রীটেরই ঠিকানা। সেইখানেই আছে ওরা।

প্রথমটায় মনে করতে পারে নি, তারপরই অসীমার কথা মনে পড়ে নামটা চিনতে পারে সে। ফ্রক পরা ছিপ্‌ছিপে মেয়েটি। সর্বদাই যেন কী এক কৌতুকের হাসি লেগে থাকে মুখে। ভারি মিষ্টি স্বভাব।

পরের দিনই গেল কনক দেখা করতে। অসীমার মা ইতিমধ্যে মারা গেছেন। অসীমার বাবা ওকে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, 'আমরা মাঝে দু'বছর এখানে ছিলুম না, ফিরে এসে পর্যন্ত অসীমা তাড়া দিচ্ছে তোমাদের খোঁজ

করবার জন্য। তা তোমরা কোথায় উঠে গেছ—কিছুই জানি না। শেষে ঐ পাগলীই খুঁজে খুঁজে বার করেছে তোমার পাত্তা। ঐ যে—'

অসীমা এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়াল। এ কী! এ কোন্ অসীমা?

বিস্ময়ে কনকের মুখ দিয়ে কথা সরে না। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সে। যেন ভেঙে চুরে নতুন ক'রে কে গড়েছে ওকে। এই সুন্দরী তন্বী কিশোরী কি সেদিনকার সেই ফ্রক-পরা ছোট্ট মেয়েটি?…

মুখের কৌতুক-হাসির রেখাটি শুধু তেমনি আছে। তাইতেই চিনতে পারে কনক।

প্রয়োজনটা খুলে বলেন জ্ঞানবাবু। মেয়ে এবার ম্যাট্রিক পাস্ করেছে। আরও পড়বে কিন্তু কলেজের পড়া সব ওর মাথায় ঢোকে না। একজন লোক চাই একটু সাহায্য করার। কনক যদি একটু—

কনক আরও অবাক। সে বলে, 'কিন্তু আমি কি পারব? কীই বা জানি? অন্য কোন প্রফেসর বা শিক্ষক যদি—'

জ্ঞানবাবু ঘাড় নাড়েন, 'না। পাগলী তাতে রাজী নয়, মাস্টার রাখতে দেবে না। তুমি যদি একটু সাহায্য করো তো হয়। তোমার মতো বোঝাতে নাকি কেউ পারে না। কিন্তু তাও ওর শর্ত কি জানো? রোজ এলে চলবে না, তোমাকে কিছু টাকাও দিতে পারব না—বেগার দিতে হবে। যত বলি যে তারও তো সময়ের দাম আছে, কিছু না দিলে চলবে কেন? তত ওর সেই এক কথা—তাহ'লে দরকার নেই, যা পারব তাই করব, নিজে নিজেই। ওঁর সঙ্গে টাকার সম্পর্ক আনতে চাই না—'

চোখের মধ্যে কি সুগভীর বিশ্বাস ও জোর ছিল অসীমার—কনকের সাধ্য ছিল না অস্বীকার করার। কনক যেতে আরম্ভ করল নিয়মিত। অবশ্য প্রতিদিন নয়—অসীমা সে বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক, সপ্তাহে দু'দিনের বেশি আসা চলবে না। অদ্ভুত, বিচিত্র মেয়ে। রহস্যময় ওর মনের গতি-প্রকৃতি।

তারপর দুটো বছর কী স্বপ্নে যে কেটেছিল কনকের!

মুখের ভাষায় প্রণয়ের কোন প্রকাশ্য ইঙ্গিত উচ্চারিত হয় নি—চিঠির ছত্রেও না। তবু কারুর মনের কথাই কারুর অগোচর ছিল না।

আশা?

হ্যাঁ—আশাও কিছু জেগেছিল বৈকি কনকের মনে। না জাগবার কারণ কি? কনক সুশ্রী দেখতে, শিক্ষিত সচ্চরিত্র ছেলে। মধ্যবিত্ত? তা হোক না—জ্ঞানবাবুর তো অর্থের অভাব নেই। ঐ একমাত্র মেয়ে। আর একটি ছেলে ওঁর অবশ্য আছে, তবু এই মেয়েটিই যে প্রাণ তা কে না জানে?

এমন সময় এম. এ. পরীক্ষার মাত্র কয়েকদিন আগে হঠাৎ কথাটা শুনল ও অসীমার মুখে, 'আমরা আবার ফিরে যাচ্ছি, মহারাজা ডেকেছেন।'

'কদিনের জন্যে?' বিবর্ণমুখে প্রশ্ন করেছিল কনক।

'তার ঠিক নেই। বাবারও কিছু মতলব আছে। মহারাজার ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চান। বিলেত থেকে ফিরে এসেছে সদ্য, খুব নাকি ভাল ছেলে। সেইজন্যই কিছুদিন ওখানে গিয়ে থাকবেন, নইলে হয়ত এখন না গেলেও চলত।'

খুবই সহজভাবে কথাগুলো বলে অসীমা। চরম নিস্পৃহতা ও অনাসক্তি ওর কণ্ঠে। যেন আর কার কথা।

কনকের মুখ দিয়ে কথা বেরোয় নি কিছুকাল, তারপর শুষ্ক ওষ্ঠে জিভ বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'আর তুমি! তোমার মত কি?'

'আমার মতের কথা তো উঠছে না। বাবার যা ইচ্ছা তাই বলছি।'

'বাবা যদি এ বিয়ে ঠিক করেন?'

'বাবার কথা শোনাই তো অভ্যাস। বাবার চেয়ে কি বেশি বুঝি আমি। আমার কল্যাণই তো তিনি চান।'

মুখে কি কৌতুকের হাসি ছিল সেদিন? না, ওটা ওর চিরাভ্যস্ত মুখভঙ্গী। অত বিচার করে নি কনক, বিচারের মতো মনের স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থাও ছিল না। নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছিল শুধু—আর যায় নি।

এম, এ.-তে কনক ফার্স্ট ক্লাস পায় নি, সেকেণ্ড ক্লাসও না। কোনমতে পাস যে করেছে সে, করতে যে পেরেছে, তাইতেই ও দস্তুরমতো বিস্মিত। তার ফলে রিসার্চ স্কলারশিপ বা অধ্যাপনা কোনটারই আশা রইল না। অথচ সংসারের যা অবস্থা—অপেক্ষা করারও সময় ছিল না। যে পথ খোলা ছিল তাইতেই ও ঢুকেছে। ইস্কুল মাস্টারী।

তারপর?

যথানিয়মেই জীবন আবর্তিত হয়েছে ওর। বিয়ে ও করতে চায় নি এটা ঠিক—কিন্তু সেটা স্বাভাবিক সঙ্কোচ ব'লেই মনে ক'রে আপত্তিটা কেউ গ্রাহ্য করে নি। বাবা মেয়ে দেখেছেন, সম্বন্ধ ঠিক করেছেন—বিয়েও হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত একটু বেঁকে দাঁড়িয়েছিল. কিন্তু বাবার শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে মা সমস্ত আপত্তি ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

খুব একটা কিছু আপত্তিরও কারণ খুঁজে পায় নি কনক।

কেন? কিসের জন্য অপেক্ষা করবে ও? কার জন্যে?···

এরপর গত তিন চার বছরে যেন কত কি ওলটপালট হয়ে গেছে। কনকের মনে হয় ওর পরমায়ুর চল্লিশটি বছর কেটে গেছে। বাবা মারা গেছেন, দাদা ভাল সরকারী চাকরী পেয়ে বিদেশে চলে গেছেন। একটা গোটা সংসার ওর মাথায় এসে পড়েছে। স্ত্রী কৃষ্ণা বিষম আনাড়ি, গুছিয়ে সংসার করতে পারে না কোনদিনই। তার ওপর পর পর দুটি সন্তান। যুদ্ধের বাজারে নিচের তলার ফ্ল্যাটও সত্তর টাকার কমে হয় না।···মাকে পাঠাতে হয় কিছু—কিছু বিধবা বোনকে। অর্থাৎ মাস গেলে সাড়ে তিনশো টাকা খরচা, খুব কম হ'লেও।

ছাত্রের ডাকে চমক ভাঙে। অতীতের আকাশ থেকে বর্তমানের মাটিতে নেমে আসে কনক।

অঙ্ক? ও—হ্যাঁ, তাই তো।

দ্রুত কতকগুলো অঙ্ক কষিয়ে দিয়ে উঠে পড়ে সে।

ছাত্র প্রশ্ন করে, 'হিস্ট্রীর টাস্কটা দেখবেন স্যার?'

'আজ থাক্ অনিল, বড্ড মাথাটা ধরেছে—'

বাইরে এসেও খুব খানিকটা হনহন ক'রে হাঁটে,—তারপর একেবারে মোড়ের মাথায় এসে থমকে দাঁড়ায়।

একবার যাবে নাকি?

এখনই?

এত রাত্রে?

তা ছাড়া সময়ই বা কই? মনকে বোঝায় কনক—এই তো সবে রাত

নটা। কলকাতার হিসেবে এমন আর রাত কি? সকালে ওর সময় নেই মোটে—এক সেই রবিবার ভিন্ন আর অবসর পাওয়া যাবে না।

না, অতদিন অপেক্ষা করতে পারবে না সে। কনকের সারা অন্তরটা যেন উদ্বেল হয়ে ওঠে।

কিন্তু এমন ভাবে ছুটে যাওয়ার কি কোন অর্থ আছে? প্রয়োজন?

সংশয় দেখা দেয় বৈকি। উচিত অনুচিতেরও প্রশ্ন ওঠে।

তবে তাতে ওর গতি বাধা পায় না। সমস্ত সংশয়েরও ওপর হৃদয়বৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে। ওকে দুর্নিবার এবং অপ্রতিহতগতিতে ঠেলে সেই দিকে—যে দিকে ওর কৈশোর এবং যৌবনের মানসী ওর পথ চেয়ে আছে—

দক্ষিণের কী একটা পাড়ার ঠিকানা। কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে এসে বাসে চাপে সে। একবার মনস্থির করার পর আর সংশয় থাকে না, থাকে শুধু একটা ব্যগ্র ব্যাকুলতা—মনে হয় পকেটে টাকা থাকলে ও ট্যাক্সি করত।

অসীমা তেমনিই আছে। তেমনি আশ্চর্য সুন্দরী, তেমনি মৃদু কৌতুকের হাসি ওর ওষ্ঠপ্রান্তে। তেমনি শান্ত, সংযত ভঙ্গী।

অথচ অভ্যর্থনার সময় যে ঐকান্তিকতা ফুটে ওঠে ওর দৃষ্টিতে, চিত্তবৃত্তিকে কষ্টে দমন করার যে সব চিহ্ন প্রকাশ পায় ওর সমস্ত আচরণে, তা চিনতে ভুল হয় না কনকের।

চোখের চাহনিতে অসীমার কী মিনতি, কী পূজা—

ইস্কুল মাস্টারীর আবরণ গা থেকে খসে পড়ে যায়, অকালবার্ধক্য লোপ পায়—চিরন্তন তরুণ মাথা তোলে কনকের মধ্যে—খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে, বুদ্ধি ও যৌবনের একটা ঔজ্জ্বল্য বিচ্ছুরিত হয় যেন ওর সর্বাঙ্গ থেকে।...

নেহাৎ ব্যক্তিগত কথাবার্তাও কিছু হয়। জ্ঞানবাবু মারা গেছেন। ওরা এই বাড়িটা কিনেছে। এখানে অসীমা আর তার ভাই আছে শুধু। ভাই বি. এ. পড়ছে।

প্রশ্নটা বার-কতক ঠোঁটের কাছে এসে ফিরে যায়—শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়েই ক'রে ফেলে, 'তো...তোমার বিয়ে হয় নি?'

অসীমা সহজ ভাবেই বলে, 'না।'

'কেন—হয়নি ?'

'না।'

'কিন্তু বিয়ে হবার তো কথা ছিল—'

'কই, তা তো জানি না।'

'সে কি ! তুমিই তো বলেছিলে।'

'না। তা তো বলি নি। শুধু বলেছিলুম যে বাবার মতলব তাই। কিন্তু সারা পৃথিবী তো তাঁর মতে চলে না।'

'তিনি—মানে মহারাজকুমার কি রাজী হন নি ?

'হ্যাঁ, তিনিও রাজী ছিলেন, তবে কথাটা পাকাপাকি হবার আগেই বাবা মারা গেলেন।'

'তাতে কি হ'ল ? তিনি আবার পেছিয়ে গেলেন ?'

'না। আমার আর বিয়ে করার প্রয়োজন রইল না। বাবা যতদিন বেঁচে-ছিলেন ততদিনই তাঁর ইচ্ছার মূল্য। এখন আমি আমার ইচ্ছামতোই চলব—এইটেই তো স্বাভাবিক।'

খুব শান্ত, খুব সহজভাবেই কথাগুলো বলে অসীমা। যেমন সেদিন বলেছিল। তেমনি নিস্পৃহতা, তেমনি নিরাসক্তি ওর কণ্ঠে।

কনকের কি আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে ?

কি নির্বোধ, কি একান্ত রকমের অন্ধ !

বিহ্বল হয়ে বসে থাকে সে। অসীমার দিকেও চাইতে পারে না।

অবশেষে একসময় এগারোটা বাজার শব্দে ওর চৈতন্য হয়।

'ইস্ এগারোটা বেজে গেল ? মাই গড—এত রাত্রে কি বাস পাবো ?'

'তার দরকার হবে না। গাড়ি বার করতে বলেছি, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

অসীমার নিজের তরফ থেকে একটাও ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে না। হয়ত সবই জানে—বিয়ে, ছেলেপুলে, সব কথাই—কিম্বা জানে না। শুধু বলে, 'আবার আসবেন তো ? কবে ?…একদিন ছুটির দিনে আসুন, খুব খানিকটা কোথাও ঘুরে আসি।'

'নিশ্চয় আসব। শনিবার এসে বলে যাবো, এ রবিবারে যেতে পারব কিনা।'

মূল্যবান গাড়ি ফাঁকা রাস্তা পেয়ে নিঃশব্দে দ্রুতগতিতে যেন হাওয়ায় পক্ষ বিস্তার ক'রে উড়ে যায়। কিন্তু তার চেয়েও হালকা ঠেকে ওর নিজেকে।

সত্যি। এই তো মোটে আটাশ বছর বয়স ওর। জীবনকে ভোগ করার, দুর্ভাগ্যকে ব্যর্থ করার এই তো সময়।

না, বর্তমানকে ও অস্বীকার করবে। এখনও ওর পথ চেয়ে সুন্দরী মেয়ে বসে থাকে, ওর আগমনের প্রহর গোণে।

জীবনে কিছু রস আছে বৈকি!

কোন নীতি মানবে না ও। কোন কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেবে না।···

বাড়িতে পৌঁছে দেখে কৃষ্ণা একেবারে রাস্তার ওপর বিবর্ণ পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে। ওর চোখে জল।

'এত রাত কেন গো?'

'এক জায়গায় গিয়েছিলুম, এক বন্ধুর অসুখ, তাই।'

অকারণে মিথ্যা কৈফিয়ৎ দেয়। অসংলগ্নভাবে কথাগুলো বলে ও।

কৃষ্ণা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'তবু ভাল। এমন ভাবনা হয়েছিল! কেউ নেই যে খবর নিই। কোথায়ই বা নেব। এধারে ছোট খোকাটার কি বিশ্রী জ্বর!'

'জ্বর?' চমকে ওঠে কনক, 'কত জ্বর?'

'কি ক'রে জানব, থার্মোমিটার আছে কি? তবে গা পুড়ে যাচ্ছে।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে স্খলিতকণ্ঠে প্রশ্ন করে কনক, 'কি হবে, ডাক্তার ডাকব?'

'আজই তো জ্বর এসেছে—ডাক্তার ডেকে আর কি হবে? চলো তুমি বিশ্রাম করবে চলো।'

নিঃশব্দে এসে মুখ হাত ধোয় কনক, ছেলেটার গায়ে হাত দিয়ে দেখে সত্যিই গা পুড়ে যাচ্ছে।

'খাবার দিই? না একটু বসবে?'

'আজ—আজ আর খাবো না কিছু, ওখানে একটু খেয়েছি, এখন আর খেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি খেয়ে নাও—'

কৃষ্ণা রান্নাঘরে যেতে যেতে বলে গেল, 'ওরা আজও একতাড়া প্রুফ দিয়ে

গেছে, বলে গেছে যে কালকের প্রুফগুলো ফেরত না পাওয়ায় খুব ক্ষতি হয়েছে। কাল প্রেস বসে থাকবে সারাদিন—সবগুলো কাল সকালে পেলে ভাল হয়।'

তা বটে। ওদের নিজেদের প্রেস, সব কাজ হিসেবের ওপর চলে। সব টাইপ জোড়া হয়ে থাকলে নতুন কম্পোজই বা করে কি ক'রে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কনক প্রুফ দেখতে বসে। ছোট আট-পয়েণ্ট টাইপের প্রুফ, দেখতে দেখতে চোখ টনটন করে, টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখার ফলে শিরদাঁড়া ব্যথা করতে থাকে। তবু শুতে ভরসা হয় না—দেখতেই হবে, যেমন ক'রে হোক। এই যখন জীবিকা—অবহেলা করা চলবে না।

অনেক রাত্রে কাজ শেষ ক'রে উঠতে গিয়ে হঠাৎ সামনের আয়নাটায় নজর পড়ল। ওর বিয়ের আয়না-বসানো আলমারী, এম.এ. পাস করার পুরস্কার।···দুই চোখের কোলে কালি, দুই রগ এবং গাল ঢুকে গেছে—অনেকটা বুড়ো মানুষের মতো। রোগা তো হয়েছেই—একটু যেন কুঁজোও হয়ে পড়েছে।

আটাশ বছর? মোটে আটাশ বছর বয়স!

বাজে কথা।

ঐ দর্পণে সমস্ত ছবিটা ফুটে উঠেছে—শুধু তো দেহটাই নয়, বিপুল সংগ্রামের ইতিহাস শুদ্ধ, প্রতিদিনের পৃষ্ঠপট আঁকা ওর সমগ্র জীবনেরই ছায়া।

না। যৌবন ওর আর নেই, মিছে কথা। কল্পনা-বিলাসেরও সময় নেই।

ওসব মিথ্যা। সত্য হচ্ছে ওর তিনটে টিউশ্যনী, কোচিং আর এই প্রুফ দেখা। ছোট ছেলেটার জ্বর—বোধহয় কাল ঝি আসবে না, এই সবই জীবনের সত্য।

বহুদূর, বহু পিছনে ফেলে রেখে এসেছে ও নিজের যৌবনস্বপ্নকে।

কনক বিছানায় শুয়ে অসীমার কথা ভাবতে চেষ্টা করে—কিন্তু অপরিসীম ক্লান্তির মধ্যে তার স্মৃতি ধুয়ে মুছে কোথায় মিলিয়ে যায় অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে।···

কাঙাল আমারে কাঙাল করেছো

বেশ কিছুদিন আগের কথা বলছি। তখনও বারো-চোদ্দ আনায় একখানা মাঝারি আকারের গামছা পাওয়া যেত।

বীরভূমের একটা শহরে গিয়েছিলাম একটু কাজে। সেখান থেকে ফিরছি। দুপুরের গাড়ি, ভীড় বিশেষ ছিল না। তবু মাঝের একটা স্টেশন থেকে যে বৈষ্ণব বাবাজীটি উঠল, সে বেঞ্চিতে না বসে চলনের পাশে কাঠের দেওয়াল ঠেস দিয়ে মেঝেতেই বসল উবু হয়ে।

নিতান্তই নিরীহ চেহারা। সামান্য একটু দাড়ি, চুলও আধা-জট-পাকানো, তার ওপর একটা ছেঁড়া নামাবলী পাগড়ির মতো করা, কাঁধে ময়লা একটা কাঁথার ঝুলি, হাতে খঞ্জনী।

খানিকটা দেখে কেমন মমতা বোধ হ'ল। বললুম, 'বাবাজী মশাই উঠে বসুন না। জায়গা তো ঢের পড়ে আছে বেঞ্চিতে।'

এতখানি জিভ কেটে বাবাজী বললে, 'না, না, আমি মশাই-টশাই নই বাবু—মশাই আমরা গুরুকে বলি। আমি বাবাজীও নই—নিছাৎই কাঙাল, ভিখিরী।'

'তা হোক, তা উঠে বসতে দোষ কি?'

'একটু বেশি অপরাধ হয়ে পড়ে না বাবা? আমার দিক থেকে দোষটা বেশি হয়ে যায়। টিকিট আমি করি নাই, সে সঙ্গতিও নাই, বিনা শুল্কে যাচ্ছি, সেই তো অন্যায়—আবার বেঞ্চিতে বসব কোন্ আস্পদ্দায় বাবা!

বুঝলাম যে নীতিজ্ঞানের এই সুক্ষ্মবিচার যে আইনের চোখে একেবারেই মূল্যহীন তা একে বোঝানো যাবে না। নিজের মনের মতো একটা সান্ত্বনা গড়ে নিয়েছে—তাতেই যদি শান্তিতে থাকে তো থাক।

প্রসঙ্গটা চাপা দিতেই আরও প্রশ্ন করলুম, 'তা কোথায় যাওয়া হয়েছিল এদিকে?'

'বাবু ঘরে পরবার দব্যর বড় অভাব চলেছে। বহির্বাস বলতে এই একটি কাপড়ে ঠেকেছে, তাও বিস্তর সেলাই দিয়ে তবে পরতে হচ্ছে। ঘরে

একেবারে দিগম্বর হয়ে থাকার অবস্থা। এখানে রাজাদের ঠাকুরবাড়িতে নন্দোৎসবের দিনে গরীব দুঃখীকে একটা ক'রে হলুদে ছোপানো নতুন গামছা দেন রাজামশাইরা। সেই আশাতেই গিয়েছিলুম, তা বেস্তর ভীড়, আমি ঠেলাঠেলি না ক'রে এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলুম। শেষে একটু এগিয়ে যেতে গোমস্তা মশাই বললেন, "এই, তুমি না সকালে একবার নিয়ে গেছ? হ্যাঁ, আমি তোমাকে নিজে হাতে দিইছি, বেশ মনে আছে। ছিঃ বুড়ো হয়ে মরতে চললে, তুলসীর মালা গলায়, তবু এত লোভ!"……তা বাবু, অমি যত বোঝাতে চেষ্টা করি যে ভীড়ের জন্যেই পিছনে দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ তাই আমার মুখখানা তাঁর চেনা মনে হচ্ছে—ততই তিনি রুখে ওঠেন। আর কথা বাড়ালুম না বাবু। চলে এলাম।'

'তাই বলে মিথ্যে অপমানটা হজম ক'রে এলেন?'

'কি করব বাবা, তাঁর সঙ্গে ঝগড়া মারামারি তো করবার শক্তি নাই, সে আমাদের করতেও নাই। তাছাড়া—' লোকটি একটু নড়েচড়ে বসল, 'বাবু, কেউ কাউকে অকারণে দুর্নাম দিতে কি অপমান করতে পারে না—তার সাধ্যি কি? যা কিছু করার মালিক সেই একজন, আমার—আমাদের মালিক। নিশ্চয় আমারই কোন অপরাধ হয়ে থাকবে, সেবা অপরাধ। তিনি তো নিজে কিছু করেন না। যা কিছু সাজা দেওয়া বলুন, বকশিশ করা বলুন—এই মানুষকে দিয়েই দেন। তার কাছে পাওনা বলে ধরে নেওয়াই ভাল।'

'আজ তাহলে আপনার খাওয়াও হ'ল না?'

'না ওখানেই—যাদের নতুন গামছা দেওয়া হয় সেই গামছায় বাধা চিঁড়া মুড়কিও থাকে। আগে জোড়া মোণ্ডাও থাকত—তা মূলেই হাভাত।…তার জন্যে কষ্ট নেই বাবা। ও আমাদের সওয়া আছে। দিতেও তিনি, না দিতেও তিনি। তাই না? আপনারা অবিশ্যি লেখাপড়া-জানা লোক। আপনাদের কি বলব—ঐ একজনের ওপর নিভ্ভর ক'রে থাকাই ভাল না? ধড়ফড়ানি, হাঁকড়-পাঁকড় কিছুই থাকে না। নিশ্চিন্তি।'

'তা ভিক্ষে করেন না?'

'করি বৈকি। মশায় এই ঝুলি দিয়ে বলে দিয়েছিলেন—প্রাতিদিন ভিক্ষেয় বোরোবি। নইলে তিনি ভাববেন অংখার হয়েছে। যেদিন খোরাক দেবার

দেবেন, যেদিন না দেবার—কিছু জুটবে না।··খাবার বেশি হ'লে দিয়ে খাবি পাঁচজনকে, কিছু না জুটলে এক ঘটি জল খেয়ে পড়ে থাকবি। বুঝবি সেদিন সেই তোর পাওনা ছিল।'

সিগারেটের বাক্স বার ক'রে ধরাতে গিয়ে কি মনে হ'ল, শুধোলুম, 'বাবাজীর বিড়ি তামাক চলে ?'

'তা মিছে কথা বলব না বাবা, পেলে খাই। দেয়ও অনেকে দয়াধর্ম ক'রে। গুড়ুকও টানি—তবে গাঁজাটা চলে না, শরীরে বড় টান ধরে। বুঝি যে মালিকের নিষেধ—নইলে তার সঙ্গে দুধ ক্ষীর বরাদ্দ করতেন।'

··একটা সিগারেট দিতে দু'হাত পেতে নিল লোকটি, সিগারেটসুদ্ধ দু'হাত কপালে ঠেকালও। কিন্তু তখনই ধরাল না। সে বাক্সে দুটোই মোট ছিল, আমি একটা মুখে দিয়ে সেটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছি—বলল, 'বাবা, উটি আমাকে ভিক্ষা দেবেন ?'

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি, 'কেন ?'

একটু যেন লজ্জিত হয়ে, 'না, মানে এমন দব্য তো জোটে না বড় একটা। বিড়ি হ'লে দয়ালের কাছ থেকে দেশলাইটাও চেয়ে নিয়ে ধরিয়ে নিতাম। ইটি যখন পেয়েছি—ঘরে গিয়ে গোবর্ধনকে দেখিয়ে তবে খাবো।···আমাদের আত্মবৎ সেবা, যা নিজে খাবো তা আগে মালিককে নিবেদন ক'রে খাবো—এই মশাইয়ের আদেশ। অবিশ্যি বিড়ি কি গুড়ুক পথে ঘাটে মেলে মনে মনে নিবেদন ক'রে নিই—এটা ভাবছি নিয়ে গিয়ে একটু দেখিয়ে নিব।'

'গোবর্ধন কি ? বিগ্রহ কিছু ?'

'না বাবা, গোবর্ধন শিলা। বৃন্দাবনের কাছে গিরি গোবর্ধন—যা আমার মালিক নিজে পূজো করেছিলেন—তারই একটুখানি শিলাখণ্ড। বৃন্দাবনের ব্রজবাসীরা, সকলের তো বিগ্রহ সেবার সামর্থ্য নাই—একটুখানি ক'রে ঐ শিলা ঘরে রাখেন, যেখানে হোক—কেউ বা সিংহাসনে প্রিতিষ্ঠে করেন, কেউ বা কুলুঙ্গীতে ফেলে রাখেন। ফুলজল দেন তাঁরাও—আর খাবার সময় ওঁর সামনেই রেখে হাততালি দিয়ে বলেন, "আও লালা, খাও জী" তাতেই নাকি মালিকের ভোগ হয়ে যায়। মন্দিরে—কি যাঁরা সামান্যভাবে বিগ্রহ রাখেন তাঁদেরও এই শিলা রাখতে হয়। ও পাহাড়ের প্রতিটি শিলা

জাগ্রত বাবা—মহাজনরা বলেন। তাই আমি ব্রজবাসী ঠাকুরকে বলে একটু-খানি চেয়ে এনে রেখে দিয়েছি।'

'নিত্য ভোগরাগ হয় তাঁর?'

বেশ প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দেয়, 'সে তাঁর অভিরুচি। আমাদের আত্মবৎ সেবা। নিজে যেমন থাকব তেমন তাঁকেও রাখব। তাঁর ইচ্ছা হয় আমার হাত দিয়ে খাবার—তিনি আমার ভিক্ষে জোটাবেন—উপোস করার ইচ্ছে হয় করাবেন। সে দায় ওঁর ওপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত আছি!'

'ঘরে যিনি আছেন, তার কি অবস্থা হয়—কিছু না জুটলে?'

'ঘরে?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বাবাজী।

'মানে সেবা দাসী-টাসী?' বলেই ফেলি শব্দটা। অনেকক্ষণ ধরেই মনে ঘুরছিল।

এতখানি জিভ কেটে বলেন, 'না বাবা, ও বালাই করি নাই। ও বড় অশান্তি। ওঁরা দাসী তো ননই, আর সেবা যা করেন তাঁর চারগুণ সেবা করিয়ে নেন। তাই বলে আমি খারাপ কিছু বলছি না—যার যেমন সেবা, আমার রুচি হয় নাই। এ আমি বেশ আছি। একটু খড়ের ঘর, সামনে একটু জমি, দু'একটা ফুলগাছ আছে, তুলসী আছেন—আমিও আছি। ঘরের চালে খড় কি দেওয়ালে মাটি যখন একেবারে থাকে না, তখন দেখি আপনা থেকেই লোকে দু'চার তড়পা খড় দিয়ে যায়, কি কেউ নিজে থেকে এসে একটু মাটি ধরিয়ে দিয়ে যায়। কোথা দিয়ে কি হয় অত হিসেবও রাখি না। মালিকের ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়েছি—নিজে মাথাই বা ঘামাব কেন?'

বলতে বলতে দেখি ঝোলাঝুলি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে বাবাজী। সামনে সওয়াদিনপুর স্টেশন, বোধহয় সেখানেই নামবে।

কি জানি কেন—লোকটাকে ঠিক মিথ্যেবাদী বলে বোধ হ'ল না, বললুম, 'বাবাজী, আমি যদি দুটো টাকা দিই, নেবে? একটা ধুতি কিনে নিতে—?'

'ও হরি—তা নেবে না কেন? বুঝেছি আজ দয়াল ঠাকুর আপনার বেশে এসেছেন। ঐ যে বাবু বলছিলুম না, যিনি যোগাবার যেদিন ঠিক বরাদ্দ ক'রে রেখে দেন। বেশি দেবেন বলেই কম দেন নাই, ঐ গামছাখানা নিতে

দেন নাই। ও কথা না শুনলে তো আপনার দয়া হ'ত না। দেন বাবু, দু'হাত পুরেই নিচ্ছি। বড় দয়া আমার দয়ালের, বড় দয়া।'

সে দু'হাতে টাকাটা নিয়ে সেই দু'হাত জোড় ক'রেই নমস্কার ক'রে নেমে গেল গাড়ি থেকে।

'কত দূর যেতে হবে?' প্রশ্ন করলাম।

ততক্ষণ গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। গাড়ির সঙ্গে চলতে চলতে উত্তর দিলে, 'বেশি না, কোশ দুই হবে। এই কাছেই। সন্ধ্যের আগেই পৌঁছে যাবো।'

প্রায়শ্চিত্ত

এ গল্পটা আসলে যমুনা মাসীর। সোজাসুজি গল্পের মতো ক'রে বলব বলেই বসেছি। কিন্তু তার আগে—অকারণে হলেও—যমুনা মাসীর সঙ্গে প্রথম কি ক'রে পরিচয় হ'ল—সে কথাটা যদি বলে নিই, খুব বোধহয় দোষ হবে না। মানে, সেটা এমনই এক বিস্ময়কর ব্যাপার—যে, পাঠকদেরও একটু সে বিস্ময়ের ভাগ দেবার লোভ সামলাতে পারছি না।

যমুনা মাসীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে —বৃন্দাবনে।

১৯২৪ সালে পুজোর সময় গঙ্গা আর যমুনায় যে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছিল—আজ আর কারও সে কথা মনে থাকার কারণ নেই। আমাদের মতো দু'-চারজন ছাড়া প্রত্যক্ষদর্শীও বিশেষ কেউ বেঁচে নেই বোধহয়—কিন্তু সে সময় খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা। ভয়াবহ এই জন্যে যে, ঐ দুই নদীতে—ওপর দিকে অন্তত উত্তরপ্রদেশে কদচিৎ কখনও বন্যা হয়—সেজন্যে কেউ বিশেষ প্রস্তুত ছিল না; তখন সরকারী সাহায্যও এত তুরন্ত আসত না। যমুনাতে তো বিশেষ জলই থাকত না, সুতরাং নৌকোর কথাও কেউ চিন্তা করে নি কখনও—ফলে বহু ক্ষয়ক্ষতি এবং বিস্তর প্রাণহানি ঘটে সে বন্যায়।

দৈবক্রমে আমরা সে সময় বৃন্দাবনে গিয়ে পড়েছিলাম। তবে দৈবক্রমেই —আমরা যেখানটায় ছিলুম, সৌভাগ্যের এবং প্রচুর বিস্ময়ের কথাও—সেখানটায় প্রায় দুশো গজ রাস্তা শুকনো ছিল, তার দু'-দিকের বাড়িতেও জল

ঢোকে নি। অবশ্য তাতে আতঙ্ক কমে নি কিছুমাত্র, আসে নি—আসতে কতক্ষণ?

ওখানকার রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতাল তখন ছিল পানিঘাটে—যমুনার ধারেই। বলা বাহুল্য, সেটা প্রথমেই সম্পূর্ণ ডুবে গিয়েছিল। যতটা সম্ভব যন্ত্রপাতি, বিছানা, ওষুধ ও ডাক্তারীর অন্য সাজসরঞ্জাম এবং শয্যাগত রোগী-দের নিয়ে সন্ন্যাসীরা এসে উঠেছিলেন শহরের মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিপূত কালাবাবুর কুঞ্জে। সেখানেও দরজা পর্যন্ত জল গিয়েছিল। তবে সে মজবুত পাথরের বাড়ি, তার কোন ক্ষতি করতে পারে নি। প্রভাস মহারাজ তখন সেক্রেটারী, তিনি ঐখান থেকেই অসাধ্য সাধন করছিলেন প্রায়। স্বল্পতম আয়োজনে অধিকতম মানুষের প্রাণরক্ষা—সর্বতোভাবে এই ব্রতের সাধনই চালিয়েছিলেন কটি সাধু।

মহারাজ কদিনই চরকির মতো ঘুরেছিলেন। সপ্তমীর দিন সন্ধ্যায় আমাদের এদিকেও এসেছিলেন এদিককার অবস্থা দেখতে। খানিক পরে হঠাৎ আমাদের আস্তানায় ঢুকে মাকে বললেন, 'মা—ঐ যে ওদিকে বড় হাম্‌দা বাড়িটা, ওর ভেতর ওদিকের কোণের ঘরে একটি বাঙালীর মেয়ে থাকে —সধবা কি বিধবা জানি না—সম্ভবত ওখানেই গুহাতপস্যা করে। কিন্তু পিছন দিক থেকে বাড়িটায় জল ঢুকে গেছে, কাল রাত্রেই, এখন বোধহয় আবার বাড়ছে. ওদিককার উঠোন তো ডুবেছেই, বোধহয় আজ রাত্রে ঘরেও ঢুকবে। কে জানে মাটির গাঁথুনি কিনা—বহুদিনের বাড়ি—মাটির গাঁথুনি হওয়াই স্বাভাবিক, জল যদি বেশিক্ষণ থাকে, ভেঙে পড়তে পারে। কাল থেকে রেঠিয়া বাজারে, গোপীনাথ ঘেরায় কত বাড়ি যে পড়ল তার ইয়ত্তা নেই। কিম্বা যদি জল বেড়ে বেরনোর পথ বন্ধ হয় জলে ডোবা চুহাকলের মতো দম বন্ধ হয়ে মরবে। আমরা কত বলছি বেরিয়ে আসতে—কিছুতেই শুনছেন না। ওর ঐ গর্ত ছেড়ে ও বেরোবে না, নরলোকের মুখ দেখবে না। আপনি মা জোর ক'রে ওকে ধরে এনে নিজের কাছে রাখতে পারেন?'

আমরা তো অবাক। ঐ বাড়িতে লোক? তা আবার বাঙালীর মেয়ে?

বাড়িটা দেখেছি বৈকি। দু'বেলাই দেখি যাতায়াতে। ছোট ইঁটের গাঁথুনি গবাক্ষবিরল ঐ প্রকাণ্ড দু'মহলা বাড়িটা আমাদের আলোচনার একটা

প্রধান বিষয়বস্তু। নিশ্চয়ই কোন রাজা মহারাজা বা তত্তুল্য জমিদার কোশল ক'রে করিয়েছিলেন, তারপর সে শখ গেছে মিটে, পরবর্তীদের আয়ও গেছে কমে—বাড়িটা পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। এখানে এত বড় বাড়ি কেনবারও লোক নেই যে বিক্রি করবে। শুধুই খালি পড়ে আছে, মেরামতের অভাবে ভাড়াটেও জোটে না, আর এখানে ভাড়া তো এক টাকা আট আনা—তাতে অত কারও লোভও নেই। কেউই থাকে না ওখানে, অন্তত আমরা কাউকে দেখি নি—থাকতে বা যেতে আসতে। শুধু এক বৃদ্ধ আধা-সন্নিসী চৌকিদার আছে। সে এই সামনের আস্তাবলটাতেই থাকে, ওখানেই রেঁধে খায়। ভেতরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তবে শুনেছি ভেতরে কী ঠাকুর আছেন, গোপাল বা শুধুই গোবর্ধনশীলা—এক ব্রজবাসী দুপুরে এসে দুটো ফুল ফেলে, ঐখানেই লাড্ডু ভোগ দিয়ে চলে যায়। (লাড্ডু অর্থে ওখানে তখন পেঁড়া বোঝাত। মানে নামে লাড্ডু ভোগ হলেও পেঁড়াই পড়ত শেষ পর্যন্ত।) ঐ বিরাট শূন্য বাড়িটায়—দরজার কপাট নেই অধিকাংশ ঘরে, থাকলেও কেউ বন্ধ করত না—একতলাতেই বোধহয় বড় বড় মাঠময়দান ধরনের খান ষোল-কুড়ি ঘর—ওর মধ্যে কে মেয়েছেলে থাকে, কী ভরসায়? ইঁদুরগুলোকে পর্যন্ত তো যেতে দেখি না!

অবিশ্বাস্য কথা, তবু মহারাজের অনুরোধ—মা গেলেন শেষ অবধি। সঙ্গে আমি আর ভাগ্নে নেড়া। তখনও দিনের আলো একেবারে যায় নি, কিন্তু বন্যায় ভেসে আসা সাপখোপ আর পুরনো হানাবাড়ির বনেদী অধিবাসী বিছেদের কথা স্মরণ ক'রে একটা হ্যারিকেন নিয়েই গেলাম আমরা।

সত্যিই, যেখানে মেয়েটি—মানে যমুনা মাসী থাকতেন, তার চৌকাঠ পর্যন্ত জল পৌঁচেছে। জল ভেঙেই যেতে হ'ল আমাদের। কিন্তু ঘরে ঢুকে আরও অবাক হয়ে গেলুম। এমনভাবে মানুষ বাস করতে পারে? একটা কাঠের তক্তপোশ—তাতে বিছানার চিহ্ন পর্যন্ত নেই; দড়ির আলনায় একটি কাপড়, একটি সেমিজ ও একটি গামছা; ঘরের মধ্যেই একপাশে একটা কাঠের উনুন, তার ওদিকে কতকগুলো ঘসি বা বড় ঘুঁটে, একটা তাওয়া, চিমটে, আর একটা পেতলের কানাউঁচু থালা—বোধহয় আটা মাখবার জন্যে; আটা রাখার জন্যেই সম্ভবত একটা মুখঢাকা কেরোসিনের টিন; দুটো মাটির কলসীতে জল

আর বড়-ছোট দুটো ঘটি। আর কোথাও কিছু নেই। জীবনযাত্রার কোন সরঞ্জাম, কোন আয়োজন—অন্তত আমাদের চোখে পড়ল না।

এই নিঃস্বতা ও নিঃসঙ্গতার সঙ্গে ঘরের অধিবাসিনী কিন্তু একেবারেই বেমানান। ওঁকে দেখে আমরা সকলেই ক্ষণেক স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আর যাই হোক, আমরা এই অন্ধকার সরোবরে এমন পদ্ম দেখার আশা করি নি। একটা সাদা সরু পাড় কাপড় আর একটি সেমিজ, বাঁ-হাতে শুধু একগাছি লোহা; পরিচ্ছদের পারিপাট্য নেই, প্রসাধন নেই—কিন্তু তাতেই যে কী অপরূপ দেখাচ্ছিল ভদ্রমহিলাকে! বয়স বেশি হবে না, তখন অত আন্দাজ ছিল না—মনে হ'ল উনিশ-কুড়ি হবে—কিন্তু আশ্চর্য সুন্দরী মেয়েটি। তাঁকে ঐখানে ঐ পরিবেশে দেখে খনিগর্ভের হীরকখণ্ডের উপমাই মনে পড়তে লাগল বার বার।

আমাদের যাওয়ার উদ্দেশ্য বুঝতে দেরি হয় নি ওঁর। তাই আমরা কিছু বলার আগেই—যাকে বলে আড় হয়ে পড়লেন। 'না দিদি দোহাই আপনার, আমাকে আর কোথাও যেতে বলবেন না। এ আমি বেশ আছি।'

মা বোধহয় এমনিই একটা প্রতিরোধ ভেবে এসেছিলেন। তিনিও দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু আমরা যে বেশ নেই ভাই। তোমাকে এভাবে, এই কালো ভয়ঙ্কর জলের মধ্যে ফেলে গেলে—পেছন দিকে তো অকুল জল, সে জল এখনও বেড়েই যাচ্ছে—আমাদের মুখে অন্নজল উঠবে না, রাতে ঘুমোতে পারব না, শয্যাকণ্টকী হবে। তুমি যদি না যাও একান্ত, আমাদেরই ক'জনকে এখানে থাকতে হবে। মরি তো একসঙ্গেই মরব।'

অগত্যা—আরও কিছু ওজর আপত্তি তুলে, আরও কিছুক্ষণ কাকুতি-মিনতি ক'রে শেষ অবধি রাজি হতে হ'ল ওঁকে। অবশ্য সে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেও মিশন হাসপাতালে বা অন্য কোন সাময়িক আশ্রয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মা এবার জোর ক'রেই এনে একেবারে নিজের ঘরে তুললেন।

সেই থেকেই সখ্য দুজনের—আমরাও মাসী বলি তাই। যদিও মার থেকে মাসী অনেকখানিই ছোট ছিলেন—মেয়ের বয়সী প্রায়।

আস্তে আস্তে, প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হ'তে অন্তরের সতর্কতার অর্গল খুলে গেল, লজ্জার বন্ধন শিথিল হ'ল। ওঁর জীবনের অনেক কথাই জানতে পারলুম,

এ বিচিত্র জীবনযাত্রার কারণ।

আয় বলে কিছু নেই। কেউ কোথাও নেই ওঁর। উনি মাধুকরীতেও বেরোন না, মাধুকরী কেন শুধু—কোথাও বেরোন না, এমন কি কোন্ দর্শনেও যান না কখনও। একটি পুরানো ঝি জাতীয় এদেশী মেয়ে—নেহাৎ উপোসী থাকে দেখে একটা সদাব্রত থেকে মাসিক ছ'সের আটা ভিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। এছাড়া তার নিজের ভঁইস আছে, সে নিজেই জ্বালানী ঘুঁটে দিয়ে যায়। দুধও দিতে চেয়েছিল কিন্তু যমুনামাসী কোনমতেই সে দুধ নিতে রাজী না হওয়ায় আর দেয় না, মাঝে-মধ্যে মাখন বার ক'রে নেওয়া 'মাঠা' বা ঘোল দিয়ে যায়, সেটাতে যমুনামাসী আপত্তি করেন না, কারণ সেটা উদ্বৃত্ত, কেউ না খেলে ফেলাই যায়। এছাড়া কখনও-সখনও বাগানের দু'একটা সব্জীও দিয়ে যায়, আর একটু-আধটু মুন। সেই শুধু মুন দিয়ে রুটি খেয়ে জীবনধারণ করেন উনি। কাপড়ও সেই মেয়েটিই চেয়ে-চিন্তে এনে দেয়—খুব ছিঁড়ে গেলে। এক মারোয়াড়ী শেঠানী সব শুনে বছরে ঝুলনের সময় একখানা শাড়ি আর দুটো শেমিজ দেন—তাতেই চলে যায় ওঁর। শীতকালে একখানা লুই কাপড়ও দিয়েছিলেন তিনি, শীতকালে মাসী সেটা গায়ে দেন—এখানের এই হাড়ভাঙা কঠিন শীত—শীত ফুরোলেই সেটা রামদুলারীর কাছে দিয়ে দেন, গচ্ছিত থাকে।

কেন এ কৃচ্ছ্রসাধন, আত্মনিপীড়ন—তপস্যার মতো ক'রে—তখন পুরোটা জানা যায় নি। অতি কষ্টে, একটু একটু ক'রে মা আস্থা অর্জন করেছিলেন, সহানুভূতির রৌদ্রতাপে যমুনামাসীর গোপন রহস্য-পদ্মটি একটু একটু ক'রে দল মেলছিল—কিন্তু পূর্ণ বিকশিত ক'রে তোলার অবসর মিলল না। বন্যার জল সরে যেতে খুব খারাপ ধরনের ম্যালেরিয়া দেখা দিল, মা আমাদের জন্যেই আরও তাড়াতাড়ি বৃন্দাবন ত্যাগ করলেন।···

চিঠিপত্র দেওয়া সম্ভব নয় যমুনামাসীর পক্ষে, আমরা তা আশাও করি নি। এরপর হঠাৎই আবার দেখা হয়ে গেল ১৯৩৮ সালে (?) হরিদ্বারে কুম্ভমেলায়। তখনও সেই নিরাভরণ একবস্ত্রা অবস্থা,—তবু মনে হ'ল আগের কৃচ্ছ্রসাধন একটু কমেছে। আলুপোড়া দিয়ে রুটি খাচ্ছেন আজকাল। মা বলতে—আমাদের বাসায় দুধ মিষ্টিও খেলেন একটু।

এরপর আবার দেখা হ'ল, মাকে নিয়ে যখন উনিশশো একচল্লিশ সালে আবার বৃন্দাবন গেলাম। তখনও উনি সেই হানাবাড়িতেই থাকেন, তবে এবার আর একটু ভাল ব্যবস্থা দেখলুম। শোয়ার একটা মাত্র হয়েছে, পোস্তবাটা বা আলু পুড়িয়ে রুটি খাচ্ছেন। শুনলুম এখন কোথা থেকে মাসিক তিন টাকা ক'রে পান, তাতেই এই বিলাস সম্ভব হয়েছে। তখনও ওখানে টাকায় ষোল সের গম, ষোল সের দুধ, এগারো বারো—কখনও বা তের ছটাকও ঘি পাওয়া যায়—সুতরাং মাসিক তিন টাকা আয় একেবারে নগণ্য নয়।

এই দু-দফা দেখাশুনো অন্তরঙ্গতার ফলে বাকী যেটুকু জানবার তা জেনে নিয়েছিলেন মা, মার কাছ থেকে আমিও শুনেছিলুম। তবে সে কথা এখন থাক্। এবার সোজাসুজিই গল্পটা শুরু করি বরং।

* * *

এখন থেকে প্রায় ষাট বছর আগের ঘটনা। সে-কথা কারও আজ আর মনে থাকার কথা নয়। আর এমন কিছু যুগান্তকারী ঘটনাও তো নয়—যা দেশ বা জাতির জীবনে বিপুল পরিবর্তন এনে দেয় কিম্বা একটি খণ্ডকালকে মহাকালের বিপুল অঙ্গ বিশেষ ভাবে চিহ্নিত ক'রে রেখে দিয়ে যায়; কোন মহামারী কি মহাযুদ্ধের মতো ইতিহাসে স্থান পায়। নিতান্তই দুটি তিনটি প্রাণীর জীবনের আর জীবন নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘটনা। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সামান্য নগণ্য দুটি তিনটি প্রাণী, তাদের কথা মনে ক'রে রাখার মতো এত গরজ কার?

তবে সে সময় একটু আলোড়ন, 'মধুচক্রে লোষ্ট্রবৎ' একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল বৈকি! অন্তত ঐ ক্ষুদ্র জায়গাটির কটি লোকের মধ্যে, বিশেষ ক'রে ঐ পরিবারটিতে। নোংরা কথার আঁশটে গন্ধে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, জীবনে বৈচিত্র্যের স্বাদ পায় এমন লোক চিরদিনই ছিল। চিরদিনই থাকবে। রামায়ণ মহাভারত কেন, স্মরণাতীত কালেও গুহামানব বা অরণ্যবাসীদের মধ্যেও যে এ শ্রেণীর মানুষ ছিল তা আমরা হলপ করে বলতে পারি।

সেই তেমনি কজন লোকের মধ্যে একটু ঘোঁট হয়েছিল হয়ত, একটু

অপ্রীতি, একটু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অশান্তি, লজ্জায় কোন কোন দুর্বলচিত্ত লোকের মাথা হেঁট হয়েছিল—নিতান্তই দু-চার দিন ছিল, দু-এক মাস বড়জোড়··· তারপর বিপুল সরোবরে সামান্য একটি ঢিল ছোঁড়ার চাঞ্চল্যের মতোই সে ঘটনা অল্প কটি লহর তুলে আবার ধীরে ধীরে নিস্তরঙ্গ শান্ত হয়ে গেছে।

বৃন্দাবনের কথাই বলছি। শ্রীশ্রীরাধাগোপীবল্লভের গোসাঁইদের তখন যিনি জ্যেষ্ঠ—সেবাইত ও মোহান্ত—প্রাণস্বরূপ গোস্বামী অনেক বেশী বয়সে বিবাহ করেছিলেন। বেশী বয়স মানে ওঁদের পারিবারিক ঐতিহ্যের তুলনায় বেশি—চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে এর আগে কেউ ও বংশ অবিবাহিত থাকেন নি, কিশোর বয়সে বিবাহ করাই তখন রেওয়াজ ছিল—বিশেষত ওঁদের পরিবারে। ওঁর বাবা প্রাণকিশোর গোস্বামী বিয়ে করেছিলেন মাত্র বারো বছর বয়সে।

এতিদিন বিয়ে না করার কারণ—এঁদের বাড়ির লোকের মতে নিতান্তই খেয়াল।

প্রাণকিশোর গোস্বামী বড় ছেলের বিয়ে দেবার সঙ্কল্প ক'রেই হঠাৎ মারা যান। বিয়ের কোন পাকা ব্যবস্থা ক'রে যেতে পারেন নি তিনি। তখন স্বরূপের বয়স ষোল। সেই যে বিবাহ স্থগিত রইল, তা আর সহজে হ'ল না, স্বরূপ নিজেই বাগড়া দিলেন।

এক অদ্ভুত কথা বললেন তিনি, আর একটু লেখাপড়া না শিখে তিনি বিয়ে করবেন না। আগেকার দিনের মতো সামান্য একটু বাংলা ও চলনসই হিন্দী ও উর্দু শিখে মোহান্তগিরি করতে তিনি নারাজ। ওতে নাকি শুধু দেবতারই অসম্মান হয় না, সেবাইত মোহান্তর আত্মারও অপমান হয়। অনেক দিন গোপীবল্লভ—যেমন-তেমন করে তাঁর সেবা করা একরকম বিশ্বাস-ঘাতকতার যোগ্য অপরাধ।

বাবা বেঁচে থাকলে অবশ্য তাঁর আদেশে বিয়ে করতে হত। কিন্তু রাধারাণীর যখন সে ইচ্ছা হ'ল না, তখন আর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এখন তিনিই যখন কর্তা, পরিবারের জ্যেষ্ঠ—তখন এ বিয়ে স্থির করারও মালিক তিনি। তাই বিবাহের প্রস্তাব শিকেয় তুলে রেখে শাস্ত্র চর্চায় মন দিলেন এবং কাশীতে এসে রীতিমতো পড়াশুনো ক'রে দেখতে দেখতে কটা পরীক্ষা

দিয়ে চার-পাঁচটি বিষয়ে উপাধিলাভ করলেন। এবার পড়াশুনো শেষ ক'রে বাড়ি এসে বসতে মা যখন পুনরায় বিয়ের কথা তুললেন তখন আর আপত্তির কোন কারণ দেখাতে পারলেন না, চুপ ক'রে রইলেন।

বেশী বয়সের ছেলের জন্য বেশী বয়সের পাত্রী দরকার। আগের মতো আট-ন বছরের মেয়ে চলবে না। অথচ এদিকে ওঁদের এই—বাঙালী গোসাঁইদের ঘরে এত বয়সের মেয়ে পড়ে থাকত না। খুঁজতে খুঁজতে শান্তিপুরের কাছে এক জায়গায় একটি মেয়ের সন্ধান মিলল। মেয়ে সুন্দরী, বয়স ষোল বছর—অন্য সব দিকেও মিল হয়ে গেল। তবে সাধারণ গৃহস্থঘর, জমিজমার ওপর ভরসা—বেশী-কিছু দিতে পারবেন না, তাঁরা জানালেন। এঁরাও চান না অবশ্য, মেয়ে দেখে পছন্দ হয়েছে, স্বজাতি পালটি ঘর, বংশের পরিচয় ভাল—এই-ই যথেষ্ট। এঁরাই রাশীকৃত অলংকার দিয়ে মেয়ে নিয়ে এলেন। মেয়ের বাবা অবশ্য মোটামুটি গা-সাজানো সব গয়নাই দিয়েছিলেন, তবে সে সব সোনার। এঁদের মতো হীরে-মুক্তোর চমক ছিল না, সে রেওয়াজও ছিল না পাড়াগাঁয়ের দিকে।

ওখানেও বেশ একটু সমারোহেই বিয়ে হয়েছিল কিন্তু এখানে যা হল তার তুলনায় কিছুই নয়। মথুরা থেকে 'জুলুস' করে বরকনে নিয়ে আসা হ'ল। চারটে হাতী, একুশটা উট এবং একশো আটটা ঘোড়া—য়্যাসিটিলেন গ্যাসের আলো, তার সঙ্গে তিন-চার দল বাজনা—এই সঙ্গে মাঝখানে রূপোর সিংহাসনে চড়ে 'তাসা'র শাড়ি-পরা, মণিমাণিক্য-ভূষিতা নববধূ সাড়ম্বরে শ্বশুরঘর করতে এল বৃন্দাবনে।

সুন্দরী বৌ, স্বরূপ গোসাঁইও সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান—সকলেই বলাবলি করতে লাগল যে এমন বরকনের জুড়ি মেলা বহুকাল তাঁদের নজরে পড়ে নি। পাড়া-ঘরে অন্য স্বজাতির বাড়ির অনেকে ঈর্ষিত হ'ল, যারা যথার্থ আপন তারা খুশী হ'ল।

তারপরও সুখ ও সৌভাগ্যের মধুর সুর কাটে নি। আদর-যত্ন, স্নেহ-ভালবাসা অঞ্জলিপুরেই পেয়েছে বৌ। শাশুড়ির দাপট ছিল খুব, দৃঢ়-চরিত্রের রাশভারী মানুষ, তেমনই বুদ্ধিমতী। বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পেতেন তিনি,

মানুষ চেনার ক্ষমতা ছিল। ছেলেমেয়েদেরও শাসনে রাখতে পেরেছিলেন—তাদের অকালে পিতৃবিয়োগ হওয়া সত্ত্বেও। স্বামীর মৃত্যুর পর বড়ছেলে পড়াশুনো নিয়ে মেতে রইল, এতবড় এস্টেট, ঠাকুরের এই ব্যবসা—তাঁকেই দেখাশুনো করতে, চালাতে হয়েছে। আর ভালই চালিয়েছেন—যে কারণে এখানে ফেরার পরও কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিতে স্বরূপের একান্ত অনিচ্ছা। চারিদিকে দৃষ্টি না থাকলে বার্ষিক দু'লক্ষ টাকা আয়ের এই ঠাটপাট এবং বিপুল জমিদারী ও সম্পত্তি এভাবে তিনি চালাতে পারতেন না।

তাঁর এই দাপট ও সর্বময় কর্তৃত্ব সত্ত্বেও শাশুড়ীকে ভাল লেগেছিল নতুন বৌ, যমুনার। বৌকে তিনি স্নেহ ও প্রশ্রয়ের মধ্যেই গ্রহণ করেছিলেন—সে স্নেহ আন্তরিক, লোক-দেখানো নয়। সেটা বোঝার মতো জ্ঞানবুদ্ধি যমুনার ছিল। স্বরূপের মা চেয়েছিলেন যে খুব সুদূর বাংলাদেশ থেকে অনাত্মীয় অনভ্যস্ত পরিবেশ ও জীবনযাত্রার মধ্যে এসে পড়ায় দুঃখ ঘুচিয়ে এখানে যাতে ওঁর মন বসে—স্নেহে ও আদরে সেই আবহাওয়া সৃষ্টি করতে।

তবু কোথায় যেন একটু বেসুর বাজছিল। খুব সূক্ষ্ম প্রায় অদৃশ্য, তবু যারা তার সঙ্গে জড়িত তাদের কানে পৌঁছবে বৈকি।

সে বেসুর বাজছিল যমুনার মধ্যেই। আর সেটা ঢাকবার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও স্বরূপ আর তার মা শ্যামসোহাগিনীর চোখে পড়েছিল। দুজনে দুরকম ব্যাখ্যা করেছিলেন তার। শাশুড়ীর ধারণা একেবারেই জলের মাছ ডাঙায় এসে পড়েছে তাই এ অস্বস্তি, বিষণ্ণতা। সাধারণ গৃহস্থঘর ওর বাপদের এতবড় দেব-সেবার সহস্রবিধ বিধিনিষেধ ও নিয়মবন্ধনের মধ্যে এসে পড়ায় হাঁপিয়ে উঠেছে। তাছাড়া এতকাল মাছ খাওয়া অভ্যাস ছিল, এখানে এসে নাগাড় নিরামিষ ডাল আর 'রসা' দিয়ে খেতে হচ্ছে, তাও আতপ চালের ভাত, তাতেই বেশী কষ্ট হচ্ছে। সময় লাগবে এটা সইতে।

সঙ্গে যে ঝি এসেছিল বাপের বাড়ি থেকে—হরিমতী—তাকে স্বরূপের মা ছাড়েন নি, বৌ আরও অসহায় একা বোধ করবে বলে। সে বললে, 'না গো গোসাঁইমা, তা নয়। আসলে কি জানো, বড্ড বাপসোহাগী মেয়ে। চার ছেলের পর একটি মেয়ে, তায় অমন সোন্দর মেয়ে বাপের মেয়ে-অন্ত প্রাণ ছিল একেবারে। মেয়েরও তেমনি সেই এতটুকুটি থেকে খাওয়া

নাওয়া এমন কি গু-মুত মোক্ত পর্যন্ত সব বাপের ক'রে দেওয়া চাই। শোবে সেও বাপের গলা জড়িয়ে। মার তিসিমানায় যেত না—অপর কেউ কোলে নিতে এলে চিলচেঁচাত। বাপও একদণ্ড যদি না দেখতে পেল মেয়েকে তো চোখে অন্ধকার দেখবে একেবারে, পিথিবীতে যেন আর কেউ নেই। দিনরাত খুকী আর খুকী, ইনিও কেবল বাপী আর বাপী। আর কারুক্কে চেনেনি কোনদিন। এদান্তে বড় হয়ে মার কাছে ঘেঁষা দিত কতকটা কিন্তু বাপের আদর-সোয়াগ ছাড়া মন উঠত না। সেই জন্যেই এমনতারা মনমরা হয়ে থাকে আমার তো বাপু অন্তত তাই মনে নেয়। বুড়ো বয়েস অবদি বাপের গলা জড়িয়ে দোল খেত তো! আরও সেই জন্যেই বাপ কখনও তেমন উঠে-পড়ে লেগে পাত্তরের খোঁজ করে নি।...নেহাৎ এতবড় ভাগ্যিটা বাড়ি বয়ে এল তাই!'

কথাটা স্বরূপেরও কানে উঠল। মনেও লাগল। তিনি যেন অন্ধকারে হঠাৎ আলো দেখতে পেলেন একটা। যমুনার এই কেমন যেন সবেতেই নিরুৎসাহ, ঔদাসীন্য—বিমর্ষতার বহু কারণ ভাবছিলেন কদিন, আকাশ-পাতাল কত কী—কিন্তু এটা মাথায় যায় নি। অনেক পীড়াপীড়ি করেছিলেন কারণটা বলবার জন্যে, অনুনয়ও করেছিলেন যুমুনা একটা কথাও বলতে চায় নি। বেশী চাপাচাপি করলে কেঁদে ফেলত। সেজন্যে স্বরূপ আর খুব জোর করতেন না।

অন্যান্য কারণের সঙ্গে এটাও মনে হয়েছে অনেকবার যে, স্বামী পছন্দ হয় নি সম্ভবত। তাতে আত্মপ্রশান্তিতেও একটু ঘা পড়েছে, অবচেতন আত্মঅহমিকায়। উদ্বিগ্নও হয়েছেন যেমন—দুঃখিতও হয়েছেন। এখন সেই বহুবিধ অস্বস্তি ও অশান্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে যে বাঁচলেন, রাত্রে জোর ক'রে টেনে খুব কাছে এনে বললেন, 'ছাখো, আমাদের এ বাড়িতে বৌ হয়ে আসার পর আর বাপেরবাড়ি যাওয়ার রেওয়াজ নেই। কেউই কখনও যায় নি। আমার দাদামশাই কি মামারা এখানে এসেই মার সঙ্গে দেখা ক'রে যেতেন বরাবর। তবু, তোমার যদি খুব কষ্ট হয় তো—না হয় মাকে বলে-কয়ে রাজী করিয়ে ক'দিনের জন্যে ওখানে পাঠিয়ে দিই, বাবাকে দেখে এসো একবার!'

'না, না, না!' অকস্মাৎ যেন চাপা গলায় একটা আর্তনাদ করে ওঠে যমুনা, 'আমি কোথাও যাবো না। কাউকে দেখতে চাই না। আমার কিছু হয় নি।'

অবাক হয়ে গেলেন স্বরূপ, হকচকিয়ে গেলেন যেন।

এই অকারণ আকস্মিক উগ্রতার জন্যে তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। বিশেষ এই ক'দিন ধরে নতুন বৌয়ের যে স্বভাব দেখছেন—ধীর, শান্ত, নম্র—তার সঙ্গে এ চেহারা যেন একেবারেই খাপ খায় না। এ কী হল! এমন কি বললেন উনি, যাতে এ প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে?

তবে উনিও শান্ত স্বভাবের মানুষ, কোন কারণে খুব উত্যক্ত হয়ে আছে যমুনা, হয়ত এই ব্যাপার নিয়ে কেউ ঠাট্টা-তামাশা ক'রে থাকবে—ভেবেই, তিনি চুপ ক'রে গেলেন, এ নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। স্ত্রীর উৎসাহহীনতাটাকে স্বভাব ধরে নিয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু বিয়ের মাস-দুই পরেই হঠাৎ শ্যামসোহাগিনীর ললাট ভ্রূকুটিবদ্ধ হয়ে উঠল, অন্ধকার হয়ে উঠল তাঁর স্বভাব-গম্ভীর মুখ। সে ভ্রূকুটি—সে মেঘ সহজে মিলোলও না। তিনি যেন কেবলই বৌকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন, আপাদমস্তক খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেন। কী দেখেন কাকেও বলেন না, কি দেখতে বা বুঝতে চাইছেন তাও না। প্রশ্নও করেন না বৌকে। তবু খুব গভীর কোন দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেছে—সেটা অন্তরঙ্গ সকলেই বুঝতে পারে।

আরও কদিন পরে বৌকে মন্দিরে যেতে নিষেধ করলেন। অন্তঃপুরে যে গোবর্ধনশিলা আছেন—যেখানে মেয়েরা প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠে জল-তুলসী দেয়, সেখানেও ওর পূজা নিষিদ্ধ হল। শাশুড়ী তাঁর ছেলেকেও কিছু বলেন নি। কাউকেই কিছু বললেন না। যার ওপর এই নিষেধাজ্ঞা জারী করা হ'ল তাকেও না। দাসী-চাকর ও অনুগত আশ্রিতা মহিলারা তাঁর রকমসকম দেখে ভারী দ্বিধায় পড়ে গেলেন। বিধিনিষেধ যা আরোপিত হয়েছে সবই অন্তঃসত্ত্বা হবার মতো। যদিচ বাড়ির বড় বৌ, বিশেষ এমন সেবাইৎ জমিদারের ঘরে, অন্তঃসত্ত্বা হলে যে আনন্দ-উৎসব পড়ে যাবার কথা, যে হৈ-চৈ, দেবালয়ে দেবালয়ে পূজা পাঠাবার কথা—তার কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না ওঁরা। বিশেষ এক্ষেত্রে, এতদিন পরে ছেলে বিয়ে করেছে, তার প্রথম সন্তান

আসছে, সে আনন্দ তো চেপে রাখার কোনই কারণ নেই।

এদিকে যত দিন যায়, শ্যামসোহাগিনীর মুখের অন্ধকার ছায়া নিবিড়তর হয়। আরও দশ-বারোদিন অপেক্ষা ক'রে, মথুরা থেকে বড় ডাক্তার আনালেন একজন, ওঁদের পারিবারিক ধাত্রীকেও খবর দিলেন। তাঁরা পরীক্ষা করতে এলে সেখান থেকে সকলকে সরিয়ে দিলেন, পরীক্ষার ফলাফলও কাউকে জানালেন না।

শুধু সেইদিন বিকেলেই সকলে সবিস্ময়ে দেখল, ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে বাসভবন, তার সীমানার বাইরে—পাঁচিলের ওপারে যে আঁতুড়-মহল আছে এ বংশের—বৌকে সেইখানে সরিয়ে দেওয়া হ'ল বিবাহের মাত্র তিন মাসের মধ্যে এবং মাসিক বেতনভুক আঁতুড়ের ঝি রামরতিয়াকে ডেকে পাঠিয়ে সে বাড়িতে বহাল করা হ'ল যথারীতি।

এত আগে এ সব ব্যবস্থা কেন তাও যেমন কেউ বুঝল না—এঁদের অন্ধকার নতমুখের অর্থও না। অনেক রহস্যই রয়ে গেল, অনেক কৌতূহল। চাপা গুঞ্জনে অস্থির হয়ে উঠলেন অন্তঃপুরিকারা। নতুন বৌয়ের চোখেই বা এমন শ্রাবণের ধারা নেমেছে কেন কদিন, গত কদিন স্বরূপ গোস্বামীই বা রাত্রে বংশীবটের কাছে এঁদের যে বাগানবাড়ি আছে, যেখানে একদিন ঝুলন দ্বাদশীতে রাধাগোপীবল্লভ যান শোভাযাত্রা ক'রে সোনার চতুর্দোলে চেপে—সেইখানে গিয়ে শুচ্ছেন—এ সব দুর্জ্ঞেয় আচরণেরও কেউ কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না।

শুধু ঝি বা দারোয়ান একজনই নয়, একটি ব্রজবাসিনী পাচিকাও ঠিক ক'রে দিলেন শাশুড়ি যমুনার জন্যে। এখান থেকে কোন যাতায়াত বা কিছু নিয়ে যাবার না কারণ ঘটে সেই ব্যবস্থা হ'ল নিখুঁতভাবেই। আরও চার-পাঁচদিন পরে দাইও এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল ও-বাড়িতে। এই রকমই নাকি দস্তুর এঁদের—চিরকালের। শুধু গেলেন না কোনদিন এ-বাড়ির যাঁরা নিকট-আত্মীয়ের দল তাঁরা—এবং স্বামী বা শাশুড়ী।

এ সব বিচিত্র ব্যবস্থারই কারণ জানা গেল যখন বিবাহের চার মাসের মাথায়। যমুনার প্রসব-বেদনা উঠল।

আর চাপা গেল না কথাটা। যাবে না বলেই শ্যামসোহাগিনী সে চেষ্টা

করলেন না। মুখে কিছু পরিষ্কার ক'রে খুলে বললেন না অবশ্য কিন্তু অতি প্রশান্ত-গম্ভীর: মুখে অন্তঃপুরবাসিনী আত্মীয়া আশ্রিতাদের ডেকে সতর্ক করে দিলেন, কি ঘটছে তা নিয়ে কোন আলোচনাও যেমন তাঁর পছন্দ নয়, তেমনি এ নিয়ে কেউ যমুনাকে কিছু বলে, আভাসে-ইঙ্গিতেও কোন কটাক্ষ করে কি গঞ্জনা দেয়—তাও না। এ তিনি কোনমতেই বরদাস্ত করবেন না। তিনি আশা করেন যে, এতদিনে তাঁকে সবাই চিনেছে, তাঁর যে কথা সেই কাজ। সেই বুঝে যেন চলে সকলে।

এরপর যমুনা সম্বন্ধে প্রকাশ্য কেন অর্ধ প্রকাশ্যেও কেউ আলোচনা করবে, এমন কি মুখ টিপে একটু বিদ্রূপ-কৌতুক-শাণিত হাসি হাসবে—সে সাহস এ-বাড়িতে কারও নেই। সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল একেবারে। যেন স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কোন ব্যতিক্রমই হয় নি কোথাও, কোন রসালো আলোচনার যোগ্য বিচিত্র ঘটনা ঘটে নি—এইভাবেই সকলে চলতে লাগল। শুধু দু-একটি বর্ষীয়সী মহিলা লক্ষ্য করলেন যে, এই প্রথম, 'বৌমা' না বলে সরাসরি যমুনার নামটাই ব্যবহার করলেন কর্ত্রী।

আঁতুড়ের একুশদিন কেটে গেলে স্নানক্ষেউরী ক'রে শুদ্ধ হ'ল যমুনা—কিন্তু, বলাই বাহুল্য, কোন উৎসবের আয়োজন, এমন কি একটা ষষ্ঠীপুজোও হ'ল না। এঁরা শুভাশৌচের কোন নিয়মও পালন করেন নি এর মধ্যে।

অতঃপর কি!

এ প্রশ্ন সকলেরই মনে ঠেলাঠেলি করছিল. কেউ ভরসা ক'রে তাকে ব্যক্ত করতে পারে নি। তবে বেশীদিন সেজন্যে অপেক্ষাও করতে হ'ল না। দেখা গেল শ্যামসোহাগিনী সে ব্যবস্থা আগেই ক'রে রেখেছিলেন। শুদ্ধ হবার পরের দিনই রাত্রে একটি ঘেরাটোপ দেওয়া পাল্কিতে ক'রে, সম্ভবত চিরদিনের মতোই যমুনা বিদায় হ'ল এ বাড়ি থেকে। সঙ্গে গেল বৃদ্ধ দারোয়ান সুরয পাণ্ডে আর আঁতুড়ের ঐ ঝি রামরতিয়া। মথুরা পর্যন্ত আরও দুজন লেঠেলকে সঙ্গে দিয়েছিলেন শ্যামসোহাগিনী, পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে, তারা মথুরা পর্যন্ত পৌছে দিয়েই ফিরে আসবে এই হুকুম ছিল; কেবল ঐ বৃদ্ধ দারোয়ান ও ঝি যাবে শান্তিপুরে যমুনার বাপের বাড়ি পর্যন্ত। না, কিছুই বলার দরকার নেই, শুধু দরজায় পৌছে দিয়ে তৎক্ষণাৎ ফিরে চলে আসবে,

কোনমতে কিছুতেই সেখানে কোন আতিথেয়তা বা বকশিশ গ্রহণ করবে না।

এছাড়া, কামদারকে দিয়ে টাঙ্গা ক'রে আরও কটি জিনিস আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে একটা বড় তোরঙ্গয় ছিল দানের বাসন, ওঁদের দেওয়া পাত্রের কাপড়জামা মায় ছাতা—আপক্ষাকৃত ছোট আর একটিতে যমুনার কাপড়জামা ও যে সব গহনা তার বাবা দিয়েছিলেন তার সবগুলি, এখান থেকে পাওয়া দামী তাসার শাড়ি, বেনারসী শাড়ি সুদ্ধ। গলায় ও হাতে যে গহনা ছিল, সেগুলো এঁদের দেওয়া—কিন্তু তা আর কেউই খুলে নেবার বা দেবার চেষ্টা করেন নি।

বাপের বাড়ি পৌঁছতে—এই ফিরে আসার পূর্ণ অর্থটা যখন বুঝতে পারলেন—যমুনার মা আছড়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তারপর বাড়ির বাকী লোকেরা, ওর দাদারা-মামারা-কাকারা মিলে যে লাঞ্ছনা করলেন এবং গঞ্জনা দিলেন তা অবর্ণনীয়। মানুষের শরীরে যে এত সহ্য হয় তা বোধ করি তাঁরাও জানতেন না। মাও সুস্থ হয়ে সেই দলেই যোগ দিলেন। সকলেরই এক প্রশ্ন—'কে এমন করেছে বল্!' কিন্তু যমুনা নিরুত্তর একেবারে। ওখানে একদিন স্বরূপও প্রশ্ন করেছিল, রামরতিয়া তো হাজারবার—দিব্যি গেলে বলেছিল সে জানলেও কাউকে বলবে না—কিন্তু সেখানেও যেমন কোন উত্তর দেয় নি, ঘাড় হেঁট ক'রে বসে থাকত, এখানেও তেমনি রইল।

তাই বলে অন্য কোন কথাও বলে নি—কি এই গঞ্জনার কোন প্রতিবাদ করতেও চেষ্টা করে নি। না উদ্ধত, না লজ্জা-ঘেন্নায় অবনত—এইভাবে স্থির হয়ে সামনের দিকে চেয়ে বসে রইল সে। চোখে জলও ছিল না তার, বহু-দিনই সে পাট উঠে গেছে। ওর ভাব দেখে মনে হতে লাগল চোখের মতো ওর সমস্ত অন্তরটাও, বোধহয় মস্তিস্ক পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ, পাথর হয়ে গেছে। কোথাও এতটুকু প্রাণস্পন্দন প্রাণরস নেই আর।

মামারা, কাকারা ওর মাকেও ধিক্কার দিলেন, 'এতবড় সর্বনাশটা হয়ে গেছে মেয়ের, এক দিনে এক মিনিটে কিছু হয় নি—তুমি মা, তুমি টের পেলে না।...তাছাড়া, বিয়ে দিতে গেলেই বা কেন তাহলে, এ অবস্থাটা তোমার তো জানা উচিত ছিল!'

কপালে করাঘাত ক'রে মা উত্তর দিলেন, 'কি জানি, এতটুকু ইশারাতেও তো কোনদিন কোন বেচাল দেখি নি। দেখলে কি আর সাবধান হই না। বাইরের কেন আত্ম-স্বজনদের মদ্দা জোয়ান ছেলেও তো কেউ যখন-তখন বাড়িতে আসে না যে, সাবধান হবো!···থাকত তো বাপের সঙ্গে সঙ্গেই সর্বদা। ওর গুষ্টি এই বিয়ের ক'মাস আগে থেকে যা জমিজায়গা দেখাশুনো করতে বাঘআঁচড়ায় গিয়ে বাস করছিলেন—তা সে সময় তো আর কেউই তেমন বাড়িতে আসে নি। কাকে দুষী ধরব?'

তারপর একটু থেমে বলেন, 'ও অবস্থাই বা বুঝব কি করে? চিরদিনই ওর ওসব অনিয়মিত। এক এক সময় তিন মাস চার মাস কিছু হত না। কি করে বুঝব·যে এটাও সেই রকম নয়?'

কোন গঞ্জনা দেন নি শুধু যমুনার বাবা।

তিনি একটি কথাও বলেন নি, এমন কি যমুনার সামনেও আসেন নি একবার। নীরব নতমুখে বাগানের একটা কোণে বসে শুধু চোখের জল ফেলেছেন।···

প্রাথমিক ঝড় কেটে গেলে কী করা যাবে তাই ঠিক করতে পারিবারিক মন্ত্রণা সভা বসল। এখানে রাখা চলবে না কোনমতেই, তাহলে এঁরাই পতিত হবেন। শেষে অনেক পরামর্শের পর ওর সেজকাকা সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে নবদ্বীপে এক চেনা ঠাকুরবাড়িতে রেখে এলেম। শহরের (সে সময় নবদ্বীপ গণ্ডগ্রামের থেকে একটু বেশি ছিল—তাকে শহর বলা যায় না কোনমতেই) একপ্রান্তে সামান্য একটি ঠাকুরবাড়ি, প্রতিষ্ঠাতারা এখন কেউ খবর নেন না, পূজারীর কাছে বার্ষিক দুশোটি টাকা আসে—তাতেই নিত্যসেবা চালান তিনি। পূজারীর দুরবস্থার অন্ত নেই। সে আর এক জায়গায় পূজা করে, এক উকীলবাড়ি রাঁধে।

পূজারীর সঙ্গে যমুনার কাকার জানাশুনো ছিল, একসময় তাঁর বাসাতে রাঁধুনীর কাজ করেছেন—তিনি মাসে সাতটি টাকা দেবার অঙ্গীকারে ভাইঝি আর তার সদ্যোজাত সন্তানকে রেখে এলেন ওঁদের কাছে। ঘর দেদার পড়ে আছে, একটা ঘর স্বচ্ছন্দে দিতে পারবে তারা; ঘরে গরু-ছাগল দুই-ই আছে, বাচ্ছাটার একটু দুধও জুটবে হয়ত। যমুনা ঠাকুরের প্রসাদ খাবে ও

থাকবে। এখন কিছুদিন কাপড়-জামার প্রশ্ন নেই, অনেক আছে, যখন সে প্রশ্ন দেখা দেবে তখন যা হয় একটা ব্যবস্থা করবেন তাঁরা। কাকা পূজারীদের আশ্বাস দিয়ে এলেন, 'আপাতত এই ঠিক রইল, অন্য কোন ভাল ব্যবস্থা যদি না হয়, এখানেই ফেলে রাখতে হয়—এর পর ছেলেটার পেট বাড়লে আরও দু-এক টাকা খরচও বাড়িয়ে দেব।'

এইখানে এসে কাকা থাকতে থাকতেই খবর পেল যমুনা, তার বাবা আগের দিন, মানে যেদিন যমুনারা এখানে পৌঁচেছে—গ্রামের প্রান্তে এক আমগাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

বৃন্দাবনে থাকার প্রায় শেষ এক মাস—অর্থাৎ আঁতুড়মহলে আসার পর থেকেই, কেমন যেন স্তম্ভিত অবস্থা হয়ে গিয়েছিল যমুনার—দেহের না হোক, মনের। তাকে দেখে মনে হত তার আশপাশের কোন ঘটনাই, এমন কি তাকেই কেন্দ্র ক'রে যা ঘটেছে—তার কোন অর্থ ওর মাথায় ঢুকছে না, কোন অনুভূতি বা সাড়ই নেই যেন ওর। কোন অপমান, লজ্জা বা দুঃখও ওকে স্পর্শ করতে পারছে না। ইংরেজীতে যাকে dazed বলে—জড়বৎ হতবুদ্ধি অবস্থা—তাই যেন হয়েছিল ছিল ওর। বর্তমানে কি হচ্ছে তাও যেমন বুঝছে না—কী শোচনীয় ভবিষ্যৎ ওর জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে তাও না।

এই অবস্থাই চলেছিল বাপের বাড়ি আসার পরও। এমন কি আত্মীয়-স্বজন পরিচিত থেকে নির্বাসনে এসে, এই রকম হীনতা স্বীকার ক'রে সবাই-কার পরিত্যক্ত হয়ে ভিখারীর মতো এই জীবন যাপন করতে এসেও তার কোন অন্যথা হয় নি। কোন দুর্গতিতেই তাকে বিচলিত করতে পারবে না, পারবে না মনে, দুঃখ কি অনুশোচনা জাগাতে, বর্তমান দুর্দশার জন্যে কোন কষ্টবোধও করবে না—এই বিশ্বাস নিয়েই ওর শোকার্ত বিরক্ত কাকা বিদায় নিলেন। সেই সঙ্গে একটা আশঙ্কাও নতুন করে দেখা দিল ওঁদের মনে—বোধহয় এইভাবে গুমরে থাকতে থাকতেই এক সময় পাগল হয়ে যাবে, আর তার বোধহয় দেরিও নেই।

নইলে যে বাপঅন্ত প্রাণ ছিল সেই বাপের মৃত্যুসংবাদেও ওর মুখে কোন ভাবান্তর দেখা যায় না! চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও পড়ে না! এ

কেমন করে হয়! বিশেষ সেই একান্ত স্নেহময় লোকটা যখন—আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয়—ওর এই দুষ্কর্মের লজ্জা ও গ্লানিতেই আত্মহত্যা করলেন। এ আঘাতে যদি ওর বোধশক্তিতে কোন চেতনা না জাগে, কোন প্রতিক্রিয়া—তাহলে আর কোনদিনই জাগবে না।

হে ঈশ্বর এর চেয়ে অভাগী মেয়েটাকে মৃত্যু দিলে না কেন!

ছেলেটাও তো আঁতুড়ঘরে মরে যেতে পারত—কিম্বা প্রসব হতে গিয়ে। তাহলে তো আর লোকলজ্জার ভয়ে এমনভাবে আধ-পাগলী মেয়েটাকে এই কারাবাসের অধম অবস্থা—এই নির্বাসনে ফেলে যেতে হত না। স্বচ্ছন্দে জামাইয়ের ওপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে সমাজে বুক উঁচু করে চলতে পারতেন!

•

বোধশক্তি অনুভূতি জাগল যমুনার—কিন্তু সে বাইরের কোন আঘাতের নয়। জাগল, অন্তর থেকেই। কামনা এসে জড়তাকে দূর করল।

এই হীন পরিবেশ, এই দৈহিক কষ্ট (রাজরানী থেকে ভিখারিনী, আক্ষরিক অর্থেই ওর বেলা প্রযোজ্য) কি লজ্জা অপমান—এ সবে বিচলিত করতে পারে নি তাকে, সে সম্বন্ধে কোন সচেতনতাই ছিল না। এমন কি ছেলেটাও পারে নি জীবন সম্বন্ধে আর আগ্রহ কি সজীবতা ফিরিয়ে আনতে। তার অনুভূতি জাগল সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বিচিত্র কারণে। যেমন তীব্র ক্ষুধার বেদনায় শিশু জেগে ওঠে ঘুম থেকে, তেমনিভাবেই জাগল।

প্রথম ও একটা আকাঙ্ক্ষা অনুভব করল স্বরূপকে দেখার জন্যে। শুধু চোখের দেখা। তার জন্যেই প্রবল আকুতি একটা। বিদ্বান ভদ্র বিবেচক, উদারমন সুন্দর স্বামী তার। এমন সহজে কেউ পায় না, সেও কোনদিন আশা করে নি পাবে, পেয়ে হারাতে হবে এমনও কখনও ভাবে নি।

যত ভাবে, যত মনে পড়ে ক'দিনের স্বামীসঙ্গের ছোটখাটো খুঁটিনাটি তথ্য—ততই যেন প্রাণটা ছটফট করে ওঠে, প্রবল তৃষ্ণা বোধ করে সেই মানুষটির সাহচর্যের জন্যে। যখন কাছে ছিল তখন অতটা বোঝে নি—আজ বুঝল, কি হারিয়েছে সে, জীবনে তার কি সর্বনাশ হয়ে গেছে। তবু স্বার্থ-চিন্তা, নিজের ক্ষতির চিন্তা সম্বন্ধেও সে অত সচেতন হয় নি, শুধু তিনি, তাঁর কথাই ভেবেছে। তাঁকে কাছে পাবার কামনাতে অস্থির হয়ে উঠেছে।

আর এই নবলব্ধ কামনাতেই ক্রমশ একটু একটু ক'রে পারিপার্শ্বিক, নিজের ভাগ্য এবং বর্তমান জীবন সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে উঠেছে।

ফলে স্বামীকে কাছে না পাক—সে অসম্ভব তা জানে—অন্তত দূর থেকে একবার চোখের দেখার আকাঙ্ক্ষাও যেমন দুঃসহ হয়ে উঠেছে, তেমনি এই হীন এই একান্ত দীন অপমানকর জীবনযাত্রাও দুর্বিষহ বোধ হয়েছে।...এই তো তার বয়স, এখনও দীর্ঘকাল হয়ত বাঁচতে হবে—শুধু বেঁচে থাকার জন্যেই এই অবস্থায় এই পঙ্ককুণ্ডে পড়ে থাকবে? না না, তা সম্ভব নয়, তাহলে সে সত্যিই পাগল হয়ে যাবে।

এই কথাগুলোই দিনরাত ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত সত্যিই—পাগলের মতো কাজই ক'রে বসল একটা। গহনার বাক্স আর ওর যত ভাল ভাল দামী কাপড়জামা—সব সেই পূজারীর বৌকে ধরে দিয়ে বলল, 'তুমি ছেলের মা, এই দেবমন্দিরে দাঁড়িয়ে আমাকে কথা দাও, আমার ছেলেটাকে তুমি সাধ্যমতো দেখবে, মানুষ করবে—না, মানুষ করার চেষ্টা করবে? তুমি চেষ্টা করো, তোমার মতো ক'রেই, গরীবের ছেলের মতোই মানুষ হোক—এই আমি চাই। তারপর যদি না বাঁচে কি মানুষ না হয়, সে জন্যে আমি তোমায় দুষব না, ভগবানও কোন অপরাধ নেবেন না। ওকে কিছু দিতে হবে না, বড় ক'রে খেটে খাবার মতো ক'রে দিলেই তোমার ছুটি—এ যা দিয়ে যাচ্ছি সব তোমার, তোমাকেই দিচ্ছি। ওঁরা যতদিন মাসোহারা পাঠাবেন তোমরাই নিও, তাতেই খরচ চলে যাবে। আমি আছি কি নেই ওঁদের লিখতে হবে না। যদি মাসোহারা বন্ধ করেন—করবেন না, তবু বলছি—তোমার পাঁচটার সঙ্গে ফ্যানভাত খেয়েই মানুষ হবে। তোমার কাছ থেকে শুধু এইটুকু কথা চাই—ইচ্ছে ক'রে কষ্ট দেবে না, কি না খাইয়ে মেরে ফেলবে না।·তাড়িয়ে দেবারও চেষ্টা করবে না। বলো দিদি, এই বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে—আমি তোমার পায়ে ধরে এইটুকু ভিক্ষা চাইছি।'

তারপর সত্যিই এক বস্ত্রে, মাত্র বৃন্দাবনের ট্রেন ভাড়াটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। ঐ পাড়ার এক বৃদ্ধ বৈরাগী আর তার সেবাদাসীও বৃন্দাবন যাচ্ছিলেন, স্টেশনে এসে তাঁদের সঙ্গ পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ট্রেনে চেপে বসল।

তখনও কিন্তু জানে না, কি আশায় যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে কিভাবে জীবন-

ধারণ করবে সত্যিই কোনদিন দেখা পাবে কিনা স্বরূপের—মাধুকরী ক'রে বেড়ানো সম্ভব হবে কিনা—এ সব বাস্তবের কথা একবারও ভাবে নি—ঐ একটি একমুখী তীব্র কামনাতেই ওর সমস্ত চিন্তা মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল, আর কোন কথা মনে পড়ে না।

কিন্তু বৃন্দাবনে পৌঁছে কতকগুলি রূঢ় তথ্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হল।

আমাদের পুণ্যভূমিতে যতগুলি তীর্থ আছে—তার সবগুলিতেই, যেমন তীর্থদেবতারাও আছেন তেমনি তাঁদের আশ্রয়ে কতকগুলি মূর্তিমান পাপও আছে—ঘিরে আছে তীর্থস্থান বা দেবস্থান—মানুষ নামক হাঙর কতকগুলি। হয়ত তাও ভুল বলা হ'ল। হাঙররা মানুষকে একেবারেই নাশ করে, মানুষ খায়—এরা আরও বেশি, তাদের ইহকাল পরকাল সর্ব গ্রাস করে। তীর্থে ভক্তরা আসেন পুণ্য অর্জন করতে—এরা প্রাণপণ চেষ্টা করে যাতে সেটাও না হয়, এদিককারও যথাসর্বস্ব যায়। আজন্মের সঞ্চয় ব্যয় ক'রে কত দরিদ্র আসে দেবদর্শনে—সে দর্শনটাও ভাল ক'রে করতে দেয় না এই ফেউগুলো—পরভৃৎ পরান্নভোজীর দল। কিন্তু শুধু আর্থীর দলই তো নয়—সমস্ত রকম পাপ আর পাপ-ব্যবসা চলে এই সব তীর্থ বা মন্দির উপলক্ষ ক'রে। সেই বাইবেলের আমলে যা ছিল আজও তাই আছে। এমন অপরাধের আয়োজন, এমন পাপের ফাঁদ পাতা কোন আধুনিক শহরেও বোধ করি নেই।

এইটেই জানত না যমুনা। সে অভিজ্ঞতার বয়সও হয় নি তার, কারণও ঘটে নি। এই প্রথম ঘটল। ঝোঁকের মাথায় নিঃসম্বল, নিঃসঙ্গ, নিরবলম্ব হয়ে চলে এসেছে—আশ্রয় কি অন্নের কথা চিন্তা না করেই। স্টেশনে নামার সঙ্গে সঙ্গেই সে প্রশ্নটা প্রকটভাবে দেখা দিল। সঙ্গী গৌরদাস বাবাজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোথায় যাবে মা রাধারানী? তোমাকে কেউ নিতে আসে নি?…কোথায় যাবে ঠিকানাটা জানো তো? বলো আমিই না হয় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

এবার বলতেই হ'ল আসল কথাটা। কেউ নেই তার—নিয়ে যাবার মতো বা সেখানে গিয়ে থাকার মতো। সঙ্গেও তিন-চারটি টাকার বেশী সম্বল নেই।

'কী সর্বনাশ মা। এ কি বলছ। কোথায় থাকবে তাহলে? এই বয়েস

তোমার, সাক্ষাৎ আগুনের মতো চেহারা।'

'আ-আপনারা কোথায় থাকবেন?' ভয়ে ভয়ে অপ্রতিভভাবে প্রশ্ন করে যমুনা।

'আমরা কোনা ধর্মশালা-টালায় উঠব হয়ত আপাতত—কি কোন কুঞ্জে যদি আশ্রয় পাই। তার পর একটা আস্তানা কোথাও খুঁজে নেব। আমরা মা ভিক্ষা করে খাব বলেই এসেছি। আমাদের তো গাছতলায় পড়ে থাকতেও অসুবিধা নাই।'

'আমি—আমি আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারি না?' থতিয়ে থতিয়ে প্রশ্ন করে যমুনা, 'অন্তত দুটো-চারটে দিন?…একটা কোথাও ঝিয়ের কজি-ফাজ খুঁজে নেব—এই ভেবেই এসেছি—'

হাসলেন বৈরাগী, 'মা, তোমাকে নিয়ে গাছতলায় থাকা যায় না, ভূত-প্রেত-পিশাচের দল যে চারদিকে।…আর ঝিয়ের কাজ? কে তোমাকে ঝি রাখবে রাধে? কার এত বুকের পাটা?'

তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'চলো। একটা আস্তানা কোথাও খুঁজে পাই কিনা। কিন্তু যদি ধর্মশালায় জায়গা পাইও সে তো তিনদিনের বেশি নয়। আর মা সত্যি কথাই বলছি, মনে কিছু করো না—আমরা যদি কোন আস্তানা পাইও, সে আমাদের মতো লোকেরই আশ্রয়, সেখানে তোমাকে রাখা চলবে না।'

অনেক ঘুরে গোপীনাথ-ঘেরায় একটা ধর্মশালায় জায়গা পাওয়া গেল। বৈরাগীরা সেই দিনই মাধুকরীতে বেরোলেন—যা পেলেন—তাই ভাগ ক'রে খেলেন তিনজনে। একটা অন্যায় জুলুম হচ্ছে ওঁদের ওপর, বিব্রত করা হচ্ছে বুঝে যমুনা খুব সঙ্কুচিত হয়ে উঠল অথচ আর কী উপায় তাও বুঝে পেল না। কাজ খুঁজতে চেষ্টা করবে কি, বাইরে একা বেরোতেই সাহস হয় না—চারিদিকে নারীমাংস-লোলুপের দৃষ্টি হিংস্র হয়ে ওঠে ওকে দেখে, চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সেটা—অভিজ্ঞতা না থাকলেও বুঝতে পারে যমুনা, স্ত্রীলোকের এ সহজাত শক্তি।…

গৌরদাস বাবাজী দুদিনের দিনই একটা আশ্রয় জুটিয়ে নিলেন। গোপেশ্বরের মন্দিরের কাছে বহুকালের একটা জরাজীর্ণ কুঞ্জ আছে—প্রায়

বেওয়ারিশ বলা চলে, বে-সেবক তো বটেই। সেখানে ওঁদের চেনা এক বাবাজী এসে আস্তানা গেড়েছে দুটি সেবাদাসী নিয়ে—তিনিই একটা ঘরের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন গৌরদাসকে।

'মা, তাহলে এখন—?' সংবাদটা দিয়ে অর্ধসমাপ্ত প্রশ্ন ক'রে জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইলেন গৌরদাস।

এখন যে কি তা যমুনা জানে না। মনে হচ্ছে তারও আত্মহত্যা ছাড়া পথ নেই। তাতে কোন দুঃখও ছিল না, যদি যে ঐকান্তিক আকুতিতে আসা—সেটা সফল হত। সে আশা মেটাবার সাহস নেই। গোপীবল্লভের মন্দিরের কাছাকাছি যেতেও ভরসা হয় না। অথচ এদিকে—ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে নানা অভদ্র ইঙ্গিত, নানা প্রলোভনসূচক প্রস্তাব এসেছে এই ধর্মশালাতেই।...

সুতরাং গৌরদাসের প্রশ্নের উত্তরে নীরবে বসে চোখের জল ফেলা ছাড়া কোন উপায় রইল না।

কিন্তু বোধকরি এই অসহায় অবস্থা দেখে গোপীবল্লভেরই দয়া হ'ল, এত দিন পরে। তিনিই হঠাৎ মনে করিয়ে দিলেন কথাটা। বাইরে কোন যাত্রী তার মেয়েকে ডাকছে, 'এ রামপিয়ারী, রামপিয়ারী গে!' সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ-বিকাশের মতো মনে পড়ে গেল নামটা—

রামরতিয়া! ওদের আঁতুড়ের মজুরনী। সে-ই ওকে রাখতে গিয়েছিল বাপের বাড়ি। যেতে যেতে পথে বারবার বলেছিল, 'বহুরানী, তুমি বড় ভাল মেয়ে, সো হামি বুঝেছি। ভাল বড়াঘরের মেয়ে আছ, হঠাৎ কী ক'রে এই একটা গুনাহ্‌গারি হয়ে গিয়েসে—নইলে এ রাস্তার মেয়ে তুমি নও। হামার অনেক উমর হয়েছে, হামি আদমি চিনি। তা বলা রইল—যদি কোনো সময় ফিন ওদিকে যাও, কৌনো বিপদে পড়ো—এই বাঁদীকে ইয়াদ ক'রো। পুরানা শহরে আনন্দী বাঈয়ের ঠাকুরবাড়ির গলিতে থাকি আমি—তাও লাগবে না, পুরানা শহরে গিয়ে রামরতিয়ার নাম লিলে সব কোই বাতলাইয়ে দিবে।'

আবার বৃন্দাবন! তখন অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য বোধ হয়েছিল কথাটা। তাই ভাল ক'রে শোনবারও দরকার মনে করে নি। ভাল ক'রে শোনে নি বলেই

এতদিন মনে পড়ে নি। আজ দুর্ভাগ্যতাড়িত হয়ে প্রত্যক্ষ মৃত্যুর সামনে এসে পড়ে সেই অর্ধশ্রুত কথাগুলো মনে পড়ল ওর। তাও তখনও—প্রবল লজ্জা আর দ্বিধা যেন এসে মুখ চেপে ধরে। রামরতিয়া যদি এঁদের সব বলে—এঁরা কি ভাববেন। কিম্বা—কিম্বা যদি ওখানেই কথাটা পৌঁছয়?

শেষ পর্যন্ত অবশ্য বলতেই হয়। সে দেশ সে সংসর্গ যখন চিরদিনের মতোই ছেড়ে এসেছে তখন আর ভয়টাই বা কী? তা ছাড়া, এই তিন-চার দিন এঁদের সঙ্গে থেকে যা শুনছে—এ ধরনের কেলেঙ্কারী এঁদের গা-সওয়া, এ কেচ্ছা ঘরে ঘরে। আর ওঁদের কথা—? সেজন্যে দরকার হয় তো রামরতিয়ার পায়ে ধরবে সে। দিব্যি গালিয়ে নেবে গোবিন্দর নাম ক'রে।'

গৌরদাস শুনে তখনই গেলেন পুরনো শহরে। সৌভাগ্যের কথা রামরতিয়া ঘরেই ছিল, সে ছুটতে ছুটতে এল একেবারে, 'আরে হায় হায়—বহুরানী হামার রে। ই কি হাল, ই কি দেখলাম হামি!' কপাল চাপড়ে হায় হায় করতে লাগল সে।

ওকে অবস্থাটা বোঝাতেই অনেকটা সময় লাগল। তার আগে ওকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতে হ'ল যে এ কথা সে কাউকে বলবে না, গোসাঁই-দের তো নয়ই।

রামরতিয়া বলল, 'মুশকিল বটে। নইলে হামার ও ভাঙা ঝোপড়ায় গেলে হামি শিরপর রাখতাম। লেকিন ওখানে গেলে তো কারও জানতে বাকী থাকবে না ও-বাড়িতে—!'

সে-ই কিন্তু ব্যবস্থা একটা ক'রে দিল শেষ পর্যন্ত। লালাবাবুর মন্দিরের পিছন দিক থেকে যে রাস্তাটা এসে গোবিন্দমন্দিরে যাবার পথে পড়েছে—তার ওপরই একটা বিরাট খালি বাড়ি পড়ে আছে। একেবারেই খালি। কেউ থাকে না যেমন তেমনি ভয়েরও কোন কারণ নেই। বুড়ো যে চৌকি-দার আছে সে 'মহাৎমা' ধরনের লোক, সবাই তাকে সমীহ করে, ভালবাসে। তার আশ্রয়ে থাকা মানে বাঘের পেটে থাকা।

তাকেই বলে-কয়ে সেদিন যমুনাকে এনে তুলে দিল—সেই বিশ কামরার খালি বাড়িতে—একা একতলার একটা ঘরে। একেবারেই নিঃসম্বল অবস্থায় একবস্ত্রে এসে উঠল।

সেই যে ঢুকেছে আর বেরোয় নি, একরাত্রি ছাড়া। ভিক্ষাতেই চলছে তবে সে ভিক্ষা বাড়ি বাড়ি নয়, শুধু রামরতিয়ার কাছ থেকেই নেওয়া। তবে কে জানে কেন, ঐ সামান্য দাসীর মধ্যে এমনই আন্তরিকতা, এমন মায়ের মতো স্নেহ আছে, সব অপরাধসহা ভাব একটি—যে তার কাছ থেকে নিতে কুণ্ঠাবোধ হয় না। তকে ঠিক জীবন ধারণের মতোই নেয়। রামরতিয়া আরও দিতে পারে কিন্তু সে দিতে দেয় না কিছুতেই।

দীর্ঘ তিন বছর কেটেছে তার পর, এই বন্যার আগে পর্যন্ত। এর ভেতর কেবল একদিন রামরতিয়া ওকে নিয়ে গিয়েছিল—ঘোমটা দিয়ে গিয়েছিল যমুনা—গোপীবল্লভের মন্দিরে। রাত্রে শয়নারতি নাকি বড় গোসাঁই-ই করছেন আজকাল। তখন ভিড়ও থাকে না, গোসাঁইয়ের বাড়ির লোকরাও কেউ আসে না। কোন চেনা লোকের সামনে পড়ার সম্ভাবনা নেই। তবুও যথেষ্ট ভয়ে ভয়ে দুরুদুরু বক্ষেই গেছে যমুনা—কিন্তু ঠাকুরের দয়াতেই বোধ হয়—কেউ টের পায় নি। অনেকক্ষণ ধরে, প্রাণভরেই দেখেছে—তাতে জ্বালা বেড়েছে আরও, কমে নি। তৃষ্ণায় বুক অবধি শুকিয়ে ছিল আগেই—এখন ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

এই দাহই কি তার প্রায়শ্চিত্ত? কে জানে!

তবে এ দহনের মধ্যে কোথায় একটু শান্তিও ছিল। এটুকুর জন্যেও প্রস্তুত ছিল না যমুনা। ওঁরা তাকে যা বিচার করেছেন তার চেয়ে ঢের কঠোরভাবে বিচার করেছে সে নিজেকেই। সেই জন্যেই এটাও ভাবে নি।

শুনল রমেরতিয়ার মুখেই যে, স্বরূপ গোসাঁই আর বিয়ে করেন নি। মাকে বলেছেন, 'না মা, অদৃষ্টে সুখ থাকলে এমন হত না। এত লোক তো বিয়ে করছে কার এমন হয়? বুঝতে হবে গোপীবল্লভের ইচ্ছা নয় যে আমি সংসারী হই। মিছিমিছি ও চেষ্টা করো না, প্রাণবল্লভের বিয়ে দাও, ওর দ্বারাই গোপীবল্লভের সেবাইৎ বংশ বজায় থাকবে।'

তার পরেও বহু পীড়াপীড়ি করেছেন আত্মীয়েরা, কেউ রাজী করাতে পারেন নি নাকি। আরও শুনেছে—দিন দিন নাকি পুজোপাঠ আর জপেই ডুবে যাচ্ছেন, অন্য কোন দিকে মন নেই। সংসার-বৈরাগ্যেরই ভাব। মনে হয় এই আঘাতেই সংসারবিমুখী হয়েছে তাঁর মন—ঈশ্বরাভিমুখী হচ্ছে।

এই সংবাদে আশ্চর্য একটা সান্ত্বনা পায় যমুনা, ভারী আরাম-বোধ হয় মনে মনে। দুস্তর অলজ্ঘ্য ব্যবধান দুজনের—জীবনে আর কখনও দেখাও হবে না, মিলন তো অবাস্তব—তবু মনে হয় একটা কোথায় সেতু রচিত হয়েই আছে। অকারণ অজ্ঞাত একটা আশ্বাস লাভ করে সে।

বন্যার জল সরে যেতে যেদিন যমুনা আবার পুরাতন বাসায় ফিরে এল, সেই দিনই প্রভাস মহারাজ এক প্রস্তাব পাঠালেন, কালীয়দমনের ঘাটের ওপর এক বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী থাকেন, তাঁর একটি সেবিকা প্রয়োজন। মাতাজীর খুবই বয়স হয়েছে, তবে রুগ্ন নন। এখনও বেশির ভাগ সময়ই তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান। হাতে টাকা আছে, শিষ্যসেবকও আছে বেশ কিছু। যথার্থ সন্ন্যাসিনী, টাকা রোজগারের জন্যে ভেখ নেন নি। যদি ভালভাবে সেবা করে, তিনি ভরণপোষণ ছাড়াও কিছু কিছু হাতখরচ দেবেন, চাই কি মরার আগে একটা স্থায়ী হিল্লেও কিছু ক'রে দিয়ে যেতে পারেন।

যমুনা কি নেবে এ কাজ ?

অবশ্য তখনই উত্তর চান নি মহারাজ, দুদিন সময় দিয়ে গেছেন।

যমুনা খুব দ্বিধায় পড়ল। ও যে খেটে খাবে বলেই এসেছিল, প্রধানত ঝিয়ের কাজ করতেই, সে কথাটা এতদিনে ভুলেই গেছে। তাই প্রস্তাবটা শুনে প্রথমে যেন একটু অবাক হয়েছিল। সেবিকা দরকার তা ওর কাছে কেন ? তারপর একটু একটু ক'রে মনে পড়েছে কথাটা, মনে হয়েছে যে এ প্রস্তাবে আনন্দিত হবারই কথা, সাগ্রহে লুফে নেবার কথা প্রস্তাবটা। এই দুঃসহ কৃচ্ছ্রসাধন থেকে যে মুক্তি তাই নয়—পরনির্ভরতা থেকেও অব্যাহতি। ওর জন্যে রামরতিয়ার এক বন্ধন হয়েছে, তার দুর্ভোগের শেষ নেই, লোকের কাছে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে হয়। তাও, কে জানে ভিক্ষার নাম ক'রে নিজের কষ্টার্জিত পয়সাই খরচ করে কিনা।

আনন্দিত নিশ্চিন্ত হবার কথা কিন্তু তা হয় না। বরং কোথায় যেন একটা অস্বস্তি বোধ করে এ প্রস্তাবে। কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম বিরাগও মহারাজদের এই ওপর-পড়া হয়ে উপকার করতে আসায়। কী দরকার ছিল এই প্রস্তাব ক'রে এখন তাকে উভয় সংকটে ফেলার। এ ব্যবস্থা নাকচ করলে

চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও আরামপ্রিয়তার পরিচয় দেওয়া হবে, রামরতিয়ার ওপর অবিচারও। অনেক করেছে সে, এখনও করছে। সেও তো বুড়ি হয়ে পড়েছে, আর কতদিনই বা এমন চালাতে পারবে।

অথচ—এখনই এই জীবনযাত্রা, এই কৃচ্ছ্রসাধনকে যেন ওর একটা তপস্যা বলে মনে হয়। মনে হয় এইটেই ওর প্রায়শ্চিত্ত, এইতেই শুদ্ধ হয়ে, ও—বাইরে বা বাস্তবে না হোক—নিজের অন্তরেও স্বামীর উপযুক্ত হয়ে উঠছে। এখন একটা জীবিকা অবলম্বন ক'রে একটা বৃত্তি ধরে—নিরাপদ নিশ্চিন্ত জীবন, সুখাদ্য আহার শুরু করলে ঐ তপস্যা থেকে বিচ্যুতি ঘটবে ওর, প্রায়শ্চিত্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।...

দুদিন সময় ছিল, কিন্তু একটা দিন দিনরাত ভেবেই যমুনা স্থির করল, সে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানই করবে—তা যে যা-ই বলুক। বরং অন্য সামান্য কোন কাজ, যা ঘরে বসে করা যায়—এ গুহা থেকে না বেরিয়ে তাই শুরু করবে। সে রকম কাজও আছে বৈকি, যেমন ঠোঙ্গা তৈরী একটা। এতে রামরতিয়াই সাহায্য করতে পারবে যথেষ্ট। কাগজ কিনে এনে দেবে, ঠোঙা নিয়ে গিয়ে দোকানে বেচে আসবে। দৈনিক দুআনা কি ছটা পয়সাও যদি পায় তো বেশ চলে যায়, এর বেশী দরকার নেই।

এর চেয়ে আরাম করলে—ওর মনে হ'ল—স্বরূপের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। তিনি যে ওর কারণেই ভোগবিলাসের বিপুল আয়োজন থাকা সত্ত্বেও একরকম বৈরাগীর জীবনযাপন করছেন—সে কথা ও ভোলে কি ক'রে?

কিন্তু প্রত্যাখ্যানের খবরটা পাঠাবার আগেই একটা যেন বিপর্যয় ঘটে গেল ওর জীবনে। অঘটন দিয়ে তার শুরু।

প্রবল কম্প দিয়ে জ্বর এল, তার সঙ্গে নানা রকম উপসর্গ। বন্যার ফলে যে কাল ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েছিল, যাতে পরে হাজার হাজার লোক মরেছে—এ সেই। কিন্তু তখনও তা মহামারীর আকার ধারণ করে নি, ও-বাড়ির চৌকিদার কি রামরতিয়া কেউই তার সে ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে নি। তারা ভয় পেয়ে গেল। চৌকিদার ভয় পেয়ে ছুটে গিয়ে রামরতিয়াকে খবর দিল, রামরতিয়া এসে ঐ অবস্থা দেখে আর এক কাণ্ড ক'রে বসল—ছুটতে ছুটতে গিয়ে স্বরূপ গোঁসাইকে খবর দিলে।

স্বরূপ প্রথমটা বুঝতেই পারলেন না রামরতিয়ার কথা। দুবার-তিনবার আদ্যোপান্ত বলতে হ'ল। তার পরও একেবারে নির্বাক রইলেন, যেন মনে মনে সবটা বুঝতে, ধারণা করতে পারছেন না, চেষ্টা করছেন তখনও। আর যাই হোক, এ সংবাদের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি, কোনদিন সুদূর কল্পনাতেও এ চিত্র আসে নি।

যমুনা! যমুনা এখানে এসেছে? এসে. আছে! এইভাবে বাস করছে।

একা, নিরুপায়—রামরতিয়া দাসীর দয়ার ওপর, ভিক্ষার উপর নির্ভর ক'রে। আশ্চর্য।...কিন্তু কেন? কেন? কোন্ আকর্ষণে অথবা কোন্ তাড়নায় এসেছে সে।

কে জানে বাপের বাড়িতেও বোধহয় স্থান হয় নি। হয়ত তাঁরাও তাড়িয়ে দিয়েছেন। হয়ত সে বাচ্ছাটাও অনাহারে মরেছে। আর কোন উপায় না পেয়েই এখানে এসেছে হয়ত। কিম্বা—

এমনি সে যাই হোক—এখন তাঁর কি কর্তব্য?

আরও একটুখানি কী যেন চিন্তা করলেন। ঘরের বাইরে দূরে অধুনা শান্ত যমুনার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইলেন প্রায় দশ-বারো মিনিট। আবেগ? আলোড়ন? দুঃখ-স্মৃতি? কে জানে কী!

আজকাল বেশির ভাগ দিনই উনি গোপীবল্লভের এই বাগানবাড়িতে একা এসে থাকেন, সাধনভজন পড়াশুনোর সুবিধে হবে ব'লে। একজন চৌকিদার ও ভৃত্য তো থাকেই, ওখান থেকে প্রসাদ কেউ এসে দিয়ে যায় দুবেলা। রামরতিয়া তা জানত, তাই এখানেই এসেছে সোজাসুজি।

দ্বিধা কিছু ছিল কিনা—ওঁর আর জড়ানো উচিত কিনা এই পরিত্যক্ত অপরাধিনীর স্ত্রীর জীবনের সঙ্গে—সেক্ষেত্রে যে বিপুল জটিলতা দেখা দিতে পারে তাঁর পারিবারিক জীবনে—এ সব প্রশ্ন মনে দেখা দিলেও তা তাঁর মুখ দেখে বোঝা গেল না। তবে দ্বিধা যতই থাক—ঐ সামান্য কটি মিনিটের বেশী সময় লাগল না তা ভেবে বিচার ক'রে দেখতে—তার পরই একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলো, যাচ্ছি আমি।'

বিস্মিত হয়েছিলেন, খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন, তবে তখনও বিস্ময়ের

অনেকটা বাকী ছিল। রামরতিয়ার মুখে মেয়েটার এই কঠিন প্রায়শ্চিত্তের বিবরণ শুনে যতটা অনুমান করেছিলেন এসে দেখলেন বাস্তব অবস্থা তার থেকে ঢের বেশী কঠিন, অনেক বেশী দুঃসহ। কারও মুখে শুনে এতটা বোঝা সম্ভব নয়। এ কেউ না দেখে কল্পনা করতে পারে না। অসুখের ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে তত নয়—জীবনযাত্রার এই নিরুপকরণতা ও দৈন্য দেখে তাঁর চোখে জল এসে গেল।

অতঃপর ডাক্তার ডাকা। স্বরূপ মিশনের ডাক্তারকেই সংবাদ দিতে বললেন। ওঁদের হাসপাতাল তখনও পুরনো বাড়িতে ফিরে যায় নি—এখন যেখানে আছে সেখানে স্থানাভাব। এখানে রেখেই চিকিৎসা করাতে হবে। নার্স পাওয়া সম্ভব নয়, ওঁদের জানাশুনো একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে আছে—রান্নার কাজ করে কারও প্রয়োজন হ'লে—স্বরূপ রামরতিয়ার হাতে একেবারে কুড়িটা টাকা দিয়ে বলে দিলেন, তাকেই এনে রাখতে, সেবা করবে, পথ্য তৈরি করবে, তার খাওয়ার খরচ তো দেবেনই, পারিশ্রমিক যা চায় তা-ই দেবেন। এই টাকা থেকেই যেন সব খরচ চালায় রামরতিয়া—দরকার হলে যেন আরও চেয়ে নেয়।

গোপীবল্লভের গোসাঁই এই নিঃস্ব মেয়েটি সম্বন্ধে এত উদ্বিগ্ন—সেটা জানার পর চৌকিদার প্রভৃতিও যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠল—ডাক্তারবাবুও একটু মুচকি হেসে মন দিয়ে চিকিৎসা শুরু করলেন, দৈনিক তিন-চারবার আসতে শুরু করলেন।

অনেক দেখেছেন তিনি, নিত্যই দেখছেন। এখানের বড় বড় গোসাঁই-দের এক ধারা। বাইরে একটি জলপাত্র থাকা চাই, সেবাদাসী। তা সে যত বড় সাধুই হোন আর পণ্ডিতই হোন।

জ্বর কমে আসতে যখন একটু হুঁশ ফেরার লক্ষণ দেখা দিল যমুনার, স্বরূপ দেখতে আসা বন্ধ করলেন। দুর্বল মস্তিষ্কে এতটা বিস্ময় আর দুঃখ-স্মৃতির আঘাত সহ্য করতে পারবে না, বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। এদেরও বলে দিয়েছিলেন তাঁর কথা যেন না বলে। কিন্তু জ্ঞান হবার পর চিকিৎসার সমারোহ, ঔষধপথ্যের প্রাচুর্য দেখে বিস্ময়ের আঘাত কম লাগল না যমুনার।

প্রথমটা ভেবেছিল মহারাজরাই এ সব ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু আড়ম্বর ও মহার্ঘ্য জিনিসের বাহুল্য দেখে ওর সন্দেহ হ'ল। বার বার রামরতিয়াকে প্রশ্ন করতে লাগল—এ সব কে করল, কেন করল। রামরতিয়াই ওর জন্যে সর্বস্বান্ত হ'ল না তো! সে অবশ্যই গোসাঁইয়ের নাম করল না—কিন্তু দৃষ্টিতে কৌতুক ও আনন্দের আভাস আর মুখের প্রচ্ছন্ন মৃদু হাসি চাপতে পারল না। তাতে ওর সন্দেহ আরও বাড়ল। আরও অস্থির হয়ে উঠল যমুনা। এতেও বিপদ বাড়তে পারে ভেবে এবং এই অস্বস্তির কথা শুনে—জ্বর ছাড়বার দিন দুই পরে স্বরূপ গোসাঁই এসে দেখা দিলেন।

আর কিছু বলতে হ'ল না। ওঁকে দেখেই বুঝল সব। রামরতিয়ার কীর্তি তাও বুঝল। লজ্জায় আত্মধিক্কারে দুই চোখ বুজে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—যাকে দেখার জন্যেই ওর এই ছুটে আসা, এই দুর্বিষহ কষ্টস্বীকার, তাকে প্রাণভরে একটু দেখবার, তার দিকে চেয়ে থাকারও শক্তি রইল না। শুধু দু'চোখ বেয়ে নিঃশব্দে জলের ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

প্রাথমিক আড়ষ্টতা কাটার পর ব্যাকুলস্বরে বলল যমুনা, 'কেন, কেন আপনি এ কাজ করতে গেলেন, কেন করলেন। ছি ছি, এ কী প্রাণ যে আপনি বাঁচাতে গেলেন? নেহাৎ আত্মহত্যা মহাপাপ বলেই করতে পারি নি—গত জন্মে কত পাপ করেছি, বাধা দেবারও বোধহয় কেউ ছিল না, আবার এ-জন্মে মহাপাপ করব, এই ভেবেই করি নি। কিন্তু মৃত্যুর এমন সুযোগ আপনা থেকে এসেছিল তা থেকে বঞ্চিত করলেন কেন? এর থেকে আমার ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়ে ডোবাও যে ভাল ছিল!'

স্বরূপ গোসাঁই হাসলেন, আলতোভাবে একখানি হাত রাখলেন ওর কপালে, 'তুমি শান্ত হও যমুনা, পাগলামি ক'রো না। এত কাণ্ড ক'রে যেটুকু ফল হয়েছে, তাকে আর নষ্ট ক'রো না।'

শান্ত হ'ল যমুনা, আর দু-চারটি কথার পরই।

ঐ একান্ত ঈপ্সিত, একান্ত আকাঙ্ক্ষিত হাতখানির দুর্লভ স্পর্শেই কাজ হ'ল। এক হাজার বাছাইকরা সান্ত্বনা-বাক্যেও এ ফল হত না। এ সৌভাগ্য ওর সুদূরতম আশার অতীত। এ যে ওর জীবনে আর কখনও হবে তা তো কল্পনাও করতে পারে নি। শুধু দূর থেকে একবার চোখের দেখা

পাওয়াই তো দুরাশা ছিল এতদিন। তার জন্যেই তো ওর এই আত্মশুদ্ধির ব্রত।

আরও দু-তিন দিন পরে, যমুনা উঠে বসেই দেখাশুনো করার লোকটিকে ছাড়িয়ে দিতে গেল। এখন রামরতিয়া এক-আধবার এলেই যথেষ্ট, অত লোক কী দরকার?

স্বরূপ বললেন, 'এত তাড়া কি, থাক না আরও দু-চারটে দিন।'

'না না, আর এ হুকুম করবেন না। কী লাভ বলুন?...আমার এ জীবনের জন্যে এত আড়ম্বরে দরকার নেই। যাকে ভিক্ষে ক'রে খেতে হয়—খেতে হবে—তার জন্যে এত আয়োজন, লোকে জানুক না জানুক, আমি যে লজ্জায় মরে যাচ্ছি।...ওদের সামনে মুখ দেখাতে পারছি না। এক এক সময় মনে হচ্ছে মেঝেতে মাথা ঠুকে মরি। আর আমার এ অপমান, এ লজ্জা বাড়াবেন না। এই কাণ্ড ক'রে আমার প্রাণ বাঁচানো। ছিঃ! এ আমার ওপর ভগবানের আর একটা আঘাত। আরও লজ্জা চাপিয়ে দেওয়া।'

অভিমান? অভিমানের মূল্য পাবে এমন একটুখানি আশা?

না। কণ্ঠস্বরে যদি কোথাও এতটুকু পূর্ব অধিকারের রেশ বাজত তো স্বরূপ বিরূপ হয়ে উঠতেন বোধহয়। কিন্তু যমুনার কণ্ঠে ও ভঙ্গীতে একান্ত হতাশার, করুণ বিলাপের সুরই বাজল। বিলাপ আর আত্মধিক্কার।

কিছুক্ষণ স্থির আত্মনিমগ্ন হয়ে বসে রইলেন স্বরূপ গোসাঁই, তার পর একেবারে অভাবনীয় একটা প্রশ্ন ক'রে বসলেন। আর যাই হোক, এতকাল পরে উনি এ প্রসঙ্গ তুলবেন তা যমুনা ভাবতেও পারে নি। এই প্রথম উনি এ কথা উচ্চারণ করলেন। এর আগে যখন এ প্রশ্ন করা উচিত ছিল—এ কৈফিয়ৎ চাওয়া স্বাভাবিক—তখন করেন নি।

স্বরূপ আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি কখনও তোমার বিচার করি নি যমুনা, তবে যারা করেছে তাদেরও বাধা দিতে পারি নি।...শুধু ভাবতেই চেষ্টা করেছি যে এটা কী করে সম্ভব হ'ল। আমার কেবলই মনে হয়েছে যে তুমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। নিতান্ত—এটা—একেবারে কারও অজ্ঞাতে হওয়া সম্ভব হয় না বলেই—।...তুমি কি সত্যিই—মানে সত্যি সত্যিই আর কারও সঙ্গে ভালবাসা হয়েছিল তোমার?...মানুষের দেহ তো,—এই কথাটাই কিছুতে ভুলতে পারি

না। মাঝে মাঝেই এ প্রশ্ন বড় পীড়া দেয়।'

যমুনা প্রবলবেগে ঘাড় নাড়ল কিন্তু তখনই কোন উত্তর দিতে পারল না। উত্তপ্ত অবাধ্য অশ্রু এসে কণ্ঠ রোধ করেছে যেন, কিছুতেই কমাতে পারছে না সে চোখ উপচে জল পড়াটা। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলল, 'না। আপনার কাছে মিছে বলব না। মানুষ মিথ্যে বলে কোন্ আশায়। ভয় থেকে বাঁচতেও বলে—কিন্তু সেও তো এক রকমের আশাই। আমার জীবনে কোন আশা নেই, কিছু ভাল হওয়া সম্ভব নয় যখন—তখন মিছে কথা বলব কেন! আপনি আমার কাছে গোবিন্দর চেয়ে, ইষ্টের চেয়েও বড়, আপনার পা ছুঁয়েই বলছি, আমি মনেপ্রাণে নির্দোষ। কাউকে কামনা করি নি, কামনা জিনিসটাই জানতাম না আপনাকে দেখার আগে। কী ঘটছে তা বোঝাবার আগেই ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল; একেবারেই যা ভাবি নি, ভাবার কথা নয়—হঠাৎ সেই জিনিস ঘটতে দেখে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম। কিছুই বুঝতে পারি নি, জানতুমও না কিছু—তার মধ্যেই ঘটে শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেই জন্যেই বাধা দিতে পারি নি।'

'কিন্তু কে, কে এ কাজ করলে যমুনা? তার তো অন্তত শাস্তি হওয়া দরকার। তুমি কেন তার পাপের শাস্তি ভোগ করবে?

দুই চোখের অবিরল ধারায় বেগ বুঝি আরও বাড়ে। তার মধ্যেই ঘাড় নাড়ে সে। 'সে কথা বলতে পারব না কিছুতেই, কোনদিনই। কাউকেই বলতে পারব না। তবে এইটুকু বলছি, তিনি জেনে শুনে কোন অন্যায় করেন নি, সেই কটি মুহূর্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি, তিনিও বোঝেন নি কি হচ্ছে। যা করেছেন অচেতন অবস্থাতেই করেছেন, একটা আচ্ছন্ন ভাবের মধ্যেই। আমি জানি তার জন্যে অনুতাপের শেষ ছিল না তাঁর, তিনিও কম কষ্ট পান নি। এসব জেনেও তাঁকে জনসমাজে হেয় করতে, তাঁর স্ত্রী-পুত্রের মাথা হেঁট করতে চাই না। যদি বুঝতুম তাতে আমার কোন লাভ হবে তো কথা ছিল। যা হয়ে গেছে—আমার যে জীবন্ত মৃত্যু—তা তো আর ফিরবে না। শুধু শুধু আরও কটা জীবন নষ্ট করি কেন?'

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে এর পর দুজনেই।

এমনিই এ ঘরে আলো আসে কম, তাতে বাইরেও ততক্ষণে অপরাহ্ন

নেমেছে—আস্তে আস্তে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। সে অন্ধকার ওদের মনে যেন আরও অনেক গাঢ়, আরও অনেক বেশি। হতাশার দুর্ভাগ্যের অন্ধকার।

নতুন যে সেবিকাটি এসেছিল, সে প্রদীপ জ্বালতে এসে উঁকি মেরে দেখে কী বুঝল কে জানে, ফিরে গিয়ে রামরতিয়ার সঙ্গে গল্প করতে বসল।

কিন্তু তার সেই সামান্য পায়ের আওয়াজেই সচেতন ও সক্রিয় হয়ে উঠলেন স্বরূপ গোসাঁই। বললেন, 'আমিও তোমাকে ভুলতে পারি নি যমুনা, এই দীর্ঘকালেও। ভগবানকে ডেকেছি, গোপীবল্লভের পায়ে মন দেবার চেষ্টা করেছি, পারি নি। কেবলই মনে হয়েছে—তোমার মুখ দেখে আমার ধারণা হয়েছিল—তোমার ওপর অবিচার হচ্ছে। অথচ সে কথা বলারও তো উপায় ছিল না। অসদ্ব্যবহার যাকে বলে মা তা করেন নি, আরও বেশী রূঢ় হ'ত অন্য লোক হ'লে। আমারও নিজের কোন উপায় ছিল না, তোমাকে রাখবার। আমি বলি কি, চলো এ রাজগীর ঠাটবাট ছেড়ে দিয়ে চলে যাই কোথাও দুজনে, কোন তীর্থে গিয়ে বাসা বাঁধি। আমরা বৈষ্ণব, ভেখ নিতে কোন দোষ নেই। দুজনেই ভেখ নিই চলো। তাহলে আর মোহন্তগিরির কোন প্রশ্ন উঠবে না। ভাই বড় হয়েছে, সে বুঝে নিতে পারবে, আর—বলতে গেলে সে-ই তো চালাচ্ছে। আমরা দুজনে চলে যাই অন্য কোন দূর তীর্থে—হরিদ্বার কি ঋষিকেশ কি দ্বারকায়। ভগবানের নাম করব, ভিক্ষা ক'রে খাব, বেশ থাকব।'

খুবই লোভনীয় প্রস্তাব, আশাতীত সৌভাগ্য। অচিন্তিত সুখ সম্পদ, স্বর্গের দ্বার খুলে কেউ সামনে ধরলেও এর থেকে বেশী কাম্য মনে হ'ত না। দু চোখ বারেক জ্বলে উঠেছিল বৈকি প্রথমটায়।

তবু যেন শিউরে উঠল যমুনা, 'না না, ছিঃ! এ কী বলছেন! অভাগী আমার জন্যে আপনি ভিখিরী হবেন!...ছিঃ! না না, এমন ক'রে আমাকে অপরাধী করবেন না। আপনি আর একটি বিবাহ করুন, বংশরক্ষা হোক। আমার কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করুন। আপনি আমাকে ভুল বোঝেন নি, নরকের কীটকে গ্রহণ করতে চাইছেন—এই আমার আশাতীত সৌভাগ্য, এতেই আমার জীবন পূর্ণ হয়ে গেছে। আর আমার কথা ভাববেন না। অনেক কষ্ট পেয়েছেন, এবার সুখী হোন। একটা ছেলেপুলে হ'লেই আমাকে

ভুলে যেতে পারবেন। আমিই বরং বৃন্দাবন ছেড়ে চলে যাচ্ছি—মথুরা কি গোকুল কি নন্দগ্রাম বর্ষানায়—মানে যেখান থেকে খুব ইচ্ছে হ'লে চুপি চুপি এসে দূর থেকে দেখে যেতে পারব। আমাকে বরং তিনটে কি চারটে ক'রে টাকা পাঠাবেন মাসে। আর আপনার কাছ থেকে হাত পেতে নিতে আমার লজ্জা নেই। এবার আমি বেশ থাকব, সুখেই থাকব।'

আরও অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন স্বরূপ। অন্ধকারে মুখটা দেখা গেল না কিন্তু যমুনা জানে দেখা গেলেও কিছু বোঝা যেত না, কী ভাবছেন তা ওঁর মুখ দেখে কখনই বোঝা যায় না।

যখন কথা কইলেন শেষ পর্যন্ত তখন আর কণ্ঠে দ্বিধার কোন চিহ্ন নেই। বললেন, 'না যমুনা, আমি মন ঠিক ক'রেই ফেলেছি। এমন ক'রে দোটানায় থাকার চেয়ে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া ভাল। মিছিমিছি দুটো জীবন নষ্ট করি কেন? এতে আমার কোন অপরাধও হবে না গোপীবল্লভের কাছে। তুমি যদি সত্যিই জেনেশুনে এ কাজ করতে, তাতেও আমি এই বলতুম। এই ব্রজধামে বহু গোসাঁইয়েরই একাধিক রক্ষিতা আছে, সেবাদাসী আছে। তাতে যদি পাপ না হয় আমারই বা হবে কেন? তুমি তো আমার বিবাহিতা স্ত্রী, আমাদের বিবাহ বিচ্ছেদও হয় নি, আমি তোমাকে বলে কয়ে ত্যাগও করি নি।···আর আমরা তো বনেই যাচ্ছি, ভেখ নিয়ে ভিক্ষা ক'রে খাবো—এতে আমাদের লজ্জা কি অগৌরবের কিছু নেই। তাতে আমি খুব একটা কিছু হারাবো, খুব লোকসান, কি পরে খুব কষ্ট হবে—একথাই বা ভাবছ কেন। এ সুখ-ভোগবিলাসে আমার কিছুমাত্র রুচি নেই। আমি এ থেকে যথাসাধ্য দূরেই থাকি তা নিশ্চয়ই শুনেছ। তুমি মিছিমিছি কুণ্ঠিত হচ্ছ। অনেক কষ্ট করেছি দুজনেই, আর না-ই বা করলুম।'

বলার পর আর বসলেন না স্বরূপ গোসাঁই। যমুনার তরফ থেকে আপত্তি কি বাদানুবাদের অবসরও দিলেন না কিছু, শুধু 'তাহলে আসি' বলে বেরিয়ে গেলেন।

সেই অন্ধকার ঘরেই চুপ ক'রে বসে রইল যমুনা।

এক সময় এসে সেই মেয়েটি আলো জেলে দিয়ে গেল, রামরতিয়া এসে

মাথা আঁচড়ে গা মুছিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু এ সব কিছুই যেন দেখতে বা বুঝতে পারল না যমুনা। কেমন যেন নেশাগ্রস্তের মতো অবস্থা ওর। চেয়ে আছে কিন্তু চোখে কিছু পড়ছে না, কথাও কইছে দু-একটা এদের প্রশ্নের উত্তরে—সেও যন্ত্রের মতো।

রামরতিয়া যখন বাড়ি ফিরবে বলে প্রস্তুত হয়ে ওকে বলতে এসেছে, হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'হ্যাঁ রে, কালীয়দমনের কাছে যে বুড়ী মাতাজী থাকেন, তাঁর কি খবর জানিস? বেঁচে আছেন তো, না রজ পেয়েছেন?'

'খুব বেঁচে আছেন, থাকবে নাই কেন? ও বুড়ীমাঈ আউরো বিশসাল বাঁচুবেন কম-সে কম। উ তো কোথায় যাচ্ছে কাল। খুব সুবা রওনা হইয়ে যাবে। মথুরা থেকে সকাল সাতটায় টিরেন ধরবে নাকি।'

'অ! তাই নাকি!' যথাসম্ভব নিস্পৃহকণ্ঠে উত্তর দিল যমুনা, 'তা কোথায় যাচ্ছেন?'

'সে হামি বলতে পারব নাই!' রামরতিয়া চলে গেল।

রাত্রের খাওয়া শেষ হলে সেই মেয়েছেলেটি মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। অঘ্রানের শেষ, বেশ শীত পড়ে গেছে। একটু পরেই তার নাক ডাকতে শুরু হ'ল। কিন্তু যমুনার চোখে ঘুম এল না কিছুতেই। দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত এ পাশ ও পাশ করল। বুকে তার প্রচণ্ড তুফান, আশা-নিরাশায়, অস্তি-নাস্তির দুমুখো ঝড়। সে ঝড়ে তার শুভ বুদ্ধি-বিবেচনার নৌকো-খানা উথাল পাতাল করছে। এক এক সময় মনে হয় বুঝি ডুবেই গেল।

শেষে রাত চারটের সময় মনে হল তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। পাগলের মতো ধড়মড় করে উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। তারপর আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে বাইরে এল। ফটকের কাটা দোর খোলা—চৌকীদার বাগানে গেছে। সে সেইভাবেই নিঃশব্দে রাস্তায় এসে পড়ল। সঙ্গে কিছুই নিল না, সাদা চাদরটা পর্যন্তও না।...

দুর্বল শরীর, পা কাঁপছে—বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ছে। তবু প্রাণ-পণে হাঁটতে লাগল সে। কালীয়দমনের ঘাট অনেক দূর—কিন্তু উপায় নেই, যেতেই হবে তাকে। এ যাওয়া যেন ওর জীবন-মরণের প্রশ্ন।

অবশেষে এক সময় যখন প্রায় অর্ধমূর্ছিতের মতো গিয়ে পৌঁছল

মাতাজীর আশ্রমে, তখন মুটেরা মালপত্র বইতে শুরু করেছে। বড় রাস্তায় টাঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে ক'টা, ওঁরা বোধহয় তাইতে ক'রেই সোজা মথুরা পর্যন্ত যাবেন। লোকও অনেকগুলি প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে।

মাতাজীও গেরুয়া রেশমের একটা আলখাল্লা মতো পরে একটা লাঠিতে ভর দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। যমুনা গিয়ে তাঁর পায়ের ওপর প্রায় আছড়ে পড়ল—এবং পড়েই রইল মড়ার মতো।

মাতাজী প্রথমটায় চমকে উঠেছিলেন কিন্তু তারপর হেঁট হয়ে চেয়ে দেখে—এখনও চোখের জোর অসাধারণ—ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'কে মা তুমি? এমনভাবে এসে পড়লে? তোমার শরীর যে খুব খারাপ দেখছি।...তোমার কি কোন অসুখ করেছে?...আমার কাছে এমন কি দরকার মা যে এইভাবে ছুটে এসেছ? কিছু প্রার্থনা আছে?...আমি তো এখন বহু দূর যাচ্ছি, তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছি, সময়ও তো মোটে নেই হাতে—আমি তো তোমার বিশেষ কোন উপকারে আসতে পারব না!'

সময় নেই তা যমুনাও বোঝে। কথা বলতে পারছে না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, বুকের মধ্যে তখন যেন একটা যন্ত্রণা শুরু হয়েছে—তবু মুখ তুলে বলে, 'মা, আমার যে আপনার সঙ্গে যাবার কথা ছিল। মিশনের বড় মহারাজ বলেছিলেন— ? আমাকে না নিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছেন?'

'ও, তুমিই সেই মেয়ে? হ্যাঁ, এমনিই রাধারাণীর মতো চেহারা বলেছিল বটে। তা তুমি তো এলে না মা, তাই আমি ভাবলুম, তোমার এ কাজ পছন্দ নয়।'

'সেই দিন থেকেই জ্বরে পড়েছিলুম, ম্যালেরিয়া জ্বর। অঘোর অচৈতন্য হয়ে ছিলুম। এই সবে দুদিন উঠে বসেছি। কাল রাত্রে শুনলুম—আপনি চলে যাবেন ভোরেই, তাই ছুটতে ছুটতে এসেছি। আমার যে আর কোন উপায় নেই মা, আপনি পায়ে ঠাঁই না দিলে।'

'আহা রে। এই পিশাচ ম্যালেরিয়ায় তোকেও ধরেছিল বুঝি? মরে যাই! তাই এমন ডাইনী-চোষা চেহারা ক'রে ছেড়ে দিয়েছে।...তাই তো, লোক অবিশ্যি আমি নিয়েছি একজনাকে, তবে সে বলেই দিয়েছে এক মাসের বেশী থাকতে পারবে না।...তুই গেলে তো ভালই হয়।...তা

তুই এখুনি, এই এক কাপড়ে যেতে পারবি আমার সঙ্গে? ঘরে গিয়ে মালপত্তর আনার আর সময় হবে না। রেলের আইন ভারী কড়া—ঠিক সময়ে গাড়ি ছাড়বেই—তুমি যাও বা না যাও।'

হে ভগবান, হে গোপীবল্লভ! তুমি কি এই একটু দয়া করলে শেষ পর্যন্ত!

এইখানটাতেই ওর বড় ভয় ছিল, একবস্ত্রে এসেছে দেখে যদি কিছু সন্দেহ করে, কিম্বা ঘরে ফিরে গিয়ে মালপত্র নিয়ে আসতে বলে।

ও যতদূর সম্ভব শান্তভাবে জবাব দিল—মনের উত্তেজনা চেপে—'তাই যাব মা। আমার কিছুতে দরকার নেই। কীই বা আছে সেখানে? সে যা হয় হবে।'

'তবে চ।...কাপড়ের অভাব হবে না। কাপড় জামা পেটিকোট কিছুরই না। পাড়ওলা সাদা কাপড়ও বেরোবে দু-চারখানা—এরা এত লোক যাচ্ছে—এদের প্যাঁড়া থেকে। আমি কিনেও দিতে পারব আজমীরে গিয়ে। চ তাহলে।...আর একটু কষ্ট করতে হবে মা, এখানে তো গাড়ি আসে না—ঐ মোড়টা পর্যন্ত হেঁটে যেতে হবে। না হয় এই বিনোদের মা আছে, ও তোকে ধরে নিয়ে চলুক—'

পুষ্করে পৌঁছেও কিছু জানায় নি যমুনা, দশ দিন পরে দ্বারকা যাত্রা করার মুখে চিঠি দিল। পাছে ডাকের ছাপ দেখে কোথা থেকে এসেছে টের পেয়ে খোঁজখবর করে—সেই ভয়েই এত সতর্কতা।

লিখল ঃ

"শ্রীচরণকমলেষু, আপনার অনেক ক্ষতি করিয়াছি, বোধ হয় এত বড় একটি মহাপ্রাণ লোকের জীবনটাই নষ্ট করিয়া দিলাম। এক্ষণে তাহার উপর আবারও লোকের উপহাস ও কদর্য ইঙ্গিত চাপাইতে চাহি না। আত্মীয়-স্বজন হইতে চিরকালের মতো দূরে চলিয়া গিয়া, মাকে ছাড়িয়া কেবল মাত্র আমাকে লইয়া চিরদিন সুখী ও তৃপ্ত থাকিতে পারিবেন না, সে সম্ভব নয়—এ আমি জানি। এরই জন্য আমিই দূরে সরিয়া গেলাম। আপনি বিবাহ করিয়া পুনরায় ঘরবাসী হইয়াছেন শুনিলে আমার এই অনুশোচনা ও আত্ম-গ্লানি দূর হইবে। প্রণাম লইবেন। ইতি—"

তারপর বহু তীর্থে ঘুরেছে যমুনা। বহু বছর ধরে।

তিনটে কুম্ভই ঘুরেছে মাতাজীর সঙ্গে—হরিদ্বারে, প্রয়াগে, উজ্জয়িনীতে। মাতাজীর দু-তিনটি আশ্রম আছে, উত্তর কাশীতে, পুরীতে, নৈমিষারণ্যে। সেখানেও অনেক দিন করে থেকেছে একটানা।

মাতাজীর ওকে খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি স্বীকার করেছেন, এমন আন্তরিক ভাব এমন আপন ভেবে আর কেউ তাঁর সেবা করে নি কোনদিন। যমুনাও মাতাজীকে ভালবেসে ফেলেছিল, ওর মনে হয়েছিল—পাতানো নয়, সত্যিকারের মাকেই পেয়েছে আবার।

মাতাজী ওকে বলেছিলেন, 'তোর একটা হিল্লে করে দিয়ে যাবো'—কিন্তু শেষ অবধি তা হ'ল না। ওরই অদৃষ্ট খারাপ, লেখাপড়া কিছু ক'রে দিয়ে যাবার আগেই হঠাৎ একদিন মারা গেলেন। রাত তিনটের সময় উঠে বললেন, 'সকলকে ডাক। হরিনাম করুক। আমার ডাক এসেছে। ব্রাহ্মমুহূর্তে রওনা হবো।' তখন কার নামে কি লেখাপড়া ক'রে দেবার কথা ছিল—তা কারও মনে থাকা সম্ভবও নয়। যমুনার নিজেরও ছিল না, সে তখন কেঁদে আকুল হচ্ছে।

মাতাজীর প্রধান শিষ্যরা মিলে ট্রাস্টি হয়েছিলেন—তাঁরা অবশ্য একেবারে ভাসিয়ে দিলেন না যমুনাকে। বললেন, 'আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের যে কোন আশ্রমে গিয়ে থাকতে পারেন। অথবা যদি আর কোথাও গিয়ে থাকতে চান, আমরা মাসে মাসে আট-দশ টাকা ক'রে পাঠাতে পারি।'

এই শেষের ব্যবস্থাটাই ভাল লাগল যমুনার। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ক'রে এবার ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। আর পারছে না এমনভাবে এই অহরহ যুক্তি-প্রতিযুক্তি প্রয়োগ করতে। মনের কোন সুদূর কোণে একটা আশাও বুঝি কিছুতে আর যাচ্ছে না যে, হয়ত স্বরূপ গোসাঁই আজও অবিবাহিত আছেন, তার জন্য অপেক্ষা করছেন। এতদিন খবর নিতে পারেন নি পাছে এই সম্পর্কটার কথা জানাজানি হয়ে যায়। এর মধ্যে মাতাজী দু-একবার বৃন্দাবনে এসেছিলেন কিন্তু সে সময়গুলো যমুনা ইচ্ছে ক'রেই সঙ্গে আসে নি, কোন-না-কোন অজুহাতে আশ্রমে থেকে গেছে।

সে বৃন্দাবনেই ফিরে যাবে জানাল ওঁদের। মাতাজীর আশ্রমে থাকবে না। অন্যত্র থাকবে।

তারা সেই ব্যবস্থাই ক'রে টিকিট কেটে ট্রেনে চড়িয়ে দিলেন। পাঁচ টাকা অন্য খুচরা খরচ এবং মাসিক বরাদ্দ হিসেবে আগাম আটটি টাকা দিয়ে দিলেন।

খোঁজ করে পুরনো বাড়িতেই আশ্রয় নিল আবার। কিন্তু পেল না আর রামরতিয়াকে, সে রজ পেয়েছে বছর দুই আগে।

দেখতে পেল না স্বরূপ গোসাঁইকেও।

শুনল তার চলে যাবার বছরখানেক পরে তিনিও কোথায় চলে গিয়েছেন। কোথায় গেছেন কেউ জানে না। যাবার আগে শুধু উকীলকে বলে গিছলেন —বলতে হয়েছিল, কারণ ভাইয়ের নামে কতকগুলো নাদাবীনামা প্রভৃতি দলিল করে দিয়ে যেতে হয়েছিল। তাঁকে বলেছিলেন কোন নির্জন জায়গায় যাচ্ছেন—সাধনভজনের চেষ্টা করতে। টাকা-পয়সা কিছু লাগবে না, ভিক্ষে করে জীবন ধারণ করবেন। এই তাঁর ইচ্ছা।

সেই যে গেছেন আর ফেরেন নি। কোন খবরও কেউ জানে না।

যমুনা মাসী সম্ভবত আজও সেই বৃন্দাবনেই অপেক্ষা করছেন—অবশ্য যদি বেঁচে থাকেন।

তাঁর ধারণা একদিন না একদিন গোসাঁই আবার ব্রজেই ফিরে আসবেন—তাঁর সন্ধানে।

আভিজাত্যের মূল্য

অভিলাষ দত্তরা ছিলেন তিনপুরুষে মার্চেন্ট অফিসারের কেরানী। তাঁর ছেলে অপূর্বর যে একদা কী ক'রে অভিজাত হবার বাসনা হ'ল তা বোধ হয় তিনিও জানতেন না। কিন্তু সে বাসনাটি তিনি অতি সঙ্গোপনে মনের মধ্যেই রেখে-ছিলেন—উপহসিত হবার ভয়েই কারুর কাছে প্রকাশ করেন নি।

কিন্তু যে বাসনা মানুষের ভাবনার সঙ্গে অর্থাৎ অষ্টপ্রহরের সব কাজ সব চিন্তার মধ্যেও অবচেতনে জড়িয়ে থাকে—সে বাসনা সিদ্ধ হয়ই। অপূর্বরও

হয়েছিল। ধমনীর রক্তটা নীল বর্ণে রূপান্তরিত হয়েছে কিনা তা জানা সম্ভব নয়—কিন্তু বাকী যেটা—চলন-বলন বেশভূষা জীবনযাত্রা—সবটাই একেবারে খাঁটি বনেদী বা অভিজাতের মতো ক'রে ফেলেছিলেন এটা ঠিক।

অবশ্য এই যুদ্ধ না এলে এবং তার পিছনে পিছনে স্বাধীনতা না পাওয়া গেলে এ সিদ্ধি কতদূর কী আসত সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। হয়ত সত্যিই, বাইরে না হোক এ উচ্চাশার জন্যে নিজের কাছেই অন্তত উপহাসাস্পদ হয়ে উঠতেন। কারণ তাঁকেও পিতৃ-পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে যথাবয়সে এক মার্চেন্ট অফিসেই ঢুকতে হয়েছিল চাকরি নিয়ে। উনিশশো সাঁইত্রিশে পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনেতে ঢুকতে পেয়েই সেদিন ভাগ্যকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়েছিলেন বি.এ. ফেল করা অপূর্ব দত্ত। তাঁর মাও সেজন্য জোড়া সত্যনারায়ণ এবং সোনার বেলপাতা সাজিয়ে কালিঘাটে পূজো দিয়েছিলেন—এই অভাবনীয় সৌভাগ্যের জন্য; এবং যথানিয়মেই বছর দুই চাকরি করার পর নিতান্ত একটি তখনকার দিনের থার্ড ক্লাস পর্যন্ত (বর্তমানের ক্লাস এইট) পড়া সাধারণ ঘরের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, মনের গোপন উচ্চাশার মূলে সবচেয়ে বড় আঘাত পড়ছে জেনেও। এর প্রথম কারণ বাবা; এই মা-বাপ-মরা মেয়েটির নামে তিন হাজার টাকার পলিসি ছিল জেনে তিনি আর কারুর কোন কথা শোনেন নি—সেই টাকায় মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, আর দ্বিতীয় গৌণ কারণ হলেন নিজেই—উচ্চাশার চেয়েও সেদিন স্বাভাবিক বয়সধর্ম হয়ত প্রবল হয়ে উঠেছিল, নিজেকে খুব কঠিন ক'রে রাখতে পারেন নি।

কিন্তু সে ত্রুটি পরবর্তীকালে সেরে নিতে পেরেছিলেন। স্ত্রী পারুলকে লেখাপড়া শেখাতে না পারলেও চালচলন আদব-কায়দায় যতটা মানুষ করা সম্ভব তা ক'রে নিয়েছিলেন, কয়েকটা ইংরেজী বুকনিও শিখিয়ে নিতে ভুল করেন নি।

তবু হয়ত এসব কোন কাজেই লাগত না—যদি না অপূর্বর ভাগ্যক্রমে ঠিক সময়ে যুদ্ধটা বেধে যেত। ব্রিটিশ ফার্ম, যুদ্ধ বাধতেই মাথার ওপরের বহু সাহেব যুদ্ধে চলে গেলেন—তার ফলে ওপর দিকে যে শূন্যতা সৃষ্টি হ'ল সেটা ভরাতে হল নিচের লোক দিয়ে। সাহেবদের মতো মাইনে আশা করা

বাতুলতা, অপূর্ব তা করেন নি—তবু উন্নতি যে হ'ল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে, লাফ দিয়ে দিয়ে, সব রকম সুদূর কল্পনা ও আশাকেও ছাড়িয়ে গিয়ে—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অবশ্য তখনও ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি—এটা ঠিক। যুদ্ধ শেষ হলে হয়ত অনেক সাহেব ফিরবেন, তখন ভাগ্যে কী ঘটবে তার ঠিক কি? সে সম্ভাবনার সূত্রও একটু ধরিয়ে রাখা হয়েছিল—বারবারই শুনিয়ে রাখা হয়েছিল যে এসব প্রোমোশনই অস্থায়ী। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হতে, সাহেবদের ফেরবার আয়োজন শুরু হবার আগেই এল স্বাধীনতা। যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে বরং বিদায় নিলেন। নেহাৎ যাদের কোন চাল-চুলো বা অন্যত্র ক'রে-খাবার কোন যোগ্যতা নেই—এমনি দু'চারজন সাহেবই টিকে রইলেন। আবার একটা পদোন্নতির প্রবল জোয়ার এল। অপূর্ববাবু অনেকদিনই দত্তসাহেবে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, এবার একজন ছোট সাহেবে পরিগণিত হলেন—সামান্য কিছু টাকার শেয়ার কিনে শেষ পর্যন্ত ডিরেক্টারও হয়ে বসলেন।

এত দিনের স্বপ্ন সফল হ'ল।

এদিকেও যেমন ধাপে ধাপে এগিয়েছেন, ওদিকেও তেমনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। শহরতলী থেকে উঠে এসেছেন বালিগঞ্জে, শেষ অবধি নিউ আলিপুরে বাড়ি ক'রে সম্পন্ন ও পদস্থ ব্যক্তির উপযুক্ত মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে বাংলো প্যাটার্ন উঁচু-ভিতের বাড়ি, গাড়ি, টেলিফোন—কিছুরই অভাব নেই তাঁর। পুরাতন আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন বহুকাল—নতুন অন্তরঙ্গতাও করেছেন বেছে বেছে, সাবধানে। অর্থাৎ কোথাও কোনমতে না কেরানী বংশের কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় কোন আচারে আচরণে সে নিম্নমধ্যবিত্ততা ফুটে ওঠে।

সবই হয়েছিল—সামান্য যেটুকু বাকী ছিল এবার একমাত্র কন্যার বিবাহে সেটুকুও সেরে নিতে চেয়েছিলেন।

একমাত্র সন্তান অনীতা—বাপের আদরের 'নীটা'।

'লা মার্টিনিয়ারে'-পড়া মেয়ে, নাচে গানে অভিনয়ে ছবি আঁকায় শিল্পকর্মে

সমান দক্ষতা।

তার চেয়েও বড় কথা—সত্যকারের সুন্দরী মেয়ে। এ রূপ বাঙালী সংসারে দুর্লভ।

এমন মেয়ে পাওয়া তাঁর উচ্চাভিলাশের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলেই মনে করতেন দত্তসাহেব।

এ মেয়ের সু-পাত্রের অভাব হয় না। কিন্তু যেমন-তেমন সুপাত্র হলে দত্তসাহেবের চলবে না। তিনি খুঁজে খুঁজে বারও করলেন ঠিক তেমনি একটি পাত্র। বাংলা দেশের এক বিখ্যাত এবং প্রাচীন জমিদার বংশের ছেলে, পিতামহ ইংল্যাণ্ডে মেম রক্ষিতা নিয়ে বাস করতেন, সেইখানেই মারা যান।

ছেলের বাবার বিবাহসম্বন্ধ এবং বিবাহ দুই-ই হয় বিলেতে—যাও তেমনি নীলরক্ত অভিজাত—এক ইংরেজ ব্যারণের ভগ্নী। ছেলের সে মা নেই, বাবা পুনরায় বিবাহ করেছেন—সেও আমেরিকান এক অভিনেত্রীকে, বছরে ছ'মাস এখানে থাকেন—ছ'মাস কুলু উপত্যকায়। ছেলে আশৈশব বিলেতে পড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে, এখানে ভারত সরকারে মোটা মাইনের চাকরিও পেয়েছে। সম্প্রতি মিশর না সুদান সরকার কারা যেন তাকে এক বছরের জন্যে ধার নিয়ে গেছে, আর দু'মাস পরেই ফিরবে সে। ফিরে এলে বিয়ে হবে—কথা পাকা হয়ে রইল। ছেলে বিদেশ-যাত্রার ঠিক আগে কোন পার্টিতে নীটাকে দেখে এবং তার গান শুনে পছন্দ ক'রে গিছল—সেই আভাস পেয়েই ছেলের বাবাকে চেপে ধরেছিলেন দত্তসাহেব, তিনিও পাত্রী দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। স্পষ্টই বলেছেন যে, ছেলে বিলেত থেকে ভাল একটি মেয়ে বিয়ে ক'রে আনতে পারে নি বলে আমি তাকে তিরস্কার করেছিলুম, কিন্তু এখন দেখছি যে ভালই করেছে ছোকরা—ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে। না হ'লে কি এমন মা-লক্ষ্মী পেতুম। কী বলেন মিঃ দত্ত?'

বলে হাহা ক'রে হেসে উঠেছিলেন। তাঁর মার্কিন স্ত্রীও ভারী খুশী হয়েছিলেন, নীটাকে দেখে ও তার সঙ্গে কথা বলে।

ফলে দত্ত সাহেবের খুশির সীমা নেই। তিনি যে সত্য-সত্যই আহ্লাদিত হয়েছেন তা তাঁর কথাবার্তায় চালচলনে প্রকাশ পাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। তাঁর চোখমুখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সে খুশির ঝলক।

অবশ্য এতে দত্ত সাহেবের আর্থিক সুবিধা কিছু হচ্ছে না। তা তিনি চানও নি। ওঁরা প্রচণ্ড ধনী—টাকার কথা বা কোন পাওনাথোওনার কথাই তোলেন নি কেউ—মেয়ে দেখে শুনে পছন্দ হয়েছে, তাঁদের ছেলের যোগ্য বলে মনে করেছেন এই যথেষ্ট—তার বেশি তাঁরা মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নন—এসবই ঠিক। কিন্তু দত্তসাহেবকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। এত বড় মর্যাদার উপযুক্ত প্রতিমর্যাদা যাতে তিনি দিতে পারেন—মানীর মান যাতে থাকে—এ বিষয়ে তিনি সদাসতর্ক ও সজাগ। এ কথা না কেউ বলতে পারে যে তিনি এ সৌভাগ্যের অনুপযুক্ত। তিনি হঠাৎ-বড়লোক।

তাই তিনি যথাসাধ্য হিসেব ক'রে ক'রে, নিজের স্মৃতিসমুদ্র-মন্থিত অভিজ্ঞতার দ্বারস্থ হয়ে এবং অপর ধনী বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ফর্দ যা তৈরী করেছেন, তাতে খরচের অঙ্ক এক লাখ পৌঁছবে বলেই মনে হয়—অন্তত তার কম নয়। তবে তার জন্যে তাঁর দুঃখ নেই। একমাত্র মেয়ে—যা কিছু আছে, আজ হোক কাল হোক—ওরই তো সব। না হয় ওর সুখের জন্যে আগেই খরচ করলেন। বরং আরও কিছু বেশি খরচ করতেও প্রস্তুত আছেন তিনি। এমন রাজা জামাই হচ্ছে তাঁর, তার উপযুক্ত আয়োজন তো চাই।

চারিদিকে সমারোহের সাড়া পড়ে গেছে, স্বামী-স্ত্রী বাজার ক'রে, ফর্দ তৈরী ক'রে, ক্যাটলগ আর প্যাটার্ন দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, অগ্রিম অন্তত সাত হাজার টাকা বায়না দেওয়া হয়ে গেছে—এমন সময় আকস্মাৎ বলতে গেলে পরিষ্কার নীলাকাশ থেকে বজ্রপাত হ'ল।

সেদিন তাঁরা, সম্পূর্ণ হীরের যে সেট হবে, তারই নমুনা পছন্দ ক'রে দু' হাজার টাকা বায়না দিয়ে, গিছলেন এক বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করতে—জামাই আগামী বুধবারেই এসে পৌঁছবে—তার জন্যে বিমানঘাঁটিতে কী রকম অভ্যর্থনার আয়োজন করা যায় তারই পরামর্শ করতে। ঐখানেই পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ ক'রে একটা পার্টি দেবেন, না পরে গ্রেট ইস্টার্নে একটা ভোজের আয়োজন করবেন—বহু আলোচনাতে স্থির করতে না পেরে প্রায় অবসন্ন হয়ে তাঁরা যখন বাড়ি ফিরলেন তখন রাত এগারোটা বেজে গেছে। এত

রাতে তাঁরা মেয়েকে জেগে থাকতে দেখবেন আশা করেন নি। সে প্রত্যহ রাত সাড়ে আটটা নটার মধ্যে খেয়ে নিয়ে—দশটায় শুয়ে পড়ে। কখনও এর ব্যতিক্রম ঘটে না। সেই মেয়েকে আজ এখনও পর্যন্ত জেগে ড্রইংরুমে বসে থাকতে দেখে তাঁদের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

দত্তসাহেব বললেন, 'হ্যাল্লো মামণি—এ যে প্লেজান্টেস্ট্ সারপ্রাইজ! আজ এখনও পর্যন্ত জেগে বসে আছ যে।'

কথাটা হাল্‌কাভাবেই বললেন বটে দত্তসাহেব কিন্তু মনে মনে বেশ একটু অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন। কারণ এর মধ্যেই লক্ষ্য করেছেন যে মেয়ের মুখ বড় বেশি গম্ভীর—তাঁদের দেখেও কিছুমাত্র আনন্দের আলো ফুটে উঠল না সে মুখে।

নীটা বিনা ভূমিকাতেই একেবারে কাজের কথা পাড়ল।

'তোমরা এ বিয়ে ভেঙে দাও বাপি, এ বিয়ে হতে পারবে না!'

কী সর্বনাশ!

এ মেয়ে বলে কি?

কিছুক্ষণ দুজনেরই মুখে কোন বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না। অবশেষে অনেক চেষ্টায় কণ্ঠস্বর খুঁজে পেল পারুলই। বলল, 'এ আবার তোমার কেমন ধারা ঠাট্টা খুকু। আর এসব জোকের কি এই সময়? দেখছ আমরা দুজনেই ডেড-টায়ারড্ হয়ে বাড়ি ফিরেছি!'

'ঠাট্টা হলে অবশ্যই এ সময় বাছতাম না মা—সেটুকু বুদ্ধি আমার আছে।'

'তার মানে?' বিহ্বল হতবুদ্ধি দত্তসাহেব প্রশ্ন করেন, 'জানো এখন পর্যন্ত কত হাজার টাকা আমার খরচ হয়ে গেছে, আরও বহু টাকার ফেরে জড়িয়ে পড়ব!'

'সেইজন্যেই তো রাত জেগে বসে আছি বাবা। আর যাতে খরচ না হয়—এবং যা খরচ হয়েছে তার মধ্যে এখনও যদি খানিকটা বাঁচানো যায়।'

'কিন্তু কেন? কেন? এ উদ্ভট কথা তোমার মাথাতে আসছেই বা কেন?'

'ও ছেলে মদ খায়। নিত্য মদ না হলে চলে না। তাছাড়া বিলেতে থাকার সময় নারী-ঘটিত বহু কেলেঙ্কারি করেছে। একবার ওকে বার্মিংহামের ওর

হোস্টেল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল—ওর বাবা সে সময় বিলেতে ছিলেন বলে বিস্তর ধরপাকড় ক'রে বাঁচিয়েছিলেন। যার চরিত্র ভাল নয় এবং যে মাতাল —তাকে আমি বিয়ে করতে পারব না।'

'কিন্তু কে—কে বলেছে এসব কথা! এসব মিছে কথা! রটনা! কেউ ভাংচি দেবে বলেই রটিয়েছে বা রটাচ্ছে। তোমার এ সৌভাগ্যে যে অনেকেরই ঈর্ষা হবে এটা তো বোঝ?'

দত্তসাহেব গলায় জোর দিয়ে বলেন।

'আমার বন্ধু মিলি চন্দ্রকে তোমরা জান—সে অত্যন্ত পিউরিটান, তাও বহুবার বলেছি। সম্প্রতি তার দিল্লীতে বিয়ে হয়েছে—এখন সে মিলি শ্রীপ্রকাশ। মিলি পাত্রের মামাতো বোন হয়—সেটা দৈবাৎ আবিষ্কার ক'রে চিঠি দিয়েছিলুম। সে খুব সঙ্কোচের সঙ্গেই সত্যি কথাগুলো লিখেছে এবং বারবার অনুরোধ করেছে যে আমি যেন শুধু তার কথাতেই কোন কিছু না করি। তা আমি করিও নি। তার চিঠি পেয়েছি কাল। আজ সকাল ও দুপুরের মধ্যে ওদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পরিচিত এবং সংশ্লিষ্ট বহু লোককে কন্ট্যাক্ট করেছি। সকলে একরকম কথা বলে নি তা বলাই বাহুল্য, তবু, তাদের সতর্কতা ও সাবধানতা সত্ত্বেও, মিলির মূল দুটো অভিযোগ তারা সকলেই সমর্থন করেছে। আমি শুধু শুধু একটা চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলছি না বাবা!'

দুজনেই চুপ ক'রে বসে রইলেন অনেকক্ষণ।

ভাগ্যে ঝিটা একটু কালা এবং চাকরটা রান্নাঘরে পড়ে ঘুমোচ্ছে এসময় —পারুলের আগেই সে কথাটা মনে হ'ল—নইলে কথাটা ছড়িয়ে পড়তে একটুও দেরি হ'ত না। ঝি চাকর বাড়িতে থাকলে কোন 'সিক্রেসী' থাকে না।

খানিক পরে দত্তসাহেব বললেন, 'ছাখো, ছেলেবেলা থেকে বিলেতে মানুষ হয়েছে, সে যদি লাঞ্চ্ বা ডিনারের সঙ্গে একটু ক'রে মদ খায়—তাকে মাতাল বলা চলে না কোনমতেই। আর—আমিও যে একেবারে খোঁজ-খবর করি নি তা মনে ক'রো না—মেয়েছেলের ব্যাপারে তার কোন দোষ কেউ উল্লেখ করে নি। ওটা আমি বিশ্বাস করি না।'

কাপড়ের মধ্যে থেকে একখানা ফোটো বার ক'রে ওঁদের সামনে টেবিলের

ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয় নীটা।

মাত্র মাস-তিনেক আগের তারিখ এবং ছবি সাক্ষাৎ পাত্রেরই।

কোন ক্যাবারেতে বা কফি-হাউসে দো-আঁশলা, একটি প্রায়-উলঙ্গ নর্তকীর কোমর জড়িয়ে ছবি তোলা।

ছবির পিছনে কোন বন্ধুকে তামাসা ক'রে লেখা যে—'তুমি এলে না, এলে একেবারেই যে জীবনটা নিরিমিষ কাটত তা নয়। এখানেও মানুষ থাকে, ভদ্রমানুষও থাকে। আর তাদের জীবন-ধারণের মতো উপকরণ দুর্লভ নয়। তার প্রমাণ এই পাঠালুম।'

আবারও কিছুক্ষণ একটা কষ্টকর অসহ নীরবতা।

তার পর দত্তসাহেব বলে উঠলেন, 'এ বন্ধুকে লেখা ছেলেমানুষি। তার জেলাসি উদ্রিক্ত করবার জন্যেই ডেলিবারেট্‌লি পাঠানো—এটা বুঝছ না? চিঠির ভাষাতেই তো তাই বোঝা যাচ্ছে। নইলে এরকম কম্‌প্রোমাইজিং ছবি কেউ কখনও পাঠায়? সে যায় নি ওখানে, যেতে চায় নি হয়ত—সে ঐ ধরনেরই লোক, নীচ আমোদই পছন্দ করে—তাই তাকে তাতাবার জন্যে একটু দুষ্টুমি। নথিং এল্‌স্‌।'

'না বাবা। তাই মনে ক'রে নিশ্চিন্ত হতে পারলে আমিও খুশী হতাম। অকারণে তোমাদের বিব্রত করা আমার পক্ষে খুব আনন্দের কথা নয়। কিন্তু এ হ'ল জীবন-মরণের প্রশ্ন—চিরজীবনের কথা। আমি বহু খোঁজ নিয়ে—নিজের মনে অন্তত নিঃসন্দেহ হয়ে একথা বলছি। উপহাস করবার বা মজা দেখবার জন্যেও যে এই সব জায়গায় যেতে পারে—এই শ্রেণীর স্ত্রীলোককে আলিঙ্গন করতে পারে—তাকে আমি স্বামী বলে ভাবতে পারি না বাবা।'

এইবার পারুল কথা কইল। বরং ফেটে পড়ল বলা যেতে পারে।

'তুমি বড্ড পাকাপাকা কথা কইছ নীটা। তুমি কি ভাব—সাহেবী স্কুলে কলেজে পড়ে আমাদের থেকে অনেক উঁচু কোন অসাধারণ জীব হয়ে গেছো? বা জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতা তোমার চেয়ে আমাদের অনেক কম? আমরা ভেবে-চিন্তে বুঝে-সুঝে যা ঠিক করেছি, তা তোমার ভালর জন্যেই করেছি। তুমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে আসো কেন? নিজের বিয়ে নিয়ে ত্রিভুবন এক ক'রে বেড়াচ্ছ—এটা বুঝি খুব গৌরবের কথা—না? ছি-ছি। আমরা লজ্জাবোধ

করছি তোমার আচরণে।’

পারুল থামবার সঙ্গে সঙ্গেই দত্তসাহেব শুরু করলেন, ‘তাছাড়া বিয়ের আগে—বয়স্ক ছেলেরা একটু এদিক-ওদিক করেই—এগুলো হল আমোদ-আহ্লাদেরই অঙ্গ। এসব এত সিরিয়াসলি নিতে নেই ; জানো ওর বাবা ওকে বলে দিয়েছিলেন বিলেত থেকে বিয়ে ক’রে আসতে—কিন্তু ও তা আসে নি।’

‘হ্যাঁ—তা জানি। আসে নি—পারে নি বলেই। হি ওআজ ফাউণ্ড আউট। কোন ভদ্র মেয়ে ওকে নেয় নি। তাছাড়া প্রচুর টাকা ছিল ওখানের ব্যাঙ্কে—সব উড়িয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল বলেই ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের চাকরি নিতে হয়েছিল ওকে তাড়াতাড়ি।’

‘য়্যাবসার্ড। কে এসব সিলি কথা যে তোমার মাথায় ঢুকিয়েছে! এ অসম্ভব, এ হ’তেই পারে না। ইংল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ড মিলিয়ে ওখানে চার-পাঁচ-খানা বাড়িই আছে ওদের।’

‘আর সোজা কথা,’ পারুল দৃঢ়কণ্ঠে বলে, ‘এ বিয়েতে আমরা অনেকদূর এগিয়েছি, এখন আর ফেরা যায় না। তাহ’লে আমাদের সোশ্যাল পোজিশ্যন কোথায় নেমে যাবে বুঝতে পারছ? তুমি সুশ্রী য়্যাকম্প্লিশড্ মেয়ে—তুমি যদি তোমার স্বামীকে জয় করতে বা বশ করতে না পার—সে তোমার দোষ। যে ঘরে পড়ছ, যে স্ট্যাটাসে উঠছ তার জন্য এটুকু রিস্ক্ নিতে ভয় পাওয়া তোমার উচিত নয়।’

নীটা তার শান্ত ডাগর চোখ দুটি বাপের মুখের ওপর রাখে, ‘তোমারও কি এই কথা বাবা?’

‘বাপি, কথাটা তুমি বুঝে দ্যাখো,’ কণ্ঠে স্নেহের মধু ঢেলে দিয়ে বলেন অপূর্ব, ‘এ বলতে গেলে রাজবংশে তোমার বিয়ে হচ্ছে। কিছু দিন আগে—আর আগেই বা বলছি কেন—এখনও বহু রাজা আছে—উড়িষ্যা বা বিহারে বা মধ্যপ্রদেশে, যাদের রাজত্ব কয়েক হাজার একরের বেশি নয়—অথচ স্ত্রী এ যুগেও শতাধিক। এছাড়া উপপত্নী আছে অজস্র। তবু কি এসব ঘরে মেয়ে দিতে কেউ ইতস্তত করে? বরং সেধে যেচে তুলে দিয়ে আসে মেয়ে—ঐ ঘরে মেয়ে দিতে পেলে ধন্য মনে করে নিজেকে। সে তুলনায় আর এ কতটুকু বলো?’

'বুঝেছি বাবা। সরি—তোমাদের এই সময় অনর্থক খানিকটা বকালাম। গুড্ নাইট।'

সে উঠে নিজের ঘরে গিয়ে সশব্দে দোর দিয়ে শুয়ে পড়ল।

এর পর ছুটো তিনটে দিন দত্তসাহেবের কাটল কণ্টক-শয্যায়।

সেদিন নিজের ঘরে গিয়ে নীটা শুয়ে পড়তে পারুল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিশ্চিন্ত হয়েছিল—কিন্তু দত্তসাহেব হতে পারেন নি। মেয়েকে তিনি মেয়ের মায়ের চেয়ে একটু বেশিই চিনতেন—তাই এই আকস্মিক স্তব্ধতার জন্যে তাঁর অস্বস্তির সীমা ছিল না।

যাই হোক—তিন-চারটে দিন যখন ভালয় ভালয় কেটে গেল তখন দত্তসাহেবও হাঁফ ছাড়লেন একটু।

তাঁরা একটু শক্ত হয়েছেন বলেই মেয়ে নরম হয়েছে। এ বিষয়ে পারুলের বুদ্ধিই ভাল। হাজার হোক মেয়েছেলে, মেয়েছেলেকে ভালই চেনে।

ইতিমধ্যে হ'বু জামাতা দেশে ফিরে এসেছেন। দত্তসাহেবেরও ছুটো-ছুটির অন্ত নেই। একা মানুষ, তাঁকেই সব করতে হবে তো। অবশ্য তাঁর অফিসের প্রায় তিন-চারশো কর্মী, অসংখ্য কন্‌ট্রাক্টর, এঁরা হামেশাই তাঁর হুকুম তামিলের জন্যে প্রস্তুত রয়েছেন তবু মাথা তো তিনিই।

জামাই বাবাজীকে অভ্যর্থনা করতে তাঁরা লোকজন ফুলের মালা নিয়ে দমদম গিয়েছিলেন কিন্তু মেয়েকে সঙ্গে যেতে বলতে পারেন নি। কেমন যেন সাহসে কুলোয় নি। ঠিক সেই কারণেই গ্রেট ইস্টার্নের পার্টির কথাও আর তোলেন নি। কে জানে, এই মুখেই যদি মেয়ে বিগড়ে বসে? তার চেয়ে আরও কটা দিন যাক, উদ্যোগ-আয়োজনটা আর একটু দেখে নিক, আরও বেশী টাকা খানিকটা খরচ হয়ে যাক—তারপর আর কিছু বলতে পারবে না। তখন একটা নৈতিক জোর বাড়বে তাঁর।

বিয়ের দিন অবশ্যই ঠিক হয়ে গেছে—সে তারিখটা পরোক্ষভাবে নীটাকে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে—এমন কি তার যে হরেক-রকমের শাড়ি ও জামা কেনা হচ্ছে—সেগুলোও তার ঘরেই জড়ো হচ্ছে। অর্থাৎ এর পর আর 'জানি না' বলতে পারবে না। পাখা ক্রমশই জালে জড়িয়ে পড়ছে বেশী করে

—পাখীর ওড়বার ক্ষমতা আর থাকছে না।

এইভাবে আরও সপ্তাহ তিনেক কাটবার পর—বিবাহের যখন মাত্র আর নটি দিন বাকী আছে, একদিন সকালে নীটা কোথায় বেরুল। দত্তসাহেব সর্বদাই ব্যস্ত এখন—পারুলেরও মাথার ঠিক নেই—সুতরাং সে কোথায় যাচ্ছে কখন যাচ্ছে আর কখন ফিরছে, তাঁরা খোঁজও রাখতেন না। কিন্তু দুপুর বেলা খাওয়ার সময়ও ফিরতে না দেখে পারুল একটু চিন্তিত হয়ে উঠল। জানাশুনো দুএকজন ওর বন্ধুর বাড়িতে ফোন করেও দেখল—কিন্তু কেউই খবর দিতে পারল না। অবশেষে উদ্বিগ্ন হয়ে দত্তসাহেবকে অফিসে টেলিফোন করবে এমন সময় বেলা দুটো নাগাদ ওদিকে ফোন বেজে উঠল। হ্যাঁ, নীটারই গলা। সে বলছে, 'একটু আটকে গেলুম মা-মণি, তুমি খেয়ে নাও। আমি এখানেই খেলাম কিনা। বিকেলে ফিরে সব বলব।'

এই বলে, পারুলের তরফ থেকে কোন প্রশ্নের অবসর না দিয়েই ফোন রেখে দিল।

পারুলের বিরক্তির সীমা রইল না। এ আবার কি আহ্লাদেপনা! এতক্ষণ ধরে তাকে ভাবিয়ে, উপবাসী রেখে এইটুকু সংক্ষিপ্ত খবর। কেন, আর দুটো শব্দ বেশি উচ্চারণ করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত!

বিকেলে বাড়ি ফিরলে রীতিমতো তিরস্কার করবে সে—মনে মনে ভেবে রাখল।

অবশ্য খুশীও একটু হ'ল সে ওর মধ্যেই—অনেকদিন পরে নীটা তাকে মা-মণি বলে ডেকেছে।

নীটা ফিরল ঠিক সন্ধ্যাটার মুখে।

পারুল তখন একটু অধীর ভাবেই ওর অপেক্ষা করছিল—ড্রইংরুমে দোরের কাছে, বাইরের দিকে মুখ ক'রে বসে ছিল সে। দত্তসাহেব একটু আগে ফিরেছেন, তিনিও সব শুনে পারুলকেই যথেষ্ট তিরস্কার করেছেন—মেয়ের ওপর যথাযথ চোখ না রাখবার জন্যে। নিতান্ত বাধ্য হয়ে তখনই তাঁকে ডেকোরেটরের কাছে যেতে হয়েছে তাই, নইলে তিনি বোধ হয় এতক্ষণ চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করতেন। সে-ই হয়েছে পারুলের আরও উৎকণ্ঠার কারণ, দত্তসাহেব ফেরবার আগে নীটা ফিরলে হয়। এবার যদি তিনি

বাড়ি ফিরে মেয়েকে দেখতে না পান তো রক্ষা থাকবে না।

এই সময় মেয়ের আগমন একান্ত আকাঙ্ক্ষিত সন্দেহ নেই কিন্তু মেয়ে ঘরে ঢুকতে তার বেশভূষা ও আকৃতি দেখে পাথর হয়ে গেল পারুল।

এ কে ঘরে ঢুকল! এ তো নীটা নয়! এ যে তার ছদ্মবেশধারী কেউ!

নিজের চোখেই বিশ্বাস করতে পারল না পারুল। নিজের বিচারবুদ্ধিকে তো নয়ই।

নীটার মাথায় কাপড়, সিঁথিতে সিঁদুর। মণিবন্ধে ঝক্‌ঝক্ করছে দুগাছি সাদা শাঁখা।

বিহ্বল অভিভূতের মতো চেয়েই আছে পারুল, সেই অবসরে কাছে এসে প্রণামটা সেরে নিল নীটা। তারপর বেশ সহজ কণ্ঠেই বললে, 'আজ আমার বিয়ে হয়ে গেল মা। এবার স্বামীর ঘর করতে যাচ্ছি—আশীর্বাদ করো যেন সুখী হই। ধনী ও অভিজাত হবার ভূতে না পেয়ে বসে আমায়।'

'তার মানে? তার মানে কি!' অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে অতিকষ্টে এই কটি কথা উচ্চারণ করে পারুল! কিন্তু দাঁড়িয়েও থাকতে পারে না বেশীক্ষণ। পা দুটোয় যেন জোর নেই কিছু।

'মানে অতি সোজা মা—আমি যাকে ভক্তি করতে পারব, শ্রদ্ধা করতে পারব—এমনি একটি মানুষের সঙ্গেই আজ আমি জীবন মিলিয়েছি। যদি সুখী না হই—যদি তার সঙ্গে বনিয়ে চলতে না পারি তো সে দায়িত্ব আর কারও ঘাড়ে চাপাব না—বুঝব নিজেই ভুল করেছি। কিন্তু সে নিজেরই ভুল—অপরের ভুলের খেসারত নয়। এই সান্ত্বনা।'

'কী বলছ খুকু! তুমি পাগল হয়ে গেছ না আমি হয়েছি! কিছুই তো বুঝতে পারছি না! এ কি ছেলেখেলা পেয়েছ নাকি তুমি—য়্যাঁ? বিয়েটা কি ছেলেখেলা?'

'ছেলেখেলা নয় বলেই তো আমার জীবনটা নিয়ে তোমাদের খেলতে দিতে পারলুম না মা। আমি এটাকে অত্যন্ত সিরীয়াস জিনিস বলেই মনে করি।'

'কিন্তু এমন রাজা জামাই ফেলে কোন্ মহামানবকে বেছে নিলে তুমি

তাই শুনি। কে সে এমন ভাগ্যবান?'

ঠিক কি করবে—তিরস্কার করবে না কান্নাকাটি করবে না ব্যঙ্গ করবে—. ভেবে পায় না পারুল। সব অনুভূতির চেয়ে কৌতূহলটাই বড় হয় শেষ পর্যন্ত।

'তাঁকে তুমিও চেনো মা। মহামানব কেউ নন, ধনী তো ননই। সামান্য একজন ইস্কুল মাস্টার। এই বিয়ে করার জন্যে তাঁকে এখন হয়ত উদয়াস্ত টিউশনী নিতে হবে—হয়ত আমাকেও চাকরি খুঁজতে হবে তাঁকে একটু বিশ্রাম দেওয়ার জন্যে।'

'ইস্কুল মাস্টার! শেষে তুই একটা ইস্কুল মাস্টারকে বিয়ে করলি।...কে সে, এমন রাজা জামাইয়ের চেয়ে বড় হ'ল!'

'আমাদের হিন্দুঘরের ঐ কুসংস্কারটা বড় ভাল লাগে মা। স্বামীর নাম করাটা আমার তত পছন্দ নয়—তবু একবার করছি! প্রণববাবুকে তুমি ভাল ক'রেই চেনো মা—প্রণব ঘোষ। ছেলেবেলায় আমাকে পড়িয়েছিলেন!'

'প্রণব! শেষে ঐ প্রণবটাকে—? ওর যে চল্লিশের ওপর বয়স হয়েছে খুকু!'

'হ্যাঁ মা। ঠিকই ধরেছ। একচল্লিশ। উনি তো মিথ্যে বলেন না। আমি প্রস্তাব করতে উনি প্রথম সেই আপত্তিই তুলেছিলেন। আমি শুনি নি। বৃদ্ধ মহাদেবকে বিয়ে করেছিলেন বালিকা উমা—এ আমাদের শাস্ত্রেরই কাহিনী।'

'তুমি প্রস্তাব করেছিলে? আর ও আপত্তি করছিল? হাসালি খুকু, হাসালি তুই! একটা ভ্যাগাবণ্ড, লোফার—পথের ভিখিরী—সে আপত্তি করবে! আসলে মহা শয়তান সে, কৌশল ক'রে জালে জড়িয়ে তোকে দিয়ে এই প্রস্তাব করিয়েছে, জানে এক মেয়ে এত বিষয়—সবই তো পাবে! কিন্তু সে গুড়ে বালি বলে দিও—কোনদিন একটি পয়সা আর পাবে না তোমরা!'

'তুমি একটু ভুল করছ মা, অনেক খুঁজে টালিগঞ্জের এক উদ্বাস্তু পল্লী থেকে ওঁকে বার করেছি। সাত বছর পরে ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা সেদিন।...আসলে আগের দিন সারারাত ধরে ভেবেও উনি ছাড়া এমন কাউকে মনে করতে পারি নি—যাকে আমি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা করতে পারি।...

অনেক পুরুষ দেখেছি—মনে ক'রো না এতখানি বয়স পর্যন্ত আমাকে সবাই এড়িয়ে চলেছে—কিন্তু যাদের দেখেছি, বিশেষ ক'রে তোমাদের গড়া এই এক অদ্ভুত অভিজাত সমাজে—তাদের কেউই আমার স্বামী হবার উপযুক্ত বলে মনে করি না। ঐ মানুষটির কথাই মনে ছিল—সহজ, স্বাভাবিক মানুষ অথচ কর্তব্যনিষ্ঠ, সত্যবাদী। দরিদ্র কিন্তু তার জন্যে লজ্জিত নয়—অথবা সে লজ্জা ঢাকবার জন্যে একটা স্পর্ধিত উগ্র অহঙ্কারও নেই।...মনে পড়াতেই ছুটে গেছি, খুঁজে বার করেছি—এতদিন যে তিনি বিয়ে করেন নি—এ আশা ছিল না খুব মনে। তবু তাঁকে রাজী করাতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর বিভীষিকা ভাঙাতেই তো একবেলা গেছে।...তিনি রাজী হয়েছেন এক শর্তে—এখান থেকে কিছু নিয়ে যেতে পারবং না। পরনের শাড়ি আর হাতের দুগাছা বালা বাদে।'

'কিন্তু তুই কি পাগল হয়ে গেলি খুকু? এ কী করলি! তুই গিয়ে সেই গরীবের সংসারে ভাত রাঁধতে, বাসন মাজতে পারবি? এ পাগলামি তুই কেন করলি মা। কেন আমাকে বললি না—আমিই না হয় অন্য পাত্র দেখতুম।'

'তা তুমি পারতে না। তোমাকে আমি চিনি। বাবার আভিজাত্যের মোহ তোমাকে আরও বেশি ক'রে পেয়ে বসেছে। এই পাত্রের লোভ তুমি ছাড়তে পারতে না। আর বাসনমাজা রান্না করা? দেখি না চেষ্টা ক'রে। নতুন রকম তো!'

'কিন্তু এটা—আমাদের প্রেস্টিজটাই কি ছেলেখেলা পেয়েছ! কাল সকালে এ খবর ছড়াবে—তখন আমাদের পোজিশ্যন কী হবে ভেবে দেখেছ! এ বিয়ে আমি মানব না। আমি জোর ক'রে আটকাব। সে লোফারটাকে জেলে দেব আমি।'

দুই সজল চোখে পারুলের যেন আগুন জ্বলতে থাকে। রাগে হাঁপাতে থাকে সে।

'পারবে না মা। একুশ পূর্ণ হয়ে আমি বাইশে পড়েছি—আমাকে আর তুমি আটকাতে পারবে না।...হ্যাঁ, আর একটা যেন কী বলছিলে? প্রেস্টিজ, সোস্যাল পোজিশ্যন? সত্যি কথা বলতে কি ঐ দুটো শব্দই আমাকে ভূতের মতো তাড়া করেছিল মা—তাই এমন পাগলামি করতে হয়েছে। অনেক সহ্য

করেছি তোমাদের ঐ মিথ্যা আভিজাত্যবোধের জন্যে—ছেলেবেলা থেকেই সয়েছি। কিছু ভুলি নি—একটি কথাও না। আমাকে তোমরা ঐ একটা মিথ্যা মোহের কাছে আবাল্য বলি দিয়েছ—বাকী জীবনটাও দিতে চাইছিলে, সেইটে আর হ'তে দিতে রাজী নই। জীবন যদি নষ্ট করতেই হয়, নিজেই করব। তোমাদের জন্যে নষ্ট হ'তে দেব না।'

'আমরা তোকে কষ্ট দিয়েছি? তোকে বলি দিয়েছি? এতদিনের এত অর্থ-ব্যয়, এত যত্নের এই পুরস্কার?'

অতিকষ্টে থতিয়ে থতিয়ে উচ্চারণ করে পারুল। দারুণ আঘাতে তার যেন প্রত্যাঘাতের প্রতিবাদের শক্তিও চলে গেছে।

'মনে ক'রে দ্যাখো তো মা—ছেলেবেলায় তোমাকে কতটুকু পেয়েছি। বিকেল বেলা আমি ইস্কুল থেকে আসতুম—তোমারও বেরোবার সময় হ'ত। তুমি যেতে সোস্যাল কল দিতে, তুমি যেতে ইংরেজী বলা শিখতে মেমের কাছে, যেতে সিনেমায়—যেতে বাবার সঙ্গে বাবার ওপরওলা অফিসারদের বাড়ি। আমি থাকতুম ঝিয়ের কাছে, সেটা সন্ধ্যে হলেই নাক ডাকিয়ে ঘুমোত। যেদিন মাস্টার আসত তো আসত—নইলে একা ভূতের মতো চুপ ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম। যেদিন অসহ্য বোধ হ'ত—পাড়ায় যে মুড়িউলী আসত সন্ধ্যাবেলা মুড়ি দিতে, তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তুম, ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম। একদিন আমার মাস্টার শান্তিবাবু দেখতে পেয়ে বাবাকে বলে দিয়েছিলেন—সে জন্যে তুমি তাঁকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলে—তাঁর এই নাক গলানোকে অনধিকার চর্চা বলে, ধৃষ্টতা বলে, স্পর্ধা বলে।...তারপর অবস্থা ভাল হ'ল—ভাল ইস্কুলে গেলুম, ভালো মাস্টার রাখা হ'ল—সবই হ'ল কিন্তু তুমি কোথায়? তোমরা কোথায়? সেই ঝি-চাকর আর মাইনে-করা মাস্টার-মাস্টারনী। গানের মাস্টার, নাচের মাস্টার, ছবি আঁকার মাস্টার। ইস্কুলের পড়া, তার ওপর এইসব চাপ—এক একদিন প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত, ভাবতুম সামনের ঐ বস্তির মেয়েগুলো আমার চেয়ে সুখী। কিন্তু তোমরা কোনদিন আমার দিকে তাকাও নি, আমার প্রাণটা দেখো নি। শুধু তোমরা বড় হবে, আরও বড় হবে—এই ছিল তোমাদের লক্ষ্য। ঝিয়ের কাছে থেকে, ঝিয়ের সঙ্গে ইস্কুলে গিয়ে বাড়ি ফিরে—হেন কুকথা নেই যা

শিখি নি। আমার অতি অল্প বয়সেই বিগড়ে যাওয়া উচিত ছিল—যাই নি সেটা তোমার কি তোমাদের গুণ নয় মা—আমার গুণ। কিন্তু তখন থেকেই মনে মনে ভাবতুম যদি কখনও দিন পাই—এই অবহেলার শোধ নেব।···তবু হয়ত তা নেওয়া হত না—যদি সামনে এই সর্বনাশ না দেখতে পেতাম। তোমরা সব জানতে, সব শুনেছিলে—তবুও আমাকে বিয়ে দিতে চাইছিলে শুধু জামাইয়ের আর জামাইয়ের বংশের পরিচয় দিয়ে নিজেরা গর্ববোধ করবে বলে। তাতে তোমাদের কী লাভ হ'ত মা বলতে পার? কী পেতে হাতের মধ্যে? মেয়ের চোখের জলের চেয়েও যার দাম বেশি?'

পারুল স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। তার কথা বলার শক্তিও লোপ পেয়েছে যেন। অবাক হয়ে চেয়ে রইল মেয়ের মুখের দিকে। এ যেন ওর সে মেয়ে নয়—যাকে সে চিনত। এ যেন আর কেউ।

কে জানে মার সেই করুণ অসহায় বিহ্বল মুখের দিকে চেয়ে নীটারও চোখে জল আসছিল কি না! হয়ত বা সেটা গোপন করতেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কেমন এক রকমের শুষ্কস্বরে বলল, 'তবে এখন আসি মা, বাপিকে বলো।'

দোরের কাছ পর্যন্ত গেছে, চলেই যাচ্ছে, বুঝি চিকালের মতোই। পারুল প্রাণপণ চেষ্টায় বললে, 'কিন্তু কোথায় যাচ্ছ, কোথায় থাকবে—সেটাও আমরা জানব না?'

'জানবে বৈকি মা। সময় হলেই জানাব। ঠিকানাও দেব। তবে আজ নয়, এখন নয়। আপাতত শুধু এইটুকু জেনে রাখো—স্বামীর ঘরেই যাচ্ছি, তাঁর কাছেই থাকব। কোন ছোট কাজ, যাতে সত্যিকার মাথা হেঁটে হয় বাপ-মার—এমন কিছু করব না।'

সত্যিই চলে গেল সে।

হয়তো প্রণব বাইরেই কোথাও অপেক্ষা করছিল, রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে ছিল হয়ত। হয়ত ট্যাক্সির পয়সাও নেই। হেঁটে গিয়ে ট্রামেই উঠবে।

কে জানে তাকে ভেতরে ডাকা উচিত ছিল কিনা। তাকে কঠিন তিরস্কার ক'রে, পুলিসের ভয় দেখিয়ে—অপমানের ভয় দেখিয়ে কিছু করা যেত কিনা!

কিন্তু কিছুই করা হ'ল না। কী করা উচিত তাও ভেবে পেল না পারুল।

শুধু বাইরের সেই ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে চেয়ে বিমূঢ়ের মতো বসে রইল সে।

চন্দ্রশেখর

এ পাড়ায় উঠে আসবার মাস তিনেকের মধ্যেই পানুবাবুর নাম রটে গেল চন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখর আর শৈবলিনী। ওঁর স্ত্রী তটিনী বৌদিই শৈবলিনী —বলা বাহুল্য। আসলে তটিনী বৌদির দৌলতেই পানুবাবুর ঐ খেতাব।
— সরকারী ফ্ল্যাটবাড়ির পাড়া। পায়রার খোপের মতো ফোকরে-ফোকরে এক-একটি পরিবার। বোধহয় সবসুদ্ধ ত্রিশ-বত্রিশটি ব্লক—প্রতি ব্লকে বারোটি করে ফ্ল্যাট। এত ঘেঁষাঘেঁষি কাছাকাছি থাকার ফলে কোন পরিবারের কেচ্ছাই কোন পরিবারের জানতে বাকী থাকে না। তুমি কারও সঙ্গে না মিশলে কি হবে—সামনের ফ্ল্যাটের সরব আলোচনা কি কলহ এড়াবে কি করে?

চন্দ্রশেখর আখ্যা কোন প্রবীণ কি প্রবীণা দিয়ে থাকবেন। এখন যারা তরুণ তারা হয়ত কেউ কেউ বঙ্কিমবাবুর নাম শুনেছে—বই প্রায় কেউই পড়ে নি। সুতরাং ও-নাম তাদের কারও মাথাতে আসবার কথা নয়। তবে ওপর মহলে চালু হয়ে গেলে সে নাম ব্যবহার করতে তো কোন বাধা নেই। অর্থ বুঝুক বা না-বুঝুক ঐ নামটাই চলে গিয়েছিল। এমন কি পানুবাবুর সামনেও যে এক-আধবার কেউ না বলেছে তা নয়।

অবিশ্যি তাতে পানুবাবুর কিছু আসে-যায় না।

কিছুতেই কিছু আসে-যায় না তাঁর।

আর সেই জন্যেই তো ঐ নাম বা উপাধি।

কী একটা আধাসরকারী আপিসে কাজ করেন ভদ্রলোক, মাঝারি গোছের মাইনে পান। সংসার বলতে দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে—আর স্ত্রী। আর এক পিসীও বুঝি ছিলেন, এই ফ্ল্যাটে আসার আগে তাঁকে কাশী পাঠানো হয়েছে—মাসে পঞ্চাশ টাকা ক'রে পাঠাতে হয়। তটিনী বৌদি সেটা সগৌরবে প্রচার ক'রে থাকেন, 'খরচটা কি কম? এক-একটা ছেলেমেয়ের

এডুকেশনেই তো ধরুন না একশো টাকা ক'রে খরচা—বেশি বই কম নয়। তা ছাড়া ওঁর সব গোপন সাহায্য আছে এতটি।…কত যে আত্মীয়স্বজন তার ঠিক নেই। ঐ দেখুন না এক পিসী—আপন পিসীও না, বাপের মাসতুতো বোন, মানুষ করেছেন বা তেমন কেউও নন— নিরাশ্রয় এই পজ্জন্তু, আমার শাশুড়ীকে জ্বালিয়ে খেয়েছেন চিরকাল—কি না তাঁকে মাসোহারা পাঠাও মোটা টাকা। তাতেই কি শেষ, আজ অসুখ, কাল ব্রত, পরশু লেপ তৈরী করাতে হবে—সেসব ঘুষ তো লেগেই আছে বাড়তি দশ-বিশ টাকা। সেটা গোপনে যায় আপিস থেকে, সেইখানেই রসিদ আসে। তবে টের পাই আমি সব।'

এসব কথা পানুবাবুর কানেও ওঠে।

তবে তিনি নির্বিকার। এ কথা যে তাঁর কানে গেছে তা তাঁর মুখ দেখে কেউ বলতে পারবে না।

কোন বিষয়েই যেন কোন কৌতূহল নেই তাঁর, কোন ব্যাপারেই আগ্রহ নেই। আপিস যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করেন না। বাজার বাড়ি ফেরার পথে—বাজার-দোকান সব কিছু। যা আনবেন ঐ একবার। এ ছাড়া যদি কিছু কখনও আনতে হয়—সে ব্যবস্থা তটিনী বৌদিকেই কবতে হবে। মেয়ে কি ছেলে কাউ:কে দিয়ে, কিংবা ঠিকে ঝি উপস্থিত থাকলে তাকে পাঠিয়ে। অসুখ-বিসুখ হ'লে বড় জোর ডাক্তারকে একবার খবর দিয়ে আসেন—তার বেশি কোন দায়িত্ব আছে এটা তাঁর আচরণে প্রকাশ পায় না। শুধু মাস কাবার হলে নিজেব সামান্য খরচের মতো কয়েক টাকা হাতে রেখে বাকী সমস্তটাই স্ত্রীর হাতে ধরে দেন—সংসারের দৈনন্দিন হিসেবে থাকেন না।

তাহ'লে তিনি করেন কি? পূজা-পাঠ!

পূজা একটু যা হয় করেন, তবে সে এমন কিছু নয়। পাঠের মধ্যে সকালে খবরের কাগজটাই প্রধান—তার বেশি সময় হয় না, কারণ দশটায় আপিস, সেজন্যে পৌনে নটা থেকে তাঁকে প্রস্তুত হ'তে হয়। বিকেলে ফিরতেও দেরি হয় তাঁর—আপিসে বেশ দায়িত্বপূর্ণ কাজ করেন, য়্যাসিস্ট্যান্টরা চলে যাবার পরও তাঁকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়। সুতরাং বাড়ি ফিরে মুখ হাত ধুয়ে বসতে বসতে রাত আটটা সাড়ে আটটা—কোন কোনদিন ন'টাও হয়ে যায়, তখন আর খুব বেশি সময় থাকে না হাতে।

যেটুকু থাকে—বই পড়ে কাটান। রাত্রে শুয়েও ঘণ্টাখানেক বই পড়া চলে—প্রবন্ধের বই আর ভ্রমণকাহিনীই বেশি, নাটক নভেল নয়। তবে তেমনি শাস্ত্রগ্রন্থ বা ধর্মগ্রন্থ যাকে বলে তাও নয়।

এ ছাড়াও চন্দ্রশেখরের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য ছিল বৈকি।

পান্নুবাবুর বয়স কত তা আমরা কেউ কোনদিন জিজ্ঞাসা করি নি। কিন্তু তটিনী বৌদিকে আকারে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করেছি—তিনি পান্নুবাবুর দ্বিতীয় পক্ষ কিনা। তার উত্তরে তিনি প্রতিবারই প্রথমটা লাল হয়ে উঠেছেন, তার পরই উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়েছেন যেন, 'না না।…দ্বিতীয় পক্ষ কেন হ'তে যাব! কী বিপদ! ওঁকে ঐরকম দেখায়—অকালবৃদ্ধ। আসলে কি জানেন, এখনকার ডাক্তাররা যা বলে তাই সত্যি—মনটা দেহের ওপর অনেকখানি কাজ করে। উনি মনে মনে নিজেকে এমন বুড়ো ক'রে ফেলেছেন যে চেহারাটাও তার সঙ্গে তাল রেখে বুড়্টে মেরে গেছে। কত ভাবেন ওঁকে? বিয়াল্লিশের এক বছর বেশি নয়। পঁচিশ বছর বয়সে ওঁর বিয়ে হয়েছে, টুনুই প্রথম সন্তান, এই সবে ষোলয় পড়েছে। সতেরো বছর বয়সে ও আমার পেটে আসে—' ইত্যাদি।

কিন্তু তিনি যতই যা বলুন, বিয়াল্লিশ দেখাত না পান্নুবাবুকে কোনমতেই। খুব সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করলেও পঞ্চান্নর কম নয়। মুখের চামড়ায় কুঞ্চন দেখা দিয়েছে, মাথা-জোড়া টাক, আর পিছনে যে কটি সামান্য চুল আছে তার বেশিব ভাগই সাদা। চালচলনের তো কথাই নেই—প্রাজ্ঞ-প্রবীণ লোকের মতোই।

সে তুলনায় কিন্তু তটিনী বৌদির বয়স সত্যিই অনেক কম দেখায়। যৌবন তাঁর তখনও যেন মধ্যগগনে স্থির হয়ে আছে, দিগন্তের দিকে এতটুকু হেলে নি। দেহের বাঁধুনি, গাত্রচর্মের মসৃণতা, উজ্জ্বল কান্তি—সবটা জড়িয়ে এখনও তরুণ-মনে তরঙ্গ তোলার ক্ষমতা রাখেন তিনি। এমন কি তাঁর যে তিনটি সন্তান হয়েছে, তার মধ্যে বড় মেয়েটি সতেরোয় পা দিয়েছে—একথা তিনি নিজে মুখে বললেও তাঁর দিকে চেয়ে বিশ্বাস করা শক্ত হ'ত।

তবু ঠিক এই কারণেই তাঁকে শৈবলিনী বা তাঁর স্বামীকে যে চন্দ্রশেখর বলা হ'ত তা নয়। প্রতাপও একজন ছিল।

সে প্রতাপটিকে মিলেছিল তটিনী বৌদির এখানে এসেই।

অবশ্য পাশের 'ডি' ব্লকের দীপু বলে, 'ওঁর যা ঠাটঠমক, ওঁর যা যৌবন আর চোখের বাঁকা চাউনি—এ কাজ এই প্রথম করলেন তা মনে হয় না। শুনেছি আগে ওঁরা সোদপুরের দিকে কোথায় থাকতেন, সেখান থেকে একেবারে এই বলতে গেলে উল্‌টো দিকে এত দূরে চলে এলেন কেন? নিশ্চয়ই সেখানে এমন কোন কেলেঙ্কারি হয়েছিল যে আর মুখ দেখানো যাচ্ছিল না।'

এতটা আমরা আর কেউ বলতুম না, বরং ধমক দিয়ে থামিয়েই দিতুম ওকে।

তবে এখানের ব্যাপারটা সন্দেহাতীত প্রত্যক্ষ।

এখানে আসার পর তটিনী বৌদি যেন হিসেব ক'রে ক'রে—আঙুলের কর গুণে বা বর্ণমালার পর্যায় ধরে একে একে সব ফ্ল্যাটে গিয়ে আলাপ পরিচয় করে আসেন।

তার মধ্যে কিছু কিছু পরিচয় দু-একদিনের বেশি এগোয় নি, কিছু বা বেশ সখ্যে পরিণত হয়েছে। দু-এক জায়গায় সে অন্তরঙ্গতা আত্মীয়তায় গিয়েও পৌঁচেছে—মানে, পানুবাবুকে বাদ দিয়ে যতটা সম্ভব। তিনি কখনই কারও বাড়ি যান না, কেউ এলেও তা মনে করে রাখেন না, পথে দেখা হ'লে বড় জোর একটু হাসির ভঙ্গী ক'রে হাতটা কপালের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান, এই পর্যন্ত।

তবে তাতে তটিনী বৌদির কোন অসুবিধা হয় না। তিনি স্বামীকে বাদ দিয়েও বেশ সপ্রতিভ ভাবেই সামাজিকতা বজায় রাখেন। প্রসঙ্গ উঠলে বলেন, 'উনি! তবেই হয়েছে। ওঁর কথা বাদ দাও। উনি হলেন উচ্চ মার্গের জীব, আমাদের মতো ইত্তিক লোকের সঙ্গে মিশবেন কেন?'

এইভাবে যাদের সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছে তাঁর—তার মধ্যে সজলের মা একজন।

সজলরা পানুবাবুদের ব্লক থেকে তিন-চারখানা ব্লক বাদে 'ই' ব্লকে থাকে। সজল, কাজল, উজ্জল তিন ভাই ওরা। তিন ভাই আর মা-বাবা।

সজলের মারও বয়স অল্প, তটিনী বৌদির থেকে দু-এক বছরের ছোটই

হবেন, কিংবা আরও কিছু বেশি। কারণ বড় ছেলে সজলের বয়সই এখন সবে দশ-এগারো। হয়ত কিছু বেশি বয়সেই বিয়ে হয়েছিল তাঁর—তবে সে আর কতই বা হতে পারে।

দীপুর ভাষায় সজলের মারও একটু 'চনমনে' ভাব। সজলের বাবা প্রলয়বাবু অবিশ্যি বুড়ো ভারিক্কি নন আদৌ, বরং তাঁর বসনে-ভূষণে চলনে-বলনে আধুনিক হবার চেষ্টাটাই প্রকট। চেহারাও চলনসই ধরনের সুশ্রী। তবে কিনা দীপুরই ভাষায় আবার বলি—যার ছোঁক ছোঁক করা স্বভাব সে করবেই। যে নিত্য পায়েস খায় তার কি আর কাটলেট খাবার সখ হয় না?

সে কথা থাক।

সজলের মার সঙ্গে তটিনী বৌদির সখ্যতা বা অন্তরঙ্গতা ক্রমশ একাত্মতায় পৌঁছল। নিত্য দেখা না হ'লে দিন চলে না কারও। শেষে এমন দাঁড়াল—তটিনী বৌদির নিত্য সন্ধ্যায় গা-হাত ধুয়ে প্রসাধন শেষ ক'রে সজলের মার কাছে যাওয়া চাই-ই, বারো মাস তিনশো পঁয়ষট্টি দিন। তা কে জানে বর্ষা, কে জানে শীত, সহস্র কাজ থাকলেও বা দৈবাৎ কেউ এসে গেলেও ঠিক একটা কৌশল ক'রে বেরিয়ে যাবেন তটিনী বৌদি। এটা তাঁর যেন নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

সজলের মার ফ্ল্যাটেই তিনি যেতেন, সজলের মার আসার সুবিধা হ'ত না। কারণ তাঁর আড়াইখানা ঘরের ফ্ল্যাট, তাঁরা দেন আশি টাকা ভাড়া—এঁদের ষাট টাকা আট আনা, দেড় কামরার ফ্ল্যাট। ছেলেমেয়েরা পড়তে বসলে সেখানে বসে গল্প করা যায় না। কাজলের মার বাড়ি যে শুধু স্থানের সচ্ছলতা তাই নয়, আরও একটু সুবিধা ছিল। তাঁর তিন ছেলেই নিচের ফ্ল্যাটে হরিবাবু মাস্টার মশাইয়ের কাছে পড়তে যায়। বুড়ো মানুষ হরিবাবু কোথাও যেতে পারেন না বিশেষ, ঘরে বসে কোচিং ক্লাসের মতো ক্রমান্বয়ে ছেলে পড়িয়ে যান।

সজলের মার ফ্ল্যাটের এই নির্জনতার সুযোগে আরও কেউ কেউ আড্ডা দিতে আসত, তার মধ্যে তাঁর পিসতুতো দেওর ক্ষিতীশও একজন। সাতাশ-আটাশ বছর বয়স, একটা কি বড় ব্যাঙ্কে কাজ করে—কাজ কম, অবসর প্রচুর। দেখতেও সুশ্রী, আধুনিক তরুণদের সব গুণ (দোষ বলা কি উচিত

হবে ?)-ই আছে। এতদিন সজলের মারই বাহন ছিল, অর্থাৎ তাঁর সিনেমা যাবার সঙ্গী। এবার তটিনী বৌদিও ওকে অবলম্বন করলেন। ফলে ক্ষিতীশ হয়ত আগে সপ্তাহে তিন-চারদিন আসত, এখন নিত্য আসতে শুরু করল। আর সজলের মা সুকৌশলে বাকী যারা অনিয়মিত অড্ডাধারী ছিল তাদের সরিয়ে দিলেন—আড্ডা বলতে দাঁড়াল দুটি স্ত্রীলোক ও একটি তরুণ।

এ বাসায় সুবিধা অনেক। প্রলয়বাবু আপিসের ফেরত একটা পার্ট টাইম চাকরি করেন, ফলে রাত দশটার আগে কোনদিনই ফেরা হয় না তাঁর। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শেষ করে ওপরে আসে—সেও নটার আগে না। ফলে সন্ধ্যা সাড়ে ছটা সাতটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা।

অবশ্য এত রাত করতেন না তটিনী বৌদি কোন দিনই। কারণ তাঁর নিজের বাসায় ফেরা প্রয়োজন ছিল। তবু সাড়ে ছটা থেকে আটটা সওয়া আটটা এ সময়টা তিনি কিছুতেই বাসায় থাকতে পারতেন না। যেন দড়ি-ছেঁড়া হয়ে বেরিয়ে যেতেন, কে যেন এক অমোঘ আকর্ষণে টানত তাঁকে—সে আকর্ষণ এড়াবার সাধ্য ছিল না তাঁর। প্রথম প্রথম রবিবারগুলোয় একটু অসুবিধা বোধ করতেন—একটু দ্বিধা, একটু সংকোচ ছিল, ক্রমশঃ সেটুকু চক্ষুলজ্জাও ত্যাগ করলেন। নির্বাক নিস্পৃহ স্বামীকে একবার ধর্মডাক দিয়ে বলে যেতেন, 'তুমি তো বাড়িতে আছ, আমি একটু ঘুরে আসছি। একঘেয়ে সংসারের ঘানি টানতে আর পারি না।'

প্রথম প্রথম অতটা তবু কেউ লক্ষ্য করে নি।

এটা যে একটা আলোচ্য বিষয় তাও কেউ মনে করে নি।

কিন্তু ক্রমশঃ করল। এমন ভাবে প্রতিদিন একই সময় যদি কেউ কারও বাড়ি বেড়াতে যায়—এমন দৃষ্টিকটু রকমের নিয়মিত—তা হলে তা দৃষ্টিকে আঘাত করবে বৈকি। আরও বিশেষ ক'রে যখন দেখা গেল ও বাড়িতে অপর যারা যেত তারা কেউই যায় না আর, তাদের যাওয়াটা যে খুব একটা বাঞ্ছিত নয়, শীতল অনাসক্ত অভ্যর্থনাতে তাও একরকম বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। তৎসত্ত্বেও যদি বা কেউ দৈবাৎ গিয়ে পড়েছে, সে দেখেছে সজলের মা রান্নাঘরে একা বসে রান্না করছেন, ও-পাশের শোবার ঘরে মৃদু আলো জ্বলছে, মৃদু আলাপের সুর, সে ঘরের দরজায় ভারি পর্দা।

এরপর পাড়ার লোক যদি দুই আর দুয়ে চার ক'রে নেয় এবং তটিনী বৌদি ও পানুবাবুকে যথাক্রমে শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখর নামে অভিহিত করে —খুব একটা দোষ দেওয়া যায় কি ?

এই ভাবেই চলেছিল বেশ কয়েক মাস।

হয়ত শেষের দিকে ক্ষিতীশের উৎসাহে একটু ভাঁটা পড়েছিল, তবে তটিনী বৌদি সে সম্বন্ধে কিছুটা প্রস্তুতই ছিলেন বলে তেমন কোন অশান্তি ঘটে নি। 'উপরি' পাওনা যতটা পাওয়া যায় ততটাই ভাল—তা দাবী করতে নেই, এটা বোধ করি তটিনী বৌদি বুঝেছিলেন।

অশান্তি ঘটল অন্যত্র।

চোখ দুটো আর মনটা পাঁচ ব্লক তফাতের বিশেষ একটি ফ্ল্যাটে পড়ে থাকত বলে তাঁর নিজের ফ্ল্যাটে কি ঘটছে অতটা টের পান নি।

বড় মেয়ের রুমার বয়স সতেরো পার হয়েছে সবেমাত্র। এবার হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেবার কথা তার। সুতরাং সে নাবালিকা তো বটেই—বালিকা বলেই ধরে নিয়েছিলেন তটিনী বৌদি। তার ওপর যে কিছু নজর রাখা প্রয়োজন তা মনেই করেন নি।

তবু, ওকে পড়ানোর জন্য অপেক্ষাকৃত প্রৌঢ় গোছেরই এক মাস্টার রেখেছিলেন। ওদিক থেকে অন্তত কোন বিপদ আসবে না। বিশেষ ওঁর তিন ছেলে-মেয়েকেই সে যখন একসঙ্গে পড়াবে তখন আর ভয়টা কি ?

শুধু একটা কথা মনে রাখা উচিত ছিল তাঁর—যে পরীক্ষার্থিনী তাকে অপর ছাত্র-ছাত্রী দুটির থেকে কিছু বেশীক্ষণ পড়ানো দরকার। ওদের ফ্ল্যাটে স্থানাভাব বলে পাশে ননীদের ফ্ল্যাটেই পড়াবার ব্যবস্থা ছিল, ননীর মেয়েও ওদের সঙ্গে পড়ত। তবে তার ক্লাস সিক্স-এর পড়া। তাদের পালা শেষ হ'লেই তারা তিনজন বেরিয়ে পড়ত, মাঠে অথবা ছাদে উঠে যেত—খেলার আসর জমাতে। ননী রান্নাঘরে রান্না করে, নয়ত ওদের বসিয়ে ওপরের কবিতাদির ফ্ল্যাটে বেড়াতে যায়—নির্জনে বেশীক্ষণ ধরে পড়াশুনোর খুব সুবিধা।

আরও দুটি কথা ভেবে দেখা উচিত ছিল তটিনী বৌদির।

রুমা তাঁরই মেয়ে। দেখতে আদৌ খারাপ নয়।

এবং মাস্টার তপনবাবুর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি—এইটুকু জেনেই তাঁকে বিবাহিত বলে ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই, বিয়ে হয়েছে কিনা প্রশ্ন করা প্রয়োজন ছিল।

সে ভুল যখন ধরা পড়ল তখন কিন্তু আর সংশোধনের সময় রইল না।

একদিন ঘরে ফিরে রুমাকে দেখা গেল না।

খুব খানিকটা খোঁজাখুঁজি করার পর খবরটা পাওয়া গেল পানুবাবুর কাছেই।

রুমার সঙ্গে তপনের বিয়ে হয়ে গেছে। রেজেস্ট্রী করে। তপন এই কাছেই একটা বাসা ভাড়া করেছে। রুমা বই-খাতা কাপড়-জামা নিয়ে চলে গেছে সেখানে, সেইখান থেকেই নাকি পরীক্ষা দেবে।

অতঃপর তটিনী বৌদি যে লাফালাফি চেঁচামেচি করলেন তা না দেখলে বোঝানো যাবে না।

আগুন হয়ে বলতে লাগলেন, 'ও বিয়ে বে-আইনী। ওটা বিয়েই নয়। মেয়ে আমার এখনও নাবালক।...জেলে দেব ঐ হারামজাদাকে। ঘানি টানিয়ে ছাড়ব।'

পানুবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিস্পৃহতা ও ঔদাসীন্যের সঙ্গে বললেন, 'তা বোধ হয় পারবে না। আমি গার্জেন হিসেবে কন্‌সেণ্ট দিয়েছি, খাতায় সই করেছি সাক্ষী হিসেবে, এর পর কি—'

বোমার মতো ফেটে পড়লেন তটিনী বৌদি, 'তুমি! তুমি বাপ হয়ে এই কাজ করে এলে! নিজের মেয়ের সর্বনাশ নিজে করলে! বলতে গেলে মেয়েটার বাপের বয়িসী। চাল নেই চুলো নেই, পথের ভিখিরী। আমার অমন সোনার প্রতিমা মেয়েকে একটা ভ্যাগাবণ্ডের হাতে তুলে দিয়ে এলে। কী খাওয়াবে সেই জোচ্চোর বদমাইশটা তাই শুনি? সংসার চালাতে পারবে?'

তারপরই কঠিন ব্যঙ্গের সুরে বললেন, 'তুমি না সাধক মানুষ, ঋষি তপস্বী! সংসারের ঊর্ধ্বে থাকতে চাও! পুণ্যাত্মা লোক! তুমি জেনে শুনে এই ধরনের দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিলে! একবার ফিরিয়ে আনারও চেষ্টা

করলে না মেয়েটাকে।’

‘ওসব আমার পোষায় না তা তো তুমি জানোই।’ প্রশান্ত সুরে উত্তর দিলেন পানুবাবু, ‘বিয়েটাকে ঠিক দুর্নীতির পর্যায়ে ফেলাও যায় না হয়ত। আর দুর্নীতি মনে করলেও বোধ হয় বাধা দিতুম না। তোমাকেও তো কোনদিন বাধা দিই নি! বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরাবারও চেষ্টা করি নি—সে তো তুমি জানোই। ও আমার ভাল লাগে না। যে যা করবে সে-ই তার ফল ভোগ করবে, মাঝখান থেকে আমি অত ব্যস্ত হই কেন?’

জলের চেয়ে ঘন

কাগজপত্র সব দেখা হয়ে গেছে। ডিগ্রি, বয়সের প্রমাণপত্র, ব্যক্তিগত চরিত্রের সার্টিফিকেট, স্টেনোগ্রাফি কলেজের সার্টিফিকেট, দুজন সম্ভ্রান্ত লোকের সুপারিশপত্র—অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি ঘটে নি কোথাও। শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপের পরীক্ষাও নিজে নিয়েছেন রমানাথবাবু—পছন্দ যে হয়েছে তার বহু ইঙ্গিত পেয়েছে ইতিমধ্যেই। তবু কেন যে এখনও একটু ইতস্তত করছেন রমানাথবাবু, সেইটেই বুঝে উঠতে পারে না তৃষ্ণা। তবে কি এ সবই ভুয়ো? ওঁর পছন্দমতো কাউকে নেবেন, এটা আগেই স্থির হয়ে আছে—এ আড়ম্বর শুধুই লোক-দেখানো?

কিন্তু তাহলে—এতগুলি উমেদারের ইণ্টারভিউ তো দু-তিন মিনিটেই শেষ হয়ে গেছে বলতে গেলে, বড় জোর কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁচ মিনিট—তারা মুখ কালি ক’রে বেরিয়েও গেছে, ওকেই শুধু একটু অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল। তারপর এই দীর্ঘ, প্রায় চল্লিশ মিনিটব্যাপী, বিভিন্ন পরীক্ষা আর প্রশ্ন। আরও কি চান উনি?

তবে কি উনি কিছু ঘুষ চাইছেন? সেটাই মুখ ফুটে বলতে পারছেন না?

কিন্তু, তাহলে তো—ভাবতে ভাবতেই ঘেমে ওঠে কৃষ্ণা। তাহলে তো সে পেরে উঠবে না। কোথাও তার এমন কিছুই নেই যে, সে এক হাজার টাকাও দিতে পারে, দিনরাত পরিশ্রম ক’রে, তিন-চারটে টিউশনি ক’রে তাকে পড়তে হয়েছে, স্টেনোগ্রাফি শিখতে হয়েছে। মা অবশ্য সংসারের কাজ

কিছু কিছু করেছেন, তাই রক্ষা। আজও ক'রে যাচ্ছেন অসুস্থ শরীর নিয়েও। ভাইটার পড়ার খরচ টানতে হয়েছে তৃষ্ণাকে। সে এই সবে বি.-কম. পাস করেছে—এখনও কোন চাকরির চেষ্টা করার সময় পায় নি। একতলার এই ঘর দুটো বহুদিন আগের ভাড়া নেওয়া তাই। নইলে এও টানা যেত না। নোনা ধরে বীভৎস চেহারা হয়েছে ঘরের, বাড়িওলা সারিয়ে দেন না, সে কথা তাঁকে বলাও যায় না। এই অবস্থায় হাজার টাকা যোগাড় করাও স্বপ্ন দেখার সামিল। বন্ধু-বান্ধব? কার কাছ থেকে না সে টাকা ধার করেছে এর মধ্যে!

এ সব ভাবতে এক মিনিটের বেশিও সময় লাগার কথা নয়, লাগেও নি। তবে এতদিনের শিক্ষায়, নানা হতাশার আঘাতে পোড়-খাওয়া বলেই সে উদ্বেগ মুখে ফোটে নি। শুধু বোধ হয় কপালে ঘাম জমে উঠেছে কয়েক ফোঁটা।

হিসেবও দ্রুত অনুমানের পথ ধরে এগোচ্ছে বৈকি। রায় সান্যাল কমপ্লেক্স-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টারের একান্ত সচিবের চাকরি, মাইনে ও অন্যান্য ভাতা নিয়ে শুরুই হবে প্রায় বারোশো টাকায়। সে পদে নির্বাচনের সব ভারই দেওয়া হয়েছে রমানাথবাবুকে। এত বড় কোম্পানীর পার্সোনেল অফিসারকে। উনি বোধ হয় হাজার তিনেক টাকা পান মাসে এখান থেকে, হয়ত আরও বেশী। উনি কি আর বিশ হাজারের কম প্রত্যাশা করবেন? তাহলে এত কাণ্ড না ক'রে গোড়াতেই সে কথাটা বলে দিলে হত!

শান্ত স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটি ওঁর দিকে চেয়ে আছে দেখে রমানাথবাবু অস্বস্তি বোধ করেন। যা বলতে হবে তা এখনই বলতে হবে। বেশী দেরি করা চলবে না। আর বলতেই যখন হবে তখন দেরি করেই বা লাভ কি!

অবশ্য ইতস্তত করার কারণও আছে একটু।

এত মেয়ের মধ্যে মাত্র এই একটিকেই পছন্দ হয়েছে রমানাথবাবুর। কর্মদক্ষতার সঙ্গে সুশ্রীতার এমন মনিকাঞ্চন যোগ—এতগুলি কর্মপ্রার্থিনীর আর একজনেরও নেই। প্রায় ত্রিশজনের তো ইণ্টারভিউ নিলেন। দেখতে ভাল হওয়াটা—কর্তা বলেন, 'বেসিক কোয়ালিফিকেশ্যন'—ওটা চাই। ওঁর সঙ্গে থাকবে, খাস কামরায় আসবে যাবে—ব্যবসা সম্পর্কে বহু বিখ্যাত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যাতায়াত করেন সেখানে, তাঁদের সামনে বেরুতে হবে, কথাবার্তা কইতে হবে—একটু প্রেজেণ্টেবল্‌ হওয়া দরকার বৈকি।

তাই বলে হাঁদা কি জরদ্গব হলেও চলবে না। জাপানী পুতুলদের দিয়ে এত বড় ফার্মের সর্বময় কর্তার আপিস চলে না।

সেই জন্মেই এত দ্বিধা রমানাথবাবুর।

আজ যে ক'জনকে ডাকা হয়েছে—অনেক বেছে বেছেই, তার মধ্যে দু' একজনের যে ঐ বেসিক কোয়ালিফিকেশ্যন ছিল না, তা নয়। কিন্তু দক্ষতা বলতে কিছু ছিল না। এরা শুধু চেহারার জোরে চাকরি চায়। এই একটি মেয়ের মধ্যেই সেই দুর্লভ যোগাযোগ দেখা গেল। এ হাতছাড়া হলে আবার সেই ক্লান্তিকর কাজের পুনরাবৃত্তি—দরখাস্ত পড়া, ছবি দেখা, আবার ইণ্টারভিউ। সেই জন্মেই, কথাটা কিভাবে পাড়বেন, মেয়েটা যাতে ভয় না পায়, আবার এর পর না গোল বাধায়—সেইটেই মনে মনে মুসাবিদা করছিলেন। তবে আর দেরি করা যাবে না।

একবার যেন কণ্ঠস্বরটা সাফ করার জন্মেই গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করলেন রমানাথবাবু, 'একটা কথা ইয়ে—মানে এখনই পরিষ্কার থাকা ভাল। আপনার রেফারেন্স, কাজকর্ম কথাবার্তা, সবই আমাদের পছন্দ হয়েছে, আপনাকেই কাজটা দেওয়ার ইচ্ছা। তবে কি জানেন, এত বড় প্রতিষ্ঠান, সারা ভারত জুড়ে কাজকর্ম, যেখানে যা কিছু ইঞ্জিনীয়ারিং কনসস্ট্রাকশন—মানে ওয়ার্থ মেনশনিং—সবই এঁরা করেন। ভারতের বাইরেও, ওদিকে কেনিয়া থেকে এদিকে ফিলিপাইনস—এঁদের বিজনেস কানেকসন। বড় বড় শিল্পপতিরা এঁদের শেয়ার কেনার জন্য পাগল, এঁদের কাছে টাকা লগ্নী করতে চান। সে ক্ষেত্রে এই কমপ্লেক্স-এর চোদ্দটা বড় কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেকটারের সর্বদাই ঘুরে বেড়াবার দরকার হবে, এটা স্বাভাবিক। বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন সেক্রেটারী আছে কিন্তু ওঁর পার্সোনাল সেক্রেটারী এই একটিই—হাতের কাছে এমন একজনের সব সময় থাকা দরকার, যিনি একদিকে ওঁর চিঠিপত্র পড়ে দেখে বুঝে বাছতে পারবেন—তেমনি ব্যক্তিগত প্রয়োজন, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, ওষুধপত্র এসব দিকে নজর রাখবেন। এমন লোককে ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হবে। এক হোটেলে বা এক গেস্ট হাউসে থাকতে হবে। অবশ্যই পাশাপাশি ঘরে। তবে তাই বলে—ঐ ইংরেজীতে কি বলে স্যাপেরোন না কি—মানে কোন বয়স্কা সঙ্গিনীকে নিয়ে যাওয়া—চলবে না।

অত বদারেশন ওঁর পোষাবে না। সে সময়ও সব সময় পাওয়া যাবে না। বেশির ভাগই প্লেনে ঘোরা, দরকার পড়লেই সঙ্গে যেতে হবে—আর একাই যেতে হবে। বুঝেছেন তো আমার কথা? য়্যাম আই প্রপারলি আণ্ডারস্টুড?'

ছু'তিন মুহূর্ত কি সময় লাগল তৃষ্ণার উত্তর দিতে। লাগলেও এর বেশি নয়। সে শান্ত সহজ কণ্ঠেই উত্তর দিল, 'বুঝেছি। জানি আমি। জেনেই এসেছি। এসব ধরনের কাজ—বইতে অনেক পড়েছি তো।'

'তা হলে যান। কালই আমি স্পেশাল ম্যাসেঞ্জার দিয়ে য়্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠিয়ে দেব। অল্-টোলড্, মাসে বারোশো টাকা, এককালীন ছু হাজার টাকা প্রথম দিনেই—পোশাক ইত্যাদি বাবদ—বাইরে গেলে খরচ ছাড়াও একটা সেপারেট য়্যালাউন্স। ঠিক আছে? নমস্কার।'

'জানি। জেনেই এসেছি। বইতে অনেক পড়েছি।' এর অর্থ কি? কি বলতে চায় মেয়েটা? তাঁকে বিদ্রূপ করে গেল নাকি? রমানাথবাবুর অস্বস্তিটা বেড়েই যায়।

না, মিথ্যা বলে নি তৃষ্ণা। জেনেই এসেছে।

এস রায় বা শশাঙ্ক রায়ের সম্বন্ধে বহু কথাই শুনেছে। বোধ হয় আর কিছু শোনা কি জানার দরকার হবে না।

'সেলফ্‌মেড ম্যান' শব্দটার যদি কোন অর্থ থাকে—তা হ'লে সে শব্দটা শশাঙ্ক সম্বন্ধেই খাটে।

কিছুই ছিল না ওঁর। মাথার ওপর কোন অভিভাবক বা টাকা খরচ করার মতো লোক। লেখাপড়া কিছু হবে না দেখে মামারা একটা ইণ্ডাস্ট্রীয়াল স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সেখানে ডিগ্রি ডিপ্লোমা কিছু নয়—শুধু একটা সার্টিফিকেট অফ মেরিট পাওয়া গিছল, তিন বছর পরে। তখন ওঁর ষোল সতেরো বছর বয়স। স্থানীয় একটা ছোট কারখানার চাকরিও ওঁর মামারা ঠিক করে রেখেছিলেন কিন্তু তা পছন্দ হয় নি শশাঙ্কর। দিন কতক দেখে এক পাঞ্জাবীর সঙ্গে জলন্ধর চলে গিছল। তাদের খেলনার কারখানা।

পুঁজি বলতে ছিল সুশ্রী চেহারা আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। তারই জোরে এক অলস ধনী, ব্যবসায়-বিলাসী, শিবনাথ সান্যালের চোখে পড়ে যান। তাঁর

পুঁজি, ওঁর পরিশ্রম—এই শর্তে 'রায় সান্যাল অংশীদারী' ফার্মের সৃষ্টি। তার পর হাজার কতক টাকা সরিয়ে নিয়ে দেনার দায়ের ভয় দেখিয়ে সান্যালকে সরাতে বেশী দেরি লাগে নি।

কিন্তু তাতেও হচ্ছিল না। সেই অবস্থাতেই এক বাঙালী শিল্পপতির সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। রতনে রতন চেনে। তিনি কোন ভুল করেন নি শশাঙ্ক সম্বন্ধে। সোজাসুজি প্রস্তাব করেছিলেন—উনি যদি তাঁর মেয়েটিকে বিয়ে করেন তাহলে তিনি ওঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবেন ওঁর ফার্মের এক্সপ্যানসানের জন্যে। মেয়ে হবে অংশীদার। তবে একটা লেখাপড়া থাকবে, বিবাহের কুড়ি বছরের মধ্যে স্ত্রীকে ত্যাগ করা বা দ্বিতীয়বার বিবাহ করা চলবে না। করলে দু লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে মেয়েকে বা মেয়ের ফ্যামিলিকে। ঠিক কি লেখাপড়া হয়েছিল তা অবশ্য কেউ জানে না—এই ধরনের একটা জনশ্রুতি শুনেছে তৃষ্ণা অনেকের মুখ থেকেই।

এ শর্তের কথা তোলার কারণ—পাত্রী ইভা কালো এবং মোটা। লেখা-পড়াও খুব বেশী কিছু জানে না।

তবে এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন হয় নি। ইভা 'লাকী'—ওঁদের ভাষায় লক্ষ্মী। সে-ই সৌভাগের সূত্রপাত। তারপর থেকেই রায় ফুলে ফেঁপে কল্পনাতীত সার্থকতায় পৌচেছেন; এদেশে যা কেউ ভাবতেও পারে না। মার্কিন মুলুকের ধনকুবেরের পক্ষেই এ সাফল্য সম্ভব, এই জানে সকলে।

তাছাড়া ইভা ওঁকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করতে চায় নি কোনদিন। নিজেকে জোর করে চাপাতে চায় নি। বাড়ি গাড়ি শাড়ি নিজের একটি মেয়ে-এই নিয়েই সে সুখী। স্বামী যে বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে চান না এতে সে যেন নিশ্চিন্ত। স্বামী যে তাঁর রূপ-তৃষ্ণা মিটিয়ে নিচ্ছেন, টাকার জোরে বহু মেয়েই সম্ভোগ করেছেন বা করছেন—তা জেনেও ইভার কোন ঈর্ষা কি উদ্বেগ নেই, সে ব্যাপারটাকে সহজ ও স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছে।

অবশ্য 'এহ বাহ্য'। ধনকুবেরদের তরুণী সেক্রেটারীদের সকল প্রকারে মনিবের মনোরঞ্জন অবশ্য কর্তব্যের মধ্যেই—এটা আজকালকার মেয়েরা ধরেই নেয়। শশাঙ্ক তার বাইরে কিছু নয়। যারা বাড়াবাড়ি করে নি—অর্থাৎ মাথায় উঠতে চায় নি—তাদের দিয়েওছেন অনেক। অনেককে ভাল বিয়ে

দিয়েছেন উদ্যোগী হয়ে। তেমনি যারা মাথায় উঠতে চেয়েছিল তাদের জুতো দিয়ে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে দিতেও দেরি করেন নি। শেষ যে একান্ত-সচিব মেয়েটিকে আত্মহত্যা করতে হ'ল, সে নাকি এই কারণেই।

অত্যন্ত নির্মম প্রকৃতির মানুষ শশাঙ্ক রায়। আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক কারও সঙ্গে রাখেন নি কোন দিন। সেই যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন, সেইখানেই সে সম্পর্কে পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে। দু-একজন যারা সে সম্পর্কে ঝালাতে এসেছিল পরবর্তীকালে, তারা সকলেই অপমানিত হয়ে চলে গেছে। কারও সঙ্গে দেখা করেন নি, কোন চিঠির উত্তর দেন নি। এমনি দান করেছেন অনেককে—সে স্বমহিমা বাড়াতে, নিজের প্রাচুর্যের বিজ্ঞাপন হিসাবে। তবে ভোলেনও নি কারও কথা। যে কেউ যে কোন সময় তাঁর বিরোধিতা করেছে কি অবহেলা করেছে—মনে ক'রে ক'রে সকলেরই সর্বনাশ করেছেন, তাদের কাউকে ক্ষমা করেন নি।

এই হ'ল শশাঙ্ক রায়। এ সব কথা জেনেই চাকরি করতে এসেছে তৃষ্ণা।

সবই জানত—কেবল শোনা কথা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় একটা তফাত থাকে তা জানত না।

এ পরিস্থিতির মুখোমুখি একদিন দাঁড়াতেই হবে তা তো জানতই। ওর অহঙ্কার ছিল অথবা চরম নিঃস্বতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েই মনকে বুঝিয়েছিল এই চরম দুর্গতির জন্য প্রস্তুত আছে সে। কেবল জানত না সে পরিস্থিতিটা ঠিক কী এবং কতখানি।

মানুষের কামনা বা কাম কতকটা একই প্রকার—এই তার ধারণা ছিল। অভিজ্ঞতা ছিল না—কারণ প্রেম নামক বিলাস চরিতার্থ করার অবসর পায় নি। সে নিভৃতিও জীবনে আসে নি। কাম চরিতার্থ করার কত প্রকার জান্তব প্রবৃত্তি ও উপায় আছে তা জানত না—এ তো কারও কাছ থেকে শোনে নি, যে শ্রেণীর বই পড়লে জানা যেতে পারে—তাও পড়ে নি।

প্রথম একটা মাস নিরঙ্কুশ ভাবেই কেটেছে। ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিল কিন্তু কাঁটার দেখা পায় নি। সঙ্গে সঙ্গে যেতে হয়েছে বৈকি—দিল্লী, গোয়ালিয়র এবং মাদ্রাজে। তবে সে যা একদিন দু'দিন থাকা, প্রচণ্ড কাজের মধ্যেই কেটেছে।

হঠাৎই একবার ব্যাঙ্গালোর থেকে ফেরার পথে দু-দিনের জন্যে উটিতে গিয়ে উঠলেন সাহেব। বোঝা গেল এ দুটো দিন বিশ্রামের জন্যেই নির্দিষ্ট রেখে-ছিলেন। কিন্তু সেই শ্রান্তি কাটাবার দানবীয় ব্যবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আর সহ্য করতে পারল না, একেবারে শেষ মুহূর্তে আপনিই বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে, 'আমি, আমি শর্বরীর মেয়ে। আপনার ভাগ্নী!'

প্রবল কামনায় উন্মত্ত রায় এই বাধায় আরও হিংস্র হয়ে উঠবেন, এটা স্বাভাবিক। সে সময়টা তাঁকে কল্পনার রাক্ষস বলে মনে হ'ল। তেমনি বীভৎস, তেমনি হিংস্র ও ক্রুর।

'কে, কার মেয়ে?'

'শর্বরী, আপনার ছোট বোন!'

'মিথ্যে কথা!'

'মিথ্যে আমি বলি না। আমি ইচ্ছে ক'রে কিছু গোপন করি নি। দরখাস্ত আপনি দেখেন নি। তাতে মা বাবার নাম লেখা ছিল!' সেও হাঁপাচ্ছে তখন। বেশী বলার বা কিছু গুছিয়ে বলার সাধ্য নেই।

অকথ্য কতকগুলো গালাগাল দিয়ে উঠলেন শশাঙ্ক রায়। সেটা তৃষ্ণাকে না শর্বরীকে না রমানাথবাবুকে—কিছু বোঝা গেল না।

'তুমি—তুমি জেনে শুনে এসেছ? জানতে এখানে এ চাকরি নিলে কি মূল্য দিতে হয়?'

'শুনেছি অনেকের মুখে। কিন্তু আমার আর উপায় ছিল না।'

'তোমাকে, তোমাকে খুন করবো আমি। টাকা ছড়ালে আমাকে কেউ ধরবে না।'

'তাই করুন। আমি সত্যিই বেঁচে যাই। এমনিও—এ চাকরি গেলে না খেয়ে মরতে হবে, নয় তো আত্মহত্যা ক'রে রেহাই পেতে হবে।'

হঠাৎ উঠে এসে কয়েকটা চড় বসিয়ে দিলেন রায়—শেষ পর্যন্ত একটা লাথিও।

তৃষ্ণা একটিও প্রতিবাদ করল না। যে রাক্ষসের পরিচয় পেয়েছে, তারপর আর কোন আচরণই বিস্ময়কর নয়।

শশাঙ্ক রায়ই যেন ক্লান্ত হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর

হঠাৎ আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমি ও সব সম্পর্ক মানি না। ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমার। সে বহুদিন চুকিয়ে দিয়েছি। ওরা কেউ আমার কোন আত্মীয় নয়।'

একটু দেরি লাগল উত্তর দিতে। ঈষৎ স্খলিত কণ্ঠে তৃষ্ণা বলল, 'আমিও ভেবেছিলুম এসব সংস্কার বুঝি গেছে। এখন দেখছি, এ গিয়েও যায় না। তবে আর আমি কিছু বলব না—আপনি যাখুশি করুন।'

শশাঙ্ক রায় পাগলের মতো তেড়ে গেলেন যেন, তৃষ্ণার এই শান্ত চেহারা দেখে আরও যেন ক্ষেপে গেছেন তিনি। মনে হ'ল যেন সত্যিই গলা টিপে মেরে ফেলবেন তৃষ্ণাকে।

তারপর কোনমতে ঘুরে দাঁড়িয়ে মাঝের দরজাটা দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে দড়াম ক'রে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

কলকাতায় গিয়ে আর আপিস যাবার প্রয়োজন হবে না, এই কথাটাই ভেবেছিল তৃষ্ণা। মাকে বলে নি কিছু, সেই জন্যেই কতকটা যথাসময়ে তৈরী হয়ে আপিসে বেরুল। দু'হাজার টাকার জামা শাড়ি জুতো এখনও কেনা হয় নি। সে বাকী টাকাটা নিয়েই বেরুল। যদি বরখাস্ত করেন এঁরা, এগুলো ফিরিয়ে দিয়ে আসবে।

তবে একটু দ্বিধা একটু বিতৃষ্ণা একটু আশঙ্কা—সব মিলিয়ে দেরি হয়ে গিছল।

আপিসে পৌঁছে শুনল সাহেব এর মধ্যে দু' তিনবার তার খোঁজ করেছেন।

সে ঘরে ঢুকতে মিঃ রায় বললেন, 'এত লেট হ'লে আমার কাজের প্রোগ্রাম নষ্ট হয়ে যায় সব। বাড়িতে রান্নার অসুবিধে হ'লে তুমি আপিসে লাঞ্চ নিও।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিপত্রের স্তূপে চাপা পড়ল দু'জনেই।

দিন দুই পরে রমানাথবাবুকে একদিন নিভৃতে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'এই তৃষ্ণা আমার ভাগ্নী—আপনি জানতেন?'

রমানাথবাবু চমকে উঠলেন, 'না স্যার। মানে আমি তো কখনও শুনি নি কে আপনার বোন, কোথায় থাকেন। কেউ আছেন তাও তো কোনদিন—'

তারপরই যেন বাক্যের পরমার্থ অনুধাবন ক'রে ফেললেন, 'তাহলে কি স্যার—আর ক'টা ইন্টারভিউ নেব?'

'না—সী'জ টু গুড এ সেক্রেটারী টু লুজ। এত দিন পরে সত্যিই কাজের মেয়ে পেয়েছি।'

তারপর একটু থেমে একটা ছোট নামের তালিকা বার ক'রে ওঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এরা আমার আত্মীয়স্বজন। দীর্ঘ দিন এদের কথা ভাবি নি। কে কোথায় আছে, কি করে—একটু খোঁজ নিয়ে আমাকে জানাবেন তো!'

মানুষের সাধ্য

সনৎবাবুর এঁই হঠাৎ-পাওয়া গুরুদেবটি ক্রমশঃ পাড়ার একমাত্র আলোচ্য হয়ে উঠল।

অথচ গুরুদবেও ঠিক নন। সনৎবাবুদের কুলগুরু আছেন, তাঁর কাছ থেকে দীক্ষাও ওঁরা নিয়েছিলেন এর আগে। তাই দীক্ষা নেবার আর প্রশ্ন ছিল না। সনৎবাবু অবশ্য নাকি বোকার মতো প্রস্তাব করতে গিয়েছিলেন যে সে দীক্ষা বিল্বপত্রে লিখে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে নতুন ক'রে দীক্ষা নেবেন। কিন্তু ইনি জিভ কেটে বলেছেন, 'বাপ্ রে, তাই কখনও হয়! গুরু ছেড়ে গোবিন্দে ভজে, সে পাপী নরকে মজে! ও কাজ করতে আমি দেব না কিছুতেই।'

সনৎবাবু আর কথা বাড়াতে সাহস করেন নি, চুপ ক'রে গিয়েছিলেন।

তিনি বোধ হয় গুরু কেন—সাক্ষাৎ ঈশ্বরের মতোই দেখতেন এই সন্ন্যাসী-টিকে। ভয়ও করতেন খুব বেশি।

সনৎবাবুর জীবনে এই গুরুদেবটি জোটবার ইতিহাস বড় বিচিত্র।

সনৎবাবু এক-পুরুষে বড়লোক। এই গলিতে যখন তিনি প্রথম আসেন তখন মণ্ডলদের একখানা ঘর ভাড়া করে থাকতেন। সনৎবাবু, তাঁর মা, ছোট ভাই এবং স্ত্রী। ডকে কাজ করতেন সামান্য বেতনে, কোনমতে মাথা গুঁজে থাকা। মাকে ও ভাইকে শুতে হ'ত উঠোনের ধারের একফালি রকে, সারা বাড়ির সারাদিনের ফেলা পচা আবর্জনার মধ্যে। তাও বৃষ্টি এলে দুর্দশার শেষ

থাকত না। ছেলে-বৌকে ডেকে দোর খুলিয়ে এক ঘরের মধ্যে কোনমতে ঢুকতে হ'ত।

কথায় বলে স্ত্রীভাগ্যে ধন। সনৎবাবুরও তাই হ'ল। থার্ড ক্লাস পর্যন্ত বিদ্যা—কুলীর চাকরি বলতে গেলে—বিয়ে করাই ওঁর উচিত হয় নি। তবু মার নির্বন্ধাতিশয্যেই কাজটা করতে হয়েছিল এবং ক'রে ঠকেন নি। নতুন বৌ এতটা দারিদ্র্যে অভ্যস্ত নয়, মোটামুটি মাঝারি ঘরেরই মেয়ে—নিতান্ত হঠাৎ কী একটা ভাল চোখে দেখে ফেলেছিলেন ওর বাবা তাই কারো কোন কথা না শুনে এই ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন—কিন্তু বৌ মালতী কখনও একটি কথাও বলে নি। রান্না করা বাসন মাজা সবই করেছে সে হাসিমুখে। শাশুড়ী কিছু করতে চাইলেও সে করতে দেয় নি—'আপনি কি চিরকালই খাটবেন? তাহলে আমাকে আনলেন কেন? আমরা কি করব?' সে যাই হোক, যে বৃদ্ধ গ্রহাচার্য মালতীর ঠিকুজী ক'রে দিয়েছিলেন তিনি নাকি বলে-ছিলেন, 'এ মেয়ে রাজরাণী হবে। যে ঘরে যাবে সোনা উথলে উঠবে। লক্ষ্মীর অংশে এর জন্ম।' সেই যুক্তিই মালতীর বাবা দিয়েছিলেন ওর বিয়ের সময়—'গরীবের ঘরে পড়ল তো কী হ'ল? ওর কপাল ফললে ঐ ঘরই ওর রাজ-প্রাসাদ হবে!' আর হ'লও তাই, মালতীর কপালই ফলল।

কী ক'রে যে কী হ'ল তা কেউ জানে না। সনৎবাবু হঠাৎ যেন ফুলে ফেঁপে উঠলেন। সামান্য টালিক্লার্ক থেকে ক্রমশঃ একেবারে স্টিভেডোর হলেন। তাঁর পুরনো বাসা-বাড়ির পাশের বস্তীটা কিনে এই বিরাট প্রাসাদ তুললেন, পরে আবার পুরনো বাড়িটাও কিনে নিলেন। বন্ধুবান্ধবরা অনেকে অনুযোগ করেছিল যে, 'এত পয়সাই যখন খরচ করছ তখন এ গলির মধ্যে থাকবার দরকার কি, বালিগঞ্জে বড় রাস্তার ওপর জমি কেনো। একে তো এই পচা-গলিতে জীবন কাটানো, তার ওপর এখানের লোক কি কখনও ভুলতে পারবে তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? চিরদিন আঙুল দিয়ে দেখাবে, লোকটা ঐ ও বাড়ির একখানা ঘরে ভাড়া থাকত আগে—এত গরীব ছিল!'

সনৎবাবু হেসে বলতেন—'ভুলে যে যায় সেটা আমারও ইচ্ছে নয়।...মনে থাকবে বলেই এখানে থাকা।'

পুরনো বাড়িটা কিনে সেটাকেও এই প্রাসাদের অঙ্গীভূত ক'রে নিলেন

বটে কিন্তু এমন কৌশলেই করলেন যে, ওঁর সেই পুরনো তিনদিক-চাপা ছোট ঘরটুকু অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়ে গেল। সেই ঘর আর তার সামনের চাপা দালানটা ছাড়া সবই ভাঙল, সবই বদ্‌লাল—শুধু ঠিক রইল ঐটুকু।

সনৎবাবুর স্ত্রীও বলতেন, 'বাপ্‌ রে, ঐ ঘরটুকুই যে আমার লক্ষ্মী।'

তিনি এ বাড়ি কেনবার পর ঐ ঘরটাই ঠাকুরঘরে পরিণত করেছিলেন। অর্থাৎ লক্ষ্মী পেতেছিলেন ঐ ঘরেই।

তবু চিরচঞ্চলা লক্ষ্মী একসময়ে চঞ্চল হয়ে উঠলেন বৈকি।

নানারকম ভাগ্য-বিপর্যয়ে সনৎবাবু এমন অবস্থায় এসে পৌছলেন যে দারিদ্র্যই তখন আর একমাত্র আশঙ্কা রইল না। আরও নানা রকমের সম্ভাবনা তাদের অন্ধকার মুখব্যাদান করে সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়িটা স্ত্রীর নামে কিনেছিলেন—কিন্তু সেটুকুও বাঁচাতে পারবেন কিনা সন্দেহের বিষয় হয়ে উঠল। এতটা বিষয় পিতৃপ্রদত্ত স্ত্রীধন থেকে কেনা, প্রমাণ করা যাবে কি?

ঠিক সেই সঙ্কট মুহূর্তেই এই সন্ন্যাসীর দেখা পেয়েছিলেন সনৎবাবু।

একদিন ভোরবেলা উঠে দেখেন তাঁরই ফটকের বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে ভিজছেন লাল কাপড়-পরা এক সন্ন্যাসী। মাথায় জটা নেই, মাথা কামানোও নয়, দীর্ঘ চুল ও গোঁফদাড়ি। গায়ে একটা চাদর সেটা ভিজে লেপ্‌টে গেছে দেহের সঙ্গে, তারই মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে গলায় কালো কালো গোলাকার কি এক পদার্থের মালা—সম্ভবতঃ পদ্মবীচির।

অত ভোরে কেউ ওঠে নি তখনও, সনৎবাবুর দুশ্চিন্তায় সারারাত ঘুম হয় নি —ভোরাই-বাতাসে একটু ছাদে বেড়াবেন বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

হঠাৎ কী হ'ল—সনৎবাবু নিজেই সদর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে সন্ন্যাসীকে সম্ভাষণ করলেন, 'ভিজছেন কেন স্বামীজী, ভেতরে আসুন না।'

সন্ন্যাসী মুখ ফিরিয়ে চাইলেন ওঁর দিকে। শান্ত কিন্তু কেমন যেন রহস্যময় চাহনি। শান্ত কণ্ঠেই বললেন, 'আমাকে ডাকছেন?…আচ্ছা চলুন যাচ্ছি।'

ভেতরে এনে নিচের বৈঠকখানাটাতে বসালেন সনৎবাবু, একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন, 'কাপড়-চাদরটা ছাড়বেন? কিন্তু আমার তো গেরুয়া নেই।'

'না না, ব্যস্ত হবেন না—ও এখনই শুকিয়ে যাবে।...জল হচ্ছে এখানটায়, তাই ভাবছেন?...আচ্ছা, আমি নিংড়ে নিচ্ছি।'

সন্ন্যাসী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভেতরের দিকে তাকিয়ে নিলেন একবার, তারপর উঠানের ধারে গিয়ে কাপড়-চাদর কাঠ কাঠ-ক'রে নিংড়ে নিয়ে একমাত্র যে কাঠের টুলটি দরজার পাশে ছিল, সেইটে এনে আবার ভেতরে বসলেন।

সনৎবাবু এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলেন। এইবার একটা কথা মনে পড়ল তাঁর। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা অমন ক'রে ভিজছিলেনই বা কেন, সামনের বাড়ির রকটায় উঠে দাঁড়ালে তো পারতেন।'

'তা পারতুম। তারই বা দরকার কি—চলে যেতেও তো পারতুম।'... এই বলে একটু হাসলেন সন্ন্যাসী। রহস্যময় হাসি। তারপর বললেন, 'এই-খানটায় এসে কী যে একটা আকর্ষণ অনুভব করলুম, মনে হ'ল কে যেন আমাকে টেনে ধরেছে—তাই দাঁড়িয়ে ভাবছিলুম, আমাকে দিয়ে আবার কার কি দরকার পড়ল!'

সনৎবাবু অন্য কথা পাড়লেন, 'থাকেন কোথায়?'

'যেখানে আশ্রয় মেলে। মানে যে থাকতে দেয়!'

'আশ্রম-টাশ্রম নেই?'

'আশ্রম? আশ্রম খুঁজব তো ঘর ছাড়লুম কেন?'

তারপর একটু হেসে বললেন, 'ঘুরে ঘুরেই বেড়াই। যখন খুব অসুবিধা হয় গুরুর কাছে গিয়ে উঠি। তিনি থাকেন কাশীতে।'

'এখানে আছেন কোথায়?'

'কেন—এই বাড়িতে!' আবারও হাসলেন। তারপর একটু থেমে বললেন, 'ভোরবেলায় শিয়ালদায় নেমেছি, কালীঘাট যাবো বলেই চলতে শুরু করেছি—কে যেন টেনেই নিয়ে এল এই গলিতে। পায়ে পায়ে এখানে এসে কেন যে ঢুকলুম তা জানি না। তারপর আবার টেনে ধরেই রাখল।'

ভণ্ড এবং বিপজ্জনক ভণ্ড বলেই মনে হবার কথা—একবার মনে হ'লও সনৎবাবুর—কিন্তু কিছু বললেন না। কেন কে জানে বরং একেবারে প্রশ্ন ক'রে বসলেন, 'একটু চা করতে বলি। চা খান তো!'

'সব খাই আমি।'

চা শুধু নয়। বেলা বাড়তে আবার এক প্রস্থ চা ও জল-খাবার। দুপুরে মধ্যাহ্ন-ভোজনেরও ব্যবস্থা হ'ল।

বাড়িসুদ্ধ লোক অবাক। স্ত্রী সন্দিগ্ধ, ছেলেরা রুষ্ট। চাকর-বাকররাও। আহারের পর একটু হেসে সন্ন্যাসী বললেন, 'একটা ভণ্ড সন্ন্যাসীকে ঘরে এনে ঢোকালেন, ভয় করছে না? আর সবাই তো ভয় পেয়ে গেছে!'

সনৎবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ভয় পাবার মতো বিশেষ কিছু আর নেই স্বামীজী। আমি ডুবেই গেছি ধরুন। সমুদ্রে যার শয্যা, শিশিরে তার কী ভয়?'

'কী রকম, কী রকম! মনে হচ্ছে আপনারই কাজে লাগবার জন্যে ভগবান এখানে আটকে দিলেন।...যদি আপত্তি না থাকে—বলুন না কী বিপদ।'

এত দুঃখেও হাসি পেল সনৎবাবুর, লোকটার ধৃষ্টতা দেখে। তবু—কী যে মনে হ'ল তাঁর, কারণটা আজও খুঁজে পান না মনের মধ্যে—বিপদের কারণ এবং পূর্ব-ইতিহাস সব খুলেই বললেন সাধুকে।

নীরবে বসে সব শুনলেন সন্ন্যাসী। সনৎবাবুর বিবৃতি শেষ হ'লে বললেন, 'এ আপনার অতি-লোভেরই শাস্তি। নিঃস্ব হওয়াই উচিত আপনার, তবু কোন কারণে দেখছি আপনার ওপর দৈব প্রসন্ন। সম্ভবতঃ সেটা আপনার সহধর্মিণীরই সুকৃতি। না, আপনার বিপদ কেটে যাবে।'

এই বলে একটু থেমে বললেন, 'আচ্ছা, আপনি এইটে ক'রে দেখুন তো।'

অতঃপর তিনি গুটিকতক কর্মপন্থা বাত্‌লালেন সনৎবাবুকে। কোন আধ্যাত্মিক পন্থা কিছু নয়—নিতান্তই ব্যবহারিক।

সনৎবাবু লাফিয়ে উঠলেন একেবারে। আশ্চর্য, এই সোজা কথাগুলো মনে হয় নি তাঁর! শুধু তিনি কেন—এত বড় বড় উকীল ব্যারিস্টারগুলোও কি মূর্খ। আইনের এত বড় ফাঁকটা তাদের চোখে পড়ে নি!

তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে একেবারে সন্ন্যাসীর পায়ে দণ্ডবৎ লুটিয়ে পড়লেন, 'সত্যিই ভগবানের কৃপারূপে আপনি এসেছেন আজ আমাকে বাঁচাতে।'

সন্ন্যাসীর মুখে তেমনি রহস্যময় হাসি, প্রণামে বাধা দিলেন না বটে, কিন্তু মুখে বললেন, 'এর মধ্যে এমন কিছু ভগবৎ-কৃপা নেই, সোজাসুজি সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপার।'

সেই যে সন্ন্যাসীর পা জড়িয়ে ধরলেন সনৎবাবু, আর ছাড়লেন না।

তিনি ঐ সন্ন্যাসীর পরামর্শেই বাঁচলেন। ওঁর কথামতো ঠিক ঠিক চলে শুধু যে সেই ভয়ঙ্কর আসন্ন সর্বনাশ থেকে বাঁচালেন তাই নয়—তাঁর গায়ে এতটুকু আঁচড়ও লাগল না। যারা এসব ভেতরের কথা জানল না—তারা অবাক হয়ে তারিফ করতে লাগল সনৎবাবুর ক্ষুরধার বুদ্ধির। হ্যাঁ—এ রকম বুদ্ধি না হ'লে আর এত পয়সা করতে পারে মানুষটা!

সেই থেকেই ঐ সন্ন্যাসী বা সনৎবাবুর নবলব্ধ 'গুরুদেব'-এর প্রতিষ্ঠা এ বাড়িতে।

গুরুদেবকে আশ্রম ক'রে দিতে চেয়েছিলেন সনৎবাবু—বাড়ি, মন্দির—সব কিছু। কিন্তু তিনি কিছুই নিলেন না। যখন থাকেন এখানে তখন বেশ থাকেন—তবে কতদিন থাকবেন বলা মুশকিল। হঠাৎ মাঝে মাঝে চলে যান কোথায়। কোথা যান তা বলেনও না। যেমন নিজেই যান তেমনি নিজেই এসে হাজির হন।

সনৎবাবু হয়ত বলেন, 'ঠিকানাটা একটু যদি জানাতেন প্রভু—কোন বিপদে-আপদে পড়লে যাতে—'

'ভয় নেই। কোন বিপদ আপদ হবে না। আর তেমন প্রয়োজন হ'লে আমি নিজেই আসব। তুমি আমাকে ত্যাগ না করলে আমি তোমাকে ত্যাগ করব না।'

'আমি আপনাকে ত্যাগ করব—কী যে বলেন!'

জবাব দেন না গুরুদেব, মুচকি হাসেন।

উনি যখন এখানে থাকেন—উৎসব সমারোহের অন্ত থাকে না। জলের মতো পয়সা খরচ করেন সনৎবাবু। কীর্তন ভজন হোম পূজা—গুরুদেব মুখের কথা খসাতে না খসাতে সনৎবাবু সব ব্যবস্থা ক'রে দেন। ব্যক্তিগত আরাম বা সেবারও ত্রুটি নেই। লালরঙে ছোপানো উৎকৃষ্ট মুর্শিদাবাদ গরদের কাপড় ছাড়া পরেন না। পায়ে দেন দামী কাফ-লেদারের চটি।...শীতকালে গায়ে দেন পালকের লেপ। রবারের গদী উঠলে সর্বাগ্রে গুরুদেবের জন্যে কিনে এনেছেন সনৎবাবু।

এই গুরুদেবটির আকস্মিক আবির্ভাবে এবং তাঁকে নিয়ে এ হেন মাতামাতি শুরু হওয়ায় পাড়াতে জল্পনা-কল্পনার অন্ত থাকে না। বড়লোকের গুরু— দুচারজন বড়লোক শিষ্যও জোটে। বেশ ফ্যাশনেবল গুরুই হয়ে উঠতে পারতেন উনি—যদি না মাঝে মাঝে অমন সর্বজন-অগোচর হয়ে উঠতেন, অর্থাৎ ডুব মারতেন। দিনরাত গুরুদেবকে উপলক্ষ ক'রে নিজেদের দেখাতে না পারলে ফ্যাশন-দুরন্ত শিষ্যদের চলে না!

কিন্তু শিষ্য যা জুটল তা সবই ভিন্নপাড়ার লোক। এ পাড়ার লোকরা— সম্ভবতঃ অতিশয় নৈকট্য-হেতু, সন্দিগ্ধ হয়েই রইল। বরং বলা উচিত তাদের বিশ্বাস হ'ল—উল্‌টো দিক দিয়ে। অতি-বুদ্ধির গলায় দড়ি, এই প্রবাদটি সম্বন্ধে কারুর সন্দেহ মাত্র রইল না। যে যতবড় বুদ্ধিমান হোক, তাকে ঠকাবারও লোক পাওয়া যায়। আর এ হওয়াই উচিত—সনৎবাবুর পাপের পয়সা প্রায়শ্চিত্তে ব্যয় হওয়াই দরকার।

শুধু পাড়ায় নয়, কেমন ক'রে এই মতটা সনৎবাবুর বাড়িতেও মূল বিস্তার করেছিল। সনৎবাবুর সাংঘাতিক বিপদ থেকে উদ্ধারের আনুপূর্বিক ইতিহাস শুধু জানতেন মালতী। তিনিও সন্ন্যাসীকে ভগবানের মতোই ভক্তি করতেন। কিন্তু সে ইতিহাস সনৎবাবুকে ছোট না ক'রে কাউকে বলা যায় না বলেই বলতে পারেন নি। তাই ওঁদের এই ভক্তি বাড়াবাড়ি ও বোকামি বলেই মনে হ'ত ছেলেমেয়েদের কাছে; তারা অত্যন্ত বিদ্বেষের চোখে দেখত গুরুদেব নামক এই জীবটিকে। বিশেষতঃ সনৎবাবুর মেজ ছেলে বিমল—সে এই বিদ্বেষকে গোপন করবার চেষ্টা করত না। বাপ মায়ের একটু বেশী আদরের ছেলে, চিরদিন সব ব্যাপারে প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে বিবেচনা ক'রে কথা বলতে শেখে নি। সে গুরুদেবকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলত, 'ব্যাটা আস্ত ভণ্ড, জোচ্চোর! …যেমন বোকা পেয়েছে আমার বাবা-মাকে! কী বলব, ওঁদেরই বাড়ি, ওঁদেরই টাকা—নইলে উচিত শিক্ষা দিতে আমি পারতুম! হাত নিস্‌পিস্‌ করে ব্যাটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দিতে!'

কোন কোন দিন দৈবাৎ এই ধরনের কোন মন্তব্য সনৎবাবু বা মালতীর কানে গেলে তাঁরা ধমক দিতেন, ছেলেকে বেশী শাসন করতে না পেরে নিজেরা নিজেদের কান মলতেন—মন্দ কথা শোনবার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। কিন্তু ওঁদের

কানে যেত দৈবাৎই। প্রায় প্রত্যহই যাঁর কানে যেত সেই গুরুদেব শুধু হাসতেন। এমন কি সনৎবাবু বা মালতীর কাছেও অনুযোগ করতেন না।

বিমল দাঁত কিড়মিড় ক'রে বলত, 'দুকান-কাটা বেহায়া! এত অপমানের পরও দাঁত বার ক'রে হাসে কী ক'রে? আশ্চর্য!'

বছর দশেক কেটে গেছে ইতিমধ্যে—সন্ন্যাসীর আবির্ভাবের পর থেকে। গুরুদেবটি ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠেছেন বাড়িসুদ্ধ সকলের কাছেই। চাকর-বাকরদের খাটুনীর অন্ত থাকে না উনি থাকলে, সুতরাং তাদের রাগ হওয়া স্বাভাবিক। ছেলেমেয়েদের রাগ জলের মতো টাকা খরচ হয় বলে—যে টাকা তাদেরই একদিন পাবার কথা! কিন্তু সনৎবাবুর সে মনোভাব হয়ত চোখে পড়ে না—আর সন্ন্যাসী তা গ্রাহ্য করেন না।

এরই মধ্যে একদিন এক অঘটন ঘটে গেল।

বিমলের জলে ভিজে ম্যাচ দেখে খুব জ্বর এল। প্রবল জ্বর।

সনৎবাবু তখন কলকাতাতে নেই। বিমলের স্ত্রী বা ওর ভাইবোনেরাও কেউ নেই। আছেন শুধু মালতী।

সনৎবাবু এখন আর শুধু স্টিভেডোরের ব্যবসার মধ্যে আটকে নেই—তাঁর অসংখ্য কারবার সারা ভারতে বিস্তার লাভ করেছে। শিল্পপতি ঠিক নন—কারণ কল-কারখানা উনি বোঝেন না, করেনওনি—কিন্তু ধনকুবের বলা যায়। সুতরাং সর্বত্রই কর্মকর্তার প্রয়োজন। বড় ছেলে থাকে বোম্বেতে, সেখানের অফিস সে চালায়। সেজছেলে দিল্লীর অফিস দেখে, ছোট ছেলে কানপুরে। জামাইদেরও টেনে নিয়েছেন সনৎবাবু নিজের কাজেই। একজন থাকে কটকে, একজন মাদ্রাজে। আর সনৎবাবু পালা ক'রে সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। সেই কারণেই বিমলকে এখানকার অফিস নিয়ে আটকে থাকতে হয়। শাজাহান যে করণে দারাকে দিল্লীতে রাখতেন—সেই কারণেই সম্ভবতঃ বিমলকে কলকাতার বড় অফিসে কাজ দিয়ে রেখেছিলেন। স্নেহ বা বিশ্বাস, কোন্‌টা বেশি কে জানে!

সনৎবাবু সে সময়টা বোম্বে অফিসে ছিলেন। বিমলের স্ত্রী নীলিমা গিয়েছিল শ্বশুরের সঙ্গে বেড়াতে। বড় জায়ের সঙ্গে ওর খুব ভাব, সে টান তো ছিলই,

তা ছাড়া বিমল কলকাতাতে স্থাণু হয়ে থাকে বলে ওর কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয় না—এবার সে একরকম রাগারাগি ক'রেই শ্বশুরের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিল।

কেউই নেই—মালতীর একটু বিপন্ন বোধ করবার কথা। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মূর্তিমান আশ্বাসের মতো গুরুদেব ঠিক সেইদিনই কোথা থেকে এসে হাজির হলেন।

মালতী নিশ্চিন্ত হলেন।

'গুরুদেব দেখুন তো—ডাক্তার ডাকতে হবে কিনা।'

গুরুদেব বিমলের শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'দরকার নেই মা। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

বিমল সে সময় ঘুমোচ্ছিল। সে শুনতে পায় নি কথাটা, তাই রক্ষা।

মালতী কিন্তু নিশ্চিন্ত হলেন।…

পরের দিন বিমলের জ্বর আরও বাড়ল।

বিকেলের দিকে কেমন যেন অভিভূত আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না। আর যদি বা পাওয়া যায়—চোখ খোলে না একবারও। নিঃশ্বাসে কেমন একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ।

মালতী একটু ভয় পেলেন। কিন্তু সে আশঙ্কা প্রকাশ করতেও ভয়-সঙ্কোচ বড় কম নয়। গুরুদেব যে আশ্বাস দিয়েছেন।

তবু উদ্বিগ্ন অথচ সসঙ্কোচ-কণ্ঠে একবার তুললেন কথাটা, 'কী করব বলুন তো গুরুদেব? ডাক্তারকে কি খবর পাঠাব? ওঁকেও তো কথাটা জানানো দরকার।'

স্থির নেত্রে মালতীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন গুরুদেব, 'ডাক্তার ডাকার সত্যিই দরকার নেই মা। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর অংশে তোমার জন্ম; শোক কখনও তুমি পাবে না। ইষ্টের নাম স্মরণ ক'রে তুমি ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দাও—তা-ই যথেষ্ট।…তবে হ্যাঁ, সনৎকে একটা খবর দেওয়া দরকার বটে। ওর অফিসের ক্ষতি হচ্ছে। বরং এক কাজ করো—টেলিফোন ক'রে দাও, নাইট্ প্লেনে চলে আসতে পারে।'

এর পর মালতী আর ডাক্তার ডাকতে পারলেন না।

এধারে টেলিফোনের লাইন পেতে পেতে অনেক রাত হয়ে গেল। রাত্রের প্লেনের সময় রইল না। পরের দিন সকালের প্লেন ধরে যখন ওঁরা এসে পৌছলেন—তখন অপরাহ্ণ গড়িয়ে এসেছে।

সনৎবাবু ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলেন তিনি। নীলিমা পিছনে ছিল, সে আর্ত কান্নাটা চাপবার জন্য প্রাণপণে মুখে আঁচল পুরে দিল, তবু একটা অস্ফুট অব্যক্ত শব্দ বেরিয়ে এল।

অমন সুস্থ সবল জোয়ান ছেলে সনৎবাবুর—দুদিনে এ কী অবস্থা হয়েছে তার!

মাত্র তিনটি দিন—তাইতেই যেন পাত হয়ে বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। অজ্ঞান অচৈতন্য নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে, একেবারে মৃতবৎ। নিঃশ্বাসের সঙ্গে কেমন একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে; রীতিমতো শ্বাস কষ্ট হচ্ছে—সেটা বুঝতে দেরি হয় না।

সনৎবাবুও যেন একটা অব্যক্ত আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, তারপরই স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, 'এ কি কাণ্ড!··কোন ডাক্তার বসে নেই কেন?··· আমাকে খবর দাও নি কেন!'

মালতী অপরাধীর মতো মাথা নত ক'রে বললেন, 'ডাক্তার তো ডাকা হয় নি।'

'ডাক্তার ডাকা হয় নি! কী বলছ পাগলের মতো যা-তা?'

সনৎবাবুর কণ্ঠস্বর রীতিমতো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

'গুরুদেব যে বললেন, কোন ভয় নেই। ডাক্তার ডাকতে হবে না।'

'আর তুমি তাই ডাক্তার ডাকলে না!···ছেলেটার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও কি সময় হয় নি তোমার? দেখতে পাও নি কী অবস্থা হয়েছে?··· গুরুদেব বললেন? এসব ব্যাপারে গুরুদেব কি বোঝেন? আর ভয় না থাকলেই বা ডাক্তার ডাকতে বাধা কি ছিল? এত কি পয়সার অভাব হয়েছিল আমার!'

তখনই টেলিফোন তুলে ডাক্তারকে ডাকলেন সনৎবাবু।

তারপর পাগলের মতো ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। কাঁদছেন না তিনি ঠিকই—কিন্তু দুই চোখ দিয়ে তাঁর অবিরল জল গড়িয়ে পড়ছে।

নীলিমা মাটিতে পড়ে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

এর মধ্যে গুরুদেব কখন এসে দাঁড়িয়েছেন ঘরে—কেউই টের পায় নি।

তিনি তাঁর অভ্যস্ত শান্তস্বরেই বললেন, 'কেন ব্যস্ত হচ্ছ সনৎ, আমি এখনও বলছি, কিছু ভয় নেই।'

সনৎবাবু যেন হিংস্রভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন—গুরুর দিকে মুখ ক'রে প্রাণপণে মনোভাব চাপবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও অন্তরের বিরক্তি কণ্ঠে চাপা রইল না। বললেন, 'না গুরুদেব, এসব ক্ষেত্রে আপনার নাক গলানো উচিত হয় নি। রোগ হলে ডাক্তার ডাকতে হয়—পাঁচ বছরের শিশুও তা জানে। আপনি কেন তাতে বাধা দিতে গেলেন! আমাদের তবু সান্ত্বনা থাকত।...এ আপনি কি করলেন!...আত্ম-অহমিকার একটা সীমা থাকা তো দরকার!'

এইবার নীলিমা মুখ তুলল, নিরুদ্ধ গর্জনের মতো শোনাল তার কথাগুলো, 'আসলে উনি যা-তা বলতেন, সেই রাগেরই শোধ নিলেন আপনি ওঁকে মেরে ফেলে। পেয়েছেন মাকে ভালোমানুষ বোকা—তাই এমন ক'রে সর্বনাশটি পাকিয়ে তুলতে পেরেছেন।...এইবার আপনার স্বরূপ বোঝা গেছে।'

মালতী দুই হাত কানে চাপা দিয়ে বললেন, 'ছি বৌমা, কী যা-তা বলছ!'

'না মা। অপনার মতো অত ভক্তি আমার নেই। আর তা ছাড়া সর্বনাশ হ'লে আমারই হবে মা। আপনার আরও অনেক আছে, আমার ঐ এক। এখন সব দায়িত্ব আপনারও নয় মা—সেটা আপনার বোঝা উচিত ছিল!'

মালতী ঘর ছেড়ে যেন কতকটা ছুটেই পালিয়ে গেলেন।

সনৎবাবু কিন্তু একটি কথাও কইলেন না, নীলিমাকেও শাসন করবার চেষ্টা-মাত্র দেখা গেল না তাঁর!

গুরুদেব স্থির শান্তভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন, মুখে তাঁর তেমনি রহস্যময় হাসি।

ডাক্তারবাবুও ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলেন।

'এ কী কাণ্ড!' অস্ফুটস্বরে এই কথা কটা বলেই তিনি ব্যস্ত হয়ে স্টেথোস্কোপ বার করলেন।

পরীক্ষা করতে করতেই তাঁর মুখ আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। কান থেকে নলটা সরিয়ে গলাটা চাপবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে আবারও বললেন, 'এ

কী কাণ্ড! এতটা বাড়াবাড়ি হ'ল, আমাকে একটা খবরও তো দেন নি কেউ। কে দেখছিল? হোমিওপ্যাথি করছিলেন নাকি?' বলতে বলতেই অপাঙ্গে একবার সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে একটু ব্যঙ্গের সুরে বললেন, 'না কি দৈব চলছিল!'

অসহিষ্ণুভাবে সনৎবাবু বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ কতকটা তাই। ইন-ফ্যাক্ট দৈবও হয় নি! উনি বললেন ভয় নেই, সেই ভরসাতে আমার স্ত্রীও চুপ ক'রে বসেছিলেন।···কিন্তু কী হয়েছে তাই বলুন না!'

'হয়েছে ডবল নিমোনিয়া—both side-ই একদম জখম।···আমার তো—sorry—আমার তো মনে হচ্ছে আর কোন চিকিৎসা না করাই ভাল! It is too late!'

কথাটা খুব ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললেও নীলিমার কান এড়ায় নি। সে এবার ডুকরে কেঁদে উঠে পাগলের মতো মেঝেতে মাথা ঠুকতে লাগল।

সনৎবাবুও যেন জ্ঞান হারালেন। তাঁর এতদিনের অন্ধ বিশ্বাস ও ভক্তি কোথায় চলে গেল, রক্তনেত্র ক'রে গুরুদেবের সামনে এসে দাঁড়িয়ে কেমন একরকম ক্রূরকণ্ঠে বললেন, 'ঠিকই বলেছে বৌমা, আপনি এইভাবে ওর ওপর শোধ তুলতে চেয়েছিলেন। এতদিন উপেক্ষার ভাব দেখাতেন—সেটা ছলমাত্র। আসলে সমস্ত রাগ পুষে রেখেছিলেন। উঃ, কী সাংঘাতিক লোক আপনি! এই আপনার সন্ন্যাস!···মনের মধ্যে এত হিংসা চেপে রেখেছিলেন? কেন, কেন এ সর্বনাশ করতে গেলেন আমার!···এত যত্নে রেখেছিলাম আমি আপনাকে, সে কথাটাও ভুলে গেলেন! আমি কি তাহলে এতদিন ধরে বুকের মধ্যে কেউটে সাপই পুষেছি!'

ডাক্তারও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, 'It's a criminal offence, জেলে দেওয়া উচিত এ সব লোককে!'

একবার মাত্র কি ভ্রূ কুঁচকেছিল গুরুদেবের?···কোনকালেও কেউ যা লক্ষ্য করে নি।

শুধু তাঁর এই আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠে কেমন একরকমের আদেশের সুর ফুটে উঠল। তিনি বলে উঠলেন, 'দাঁড়াও ডাক্তার। তোমাকে একটা কথা প্রশ্ন করি, আগে খবর দিয়ে তোমাকে ডাকলে তুমি বাঁচাতে পারতে?'

'কেন পারতুম না। নিমোনিয়ার তো এখন অব্যর্থ ওষুধ বেরিয়েছে প্রায়। এখন তো সহজ হয়ে গেছে চিকিৎসা।'

'হ্যাঁ। তবু ঐ প্রায়। ও শব্দটাকে বাদ দিতে পারো না। প্রায় অব্যর্থ—কিন্তু একেবারে অব্যর্থ নয়। তোমার ছেলের গা গরম দেখে এসেছ না বেরোবার সময়? তাকে বাঁচাতে পারবে?…এই তো সূচনা তার। বরং যাবার সময়ই আরো বড় ডাক্তার কাউকে ডেকে নিয়ে যেও।…মানুষের সাধ্য কতটুকু ডাক্তার!…আত্ম-অহমিকার কথা বলছিলে না সনৎ, বড় বড় ডাক্তারের হাতে অজস্র লোক প্রতিদিন মরছে দেখেও তারা মানুষকে বাঁচাবার কথা মুখে আনে—এমন আত্ম-অহমিকা দেখেছ কোথাও?'

তারপর একটু থেমে নীলিমার দিকে চেয়ে বললেন, 'বৌমা—আমি ইষ্টের নাম ক'রে বলছি, তোমার স্বামীর ওপর কোন আক্রোশ কি কোন বিদ্বেষ আমি রাখি নি। আমি এখনও বলছি ও বাঁচবে। তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি বড় ডাক্তার কাউকে ডাকো, নয়তো ওঁকেই বলো ওষুধ ইন্‌জেকশ্যন্ দিতে।… এরই মধ্যে হাল ছেড়ে দেবার মতো কিছু হয় নি।…ডাক্তার, প্লীজ্—আর একটিবার ওকে ছাখো তো!'

তাঁর সেই কণ্ঠস্বরে কী ছিল—ডাক্তার যেন কতকটা অভিভূতের মতোই আবার গিয়ে রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসলেন। নলটা কানে লাগালেন আবার কতকটা অনিচ্ছাভরেই—যেন ফল কী হবে বসবার আগেই তা জানেন—কিন্তু দেখতে দেখতে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর মুখের ভাব বদলাতে শুরু করল। বিস্মিত অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বার-দুই বলে উঠলেন 'স্ট্রেঞ্জ। স্ট্রেঞ্জ!!'

তরপরই নল নামিয়ে ব্যাগ খুলে ইঞ্জেক্‌শ্যনের সরঞ্জাম বার করলেন।

ছুটে এলেন সনৎবাবু, 'কী দেখলেন, কী দেখলেন ডাক্তারবাবু? আশা আছে কি কিছু?'

'সত্যিই বড় আশ্চর্যের ব্যাপার তো মশাই। এ দু'মিনিট আগেই দেখলাম —এত ভুল হ'ল আমার? এখন কিন্তু সত্যিই অতটা খারাপ লাগছে না, অন্ততঃ হাল ছেড়ে দেবার মতো নয়। আমি একটা গ্লুকোজ-কোরামিন দিয়ে দিচ্ছি এখনই। আপনি একজন কাউকে রেডি থাকতে বলুন। এটা দেওয়া হয়ে গেলেই আমি কটা ওষুধ লিখে দেব—ছুটে গিয়ে কিনে আনবে। বরং

গাড়ি ক'রেই যাক।'

শুনতে শুনতেই এদিকে তাকিয়েছিলেন সনৎবাবু, কিন্তু গুরুদেব ততক্ষণে বেরিয়ে গেছেন কখন নিঃশব্দে। তাঁকে আর দেখা গেল না।

তাঁকে আর এ বাড়িতে দেখা গেল না কোনদিনই।

যেন উবে গেলেন তিনি। কেউই দেখতে পায় নি—কখন তিনি গেলেন।

অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন সনৎবাবু। সমস্ত গুরুভাইকেই খবর দিলেন। কিন্তু কেউই আর তাঁর খোঁজ পেল না। কোন স্থায়ী পাত্তাও জানা নেই তাঁর—কোথায়ই বা খোঁজ নেবে।

শেষে সনৎবাবু খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। তাতেও কোন ফল হল না।

এখন মনে হচ্ছে, এ জীবনে বোধহয় আর কখনও গুরুদেবের দেখা পাবেন না তিনি।

অথচ প্রয়োজন যে অফুরন্ত!

একবার ছু'পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনারও যদি অবসর পেতেন!

কিন্তু পাবেন না যে সে অবসর, তা-ও বোঝেন। তিনিই ত্যাগ করেছেন গুরুদেবকে। সেদিন যেটা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল, তাই ঘটল। গুরুদেবের সেদিনকার রহস্যময় হাসির অর্থটা আজ পরিষ্কার হয়েছে।

প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী ছিল সেই ডাক্তারের। তাঁর ছেলেকে সত্যিই তিনি বাঁচাতে পারলেন না। নিমোনিয়া রোগেই মারা গেল বেচারী। অনেক বড় বড় ডাক্তারই তো তিনি ডাকলেন—কিন্তু কোন ফল হ'ল না।

কতকটা তাঁরই নির্বন্ধাতিশয্যে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন সনৎবাবু। ডাক্তারের মনে হয়েছিল তাঁর ক্ষমা পেলে ছেলেটা বাঁচবে।

সেটা আর সম্ভব হ'ল না। দেখা পেলে হয়ত ক্ষমাও পেতেন। দেখাই পেলেন না যে!

শুধু বিমলই এখনও বলে, 'বোগাস্। ভালো হয়েছে লোকটা গেছে। বেঁচেছি আমরা। অলৌকিক শক্তি না আরও কিছু! হামবাগ! চিকিৎসা হয়েছে বেঁচে গেছি। ডাক্তারের কেস? ওটা কোইনসিডেন্স্ মাত্র। লাগে

তুক না লাকে তাক্। হঠাৎ লেগে গেছে।'

সন্ন্যাসের বিষ

বন্ধু যখন সন্ন্যাসী হয়—তখন সে আর ঠিক বন্ধু থাকে না। থাকা সম্ভবও নয়। সাদা কাপড়ে সামান্য একটু রঙের ছোঁয়াচ লাগলেই কি জানি কেন, একটা সুদূর এবং সুদুস্তর ব্যবধান রচিত হয়ে যায়। সন্ন্যাসী বন্ধু হয়ত বন্ধুই থাকে, কিন্তু গৃহস্থ আর কিছুতেই তার সঙ্গে আগের মতো অন্তরঙ্গভাবে মিশতে পারে না। একটা সম্ভ্রমের দূরত্ব থেকেই যায় দুজনের মধ্যে।

এটা সেদিন যেন আরও নতুন ক'রে অনুভব করলাম আমাদের নবগোপালকে দেখতে গিয়ে।

নবগোপাল আমার অনেকদিনের বন্ধু। একসঙ্গে আমরা বি. এ. পর্যন্ত পড়েছিলাম। তার পর আমি গেলাম ওকালতি পড়তে—নবগোপাল ঢুকল মাস্টারীতে। বিয়ে-থা করে নি, তা বিয়ের বয়স উৎরেও যায় নি একেবারে; আর দুদিন পরেই করবে ভাবছি, হঠাৎ একদিন শুনলুম বদরীনারায়ণের পথে কোথায় কোন্ সন্ন্যাসী গুরু পেয়ে দীক্ষা নিয়েছে—তার মাসকতক পরে শুনলুম, নবগোপাল নিজেও সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছে।

সেও হ'ল আজ বছর পাঁচেকের কথা। হঠাৎ এর মধ্যে একদিন অফিসে গিয়ে শুনলুম—কে এক সন্ন্যাসী এসেছেন, আমাদের অফিসে বড় সাহেবের ঘরে, ওঁর ঠিক গুরু না হ'লেও গুরুস্থানীয়—তাঁকে উঁকি মেরে দেখবার জন্য হৈচাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছে অফিসে; কাজকর্ম প্রায় বন্ধ।

কিছুদিন ওকালতি করার বৃথা চেষ্টা ক'রে আজ বছর পাঁচেক হ'ল এই ভাটিয়া ফার্মে ঢুকেছি আইন-উপদেষ্টা হয়ে। কিন্তু আমাদের বড় সাহেব যে টাকা আনা পাইয়ের (অধুনা নয়া পয়সার) বাইরে আর কিছু জানেন—তা কখনও মনে হয় নি। বিশেষত এই গুরু-রোগ—এ তো অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। বিস্ময় হ'ল, কৌতূহলও বোধ করলাম পর্যাপ্ত। কিন্তু তবু আমার পক্ষে ঠিক দেখতে যাওয়া সঙ্গত হবে কিনা ভাবছি, এমন সময় আমার যেটি ব্যক্তিগত কেরানী—ভবেশ বলে একটি ছেলে—ছুটতে ছুটে এসে খবর দিলে—'স্যার এ

সন্ন্যাসী বাঙালী, আমাদের যারা গিছল তাদের সঙ্গে বাংলাতেই কথা কইছেন। বলছিলেন, ওঁর নাকি কলকাতাতেই বাড়ি ছিল এককালে।'

ভাটিয়া মহাজনের বাঙালী গুরু!

তাজ্জব বটে!

এরপর কৌতূহল চেপে রাখা সত্যিই শক্ত। মনে মনে বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাবার একটা ছুতো খুঁজে নিয়ে শেষ পর্যন্ত উঠেই পড়লাম, এবং বড় সাহেবের ঠেলাদোরে ছুটো টোকা দিয়ে আমন্ত্রণের অপেক্ষা না ক'রেই ঢুকে পড়লাম।

কিন্তু পরক্ষণেই চমকে উঠতে হ'ল। মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'আরে এ যে গোপাল!'

নবগোপালও খুশী হয়ে উঠল দেখলুম, উঠে দাঁড়িয়ে একেবারে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল, 'সোমনাথ! আয়, আয়। তুই এখানে!'

'আমি এখানে চাকরি করি—কিন্তু তুমি—আই মীন আপনি—'

'আবার আপনি কি! আরে একটা গেরুয়াতেই আপনি!'

ততক্ষণে আমার বড় সাহেবও উঠে দাঁড়িয়েছেন। বোধহয় আমার প্রতি তাঁর সম্ভ্রমবোধের থারমোমিটার কয়েক ডিগ্রি উঁচুতে উঠে গিয়ে থাকবে। তিনি সসম্ভ্রমে পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি হলেন শ্রীমৎ স্বামী আত্মচৈতন্যানন্দ। আমার গুরুস্থানীয়।'

'আরে ওকে আর ঐ সব খটমট নাম শুনিয়ে কাজ নেই—ওর কাছে আমি অনেককালের গোপাল।' হেসে বলল নবগোপাল।

তবু—ঠিক সহজ হ'তে আর পারলুম কই! 'তুই' তো বেরোলোই না, 'তুমি' বলতেও প্রত্যেকবার আটকে আটকে যেতে লাগল। গোপালও বলতে পারলুম না শুধু—'গোপাল মহারাজ' ক'রে মানিয়ে নিলুম কতকটা। অথচ নবগোপাল তো ঠিক তেমনিই আছে। পরিবর্তনের মধ্যে কাছাখোলা গেরুয়া কাপড়, গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি এবং মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল। জটা নয়—অথচ গৃহস্থ ভদ্রলোকের সুবিন্যস্ত চুলও নয়, ছুটোর মাঝামাঝি।

আমার কথাবার্তা আড়ষ্ট হয়েই রইল, কিন্তু গোপালের কোন বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না—আলাপটা বলতে গেলে সে একতরফাই চালিয়ে গেল। সে

বেশির ভাগ সময়ই এখন হিমালয়ে থাকে, শীতের সময় উত্তর কাশীতে, গরমের সময় একেবারে তিব্বত সীমান্তের কী একটা জায়গায়। সমতলে বড় একটা নামে না, তবে এক-আধবার আসতেই হয় ভক্তদের আকর্ষণে। গত বছর বোম্বেতে এসে আমাদের বড় সাহেবের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়—সেই সময়ই এঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ ও আকিঞ্চনে ওকে কথা দিতে হয়—একবার কলকাতা আসবে। সেইজন্যেই এসেছে। বড় সাহেবের বিশ্বাস, গুরুজী একবার পায়ের ধুলো দিলে কাজ-কারবার ভাল চলবে—সেই কারণেই টেনে এনেছেন এখানে। আজকের রাতটা অবধি আছে কলকাতাতে—কাল ভোরের প্লেনে যাবে লক্ষ্ণৌ। সেখান থেকে পিলভিট হয়ে নিজের ডেরায় ফিরে যাবে। অর্থাৎ প্রায় রাজকীয় গতিবিধি।

প্রশ্ন করলুম, 'আছ কোথায়?···এঁর বাড়ি?'

'গ্র্যাণ্ড হোটেলে উঠেছি কাল। গৃহস্থের বাড়িতে আমার একটু অসুবিধাই বোধ হয়।···তাছাড়া বহু ভক্ত দেখা করতে আসে খবর পেলেই। ইনি থাকেন অশোক পার্কে, বড় একটেরে হয়ে পড়ে।'

গ্র্যাণ্ড হোটেলে! ঢোঁক গিললুম মনে মনে।

অনুতাপও একটু হ'ল। কী হ'ল আইন পড়ে আর চাকরি ক'রে। কেনই বা বিয়ে ক'রে ফেলতে গেলুম সাত-তাড়াতাড়ি। বৃত্তি হিসেবেও যদি সন্ন্যাস নিতুম তো ঢের ভাল হ'ত।

বেশিক্ষণ বড় সাহেবের ঘরে বসে থাকা যায় না। অগত্যা উঠে পড়তে হ'ল। বললুম, 'কালই চলে যাচ্ছ—নইলে বলতুম গরীবের বাড়ি একবার আসতে।···কত কথা জমে আছে, অনেক কিছু জানবারও ছিল। কিন্তু এত সময় কম!'

'তা তুইই আমার ওখানে আয় না। এখন ওখানেই ফিরব, কিন্তু বিকেলে আর সন্ধ্যায় আরও বহু লোক আসবে। তুই আটটা নাগাদ আসতে পারিস না? ঐ সময়টা আমি ফ্রী হব। অন্তত ঘণ্টাখানেক বসে গল্প করতে পারব।···আয়, কেমন? নিচে রিসেপ্‌শ্যনে খোঁজ করিস—আমি বলে রাখব এখন। তখনই লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবে আমার কাছে।'

অস্বীকার করতে পারলুম না। করার ইচ্ছাও ছিল না। সত্যিই অনেক

প্রশ্ন জমে আছে মনের মধ্যে, অনেক কৌতূহল!

ঈর্ষা? হ্যাঁ, তাও একটু বোধ করছি বৈকি!

হয়ত ঈর্ষা থেকেই এত কৌতূহল।

কাঁটায় কাঁটায় আটটায় গিয়ে হাজির হলুম। দেখলুম, স্বামীজির খাতির সর্বত্র। রিসেপ্‌শ্যন্ একেবারে তটস্থ। তৎক্ষণাৎ বেয়ারা দিয়ে লিফ্‌টে চড়িয়ে ওপরে পাঠিয়ে দিলে এয়ার-কণ্ডিশ্যন করা স্বামীজির ঘরে।

একটি ভদ্রলোক তখনও বসেছিলেন—হাতজোড় ক'রে, ভক্ত গরুড়ের মতো। আমি যেতেই গোপালও তাঁকে—যাকে বলে 'সামারিলি ডিসমিস্' ক'রে দেওয়া, তাই দিলে। বললে, 'আমার অনেকদিনের বন্ধু এসেছে। এঁর সঙ্গে এবার একটু গল্প করব। আপনি এখন যান তাহলে।'

'বাবা—আবার কবে দেখা পাব?' কাতরকণ্ঠে প্রশ্ন করেন তিনি।

'প্রয়োজন পড়লেই পাবেন। সময় বুঝলে আমি নিজেই আসব। যান।'

তিনি ঈর্ষাতুর নেত্রে একবার আমার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

দরজার কপাট নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে যেতে নবগোপাল বললে, 'নে, আরাম ক'রে বোস। সিগারেট খেতে চাস তো খেতে পারিস। তবে আমার ওসব চাষ নেই।'

যথাসাধ্য আরাম করে বসে সিগারেটও ধরালুম একটা। বললুম, 'তারপর?'

'তার পর আর আমার কি? কৌতূহল তো তোরই। কী বলতে চাস তুই-ই বল!'

'বলার কথা তো কতই। হঠাৎ সন্ন্যাসই বা নিতে গেলে কেন—আর কী-ই বা পেলে সন্ন্যাস নিয়ে—এইটেই তো বড় প্রশ্ন!'

একটুখানি চুপ ক'রে বসে রইল নবগোপাল, তারপর বললে, 'দ্যাখ্, ছেলে-বেলা থেকে মার মুখে শুনতুম গুরু মানুষের ঠিকই থাকেন—সময় হলেই দেখা দেন। কথাটা বিশ্বাস করি নি। দেখা যেদিন হ'ল—সেইদিনই বুঝলুম।

চুম্বক যেমন ক'রে লোহাকে টেনে নেয় তেমনি ক'রেই টেনে নিয়ে গেলেন। কেন যাচ্ছি ওঁর সঙ্গে, কোথায় যাচ্ছি—কিছুই ভাববার সময় পাই নি। এমন কি যে সঙ্কল্প নিয়ে গেছি তাও যে সারা হ'ল না, ব্যাস-চটি থেকে ফিরে এলাম—সেজন্যও কোন দুঃখ বোধ করি নি···ঠিক মন্ত্রমুগ্ধের মতো চলে গেছি। এতগুলো লোকের মধ্যে কেন যে ওঁকেই চিনতে পারলাম গুরু বলে, বড় সাধক বলে—তাও বুঝতে পারি নি - সেদিনও না, আজও না। আর তিনিই যে কেন আমাকে বেছে নিলেন—! অবশ্য পরে বলেছিলেন, তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম ভাল আধার বলে। তাছাড়া তোমার সঙ্গে আমার জন্মান্তরের পরিচয়, তুমি চিনতে পার নি, কিন্তু আমি চিনেছি।·· সেইদিন থেকেই তাঁর পায়ে বিকিয়ে বসে আছি সোমনাথ, তিনি যা করাচ্ছেন তাই করছি। আমার কোন স্বাধীনতা নেই, আমি তা চাইও না!'

এই পর্যন্ত বলে একটু চুপ করল নবগোপাল।

আমি রুদ্ধনিঃশ্বাসে শুনছিলাম। সে থামতে না থামতে প্রশ্ন করলাম, 'তার পর—তাঁর সঙ্গে কোথায় গেলে?'

'প্রথমেই তিনি নিয়ে গেলেন তাঁর আশ্রমে—হিমালয়ের এক নিভৃত প্রত্যন্তে। প্রায় কৈলাসের কাছাকাছি। রূপকুণ্ডের কথা কাগজে পড়েছিস নিশ্চয়ই—সে রূপকুণ্ড আমাকে গুরুদেবই প্রথম দেখান। ঐ মহাশ্মশান বাঁয়ে রেখে গিয়েছিলাম আমরা, বেশ মনে আছে। দীর্ঘ পথ, যেমন কষ্টকর, তেমনি বিপদসঙ্কুল। কিন্তু বিশ্বাস কর্ তুই—সত্যিই বলছি, এতটুকু কষ্ট হয় নি কোনদিন। আমার সঙ্গে যা শীতবস্ত্র ছিল তা সামান্যই—কেদার-বদরীরও উপযুক্ত নয় হয়ত। আর গুরুদেবের তো কিছুই ছিল না। বিছানা-পত্রও ফেলে রেখে গিয়েছিলাম, গায়ে যা ছিল তাই, হাতে দড়িবাঁধা একটা লোটা আর লাঠি।

'কিন্তু তবু পথে কোথাও এতটুকু অসুবিধা ভোগ করতে হয় নি। যখন যেখানে রাত হয়েছে সেখানেই একটা না একটা গুহা পেয়েছি। আর সে সব গুহাতেই যে কবে কে রাশি রাশি শুকনো কাঠ আর ঘাস জড়ো ক'রে রেখে গিয়েছিল জানি না, আমরা গিয়েই ঘাস বিছিয়েছি, আগুন জ্বেলেছি। গুহার কোণে কলসীসুদ্ধ জলও পেয়েছি—আর দেখেছি সেই অন্ধকারে কোথা থেকে

পাহাড়ীরা এসে গরম পুরী, গরম দুধ, গরম চা জুগিয়ে গেছে। অথচ এমন সব স্থানে রাত কাটিয়েছি যার কোনদিকে একশো মাইলের মধ্যে কোন লোকালয় নেই ; গাছ তো দূরের কথা, একটি তৃণ পর্যন্ত নেই। এই ভাবেই পৌঁচেছি তাঁর আস্তানায়—সে ঠিক কোথায় এবং কতদূরে তা আজ আর বলতে পারব না। কারণ তিনিই নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনিই আবার লোকালয়ে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। পায়ের জুতো ছিঁড়ে গেছে—তাঁর গুহাতে নতুন জুতো মোজা পেয়েছি। সেখানে শীতে কোন কষ্ট পাই নি—গরম জল চা খাবারের অভাব হয় নি। বোধ হয় চার-পাঁচ মাস ছিলাম সেখানে—ঠিক কতদিন ছিলাম তার কোন হিসাবও রাখি নি। সংখ্যা-গণনার অতীত, সমস্ত হিসাবের বাইরে—এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে ছিলাম আমরা। তিনি বলেছিলেন, "এস"—তিনিই এক সময় বললেন, "যাও"। এর বেশি কিছু বলেন নি তিনি। শুধু প্রশ্ন করেছিলাম, "আবার কবে দেখা পাব?" তিনি বলেছিলেন, "যেদিন মনে মনে ডাকবে আমাকে। তবে বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে ডেকো না।" এই হ'ল আমার দীক্ষার ইতিহাস। তারপর ফিরে এসেছিলাম—এখানকার সব গুছিয়ে বিদায় নিতে। সন্ন্যাস তিনি দেবেন না বলে দিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে কে দেবে তাও তিনি বলে দিয়েছিলেন। এখান থেকে বিদায় নিয়ে সেইখানেই গিয়েছিলাম—উত্তর কাশীতে গিয়ে পুরোপুরি বিধিসম্মত সন্ন্যাস নিই। তিনি আমার গুরুও বটে, গুরুভাইও বটে। তিনিও আমার সেই অলৌকিক গুরুদেবেরই শিষ্য।'

'অলৌকিক?' একটু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সঙ্গেই প্রশ্ন করি।

'লোকোত্তর বলাই উচিত।' নবগোপাল উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'যা শুনলি সোমনাথ—তার পরেও কি তুই তাঁকে সাধারণ মানুষের, এই পৃথিবীর অপর জীবের মধ্যে ফেলতে পারিস? সাধারণ একটা পাতলা চাদর গায়ে আর খালি পা—বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছি তাঁকে দিনের পর দিন, কিছুই হয় নি। গুহাতে থেকেছি রাত্রে, কিন্তু তাঁকে ঘুমোতেও দেখি নি, কম্বলও গায়ে দিতে দেখি নি। প্রথম বরফের পথে পা দিয়ে আমার খুব শীত করেছিল—আমার দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে শুধু বললেন, "খুব শীত করছে?" তারপর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "আর করবে না।" সত্যিই আর করে নি।

এ কে কী বলবি তুই ?'

উত্তরটা এড়িয়ে গেলুম। একটু চুপ ক'রে থেকে বললুম, 'তা, তুমি কি পেলে ?'

'কী পেলুম ?' মুচকি হাসল নবগোপাল। তারপর জানলার কাচের মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী পেলুম তা কি নিজেই জানি যে তোমাকে বলব। হয়ত কিছুই পাই নি। আর পাওয়া কি এতই সহজ ? কত লোক কত কাণ্ড করেছে এই পাবার জন্যে—জন্মজন্মান্তর ধরেই করেছে—কিন্তু কিছুই পায় নি। তবে পাই বা না পাই—একটা কথা তোকে বলতে পারি সোমনাথ, এই পাওয়ার চেষ্টাতে যে সুখ আছে, যে শান্তি আছে—মানুষের জীবনে তাই-ই ঢের।'

'না না—সে পরম পাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করি নি। সাধু-সন্ন্যিসী না-ই হই, ঘোর নারকী পাতকী বদ্ধ বিষয়াসক্ত জীব যাই হই না কেন—এটুকু জানি যে সে "পাওয়া" অত সহজ নয়। আমি বলছি বিভূতি-টিভূতি কি পেলে ? গুরুদেব তাঁর অলৌকিক শক্তি দিয়েছেন কিছু ?…না শুধুই আধ্যাত্মিক।'

নবগোপাল গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, 'বিভূতি চাইতেও নেই, সে শক্তি দেখাতেও নেই। ওতে বড় ছোট হয়ে যেতে হয়। ওটা হচ্ছে এগিয়ে যেতে যেতে পিছিয়ে আসা। কোন মানুষ তেতালা যাবার সংকল্প ক'রে সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে চারটে সিঁড়ি উঠেই যদি ভুলে বসে থাকে—আহ্লাদে আটখানা হয় তো তাকে যতটা নির্বোধ বলবে—সাধকের ঐ শ্রেণীর বিভূতিতে খুশী থাকাও ঠিক ততটাই নির্বুদ্ধিতা। সেই পরমহংসদেব অষ্টসিদ্ধাই চাওয়াতে মা কি জবাব দিয়েছিলেন মনে নেই ? ওটা বড়ই তুচ্ছ জিনিস সোমনাথ।'

বললাম, 'তা হয়ত ঠিকই। কিন্তু ভাই আমরা সামান্য প্রাণী। তেতালার ওপর অত লোভ আমাদের নেই—সেটা সুদূর। আমরা একতলার ঐ চারটে সিঁড়িতেই খুশী। আমাদের কৌতূহলই বল, লোভই বল—সিদ্ধির থেকে সিদ্ধাইতেই বেশি।…আর সত্যি কথা বলতে কি—মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করারও ওটা একটা প্রধান অস্ত্র, নয় কি ? তুমি এতক্ষণ যা বললে—গুরুদেবের যা অলৌকিক মহিমার কথা প্রচার করলে—সবই কি ঐ বিভূতির

কথাই নয়? তুমি তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির কথা কতটুকু বলেছ—আর বললেই বা কি বুঝতুম?

একটু বোধ হয় অপ্রতিভ হল নবগোপাল। বললে, 'তা ঠিক। হয়ত সেই ভাবেই প্রলুব্ধ করতে চেয়েছি তোমাকে, তোমার সম্ভ্রম উদ্রেক করাতে চেয়েছি। ঠিকই—তিনি সিদ্ধপুরুষ শুধু এইটুকু বললে কীই বা বুঝতে!'

ওর সেই অপ্রতিভতার সুযোগ নিতে ছাড়লুম না। সঙ্গে সঙ্গে বললুম, 'সেই কথাই তো বলছি। এখন তোমার কথা একটু বল দিকি। কী শক্তি বা বিভূতি লাভ করলে!'

ততক্ষণে সামলে নিয়েছে নবগোপাল। বললে, 'আমি যা বিভূতি বা শক্তি পেয়েছি তা তো দেখছই। আমার মতো একাত্তর টাকা মাইনের ইস্কুল মাস্টার গ্র্যাণ্ড হোটেলে বাস করছি, তোমার বড়-সাহেব আমায় প্লেনে ঘোরবার টিকিট কেটে দিচ্ছে—এইটেই কি যথেষ্ট নয়। এই তো প্রত্যক্ষ ফল।'

নবগোপাল হাসল খানিকটা।

আমি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ওর হাতটা চেপে ধরলুম, 'না ভাই, অত সহজে আমাকে ভোলাতে পারবে না। এ যা বিভূতির কথা বলছ—এ গুরুদত্ত বিভূতি নয়। এ গেরুয়া রংটারই বিভূতি। চারিদিকেই তো দেখছি—এদেশে এখনও গেরুয়ার শক্তি অপরিসীম।...ওটা কিছু নয়। অমন গুরু তোমার, স্বেচ্ছায় এসে দেখা দিয়ে টেনে নিয়ে গেছেন, আবার ভাল আধার বলে স্বীকার করেছেন, কাছে রেখে শিক্ষা দিয়েছেন—তাঁর অমন বিভূতির কিছু যে পাও নি—এ আমি বিশ্বাস করি না।'

নবগোপাল গম্ভীর হয়ে গেল। একটু যেন বিব্রতও হ'ল। বললে, 'কিছু যে পাইনি তা-ই বা কেমন ক'রে বলি। পেয়েছি। কিন্তু সে কথা থাক! অন্য কথা বল।'

'না ভাই, আমি একটু দেখতে চাই। একটা কিছু, সামান্য কিছু দেখাও। ছেলেবেলা থেকে শুনেই আসছি—চোখে দেখলাম না এখনও। বড় কৌতূহল। সত্যিই কি এ পথে শক্তি আছে? এমন অসাধারণ অমানুষিক শক্তি!'

'যা শুনেছ সোমনাথ, এতকাল ধরে এত লোকের মুখে—তা সব মিথ্যা এমনই বা ভাব কেন? নিশ্চয়ই সত্য। তবে সত্য-মিথ্যা জড়ানো জগৎ, কোথাও কোথাও হয় তো—কিছু ভেল, কিছু ধাপ্পাবাজী চলে। তা নিয়ে মাথা ঘামিও না।'

আমার যেন কেমন একরকম ঝোঁক চেপে গেল। আমি ওর হাত দুটো আরও জোরে চেপে ধরলুম, 'না ভাই গোপাল—অত সহজে আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। তুমি অনেক জান, অনেক পেয়েছ, আমাকে একটা কিছু দেখাও—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, দ্বিতীয়বার অনুরোধ করব না আর।'

একটুখানি ভাবল নবগোপাল। তারপর বলল, 'বেশ, বল কী দেখতে চাও।'

'কী পার তুমি তা তো জানি না। একটু অন্ততঃ খুলে বল সেটা—তবে তো ফরমাশ করব।'

'ছিঃ! এসব কথা কি বলবার! আত্মশ্লাঘা হয় যে। তা ছাড়া গুরুর নিষেধও আছে—এসব কথা বলে বেড়াতে।'

আমি অনেক ভাবলাম। কী ঠিক জানতে চাইব—কী প্রমাণ চাইব ওর অলৌকিক গুরুদত্ত ক্ষমতার।

শেষে আর কিছু না পেয়ে হঠাৎ বলে বসলাম, 'তোমাদের শুনেছি, যাঁরাই সাধনমার্গে কিছু অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদেরই খানিকটা দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়। বল তো এখন এই মুহূর্তে আমার স্ত্রী কি করছেন!...আমি ঘড়ি দেখে রাখছি—বাড়ি গিয়ে মিলিয়ে নেব।'

একটু মুচ্‌কি হাসল নবগোপাল, তার পরই কয়েক মিনিটের জন্য যেন পাথর হয়ে গেল। মুখ-চোখ ভাবলেশহীন, অথচ সবটা জড়িয়ে কেমন যেন একাগ্র তন্ময় ভাব ফুটে উঠল একটা।

তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তিনি এখন বসে চিঠি লিখছেন। তোমার শোবার ঘরে বসে, টেবিল ল্যাম্পের আলোতে চিঠি লিখছেন। ঘরের বাঁদিকে খাটটা—সেখানে ছেলেমেয়েরা ঘুমোচ্ছে, তার ওধারে—মাথার দিকে যে ফালিপানা জায়গাতে স্যুট্‌কেশগুলো আছে স্তূপাকার করা, সেইখানে বসে খুব দ্রুত চিঠি লিখছেন।'

এত রাত্রে চিঠি লিখছে নমিতা।

সে কি! কাকে লিখছে! এমন কি জরুরী চিঠি যে ঐভাবে দ্রুত লিখছে।

'আচ্ছা, কি লিখছে আর কাকে লিখছে বল তো।'

সেই কঠোর একাগ্র ভাবটা মিলিয়ে এল ক্রমশঃ। আস্তে আস্তে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে এল নবগোপাল। কিন্তু মুখে যে কেমন একটা অন্ধকার ছায়া নামল সেই কঠোর একাগ্রতার পরিবর্তে। একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল, 'সেটা আর না-ই বা জানলে সোমনাথ। ছ্যাখ, এ সন্ন্যাসের বিভূতি গৃহে নিয়ে যেতে চেয়ো না। শান্তিভঙ্গ হবে। সন্ন্যাসের বিষ আছে—গৃহীর পক্ষে এসব মঙ্গলজনক নয়।'

'তুমি এবার আমাকে ছেলেভোলাতে শুরু করলে। প্লীজ, প্লীজ গোপাল বল—প্লীজ!'

নবগোপাল অদ্ভুত দৃষ্টিতে একবার চাইল আমার মুখের দিকে। তারপর বলল, 'স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বড় বিচিত্র সোমনাথ। বাইরে বড় সুন্দর, বড় মিষ্ট। হয়ত সব মানুষেরই তাই। ভেতরটা খোঁজ করতে গেলে অনেক সময়ই ঠকতে হয়। কারুর মনের কথা না জানাই ভাল!...আমি বরং একটা কাজ করি—কাল গোয়ালা-বাজার পত্রিকায় প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কী বেরোবে—তার কয়েক লাইন শুনিয়ে দিচ্ছি—তুমি মিলিয়ে নিও।'

নবগোপালের এই ভাবটা আমার ভাল লাগল না। তার এই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা—এই বিচিত্র দৃষ্টি এবং উপদেশের এই ভাষা—সবটাই একটা অস্বস্তিকর ইঙ্গিত করছে। আমার মাথা আগুন হয়ে উঠল নিমেষে—আমি সব ভুলে একেবারে ওর সামনে কার্পেটের ওপর হাঁটু গেড়ে বসলাম।

'গোপাল ভাই, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে আর সংশয়ে রেখো না। কী লিখেছে বল—প্রথম চারটে লাইন অন্ততঃ!'

নবগোপালের মুখটা আরও গম্ভীর, আরও ম্লান হয়ে এল। বরং বলা চলে বেদনার্ত হয়ে উঠল। সে আস্তে আস্তে বলল, 'কী পাগলামি করছিস সোমনাথ, উঠে বোস।'

'আগে তুমি বল—'

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর বলল, 'তোর বউকে তুই ভালবাসিস?'

'হ্যাঁ বাসি। আর কোন মেয়েকে কোন দিন এত ভালবাসি নি।'

'তাকে তুই বিশ্বাস করিস?'

'করি। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোথাও কোন আবরণ কোন মিথ্যা নেই। আমার জীবনের সব কথা সে জানে, আমিও জানি তার সব কথা, পারফেক্ট হারমণি আছে আমাদের মধ্যে।'

'তাহলে বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকেই জিজ্ঞাসা কর না—কী লিখেছে আর কাকে লিখেছে সে!

আবারও সেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা। আবারও একটা অন্ধকার ইঙ্গিত।

মাথা খারাপ হয়ে যাবে নাকি আমার।

হঠাৎ যেন খুনই চড়ে গেল মাথায়। ওর হাত দুটো সজোরে চেপে ধরলুম—এত জোরে যে, সে একটা 'আঃ' শব্দ ক'রে উঠল—বললুম, 'বল গোপাল, বলতেই হবে তোমায়—নইলে আমি ছাড়ব না।'

তবুও নবগোপাল তেমনি বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। বললে, 'সাধক জীবনের এই দিকটা বড় ঘৃণ্য সোমনাথ—এ শক্তি শুভ শক্তি নয়। একে না ঘাঁটালেই ভাল করতিস।...যা ভাল বুঝিস—কিন্তু একটা প্রতিজ্ঞা আমার এই গা ছুঁয়ে তোকে করতে হবে। বল—এ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কোন অশান্তি করবি না—তার কাছে কোন কৈফিয়ৎ চাইবি না। বল্, প্রতিজ্ঞা কর—!'

'করছি। কিছু বলব না তাকে, কোন কৈফিয়ৎ চাইব না। কোন অশান্তি হবে না—প্রতিজ্ঞা করছি তোমাকে ছুঁয়ে।'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে তার গদী-আঁটা আসনে ঠেস দিয়ে বসল, তারপর ডবল কাচের মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বলতে লাগল—

'তোমাকে এতদিন চিঠি লিখতে পারি নি—তার জন্যে কিছু মনে ক'রো না, লক্ষ্মীটি। সংসারের চাপ এত যে লেখবার সময়ই পাই না। তাছাড়া একা বসে আড়ালে লিখব—এমন অবসরও দুর্লভ। আজ উনি এক সন্ন্যাসী বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন—রাত হবে ফিরতে। ছেলেমেয়েরাও ঘুমিয়ে

চিঠি লিখতে ভরসা হয় না। এ মাসে তোমাকে কিছু পাঠাতেও পারব না। তার জন্যে যেন রাগ ক'রো না—গত মাসে অতগুলো টাকা পাঠাতেই আমার কিছু দেনা হয়ে গেছে—সংসার খরচ থেকে কিছুই বাঁচে না আর বিশেষ। এক ওঁর পকেটমারা—তাই বা কী থাকে আজকাল ?'

এই পর্যন্ত একটানা সুরে পড়ে চুপ করে নবগোপাল।

আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। সর্বাঙ্গে যেন বিছা কামড়াচ্ছে, এত জ্বালা—কানে যেন কে গরম সীসে ঢেলে দিচ্ছে—এত যন্ত্রণা, তবু শুনছি। না শুনে পারছি না। হয়ত আরও বললে শুনতাম। আরও শুনলে খুশী হতাম। ব্যথারও যে এত আকর্ষণ, এত মোহ আছে—আজ এই প্রথম জানলাম ভাল ক'রে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করলাম, 'তারপর ?'

নিজের গলা নিজের কানেই শোনাচ্ছিল যেন সাপের হিস্ হিস্ শব্দ।

'তারপর আর জানি না—পারব না এখন পড়তে। চিঠি শেষ হয়ে গেছে—তুলে রেখেছে স্যুটকেশে।'

'আচ্ছা, কাকে লিখছে ?'

'তা জানি না। চিঠিতে কোন সম্ভাষণ কি শিরোনামা নেই।'

উঠে দাঁড়াল একেবারে নবগোপাল।

'তুই এবার যা সোমনাথ। আমাকে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তোকে ডেকে না আনলেই ভাল হ'ত।'

সে দোরের কাছ অবধি এগিয়ে এল আমার সঙ্গে।

কী ক'রে হোটেল থেকে বেরিয়েছি, রাস্তা পেরিয়ে গড়ের মাঠে এসে বসেছি তা জানি না।

এখন নয়, এখন নয়, একটু পরে—এই শুধু জপ করছি মনে মনে। এখন ফিরে গিয়ে নমিতার চোখের দিকে চেয়ে সহজ ভাবে কথা কইতে পারব না। তার চেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়লে যাব—যখন সে আমার মুখের ভাব অত লক্ষ্য করবে না—বেশী কথা বলার দরকার হবে না।

নমিতা এই চিঠি লিখলে! নমিতা! একি সত্যি? একি সম্ভব?

কাকে লিখলে? কে সে? পুরুষ—না স্ত্রী?

ভাই? প্রণয়ী? অথবা অপর কেউ!

আমাকে গোপন ক'রে সে টাকা পাঠায়! ঋণ ক'রে!

ছেলেকে সুদ্ধ গোপন ক'রে চিঠি লেখে।

না—না। এ সব মিথ্যে। ধাপ্পাবাজী। গাঁজা।

আজ দশ বছর ঘর করছি নমিতার সঙ্গে—দুজনে একাত্ম হয়ে গেছি। কারুর কাছেই কারুর কোন কথা গোপন নেই।

আমরা ভালবাসি পরস্পরকে—বুঝেছ সন্ন্যাসী—ভালবাসি।

তোমার সেইটাই ঈর্ষা, তাই তুমি চাও কৌশলে আমাদের মধ্যে অশান্তির বীজ বুনে দিতে। এটা সব ছল। উঃ, কী ধড়িবাজ তুমি। কেমন কৌশলটাই না করলে! ঠগ, ধাপ্পাবাজ কোথাকার।

অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

কথাটা মনে করার সঙ্গে সঙ্গে শান্তি পেলাম অনেকটা।

ওর মতলব আমি ধরে ফেলেছি। এই ক'রে ও আমাদের সংসারের শান্তি নষ্ট করতে চায়। নিজে যা পেল না, যা ভোগ করতে পারল না—তা আমরাও যাতে না ভোগ করতে পারি, সেই চেষ্টা।

হন্ হন্ করে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। ট্রামে চড়া বা বাসে চড়ার কথা মনেও হ'ল না। হেঁটে গলদ্ঘর্ম হয়ে বাড়ি পৌঁছলাম।

তারপর থেকে কেবলই সহজ হবার চেষ্টা করছি। স্বাভাবিক হ'তে গিয়ে যে অস্বাভাবিক হয়ে পড়ছি সেটা বুঝেও কিছুই করতে পারছি না।

নমিতা অবাক হয়ে গেছে। প্রথম অবাক হয়েছে আমি পৌঁছতে—'কী গো, তোমার এমন চেহারা কেন? চোখ-মুখ লাল! চুলগুলো পাগলের মতো খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে, ঘেমে নেয়ে উঠেছ, ব্যাপার কী?'

উত্তর দিয়েছি, রসিকতা ক'রেই উত্তর দিয়েছি / 'বাড়িতে বসে আজ মজা ক'রে পায়ের ওপর পা দিয়ে, তুমি কি বুঝবে! হয়ত শুয়ে ছিলে, নয়ত বই পড়ছিলে—পরিশ্রম বলতে তো এই। আমাকে এই এতটা পথ হেঁটে আসতে হয়েছে। চেহারা কি তার পরেও ফুলের মতো থাকবে তুমি আশা কর?'

একটা ছায়া কি পড়েছিল নমিতার মুখে? একটা আতঙ্কের ছায়া?

কিন্তু পড়লেও সে খুব স্বল্পস্থায়ী। ও বলেছিল, 'তুমি হেঁটে এলে নাকি এতটা পথ? কেন গো?'

'কেন আবার কি! কলকাতা শহরের ট্রামে-বাসে ওঠা যায়? যাও না, একবার চেষ্টা ক'রে দেখই না!'

আরও কত কি বলেছি। পাগলের মতো আবোলতাবোল। হা-হা ক'রে হেসেছি অকারণেই।

নমিতা ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে দেখেছে বার বার। বার বার প্রশ্ন করেছে—'তোমার কি হয়েছে বল তো? সিদ্ধি খেয়েছ নাকি?...না কি অন্য কোন নেশা করেছ? ব্যাপারটা কি খুলে বল দিকি!'

ব্যাপারটা কি বলতে পারি নি। পারবও না কোন দিন। সন্ন্যাসীর কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি। তাকে ছুঁয়ে শপথ করেছি। বলতেও পারব না—প্রশ্ন করতেও পারব না।

তাই কিছুই বলতে পারি নি। হেসেছি, রসিকতার চেষ্টা করেছি—আর ভাবছি কোন্ স্যুটকেশটায় আছে? ওপরেরটায়? মাঝেরটায়? ঐটেতে থাকাই সম্ভব—ওটা ওরই, ওরই টুকিটাকি জিনিস থাকে ওতে। আমি কোন দিন খুলি না।

আচ্ছা ও ঘুমোলে কি উঠে খোলা যায় ওটা?

ঘুম ভাঙবে না ওর?

যদি ভাঙে তো কী বলব?

বলব ছুঁচ খুঁজছি! পায়ে চোঁচ ফুটেছে তাই।

যদি বলে ছুঁচ তো ঐ কুলুঙ্গীতেই আছে?

কাল সকালে এক সময় খুলব—যখন ও বাথরুমে যাবে কাপড় কাচতে?

যদি ছেলেটা উঠে পড়ে তখন? যদি মাকে বলে দেয়?

কাল দুপুরে দেখব?

অসুখ বলে বাড়িতে বসে থাকব?

ভেবেছি, কেবলই ভেবেছি। কী উপায়ে দেখা যায় চিঠিখানা।

আবার ভাবছি—দরকার নেই। যদি সত্যি হয়—প্রশ্ন করতে পারব না,

কৈফিয়ৎ চাইতে পারব না। অথচ তার পরেও কি নমিতার সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ভাবে স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘর করতে পারব ?

এখনও ভাবছি, নমিতার পাশে শুয়ে শুয়ে—দ্রুত ভাবছি।

নমিতা একটানা বকে যাচ্ছে। এবার পুজোয় কী কী কিনতে হবে—তারই লম্বা ফর্দ দিয়ে চলেছে। এবার নাকি ওর বোনপোদেরও পোশাক দিতে হবে।

আমি ভাবছি ঘুমের ওষুধ একটা খাওয়ালে হ'ত ওকে—

স্যুটকেশটা নিশ্চিন্ত হয়ে খোলা যেত।

এও বুঝতে পারছি খুলতে আমাকে হবেই। দেখবই কী আছে স্যুটকেশে।

যদি চিঠি থাকে তো কাকে লিখেছে, কী লিখেছে।

তারপর ?

যদি সন্ন্যাসীর কথা সত্য হয়—তখন কী করব ?

সেইটেই বুঝতে পারছি না কিছুতে।

এ জন্মের পাওনা

ব্যাপারটা ঠিক কী ঘটল—জয়ন্ত ঘোষাল প্রথমটা বুঝতেই পারেন নি। সামান্য জ্বর—গায়ে হাতে ব্যথা, ইনফ্লুয়েঞ্জাই। শুধু বুকের ব্যথাটার জন্যেই ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। ডাঃ সেনগুপ্ত বড় ডাক্তার—ইনফ্লুয়েঞ্জায় তাঁকে কেউ ডাকে না। কিন্তু জয়ন্ত ঘোষালও তো নেহাত কেউকেটা কেউ নন, তাঁর জীবনের দাম আছে। তিনি সেনগুপ্তকেই ডেকেছিলেন। ডাক্তার এসেছিলেন হাসতে হাসতে—মশা মারতে কামান-দাগা নিয়ে রসিকতাও করেছিলেন দু-একটা—কিন্তু বুকে চোঙা বসাবার পর একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। মিনিট পাঁচেক ধরে পরীক্ষা ক'রে বলেছিলেন—'বুকে একটু প্যাচ্ বসেছে দেখছি। সামান্যই অবশ্য, তবু পেনিসিলিন দেওয়াই ভাল। পেনিসিলিন নিয়েছিলেন কখনও এর আগে ? রি-য়্যাকশন হয় না তো ?'

'কিছু না, কিছু না। বহুবার নিয়েছি।' জবাব দিয়েছিলেন জয়ন্ত ঘোষাল।

'তাহলে একটা আমি দিয়েই যাই, ব্যাগে আছে। কাল আর একটা দিলেই হবে। আনিয়ে রাখবেন।'

তারপর ধীরে সুস্থে সিরিঞ্জ খুলে ইন্‌জেকশ্যনের তোড়জোড় করেছিলেন।

জয়ন্ত ঘোষাল আদৌ সেদিকে তাকান নি। তিনি তখন তাঁর সেক্রেটারী সুরেশকে কতকগুলি জরুরী চিঠির উত্তর বলে দিচ্ছিলেন। চিঠিগুলো না লিখলেই নয়···তাছাড়া একটা চেক সই করতে হবে; আগামী কাল বা পরশু যেসব এন্‌গেজমেন্ট করা আছে, সেগুলো চিঠি লিখেই হোক আর ফোন্ ক'রেই হোক—নাকচ করতে হবে; হয়ত তার পরের দিন সুস্থ হয়ে উঠবেন, না ওঠেন তো সে অন্য ব্যবস্থা; কর্পোরেশনে একটা জরুরী দরকার আছে, সেখানে সুরেশের নিজের যাওয়া দরকার—এমনি সব খুচরো নির্দেশ দিচ্ছিলেন তাকে। এরই মধ্যে ডাক্তার হাতটা টেনে য়্যালকোহলে-ভিজে তুলো দিয়ে মুছতে শুরু করেছিলেন, সেটা ঐ সুরাসারের ঠাণ্ডা স্পর্শে টের পেয়েছিলেন তিনি। তবুও তাকান নি। তারপর ছুঁচটা বিঁধল, ছুঁচটা টেনে নিয়ে ডাক্তার সেই জায়গাটা একটু দলে দিলেন তুলো দিয়েই—সেই সময়টা শুধু একবার ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়েছিলেন। নিশ্চিন্ত, প্রসন্ন দৃষ্টি। একটু বা ধন্যবাদজ্ঞাপকও হয়ত।

তারপরই সব যেন গোলমাল হয়ে গেল।

অকস্মাৎ বুকটায় যেন একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করলেন—না, ডান কি বাঁ তা বুঝতে পারেন নি অত—সঙ্গে সঙ্গে যেন সারা শরীরেই কেমন একটা অজানা যন্ত্রণা—মনে হ'ল পৃথিবীতে বাতাস বড় কম—যেন নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না। কী একটা বলতে গেলেন—দেখলেন ওঁর মুখের দিকে চেয়ে ডাক্তারের মুখও বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, পাগলের মতো হাতড়াচ্ছেন নিজের ব্যাগটায়—তারপর হঠাৎ বড় শান্তি। সব যেন মিলিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে—বোধ করি ঘুমিয়েই পড়লেন। তাতেও বিস্ময়ের কিছু নেই। অমন হয়। আর একবার তাঁর পেটে কলিক পেন ধরেছিল—অনেকক্ষণ পরে যখন ব্যথাটা ছাড়ল—বেশ মনে আছে—এক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি।

না, এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল। এ কাণ্ডটা শুরু হয়েছে এই এখন, ঘুমের ভাবটা, তন্দ্রাটা কেটে যাবার পর।

এই কাণ্ডকারখানাটাই ঠিক বুঝতে পারছেন না।

একটা বিরাট গোলমাল হয়েছে কোথায়। কিন্তু সে কি তাঁর মাথাতেই? না কি সবটাই স্বপ্ন দেখছেন তিনি? স্বপ্নে এসব সম্ভব—কিন্তু এত পরিষ্কার কি স্বপ্ন হয়?

তিনি দেখছেন—অথচ তাঁরই দেহটা সামনে পড়ে। স্ত্রী আছড়ে পড়ে কাঁদছেন খাটের পাশে। বড় ছেলে বিজয় উদ্‌ভ্রান্তের মতো বসে ব্যাকুলভাবে চেয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে—অর্থাৎ তাঁর ঐ আর-একটা-দেহের মুখের দিকে—ঐ যে দেহটা খাটে শুয়ে আছে তাঁর। বিজয় এলই বা কেন এখন! সে তো অফিস গিয়েছিল—আলিপুরে। ছটার আগে তো আসবার কথা নয় ওর। সবচেয়ে ডাঃ সেনগুপ্তের এ কী হ'ল! চিন্তিত বিবর্ণ মুখে বসে, এত হাওয়াতেও মুখখানা ঘামে ভেসে যাচ্ছে, দামী কড়া-ইস্ত্রি-করা কলার ভিজে ন্যাতা হয়ে উঠেছে। ওঁর এমন চেহারা তো কখনও দেখা যায় নি। যেন বড্ড ভয় পেয়ে গেছেন। এ কী—আরও তিন-চারজন ডাক্তার এল যেন। এদের তো তিনি চেনেনও না। কে এরা? আরে—ওরা যে ঐ দেহটাকেই দেখছে। নানারকমে পরীক্ষা করছে। ওদেরও মুখ বড় গম্ভীর যে! শুকনো মুখে ঘাড় নাড়ছে। কী সব বলাবলি করছে ডাক্তার সেনগুপ্তের সঙ্গে কার্ডিয়াক য্যারেষ্ট", "ইন্‌স্ট্যান্টেনিয়াস্ ডেথ্"। 'করোনারী য্যাটাক্ হয়েছিল নাকি এর আগে কখনও?' একজন প্রশ্ন করলেন বিজয়কে। এরই মধ্যে কে একজন বলে উঠলেন, 'না না—পেনিসিলিন শক্। এ রকম হয়।'

ওহো—

এবার হঠাৎ একটা কুটিল সংশয় দেখা দিল জয়ন্ত ঘোষালের মনে।

তবে কি—তবে কি এটা স্বপ্ন নয়? এটা কি তিনি জেগেই দেখছেন? নিজের চোখেই দেখছেন—নিজেকেই?

মানে—মানে তিনি কি মরে গিয়েছেন?......

চিৎকার ক'রে প্রশ্ন করতে চাইলেন, জানতে চাইলেন। আকুলভাবে বিজয়কে ডাকতে গেলেন।

কিন্তু না। তিনি বুঝি আর কোনোদিনই তাঁর কণ্ঠস্বর কাউকে শোনাতে পারবেন না।

মনে হচ্ছে তিনি মরেই গিয়েছেন। নইলে এমন কেন হবে! নইলে ওঁর দিকে ওরা ফিরেও তাকাচ্ছে না কেন? ঐ দেহটা নিয়েই সবাই ব্যস্ত।

এ 'শক্'টাও বড় কম নয়, এই অনুভূতি ও উপলব্ধির শক্‌টা। পেনিসিলিন শকের চেয়ে অনেক বেশী। আর একবার মরা সম্ভব হ'লে তিনি মরেই যেতেন। কিন্তু হৃদ্‌পিণ্ডটা তাঁর ঐ দেহেই পড়ে আছে—শক্-এ যেটার ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর এ অশরীরী দেহে বায়ুভূতো-নিরালম্ব অবস্থায় হৃদ্‌পিণ্ড থাকা বা তার কাজ বন্ধ হওয়া সম্ভব নয়।

উপলব্ধির প্রথম আঘাতটা কাটতেই সমস্ত অন্তর ওঁর হায় হায় ক'রে উঠল।

যে সব কাজ হ'ল না, পড়ে রইল; যে সব নির্দেশ দেওয়া হ'ল না বিষয়-সম্পত্তির, যে সব ব্যবস্থা ক'রে আসা হ'ল না—সেই সবের জন্যেই তাঁর এই আকুলতা, এই হাহাকার।···

জয়ন্ত ঘোষাল বিখ্যাত ব্যবহারজীবী, বিখ্যাত দেশকর্মী, বিখ্যাত জননেতা। জেল খাটেন নি বটে কখনও—তবে চিরকালই কংগ্রেসের দিকে ছিলেন।··· দু'মাস জেল খেটে অর কতটুকু করতে পারতেন, তার চেয়ে ঢের বেশী করেছেন টাকা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে পরামর্শ দিয়ে—সরকারী মহলের সঙ্গে যোগ-সূত্র বজায় রেখে। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের হাঙ্গামার সময় মুঠো মুঠো টাকা খরচ করেছেন নেতাদের পরিবারের জন্যে। জেলে থাকলে কি করতে পারতেন? নেতাজীর পালাবার সময়ও তিনি আর সুরেশবাবুই তো সব টাকাটা যোগাড় ক'রে দিয়েছিলেন।

তা কংগ্রেস সে বিশ্বস্ততার নিমক রেখেছে। আজ তিনি বিধানসভার সভ্য, বহু সরকারী কমিটির সঙ্গে যুক্ত—মন্ত্রিত্বও একটা ইচ্ছা করলেই নিতে পারতেন—শুধু সে মাইনেতে তাঁর সংসার চলবে না বলেই নেন নি।

মন্ত্রিত্ব আর ওকালতি তো একসঙ্গে করা যাবে না। সেই কারণেই তাঁর পার্লিমেন্টেও যাওয়া হয় নি।

তা না হোক। তার জন্যে তিনি দুঃখিত নন। দেশ ও দশের সেবা করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য, যে যেভাবে পারে। এ যে সেই সেবারই নানান্ কাজ চাপা পড়ে রইল—তার সঙ্গে নিজেরও অবশ্য—সেইটেই বড় দুঃখ। উইলটা করা উচিত ছিল, করি-করি ক'রেও হয়ে ওঠে নি। বর্তমান আইনে মেয়েরাও সম্পত্তির অধিকারী। এই বাড়িটা তাঁর চার মেয়ে ও দুই ছেলের মধ্যে ভাগ হয়—তা তিনি চান না। বিশেষ ক'রে মেজ মেয়ে রেখার শ্বশুরটা মহা বদমাইশ ও জাঁহাবাজ লোক। মেয়েরা যাতে বসতবাড়িটার ভাগ না পায়—এইটে ক'রে যাবেন, বরাবরই মনে ছিল। কিন্তু—

কিছুই, হ'ল না।

আসলে ঘটে উঠল না। এমন যে হবে—এমন অকস্মাৎ—সেইটেই তো ভাবতে পারে নি একবারও। সময়াভাব অবশ্য যথেষ্টই ছিল কিন্তু সে তো তাঁর সঙ্গের সাথী। ওরই মধ্যে সময় ক'রে যখন সবই করেছেন তখন এটাও করা চলত। হয়ে উঠল না—সেটা নিতান্তই ওঁর দূরদৃষ্ট আর দূরদৃষ্টির অভাব।

তবে—জয়ন্ত ঘোষালের অনেক গুণ, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণ হ'ল তাঁর অসাধারণ সহজ ও সাধারণ বুদ্ধি—তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান—তাই একটু পরেই হাহাকার ও আকুলতার প্রাথমিক তীব্রতাটা কাটিয়ে উঠলেন। মনকে বোঝালেন যে, যতদিনই তিনি বাঁচতেন না কেন, আরও পঁচিশ বছর বাঁচলেও—হাতের কাজ তাঁর কমত না; কখনই তিনি সব কাজ সেরে, সব গুছিয়ে যেতে পারতেন না। মিছিমিছি তার জন্যে মন খারাপ ক'রে কোন লাভ নেই। আর বিষয়-সম্পত্তি—তিনিই যখন রইলেন না, তখন যে খুশি নিক—তাঁর কি? তাছাড়া তাঁর মনে পড়ল—বসত বাড়িটা ঠিক তিনি উইল করতে পারতেনও না, কারণ ওর জমিটা কেনা হয়েছিল তাঁর স্ত্রীর নামে।

সুতরাং—যাক্‌গে।

জয়ন্ত ঘোষাল কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে তাঁর দিকে অর্থাৎ ঐ প্রাণহীন দেহটার দিকে মন দিলেন।

এ ব্যাপারটাও মন্দ নয় কিন্তু। মরে তিনি সবাইকে দেখছেন, তাঁকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। এটা তাঁর অনেক দিনের শখ, তিনি গত জ্যৈষ্ঠ

মাসেও পুরীতে গিয়ে জগন্নাথকে জানিয়ে এসেছেন—কে যেন তাঁকে বলেছিল জগন্নাথ খুব জাগ্রত ঠাকুর, স্থানে দাঁড়িয়ে মনোবাঞ্ছা জানালে তা পূরণ হয়ই—যে, মরবার পর যদি আত্মা থাকে তো সে আত্মার যেন এই মনটাও থাকে। এই মন নিয়ে যেন তিনি জগৎটাকে দেখতে পারেন, সকলের আসল চেহারাটা দেখতে পান।

আশ্চর্য তো—আজ ভাবতে খুব অবাক লাগছে,—এত জিনিস থাকতে এমন বেয়াড়া প্রার্থনাই বা তিনি জানাতে গেলেন কেন। মরবার কথাটাই বা তাঁর মাথাতে গেল কি ক'রে। ষাট বছর বয়স হয়েছিল বটে কিন্তু যে রকম সুস্থ সবল ছিলেন—মৃত্যুর কথা চিন্তা করাটা খুব স্বাভাবিক ছিল না সেদিন। তবে কি একেই লোকে intuition বলে, ষষ্ঠ অনুভূতি?

অবশ্য এটা তিনি অনেকদিন, অনেকবার ভেবেছেন। এই যে এত লোক তাঁকে সমীহ ক'রে চলে, তোষামোদ করে—স্নেহ-প্রেম-প্রীতি দেখায়—এ কী তাদের মনের কথা? এ কী সত্য?

সেইটেই জানতে চেয়েছেন শুধু।

কিন্তু কোনদিন ভাবতে পারেন নি যে, সত্যিসত্যিই এ সুযোগ আসবে। মৃত্যুর পরও তাঁর এই পার্থিব অনুভূতি থাকবে।

ঈশ্বর যে সে সুযোগ দিয়েছেন—এর জন্যে তিনি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ।

আঃ, বিজয়টা অমন ছেলেমানুষের মতো কাণ্ড করছে কেন? তুই বড় ছেলে, পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হ'তে চলল—তুই কোথায় বাকী সকলকে দেখবি, তা নয়, তুই-ই এমন মেয়েছেলের মতো ডুকরে-ডুকরে কাঁদতে শুরু করলি! এসব এখন করবে কে তাহলে!

এই যে তাঁর বড় মেয়ে নন্দাও এসে গেছে। চোখ-মুখ বসে গেছে বেচারার। কী চেহারা হয়েছে! এই তো আজ সকালেও দেখেছিলেন ওকে। কই তখন তো এমন দেখেন নি। আর রেখাটা—একে ওর শরীর খারাপ, তার ওপর যদি এমন ক'রে মেঝেতে মাথা ঠোকে তো বাঁচবে কি ক'রে। এতগুলো লোক রয়েছে, কেউ থামাতে পারছে না! কী বিপদ! এটাও কি এখন তাঁকে বলে দিতে হবে। বলবার যে উপায়ও নেই ছাই!

আর বুলুটার কাণ্ড দেখেছ! তাঁর—মানে তাঁর দেহটার পায়ে মুখ ঘষছে কী ক'রে! ওর কপালের সিঁদুরের ফোঁটায় আর চোখের জলে তাঁর পা লাল হয়ে গেল যে!

দেখতে দেখতে তাঁর মনটা টনটন ক'রে উঠল। ওদের ব্যথায় তো বটেই—সেই সঙ্গে নিজেরও ব্যথায়। এমন স্নেহের সংসার তাঁকে ছেড়ে চলে আসতে হ'ল—এ কি কম আপসোস!

কিন্তু দুঃখ বা ব্যথা যতই হোক—একটা অনির্বচনীয় তৃপ্তিও বোধ করছেন তিনি—তাতে কোন সন্দেহ নেই। কী ভয়ই ছিল মনে মনে! বহু বই পড়েছেন—এই ধরনের বহু কাহিনী। কিছু কিছু নিজের জীবনেও দেখেছেন বৈকি—এত ব্যস্ত জীবনে কম লোকের সংস্পর্শে আসেন নি তো! দেখেছেন যে সমস্ত সম্পর্কই একটা বিরাট স্বার্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত। জীবিতকালে কত মিষ্টি কথাই বলে আত্মীয়-স্বজনরা, কত আত্মীয়তা দেখায়। কিন্তু মরার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখোশ খুলে যায়। এই তো, তাঁর ছোট মামাশ্বশুরের কাণ্ডটা তো চোখেই দেখা। বুড়ো দাদাশ্বশুরের মরবার সময় ভীমরতি হয়েছিল—যত রাজ্যের শেয়ার আর কোম্পানির কাগজ বেচে সব টাকা এনে রেখেছিলেন লোহার সিন্দুকে। ছোট ছেলে শেষের দিকে প্রাণ দিয়ে বাপের সেবা করেছিল—সবাই ধন্যি ধন্যি, কিন্তু মরবার সময় কোন ছেলের জল পেলেন না বুড়ো মানুষ। শ্বাস উঠতেই বাবার কষ্ট হচ্ছে এই অছিলায় সবাইকে বার ক'রে দিয়ে দোর দিলে ছোটমামা। কিন্তু সে বাপের সেবা করার জন্যে নয়। কারণ দোর খুলে সবাইকে যখন ডাকল সে—তার অনেক আগেই বুড়ো চোখ বুজেছে। গঙ্গাজল তখনও ঠাকুরঘরে। অন্য ছেলেরা এবং স্ত্রী ঘরে ঢুকেই আগে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন চাবির জন্যে। সে চাবি কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তাই নিয়ে কী গোলমাল, অশান্তি এবং নোংরামি! পরস্পরের প্রতি দোষারোপ এবং কটূকাটব্য। পরের দিন চাবিটা বেরোল ঠাকুরঘর থেকে। তখন লোহার সিন্দুক খুলে দেখা গেল তেত্রিশটি টাকা মাত্র পড়ে আছে তাতে। সবাই জানত মাথার বালিশের নিচে সিন্দুকের চাবি না থাকলে বুড়োর ঘুম হ'ত না। সেদিন সকালেও দিদিমা দেখেছেন সে চাবি। ঠাকুরঘরে এলই বা কোথা থেকে, আর টাকাগুলোই বা গেল কোথায়?

প্রকাশ্য অভিযোগের অভাব হ'ল না। কালি উজোড় হয়ে পড়ল ছোটমামার ঘাড়ে। অপরাধটাও স্পষ্ট। কিন্তু প্রমাণ হ'ল না কিছুতেই। ফলে এখন ছোটমামার অবস্থাই সবচেয়ে শাঁসালো। বড় ও মেজমামা ফ্যা ফ্যা ক'রে বেড়াচ্ছেন।

অতদূর যাবারই বা দরকার কি। পদ্মলোচন সরকার ক্রোড়পতি—এ কে না জানে আর কে না জানত! মেয়ে-জামাই থাকতেও ভদ্রলোক ভাগ্নেটিকে বুকে ক'রে মানুষ করেছিলেন—ব্যবসা-বাণিজ্য, শেয়ার মার্কেটের কাজ, বলতে গেলে হাতে ধরে সব শিখিয়েছিলেন। ইদানীং নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছিল সে। বার বার বলতেন পদ্মলোচন—'মেয়েজামাই নিজেদের টাকা যেভাবে রাখত তার চেয়ে অনেক ভালভাবে রাখবে আর খাটাবে আমার প্রমথ!' সেই প্রমথ কী বেইমানিটাই না করল! মরবার পর দেখা গেল পদ্মলোচনের কিছু নেই—সব টাকাই প্রমথ মজুমদারের নামে। জীবনের শেষ আট মাস প্রমথই মামার ঘরে শুত—সারাদিন পাশে বসে থাকত। সবাই ধন্য ধন্য করেছিল তখন। আসলে পদ্মলোচনের মাথার যন্ত্রণা কমাবার জন্যে সাংঘাতিক ওষুধ দেওয়া হ'ত—তারই নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন পদ্মলোচন। সেই সুযোগে ইচ্ছামতো কাগজপত্রে, দলিলে, শেয়ারস্ক্রিপ্টে সই করিয়ে নিয়েছে প্রমথ। পদ্মলোচনের জামাই বুড়োবয়সে একটা স্যানিটারী ওয়ারস্‌এর দোকান দিয়েছে বৌবাজারে—স্রেফ পেটের দায়ে।

জয়ন্ত ঘোষাল অত কিছুই করেন নি ছেলেমেয়ের জন্যে। করবার সময়ও ছিল না তাঁর। সাধারণভাবেই মানুষ হয়েছে তারা। তবে হ্যাঁ, অর্থব্যয়, তা তাঁর যতটুকু সাধ্য করেছেন—এটা ঠিক। মাস্টার ছিল সকলের জন্যেই। নিয়মিত কাপড়-জামা-জুতো সরকার মশাই কিনে দিয়েছেন—আমোদ-প্রমোদ খেলাধুলোর জন্যেও যখন যা দরকার যোগাতে কখনও আপত্তি করেন নি তিনি। কিন্তু নিজে কোন কিছুই দেখতে পারতেন না। পারলে কি আর বুলুটা ঐ কাণ্ড ক'রে বসে! শেষকালে কিনা ঐ একটা লোফার গানের মাস্টারকে বিয়ে করল! অবশ্য তিনি বাধা দেন নি। কেলেঙ্কারীর ভয়েই কতকটা। এ ধরনের কেচ্ছা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পক্ষে বড় মারাত্মক। তার চেয়ে

যেটা সোজা সেইটেই করেছেন—তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে একটা চলনসই চাকরিতে বসিয়ে দিয়েছেন। বুলুর নামে ছোট্ট একটা বাড়িও ক'রে দিয়েছেন শহরতলীতে। তারপর তার ভাগ্য।

তা হোক্। তবু ওদের এতটা শোক তিনি আশা করেন নি। বিশেষতঃ স্ত্রীর কাছ থেকে। অবশ্য তার মাছ খাওয়া এবং গয়না পরা ঘুচল বটে কিন্তু তার জন্যে কি এতটা শোক হয়? মুহুর্মুহুঃ ফিট হচ্ছে বেচারীর। এখন তো ওকে নিয়েই ডাক্তাররা বিব্রত। কতদিন যে তাঁর সঙ্গে দুটো কথাও কইতে পায় নি। ইদানীং দেখাই হ'ত কালে-ভদ্রে। বহু রাত অবধি বাইরের ঘরে বসে কাজ করতে হয় বলে বাইরের ঘরের সঙ্গে লাগোয়া একটা শোবার ঘর ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছিলেন। রাত দুটো-তিনটেয় উঠে গিয়ে সেখানে পড়তেন—সকালে সেইখানেই চাকর চা দিয়ে আসত। জলখাবার চা সব পৌঁছত সেখানে। দুপুরে বা রাত্রে বেশির ভাগ দিনই বাইরে বাইরে খেতে হ'ত—দৈবাৎ যেদিন বাড়িতে খেতেন, সেদিনও এত অসময়ে খেতে আসতেন যে, স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হওয়াই সম্ভব ছিল না। ওঁর নিজস্ব চাকর জগনই তদারক করত, গরম জলে বসিয়ে রাখা টিফিন ক্যারিয়ার খুলে থালা-বাটিতে সাজিয়ে দিত। রাত্রের খাবার নিচের ঘরে সাজানো চাপা দেওয়া থাকত প্রত্যহ, খেতেন তো খেতেন, নইলে পরের দিন সকালে চাকরবাকররা খেয়ে নিত। সুতরাং স্ত্রীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের সুযোগই ঘটত না। তবুও যে, সে তাঁকে এত ভালবাসত, এত ভালবাসা যে সম্ভব কোন উপেক্ষিতা প্রায়-বিস্মৃতা স্ত্রীর পক্ষে—তা তিনি কখনও কল্পনাও করেন নি।

আজ বড় অনুতাপ হচ্ছে, বড়ই দুঃখ বোধ করছেন ওর জন্যে। সময় থাকতে যদি একটু মনোযোগ দিতেন। যদি একটু ফিরে তাকাতেন!···

জোর ক'রে অন্যদিকে মনটা সরিয়ে আনলেন জয়ন্ত ঘোষাল। ব্যথায় টনটন ক'রে উঠছে বুকটা—অর্থাৎ অন্তরটা। এখন তো তাঁর বুক বলে কিছু নেই, দেহই নেই তার বুক—এখন সবটাই এই মন। এই মনটাই আত্মা নাকি? কে জানে!···

বিস্তর ফুল এসে পৌঁচেছে। রাশি রাশি ফুল। সংবাদটা এতক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী, এমন কি স্বয়ং লাটসাহেবাও 'রীদ' পাঠিয়েছেন।

কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা ক্লাব বাদ যায় নি। ব্যক্তিগতভাবেও বিস্তর মালা, বাঞ্চ্, তোড়া এসে পৌঁচচ্ছে। ওধারের ঘরটা ভরে গেছে ফুলে ফুলে। কলকাতার বাজারে বোধ হয় ফুল আর রইল না।

নিরতিশয় তৃপ্তির সঙ্গে মনে মনে হিসেব ক'রে দেখলেন জয়ন্ত ঘোষাল—অন্ততঃ পাঁচশ' টাকার ফুল তাঁর উদ্দেশ্যে কেনা হয়েছে, এই গত দু ঘণ্টায়।

বহু লোকও আসছে। বড় রাস্তায় গাড়ি রাখার জায়গা নেই। তাঁর বাড়ির সামনেকার এই অপেক্ষাকৃত অপরিসর পথটা তো লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। আহা, তাঁর খুড়শাশুড়ী বুড়ো মানুষ—আসতেই পারছেন না ভিড় ঠেলে। পাড়ার ছেলেগুলো যথাসাধ্য ভলান্টিয়ারী করছে বটে কিন্তু এ ভিড়ে তারা কী করবে?

কে যেন—হ্যাঁ, তাঁরই তো ভগ্নীপতি রমেশবাবু—একখানা বোম্বাই খাট কিনে নিয়ে এলেন। বেশ দামী খাট বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু দামটা দিলে কে? কই, বিজয়ের কাছ থেকে তো কেউ চায় নি। রমেশবাবু নিজেই দিলেন নাকি? না জামাইরা কেউ? যে-ই দিয়ে থাক, বিবেচনা আছে মানতেই হবে। শোকার্ত স্ত্রী-পুত্রের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যে নবাবী করে নি, এর জন্যে তিনি মনে মনে সাধুবাদ দিচ্ছেন তাকে।

কিন্তু আর না। এখনই যে দৃশ্যের অবতারণা হবে তা জয়ন্ত খুব জানেন। ঐ দেহটা তাঁর পালঙ্কের শয্যা থেকে তুলে বোম্বাই খাটে নিয়ে যাবার সময় আরও আছাড়ি-পিছাড়ি করবে তাঁর ছেলেমেয়েরা, তাঁর স্ত্রী। এমনিতেই ওদের যা অবস্থা, দাঁড়িয়ে দেখা যায় না। রেখার কপালটা ঢিপি হয়ে ফুলে উঠেছে, এবার হয়ত রক্তারক্তি হবে। সে দিক দিয়ে বুলুর অবস্থাটাই ভাল। এসেই যে চিৎকার ক'রে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, এখনও জ্ঞানই হয় নি। কেউ কেউ মাথায় জল দিয়ে বাতাস করছে অবশ্য, কিন্তু কী লাভ? অজ্ঞান হয়ে থাকাই ভাল। বুলুর বেশী লাগবে তা তিনি জানেন। ইতিমধ্যেই রোমান্সের রস মরে এসেছে ওর মনে। স্বামীর অপদার্থতা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। তিনি যে ওদের জন্যে কতখানি করেছেন তাও বুঝছে। তিনি বেঁচে থাকলে তবু কতকটা ভরসা ছিল। সেটুকুও গেল।

জয়ন্ত ঘোষালের বিদেহী সত্তা ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসে।

নিজের অফিস ঘরে ঢুকে অতি প্রিয় ও অতি পরিচিত চেয়ারখানিতে আশ্রয় নেয়। এখানে ওরা আসবে না। হাহাকারের শব্দটাও অত স্পষ্ট আঘাত করবে না। কতকটা নিশ্চিন্ত।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত দেহের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশান অবধি না গিয়ে পারেন নি জয়ন্ত ঘোষাল। কৌতূহল—হ্যাঁ, কৌতূহল তো বটেই সেই সঙ্গে দেহের প্রতি একটা সহজাত আকর্ষণও তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আর সেই সহজ মমতাতেই আগুনটা জ্বলবার সময় কষ্টও পেয়েছেন খুব। দেহের অনুভূতি নেই, স্নায়ুর তো বালাই-ই নেই, তবু যেন মনে হয়েছিল ঐ সুবিপুল ও সুবিস্তৃত সুগন্ধি বহ্নিশিখার (চন্দনকাঠ ধূপধুনো কিছুরই অভাব ঘটে নি—বলা বাহুল্য) দহনজ্বালা তিনি সেই দেহের প্রতিটি স্নায়ু দিয়ে অনুভব করছেন। একেই বোধ হয় মায়া বলে। মহামায়ার মায়া দেহান্তের পরও রেহাই দেয় না মানুষকে, যতক্ষণ মন ততক্ষণ মায়া থাকে।

তবে সেই কষ্টটা কমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে—অর্থাৎ চিতায় জল দেওয়ার পর থেকেই আবার সেই তৃপ্তির ভাবটা ফিরে এসেছে। To make the best of it—ইংরেজী মহাবাক্যের অনুসরণে মন্দের ভালটুকু বেছে নিয়েছেন তিনি। তাঁর আর বিশেষ ক্ষোভ নেই। মরার ফলে অনেক হারিয়েছেন তিনি এটা ঠিক, কিন্তু পেলেনও তো বড় কম নয়। জীবিত থাকতে এত শ্রদ্ধা প্রীতি-ভালবাসা কল্পনাই করতে পারেন নি—এমন কি যেটুকু দেখেছেন সেটুকুও বাহ্যিক মূল্যে গ্রহণ করতে পারেন নি। একটু সন্দেহ একটু ব্যঙ্গের ভাব বরাবরই ছিল। তিনি বুদ্ধিমান, বুদ্ধিজীবী, মানুষ চরিয়ে খান—সুতরাং এসব সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত ধারণাও যেমন নেই—মোহও নেই। মানুষের সবটাই মৌখিক, স্বার্থের সম্পর্ক, এটা মেনেই নিয়েছিলেন। আজ মৃত্যুর পর এদের যে পরিচয় তিনি পেলেন তা একেবারে অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয়। আর অপ্রত্যাশিত বলেই এত মধুর, অভাবনীয় বলেই এত উত্তেজক।...

শ্রাদ্ধশান্তি পর্যন্ত এই মাধুর্যের আবেশে ডুবে রইলেন জয়ন্ত ঘোষাল। না, কোথাও কোনো ছন্দপতন হয় নি, লাগে নি কোন রূঢ় আঘাত। কারুর আচরণে কোথাও এতটুকু ত্রুটি ঘটে নি। ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী-পুত্রবধূ—

সকলের শোকই আন্তরিক, সকলের আঘাতই মর্মান্তিক। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে যাদের সঙ্গে কাজ করেছেন—এমন কি যাদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে বেশ একটু মতবিরোধও ঘটেছে, তারাও সত্যকার গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছে তাঁর জন্যে। খবরের কাগজে বেশ ফলাও ক'রে শোকবার্তা সাজানো হয়েছে। অধিকাংশ কাগজেই তিন কলম হেডলাইন ছিল—অন্ততঃ দু কলমের কম কেউ দেয় নি। শোক সংবাদ আর তার সঙ্গে ডাক্তার এবং য়্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসার ওপর তীব্র আক্রমণ। বড় ডাক্তার বলে সেনগুপ্ত অব্যাহতি পেলেন না। অধিকাংশ কাগজেই পরোক্ষে এই মৃত্যুর জন্য ডাঃ সেনগুপ্তকে দায়ী করা হ'ল। কেউ কেউ চিঠি দিলেন—কেন একে হত্যাকাণ্ড বলা হবে না, প্রশ্ন ক'রে। লোকসভায়, বিধানপরিষদে প্রশ্ন উঠল। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-মন্ত্রী পেনিসিলিনের খালি য়্যাম্পুলটি পরীক্ষা করার আদেশ দিলেন। যে ডাক্তারখানা থেকে ওটি কেনা—তাদের পর্যন্ত দিনকতক থানা-পুলিশের হামলা সইতে হ'ল। এক কথায় তাঁর মৃত্যু নিয়ে চাঞ্চল্য ও আলোড়নের শেষ রইল না—সমস্ত জাতি যে তাঁর এই আকস্মিক তিরোধানে শুধু ক্ষুব্ধই নয়—ক্রুদ্ধও হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ প্রত্যহই সংবাদপত্রে রাশি রাশি প্রকাশিত হ'তে লাগল।

এদিকে শ্রাদ্ধশান্তিও যতদূর সম্ভব ঘটা করেই হ'ল। মেয়েরা প্রত্যেকে তাদের চতুর্থী শ্রাদ্ধে একটি ক'রে ষোড়শ দিল। ছেলেরা বৃষোৎসর্গের আয়োজন করল। এটা এমন কি তাঁরও বাড়াবাড়ি বলে মনে হ'ল। সোজাসুজি ষোড়শ দান দিলেই হ'ত। তোদের কি এমন অবস্থা যে তোরা এতটা করতে গেলি। আসলে চারিদিকে এত হৈ চৈ পড়তে দেখে ওদের মনেও তাঁর আসন একটু উঁচুতে চলে গেছে, দাম গেছে বেড়ে। এখন ওদেরও মনে হচ্ছে যে তাদের বাবা একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, আর সেই অসাধারণ পিতার শ্রাদ্ধ বেশ একটু সমারোহের সঙ্গেই করা দরকার, নইলে সম্মান রক্ষা হয় না।

ওদের নির্বুদ্ধিতায় হাসি পেল জয়ন্ত ঘোষালের। তবু তিনি খুশীও না হয়ে পারলেন না।

এখন তাঁর মনে হচ্ছে যে তাঁর মূল্য একমাত্র তিনিই বোধ হয় বরাবর

একটু কম ক'রে ধরেছেন। আসলে যতটা তিনি করছেন বলে ধারণা করেছিলেন, তার চেয়ে ঢের বেশী করেছেন দেশ ও দশের জন্যে। বিনয় থাকা ভাল, তবে সত্যের থেকে কমিয়ে ধরাও কিছু নয়। ঠিক মূল্যটির ধারণা থাকলে জীবিতকালেও প্রতিষ্ঠাটা উপভোগ করতে পারতেন।

শোকসভা হ'ল অনেকগুলি। একটা তো স্বয়ং শেরিফই ডেকে বসলেন। ছোটখাটো সভা প্রায় পাড়াতে পাড়াতেই হ'তে লাগল। একই সময় একাধিক সভা হওয়ার ফলে সবগুলোতে তিনি যেতেও পারলেন না। তা না পারুন, মোটামুটি তিনি বুঝে নিয়েছেন কে কী বলবে আর শোক-প্রস্তাবে কি লেখা হবে। বড় সভাতে তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যে যে কমিটি হয়েছে তাতে ইতিমধ্যেই নাকি হাজার টাকার ওপর চাঁদা উঠেছে। এখন তাঁর ভয় হচ্ছে—বিজয়টা যা বোকা—হয়ত সেও একটা মোটা টাকা দিয়ে বসবে। এসব কমিটি তিনি অনেক দেখেছেন, না আঁচালে বিশ্বাস নেই। স্মৃতিরক্ষা কমিটির পুরো হিসেব পাওয়া এদেশে প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা। স্মৃতিরক্ষাটাও হয়ে ওঠে না অনেক সময়।

সে যা হোক, মন ভ'রে গেছে তাঁর। তিনি তৃপ্ত।

আর কি চায় মানুষ? মানুষ যে পাওনা ইহজন্মে কল্পনাও করতে পারে না, তিনি সে জীবনের সীমানা পেরিয়ে এসেও দু হাত ভ'রে পেয়েছেন তাই।

না, তাঁর আর কোন ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই। মৃত্যুর জন্যেও কোন আপসোস নেই। ছোটখাটো অসুবিধা একটু-আধটু তো হবেই—কিন্তু সে ক্ষতির চেয়ে লাভের দিকটা তাঁর অনেক ভারী হয়ে গেছে। জগন্নাথ যে স্থানে-থেকে-কানে-শুনেছেন—এই অপরূপ অভিজ্ঞতা যে উপলব্ধি করার সুযোগ দিয়েছেন—এর জন্যে তিনি প্রত্যহই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন জগন্নাথের কাছে।

কিন্তু শ্রাদ্ধশান্তি নিয়মভঙ্গ ইত্যাদি চুকে যাবার পর প্রথম একটু বেসুরো লাগল, এই একটানা তৃপ্তির সংগীতে। দিনরাত যে রেশটায় তিনি মশগুল হয়ে ছিলেন তা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'তে হ'তে এক সময় মনের দিগন্তে

মিলিয়ে যাবার উপক্রম হ'ল।

মেয়েরা যে যার শ্বশুরবাড়ি ফিরে গেছে। যাবার আগে প্রকাশ্য ভাগ-বাটোয়ারার কথা কেউই তোলে নি—শোকার্ত মা'র সামনে সে কথা তোলা শোভন হবে না সবাই জানে—শুধু আকারে ইঙ্গিতে দাদাকে প্রস্তুত থাকবার কথা জানিয়ে গেছে। তারা না দাবি করুক—তাদের শ্বশুরবাড়ি ছাড়বে কেন ?

অবশ্য এতে দোষের কথা কিছুই নেই। যা স্বাভাবিক যা সঙ্গত তাই তারা করেছে। বরং করেছে অনেক সন্তর্পণে। বিষয়ের কথা নিয়ে জয়ন্ত ঘোষাল অত ব্যস্ত নন। এর চেয়ে ঢের বেশী কুৎসিত চেহারা তিনি দেখেছেন সংসারের—নগ্ন স্বার্থের। তাঁর ছেলেমেয়েরা সে তুলনায় সোনার চাঁদ।

কিন্তু মেয়েরা চলে যাবার পরই সংসারটা কেমন যেন নিস্তরঙ্গ হয়ে উঠল, উত্তেজনাহীন—সেইটেই খারাপ লাগল জয়ন্ত ঘোষালের। ইহলোকের সমস্ত রকম সম্ভোগ তাঁর উঠে গেছে চিরকালের মতো—তাঁর খাদ্য পানীয় তাঁর প্রাণ-ধারণের উপায় বলতে শুধু একটু উত্তেজনা। তা তাই যদি না থাকে তো তিনি বাঁচেন কী ক'রে ? মানে তাঁর এই অনুভূতিময় সত্তা বাঁচে কি ক'রে ?

না, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি বিশ্বস্ততার কোন অভাব নেই। তাঁর অফিসঘর আর তার পাশের বাড়তি শোবার ঘরটি—ঘরের অত্যন্ত অকুলান সত্ত্বেও বিজয় কাউকে দখল দেয় নি, কোন রকম ভিন্ন ব্যবস্থা হ'তে দেয় নি, ঠিক তেমনিই সাজিয়ে রেখেছে, তাঁর জীবিতকালে যেমন থাকত। তাঁর নিজস্ব চাকর জগন যেমন প্রত্যহ সকাল বিকেল ঝাড়ামোছা করত আগেও—তেমনিই ক'রে যায় দু বেলা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি তিনি এখনও বেঁচে আছেন এবং এখনই এসে বসবেন সেখানে।

এ ছাড়াও—তাঁর যে সব দানধ্যান মাসিক সাহায্য ইত্যাদি ছিল তাও—অন্ততঃ এ মাসে বজায় রেখেছে বিজয় ঠিক ঠিক মতো। এর চেয়ে বেশী আর সে কীই বা করতে পারে ? তাকেও রোজগার ক'রে খেতে হবে—শোকে ডুবে থাকার বিলাস তার সাজে না। সে-ই এখন বাড়ির কর্তা, চার চালের ভার তার মাথায়। তাছাড়া তারও স্ত্রী পুত্র আছে।...

তবু যতই বোঝান মনকে, আর মন ছাড়া কীই বা আছে এখন তাঁর, মন

যেন কেমন একটা অব্যক্ত অবয়বহীন ক্ষোভ অনুভব করে। ছেলে দিন দিনই তার কাজ কর্তব্য—তার সংসারে ডুবে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে একদিন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সিনেমাতেও গিয়েছিল—কী একটা হাসির ছবি দেখতে। ফিরে এসে বোমাকে বলছিল, তাই শুনতে পেলেন জয়ন্ত ঘোষাল। বলছিল, 'ওরা টানাটানি করলে, মনটাও খারাপ—তাই চলে গেলাম। মন্দ নয় ছবিটা, আর কিছু না হোক—অনেকদিন পরে খুব খানিকটা হাসা গেল।'

বৌমা বললেন, 'বেশ তো স্বার্থপর লোক তুমি! এই এক মাস দেড়মাস আমাদের ওপর দিয়ে কী ঝড়টা গেল বলো দিকি! আমাদের বুঝি আর হাসতে ইচ্ছে করে না!'

অপ্রতিভ বিজয় বলে, 'হবে হবে। দু-একটা দিন যাক না—মা'র কথাটা ভেবেই আরও আমি তোমাকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছি না।'

'যাও যাও! মা'র কথা ভেবে নিজের আটকায় না! যত ভাবনা আমাদের বেলা!'

সেখান থেকে আস্তে আস্তে সরে আসে জয়ন্ত ঘোষালের বিদেহী সত্তা। অস্বাভাবিক নয়, অসঙ্গতও নয়। এমন একটা কিছু হৃদয়হীনতার পরিচয়ও দেয় নি বিজয়। তবু—

ছোট ছেলে সঞ্জয় গত সপ্তাহ থেকেই সিনেমা ও ফুটবলের মাঠে যেতে শুরু করেছে, কিন্তু তাতে তাঁর অতটা ক্ষোভ হয় নি। ছেলেমানুষ, কলেজে পড়ছে—সবে ফার্স্ট ইয়ার, ওর কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী কিছু বা অন্যরকম কিছু আশা করেন নি। কিন্তু বিজয়ের সম্বন্ধে আর একটু—। মানে হয়ত সেটা অন্যায়, তবে বিজয়ই তার ব্যবহারে অতটা বেশী আশা জাগিয়েছে তাঁর মনে।

সেখান থেকে সরে জয়ন্ত ঘোষাল স্ত্রীর শয়নঘরে, তাঁদের শয়নঘরে গিয়ে দাঁড়ান।

শীর্ণ মলিন হয়ে গিয়েছে বেচারী। কেমন যেন শ্রীহীন। তবু তো মেয়েরা একেবারে থান পরতে দেয় নি। চুলপাড় ধুতি আর হাতেও একগাছা ক'রে চুড়ির ব্যবস্থা বজায় রেখেছে।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন জয়ন্ত ঘোষাল।

শুয়ে শুয়ে বই পড়ছেন স্ত্রী। কী একখানা মোটা বই। না, কোন ধর্মপুস্তক নয়, বিজয় এনে দিয়েছে কী একটা ভ্রমণ-কাহিনী। বেশ মনোযোগ দিয়েই পড়ছেন বইখানা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি পাশে। হয়ত আশা করেছিলেন—মনের কোন্ সুদূর প্রত্যন্ত দেশে যে—বইতে বেশীক্ষণ মন বসবে না, হয়ত এখনই ওখানা ঠেলে সরিয়ে রেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন, কিংবা বইখানা মুড়ে রেখে অন্যমনস্কভাবে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকবেন অথবা দুই চোখের প্রান্ত বেয়ে নামবে দু ফোঁটা অশ্রু—এতদিন যা ক্ষণে ক্ষণেই অজস্রধারে পড়েছে।

এসব কিছুই হ'ল না। নিবিষ্টচিত্তেই পড়ে যেতে লাগলেন—যতক্ষণ না, প্রায় রাত এগারোটা নাগাদ, বামুন-মেয়ে এসে গলাখাঁকারি দিয়ে দোরের কাছে দাঁড়ালেন, ততক্ষণ একবারও মুখ তুললেন না উনি।

এখন তাড়াতাড়ি বইটা মুড়ে উঠে বসে বললেন, 'কী গা বামুন-মেয়ে ?'

'এবার তাহলে আপনার খাবার আনি মা ?'

'ওদের সব খাওয়া হয়ে গেছে ? ছেলেদের ? বিজু বৌমা—ওরা ?'

'সব। ওসব পাট চুকিয়ে উনুন পেড়ে তবে তো এখন আপনার খাবার তৈরী করলুম।'

'তবে দাও।'

গৃহিণীই এতকাল দাঁড়িয়ে থেকে তদ্বির করতেন সকলের খাওয়ার সময়। এখন আর তিনি নামেন না। বিজয়ই নামতে দেয় না। অবকাশ দিয়েছে তাঁকে।

ঝি এসে আসন পেতে ঠাঁই ক'রে দিয়ে গেল। বামুনঠাকরুন খাবারের থালা নিয়ে এলেন। খান আষ্টেক লুচি, দু-তিন রকম ভাজা, আলুছেঁচ্কি, কী একটা মিষ্টি—এক বাটি ঘন দুধ।

গৃহিণী দুধ দেখিয়ে আপত্তি করলেন আজও।

'আমায় কেন দুধ দাও বামুন-মেয়ে! আমি কি কচি খুকী ?'

'কিছুই তো পড়ছে না পেটে, মাছ না মাংস না। একটু দুধ না খেলে বাঁচবেন কী ক'রে মা ?'

'আরও কি আমার বাঁচার দরকার আছে বামুন-মেয়ে ? আর কেন ?

কী সুখভোগের জন্যে বাঁচব?'

বলতে বলতে কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে আসে গৃহিণীর।

'বালাই ষাট। ছেলেমেয়েগুলো আছে, তাদের মুখ চেয়েই যে বাঁচতে হবে মা। বিজু আমায় বার বার বলে দিয়েছে—মাছটাছ যখন খেতেন তখন একরকম ছিল—এখন যেন দুধ না বাদ যায় কোনদিন। আর কারুর দুধ হোক না হোক—মা'র দুধ ঠিক ক'রে রাখবে!'

বিষাদে বিকৃত মুখ সগর্ব হাসিতে বিস্ফারিত হয়ে উঠল; সস্নেহ স্নিগ্ধ কণ্ঠে গৃহিণী বললেন, 'ও একটা আস্ত পাগল বামুন-মেয়ে। ওর কথা শুনতে গেলে সংসার চলে না। ও ভেবেছে চিরকাল ওর মাকে ও বাঁচিয়ে রাখবে!'

বললেন কিন্তু দুধের বাটি ঠেলেও রাখলেন না। বরং লুচির পালা শেষ ক'রে বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই সেই ক্ষীরের মতো ঘন দুধটি খেয়ে উঠলেন।

জয়ন্ত ঘোষাল সেখানেও আর দাঁড়াতে পারলেন না। স্ত্রী তাঁর জন্যে আজও শোকার্ত, তাঁর অভাবে জীবনের কোন অর্থই আর নেই ওঁর—একথা যতই বার বার বোঝাতে চেষ্টা করলেন স্ত্রীর প্রথম কথাটার সূত্র ধরে, ততই মনে মনে একটা আশাভঙ্গের বেদনা অনুভব করতে লাগলেন তিনি। তবে কি স্ত্রী ঐ দুধটা ঠেলে রেখে, লুচিগুলোও না খেয়ে অভুক্ত উঠে পড়লে খুশী হতেন জয়ন্ত ঘোষাল?

না, না—সে নিতান্ত স্বার্থপরের মতো কথা হ'ল! অত স্বার্থপর তিনি নন। তবু—

তবু যে ঠিক কি চান তিনি, কী ঘটলে খুশী হতেন, তাও নিজের মনকে ভাল বোঝাতে পারেন না।

আরও মাসখানেকে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন জয়ন্তবাবু।

বিজয় ভগ্নীপতিদের ডেকে, মামা ও শ্বশুরকে মধ্যস্থ করে, একটা আপস ক'রে ফেলেছে। তাদের কিছু কিছু নগদ টাকা দিয়ে এই বাড়ি এবং ভাড়াটে বাড়িখানা, দুটোই বাঁচিয়েছে। অন্য অন্য বিষয়কর্মেরও সুব্যবস্থাই করেছে। যতটা ছেলেমানুষ এবং কাঁচা ভাবতেন ওকে, ততটা যে সে আদৌ নয়—তা নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণ ক'রে দিয়েছে সে।

তারপর?

তারপর সংসার পূর্ববৎই চলছে। দুটো ঝি চাকর কমানো হয়েছে শুধু। আর কিছুই করতে হয় নি। বিজয় যা মাইনে পায় আর ওবাড়ির ভাড়া—তাতেই চলে যাচ্ছে সংসার। কিছু টাকা এখনও আছে হাতে—ওর মা'র নামে লিখে-দেওয়া একটা মোটা টাকার লাইফ ইনসিওরেন্স ছিল, বিজয় প্রস্তাব করেছে যে, সেই টাকায় মা'র নামে একটা বাড়ি কিনে দেবে, মা'র যাতে নিজের খরচের জন্যে কোনদিন ছেলেদের মুখাপেক্ষী না হ'তে হয়। এ প্রস্তাবে সকলেই খুশী হয়েছে, ধন্য ধন্য করেছে বিজয়কে। বিজয়ের মাও খুশী হয়েছেন। হয়ত একটু নিশ্চিন্তও হয়েছেন।

কিন্তু যত এদিকে সুবন্দোবস্ত হচ্ছে তত যেন মনের মধ্যে একটা অসন্তোষ ও বিক্ষোভ অনুভব করছেন জয়ন্ত ঘোষাল। তবে কি তিনি এদের দুর্দশাই চেয়েছিলেন? মাঝে মাঝে এ আত্মজিজ্ঞাসাও করেন—বৈকি জয়ন্ত। না, না—ছিঃ! নিজেই শিউরে ওঠেন আবার কথাটা ভেবে।

তবু—।

তবু—সংসার বেশ চলেছে তাঁকে বাদ দিয়েও। দাসী চাকর সরকার মশাই, যথানির্দিষ্ট নিয়মে কাজ ক'রে যাচ্ছে। স্ত্রী, দুই পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনী, কন্যারা—কারুরই কিছু আটকাচ্ছে না। অভাবও নেই তেমন—তাই হাহাকার বা দুঃখও আর নেই। যথানিয়মেই নেই। তাই বলে কি তাঁর স্মৃতির প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করেছে ওরা? তাও তো নয়। আজও নিচের ঘর দুটি তেমনি সাজানো আছে, তেমনি প্রত্যহ চাবি খুলে জগন ঝাড়ামোছা করে। রবিবার রবিবার বিজয় নিজে এসে দাঁড়ায় সে সময়ে। কেবল স্ত্রীই আসেন না কোনদিন, কিন্তু সে তো পুরাতন স্মৃতি জাগ্রত হয়ে দুঃখের কারণ হবে বলেই আসেন না।

স্ত্রী তীর্থে যাবেন ঠিক হয়েছে। বড় বোনের সঙ্গে যাবেন। স্ত্রীর নিজের হাতেই বেশ কিছু টাকা আছে, সেই ভরসাতে যাচ্ছেন। ছেলেদের দিতে হবে না এক পয়সাও। তাই কারও কোন আপত্তিই নেই। বিজয় একটু ক্ষীণ আপত্তি তুলেছিল, বৌমা সেটুকু তুলতে দেয় নি। বুঝিয়ে বলেছে, 'তুমি বুঝছ না। দিনকতক ঘুরে এলে ভালই হবে, শান্তিই পাবেন। সেই থেকে এই কটা দেওয়ালের মধ্যে আটকে আছেন, সেই সব স্মৃতি চারদিকে—তার

থেকে দুদিন বাইরে গেলে উপকারই হবে।'

এমনিতেও স্ত্রী বেশ সামলে নিয়েছেন। আগের মতোই সকালে ভাঁড়ারে এসে বসেন। কুটনোও কুটে দেন মধ্যে মধ্যে। নাতিনাতনীদের স্নানাহারের তদ্বির করেন। ছেলেদের খাওয়ান সামনে বসিয়ে। এক কথায় পুরাতন নিয়ম ও অভ্যাসে ফিরে এসেছেন অনেকখানিই।

না—কারুরই কিছু আটকে নেই।

বন্ধুবান্ধব—যাঁদের তাঁকে না হ'লে, তাঁর পরামর্শ উপদেশ না হ'লে একদম চলত না—তাঁরাও তাঁকে বাদ দিয়েই বেশ মানিয়ে নিয়েছেন নিজেদের জীবন ও কর্মক্ষেত্র। যে রাজনৈতিক দলের তিনি ছিলেন স্তম্ভবিশেষ—সেখানেও তাঁর স্থান পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন কথাপ্রসঙ্গে কখনও কখনও নামটা ওঠে, এক-আধবার হয়ত দুঃখ প্রকাশও করেন কেউ কেউ—ঐ পর্যন্তই। আর হয়ত সেই সময়ই তাঁর স্মৃতিরক্ষার কথাটাও ওঠে, চাঁদা তোলার জন্যে আর একটু সক্রিয় হওয়া দরকার—এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত হন। কিন্তু ঐখানেই সে পালা শেষ। আবার যথারীতি জুড়িয়ে যায় কথাটা। শোকসভাতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বার বার যাদের কণ্ঠ আবেগরুদ্ধ হয়ে এসেছিল—তাদেরও মুখে তাঁর নামটা আর শোনা যায় না।

এক কথায় তাঁর ঋণ সংসার শোধ ক'রে দিয়েছে, আর তাঁর কোন পাওনা নেই—ওদের সঙ্গে তাই তাঁর কোন সম্পর্কও নেই।

এইবার ধীরে ধীরে চরম অনুভূতটার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন জয়ন্ত ঘোষাল।

মৃত্যুর পরেও দৈহিক অস্তিত্বের অনুভূতিটা থাকা খুব কৌতুকজনক অবস্থা নয়, আরামদায়ক তো নয়ই। এ জন্মের সম্পর্ক এ জন্মেই চুকিয়ে দেওয়া ভাল। পরজন্মে তার জের টানার কোন অর্থই হয় না।

এতদিন তিনি ছিলেন নিজের বিপুল প্রতাপে, সংসারের মধ্যে মানুষের মধ্যে, দেশ ও দশের মাঝে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে—সেইভাবেই নিজের মূল্য নিজের মনের মধ্যে নির্ধারিত ছিল এতকাল—কিন্তু আজ দেখছেন সেই স্থান তেমনিই আছে, তাঁকে কেউ বিন্দুমাত্র খাটো করে নি। তবু তাঁর

আর কোন প্রয়োজন নেই, সেই বিশেষ স্থানটিই মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। তাঁকে বাদ দিয়েও জগৎসংসার বেশ চলেছে—আর হয়ত চলেই যাবে। একদিন সম্পূর্ণ বিস্মৃতির মধ্যেই পড়ে যাবেন তিনি।

আর পড়েই তো আছেন।

তীর্থযাত্রার আগে স্ত্রী যখন তাঁর পোর্টম্যান্টো গোছাচ্ছিলেন তখন অনেক আশা ক'রেই পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন জয়ন্ত। তাঁর এনলার্জ-করা বড় ছবিটা না হোক, তাঁদের বিবাহের বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ছবিটা না হোক (বড় অয়েল-পেন্টিংটার কথা তিনি ধরছেনই না, সে যে অসম্ভব তা তিনি জানেন) —অন্তত ছোট্ট যে বাঁধানো ছবিখানা স্ত্রীর বিছানার পাশেই থাকে—সেখানা তিনি অবশ্যই বাক্সের মধ্যে নিয়ে নেবেন। কিন্তু একে একে সব জিনিসই তাতে উঠল—খুঁটিনাটি অনেক কিছু, প্রাত্যহিক অভ্যাসের অজস্র উপকরণ, পূজার সমস্ত সরঞ্জাম—কেবল সে ছবিখানারই স্থান হ'ল না। সম্ভবত মনেও পড়ল না।

যাত্রার দিন সিঁড়ি দিয়ে নামবার মুখে দালানের ওপাশে টাঙানো বড় অয়েল-পেন্টিংটায় চোখ পড়তে একবার থমকে দাঁড়িয়ে যখন মুহূর্তের জন্যে চেয়ে দেখলেন, একবার সকলের অজ্ঞাতসারে হাতটা নমস্কারের ভঙ্গীতে কপালে উঠল—তখনও একটু ক্ষীণ আশা দেখা দিয়েছিল জয়ন্ত ঘোষালের মনে—এইবার হয়ত ছোট ছবিখানা সঙ্গে নেবার কথা মনে পড়বে গৃহিণীর। কিন্তু তাও পড়ল না। বাইরে গাড়ি হর্ন দিচ্ছে। তারই মধ্যে বধূকে নাতি-নাতনী সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ দিয়ে, দাসী চাকরদের ওপরে একটু নজর রাখতে বলে, তাদেরও নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়ে, ছোট ছেলের চিবুক স্পর্শ ক'রে চুমো খেয়ে—ব্যস্তভাবে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

না, জয়ন্ত ঘোষাল সত্যিই মরে গিয়েছেন। তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

মরার পরে সাধারণ মানুষ যা পায় তা হয়ত এখনও পাবেন তিনি।

ঘটা ক'রে সপিণ্ডকরণ হবে। বার্ষিক শ্রাদ্ধও হবে।

বিজয় হয়ত গয়াতে গিয়ে শেষকৃত্য শেষ ক'রে পাওনা চুকিয়ে দিয়ে আসবে একেবারে। তখন হয়ত সবাই আর একবার দু-এক ফোঁটা ক'রে

চোখের জল ফেলবে, তারপর আবার তিনি হারিয়ে যাবেন ওদের স্মৃতির মধ্যে। সংসার চলবে তার নির্দিষ্ট পথে। জীবিতদের নিয়েই তার চিন্তার শেষ নেই—এর মধ্যে মৃতের কথা বৃথা ভাবতে বসবে কে ?···

কখনও কখনও কোন শুভকর্ম উপলক্ষে আভ্যুদয়িকের সময় হয়ত একবার মাত্র তাঁকে স্মরণ করবে তাঁর বংশধররা। তারপর দু-এক পুরুষ পরে তাঁর নামটাও আর মনে পড়বে না। 'যথানামো' ক'রে সারবে।

মনে মনে হাঁপিয়ে ওঠেন, ছটফট করতে থাকেন জয়ন্ত ঘোষাল। বাড়ি ছেড়ে দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোথাও যেতে পারেন না। কোথাও যে যাওয়া যায় তাও বোঝেন না। যাদের নিয়ে ইহলোক তাঁর—যাদের মধ্যে নিজের জগৎকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলেন—তাদের বাইরে আর কোথাও যাবার কথা ভাবতেই পারেন না। অথচ সেই জগতের মধ্যেও যে আর কোথাও তাঁর স্থান নেই! বাড়তে, পাড়ায়, বার লাইব্রেরীতে, কংগ্রেস অফিসে, য়্যাসেম্বলীতে, খবরের কাগজের অফিসে—কোথাও আর কেউ তাঁকে মনে করে রাখে নি। তাঁর জন্যে কেউ শোক করছে না, আপসোস করছে না। কোথাও এতটুকু কাজ আটকে নেই কারুর।

এর চেয়ে যদি কখনই এত শোক কেউ না করত, যদি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সকলের বেইমানিটা চোখে পড়ত তো এত দুঃখ বোধ হয় হত না। আনন্দ-উত্তেজনার উগ্র সুরা ক্রমাগত পান করার পর আজ তাঁর সব কিছু মাদক-উপকরণ ঘুচে গেছে। আজ তাঁর মতো হতভাগ্য কে! কী নিয়ে থাকবেন তিনি—এই বাড়িঘর, এই সমাজ, এই দেশের মধ্যে বিস্মৃত অবহেলিত এমনি ঘুরে বেড়াবেন ?

নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজের অস্তিত্বহীন দেহের গালে-মুখে চড়াতে ইচ্ছে করে তাঁর। কেন এ দুর্বুদ্ধি হয়েছিল তাঁর—এ জন্মের জের পরজন্ম পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার! এমন দুর্বুদ্ধি যেন আর কখনও কারুর না হয়। হে ঈশ্বর, হে জগন্নাথ, এবার ক্ষমা করো ওঁকে—জয়ন্ত ঘোষালকে! এবার রেহাই দাও। এ জন্মের এই অদৃশ্য বন্ধন থেকে মুক্তি দাও!

অন্তর্যামী

সাধুটিকে আপনারা কেউ কেউ দেখে থাকবেন। সাধুই বলব—যদিও তিনি গেরুয়া পরতেন না, বহির্বাস হিসাবে একটা মোটা সাদা কাপড়ের আলখাল্লা ব্যবহার করতেন। ছবির যীশুর মতো বড় বড় চুল এবং গোঁফ দাড়ি ছিল। রংটা হয়ত এক কালে ফরসাই ছিল—তখন তামাটে হয়ে গেছে। তখন মানে আমি যখন প্রথম দেখি—১৯৫৬/৫৭ হবে। দীর্ঘদেহ, কান্তিমান পুরুষ। হাসিখুশি। সাধুর নাম জানি না, শুনলেও মনে নেই। থাকতেন বার্লোগঞ্জ আর মুসৌরীর মাঝামাঝি একটা স্থানে, কুঠিয়া বা ঝোপড়া কিছুই ছিল না। মুখোমুখি দুটো গাছের ছায়ায় বাস করতেন। নিচে বার্লোগঞ্জ থেকে জায়গাটা দেখিয়েছেন—আমি যে আশ্রমে থাকতুম সেখানের স্বামীজীরা, বার্লোগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক দে। কাছাকাছি আবৃত আশ্রয় বলতে কিছু নেই। এমন কি একটা তেরপলের ছাউনির শাখাপ্রশাখার তৈরী কোন চালা—কিছুই না।

ওদিকে সমতলের মতো নিবিড় ঘন জঙ্গল হয় না সত্য কথা, তবু গাছপালা বেশ আছে, অরণ্যের মতোই দেখায় দূর থেকে। আর শিওয়ালিক শ্রেণীতে নেই কি—বাঘ, ভালুক, ময়াল, বুনো হাতী এখনও দেখা দেয় মধ্যে মধ্যে।

এ প্রসঙ্গ তুললে সাধুটি হা হা ক'রে হাসতেন শুধু। পূর্বের শরীর কোথাকার বললেও উত্তর পেতুম না। বলতেন, 'আন্দাজ করুন না'। পরিষ্কার বাংলা বলতেন তবে মনে হ'ত কোথায় একটা ভিনদেশী টান আছে। শেষের দিকে এক-আধটা কথায় মনে হয়েছে, আসলে রাজস্থানী।

উনি ভিক্ষায় যেতেন না—কোন ছত্রে বা গৃহস্থ বাড়িতে। এক ভদ্রলোক তাঁর ঘরের ভঁইস-দুধের ঘোল মইতেন (মাখন বার করার জন্য), সেই ঘোল ছোট একটি পিতলের বালতি—এ বালতি পশ্চিমে বহু সাধুর হাতেই দেখে থাকবেন, ভেতরটা 'নিকেল' করা থাকে—ভ'রে দিতেন। সেইটেই তাঁর দিনে-রাতের খাদ্য ছিল। খাদ্য বা পানীয় যাই বলুন।

মধ্যে মধ্যে উনি নিচে, যে আশ্রমে আমি থাকতুম—সেখানে আসতেন।

আসতেন ঐ আলখাল্লা ময়লা হ'লে। এখান থেকে একটু সাবান চেয়ে নিয়ে সেটা কেচে দিতেন, সেই সঙ্গে একটা কৌপীনও। ময়লা কৌপীন হাতে করে নিয়ে আসতেন। কেচে শুকোতে দিতেন, সন্ধ্যার আগে—শুকনো বা আধা শুকনো (মেঘ করলে পুরো শুখোত না) বহির্বাস গায়ে দিয়ে আবার ওপরে উঠে যেতেন। মধ্যে মধ্যে গম্ভীর বাঘের ডাক নিচে থেকে শুনেছি বৈকি। কিন্তু তিনি ভয় পেতেন না। বর্ষার সময়ও কোন আচ্ছাদিত স্থানে যেতেন বলে শুনি নি।

এই আশ্রমে আসার দিনটিতে তিনি ভাত রুটি খেতেন। তবে তার বদলে তাঁর ভিক্ষালব্ধ ঘোল এঁদের নিতে হ'ত। রঘুবীর মহারাজ থাকলে তা কাপড়ে ঝুলিয়ে রেখে জল শূন্য হলে 'শ্রীখণ্ড' তৈরী করতেন, মারাঠীদের এটি এক সুস্বাদু খাদ্য।

এই সাধুকে আমি পরবর্তীকালে উল্লেখ করতে গেলে, 'যীশু' বলেই উল্লেখ করতুম। এখানেও তাই করছি।

এঁকে আমি দেখেছি কয়েকবারই। বার্লোগঞ্জে তো বটেই—কিষেণপুরে, ঋষিকেশে এমন কি একবার হরিদ্বারেও দেখেছি।

এখানে একটি বিশেষ দেখা হওয়ার কাহিনী বিবৃত করে এ প্রসঙ্গ শেষ করব। উনি বেঁচে আছেন কিনা জানি না, সম্ভবত আছেন। বর্লোগঞ্জে যাওয়াও বন্ধ হয়েছে—মুসৌরীতেও যাই নি বহু দিন—আর কোন সংবাদই রাখি না

আমি যে দিনের কথা বলছি, মাত্র তার দিন কয়েক আগেই যীশু তাঁর আলখাল্লা কাচার জন্যে আশ্রমে এসেছিলেন। সেবার আমি আশ্রমে উঠি নি, মুসৌরীতেই এক ভদ্রলোকের বাড়ি উঠেছিলাম। সেটা মুসৌরী আর বর্লোগঞ্জের মাঝামাঝি—হেঁটে আসা-যাওয়া করা যায়। আমিও প্রত্যহই সকালে জলযোগের পর একবার আশ্রমে আসতুম। এখানের বাগানের একটি কোণ আমার বড় ভাল লাগত। নিচে দেরাদুন থেকে ওপরে লাইব্রেরী বাজার (না কুল্‌ড়ি (?) ঠিক মনে পড়ছে না) পর্যন্ত সমস্ত বাসের রাস্তাটা দেখা যেত—দুন ভ্যালির বিচিত্র শোভাও।

যীশু সেদিন এসেছিলেন একটু আগেই। এসে আমার কাছেই বসলেন,

এক কাপ চাও খেলেন আমার সঙ্গে—ভক্তদের দিয়ে যাওয়া একখানা বালুশাহীও।

কথাপ্রসঙ্গে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আবার তো আপনার সেই মাস-খানেক পরে আসা—ততদিন আমি এখানে থাকব না। যদি সামনের বছরে আসি তবেই দেখা হবে আবার।'

উনি কেমন এক রকম স্থির বিচিত্র দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'না, হয়ত দিন চারেকের মধ্যেই আমাকে আসতে হবে একবার। তবে সে রাত্রে—আপনি আসবেন কি?'

'কেন, রাত্রে কেন? এত তাড়াতাড়ি?' উনি তেমনি রহস্যভরা দৃষ্টি আমার চোখে স্থির রেখে বললেন, 'দেখুন না—চারটে দিন তো! কৌতূহলটা না হয় চেপেই রাখলেন। জানেন তো—ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাসের শেষটা আগে পড়ে নিলে সব রসই মাটি হয়ে যায়।'

অতএব আর প্রশ্ন করা গেল না। বেশ একটু অধীর উৎসুক হয়েই রইলুম।

খবরটা পেলুম এর এক দিন পরেই।

যাঁর বাড়ি ছিলুম—মুখুয্যে মশাই তিনিই খবরটা দিলেন।

আমাদের ঐ মঠের মোহান্ত মহারাজের জ্বর হয়েছে কাল রাত্রি থেকে —তাতে অত ব্যস্ত হবার কারণ ছিল না—এঁদের বন্ধু ডাঃ গ্রোভার খবর পেয়ে নিজেই এসেছিলেন, সহজ স্বাভাবিক ভাবেই পরীক্ষা করছিলেন, হাসি ঠাট্টা করতে করতে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরীক্ষার পরই তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে, বাইরে এসে বলেছেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার। সামান্য জ্বর, তাও বলছেন গত কাল বিকেল থেকেই হয়েছে—কিন্তু পাল্‌স্‌এর অবস্থা খুব খারাপ, হার্ট ভাল নয়। আমি গোটা দুই ইনজেকশ্যন দিয়ে যাচ্ছি, আপনারা বরং দেরাদুন থেকে ডাঃ দত্ত বা ক্যাপটেন মিত্রকে খবর দিয়ে আনিয়ে নিন। আমি একা এ কেসের দায়িত্ব নিতে রাজী নই।'

খবর শুনে একটু বেলায় নিজেই গেলাম।

এ মহারাজের আদরযত্ন জীবনে ভুলব না এত দিনে একটা আন্তরিক টান জন্মে গেছে, নিছক ভদ্রতা রক্ষার জন্যেই যাওয়া নয়।

গিয়ে দেখি এঁদের টেলিফোন পেয়ে দুই ডাক্তারই এসে গেছেন। তাঁদেরও মুখ গম্ভীর। একটু যেন বিহ্বলও—এতটা অবনতির কারণ ধরতে না পেরে।

এঁরা তখন ডাঃ গ্রোভারের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি এসে গেলেন আমি থাকতে থাকতেই। তিনজনে পরামর্শ করে একটা চিকিৎসার ধারা ঠিক করলেন।

তারপর চলল—যাকে বলে যমে-মানুষে টানাটানি। সন্ন্যাসী যুঝলেনও খুব।

ডাঃ গ্রোভার সেদিনই বলেছিলেন হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা— কিন্তু দুজন বাঙালী ডাক্তারই আপত্তি করেছিলেন, হার্টের যা অবস্থা তাতে টানা-টানি চলবে না।

তবে তার জন্যে কোনও অসুবিধা হল না। কনখল সেবাশ্রম থেকে ডাক্তার এলেন, কিছু যন্ত্রপাতিও এল—কিন্তু কোন কিছুতেই রোগীকে বাঁচানো গেল না। তিন দিনের দিন রাত একটার সময় উনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

অতঃপর মৃতকে রেখে জীবিতদের মধ্যে আলোচনা শুরু হ'ল সৎকারের ব্যবস্থা নিয়ে। এদের সম্প্রদায়ে অগ্নিসৎকার প্রচলিত আছে—সেই ভাবেই কথা চলছিল। হরিদ্বারে নিয়ে গিয়ে দাহ করা হবে—পরের দিন সকালে একটা ট্রাক যোগাড় ক'রে নিয়ে যাওয়া হবে, তার আগে হরিদ্বারে দু-এক জনকে টেলিফোন করা প্রয়োজন—কিন্তু সেও সকালের আগে, ডাকঘর না খুললে কিছু করা যাবে না,—ইত্যাদি।

আমিও উপস্থিত ছিলুম সেখানে। তবে আমি আর কি বলব, নবাগত তায় ক্ষণিকের আগন্তুক।

অকস্মাৎ অতি পরিচিত একটি কণ্ঠস্বর কানে গেল। 'কিন্তু ওঁর খুব ইচ্ছা ছিল ওঁকেও জলসমাধি দেওয়া হয়। সত্যেশ্বর মহারাজ কি ভুলে গেলেন? ওঁকেও তো বার বার করে বলে গেছেন।'

চমকে উঠলুম। যীশুই।

প্রশান্ত মুখ, আমার দিকে চোখ পড়তে ওঁর দৃষ্টিতে একটা চাপা কৌতুক ফুটে উঠল।

ঠিক তো। আজই চতুর্থ দিন এবং রাত্রি। তার মানে? উনি কি—অন্তর্যামী, না ত্রিকালজ্ঞ?

ততক্ষণে সত্যেশ্বর মহারাজেরও মনে পড়েছে কথাটা।

যীশু বললেন, 'ট্রাকের জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। সে ব্যবস্থাও করে রেখেছি, পয়সা নেবে না, কাল সকালেই আসবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনাদের সেবায় থাকবে। হরিদ্বারেও আমি খবর পাঠিয়ে দিয়েছি বিকেলেই। আর যদি আপত্তি না থাকে, আমিও আপনাদের সঙ্গী হবো।'

উপস্থিতি

এটা কোন ভয়-দেখানো গায়ে-কাঁটা-জাগানো গল্প নয়, ভূতের গল্পও নয়। আদৌ কোন গল্প হ'ল কিনা, হয়ে উঠল কিনা—তাও বুঝতে পারছি না। যেমন ঘটেছিল ঠিক তেমনি বলছি। কাউকে বিশ্বাস করতেও বলছি না। করবেন কিনা সে আপনাদের অভিরুচি।

অবশ্য একটা কথা ঠিক, খবরের কাগজটা যখন হাতে এল তখন বসে আমি একটা গল্পের কথাই ভাবছিলুম। এক একটা সময় আসে না—সব লেখকেরই আসে—কেমন একটা শূন্যতা বোধ হয় চিন্তার কল্পনার ভাণ্ডারে, কি লিখবে খুঁজে পায় না! কে জানে, রবীন্দ্রনাথেরও এমন সময় আসত কি না।

কাগজটা ঘরে এসে পড়তেই তখনকার মতো আবশ্যিক লেখার (অন্তত সে চিন্তা) হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে তাড়াতাড়ি কাগজটা টেনে নিলাম। আর খুলতেই চোখে পড়ল—বনমালীবাবু মারা গেছেন।

খুবই ছোট খবর, চোখে পড়বার কথা নয়। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ওপরের দিকে ছ পয়েন্ট হরফে লেখা তিন লাইনের সংবাদ। তবু চোখে পড়ল। খবরটার মূল্য আর কারও কাছে আছে কিনা জানি না, আমার কাছে অনেকখানি।

বনমালীবাবু আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। দক্ষ প্রশাসক, 'অল রাউণ্ডার'। সেকালের শিক্ষক—দরকার হলে সব বিষয়ে পড়াতে পারতেন, ছেলেরা তাঁকে ভালবাসত, তিনিও তাদের ভালবাসতেন। সেই জন্যেই,

শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও ৯২ টাকা সি. এম. দরের কাগজে এই দেড় সি. এম. স্থান ব্যয় করতে দ্বিধা করেন নি কাগজের কর্তৃপক্ষ।

বয়েস হয়েছিল অবশ্য, ওরা লিখেছে ছিয়াশি বছরে মারা গেছেন, আমার তো মনে হয় আরও বেশি। তবু খবরটা পড়ে যে এতটা বিচলিত বোধ করলাম, তার কারণ ওঁর কাছে আমার ঋণ অনেকখানি। উনি প্রধানত ইংরেজী পড়ালেও বাংলা সাহিত্যের নেশা উনিই আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। আমার একটু আগ্রহ আছে দেখে উনি লাইব্রেরী থেকে ভাল ভাল বই বেছে দিয়েছেন। তা নিয়ে ওঁর একান্ত অনবসরের মধ্যেও আলোচনা করেছেন। এমন কি আমার সেই বালক বয়সের একেবারেই অপরিপক্ক হাতের রচনা-প্রচেষ্টাকেও ব্যঙ্গবিদ্রূপ না ক'রে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন।

তারপরও বরাবর যোগাযোগ রেখেছেন। এই মাত্র বছর চারেক আগেও একটি বই পড়ে ভাল লাগাতে চিঠি লিখে অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জানিয়েছেন।

সেদিন আর কিছু লেখা গেল না, লেখার চিন্তাও নয়। বাল্যের অসংখ্য স্মৃতি মনে এল ভিড় ক'রে। মানুষটি দেখতে সুপুরুষ ছিলেন, পয়সাওলা ঘরের ছেলে। টাকার অভাবে মাস্টারী করতে আসেন নি, পড়াতে ভাল লাগে বলে এসেছিলেন। তাও ইংরেজীতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, অনায়াসে কলেজে অধ্যাপনা করতে পারতেন, সেও ওঁর ভাল লাগে নি। অবশ্য চাল-চলনে একটু স্বাতন্ত্র্য ছিল বরাবরই। ভাল দেশী ধুতি পরতেন, ভাল জামা। জিনিস যা কিনতেন দামী দামী। গরিবের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন—শ্বশুর-বাড়ি থেকে যা তত্ত্ব আসত, তা নিয়ে কখনও কিছু বলেন নি বা মা-বাবাকেও বলতে দেন নি—তেমনি তা ব্যবহারও করতেন না কখনও। স্ত্রী লজ্জিত বোধ করলে বলতেন, 'ছ্যাখো, ওঁরা যা দিচ্ছেন ওঁদের সাধ্যের অতীত, আমি মাস্টারী ক'রে খাই, একশো টাকা মাইনের চাকর—আমারই এতটা চাল ভাল নয়, দোষ আমারই।'

এই সব কত কি এলোমেলো চিন্তা মাথায় আসতে লাগল, শেষ অবধি 'ছুত্তোর' বলে উঠে পড়লাম। বনমালীবাবুর স্ত্রী বেঁচে নেই, দুই ছেলে, ছেলের বৌরা নাতিনাতনী আছে, তাদের সঙ্গেই দেখা করা দরকার।...

দেখা করতে গিয়েছলাম সেই কারণে কিনা জানি না, ওরা এসে যথানিয়মে দায় জানিয়ে গেল। না জানালেও আমি যেতাম অবশ্য। সেকথা বলেও দিলাম তাদের।

ঘটনাটা বা গল্পটা সেই শ্রাদ্ধের দিনেরই।

কলকাতা থেকে বেশি দূরে না হলেও জায়গাটা একটু পাড়াগাঁ-মতো। বাস যতদূর যায়, তারপরও একটু হাঁটতে হয়। বিকেলে রিক্‌শা চলে—কিন্তু সকালের দিকে সেই পথেরই দু'পাশে বাজার বসে। এত ভিড় যে তা ঠেলে রিক্‌শা চালানো যায় না।

অগত্যা হেঁটেই যাওয়া।

যেতে যেতেই চোখে পড়ল, একটি ছোকরা গোটাকতক পাকা পেঁপে আর চালতা নিয়ে বসে আছে। বোধহয় নিজেদের বাড়ির ফসল, বেচতে এসেছে। কারণ পেঁপেগুলো প্রায় গাছ-পাকার মতোই টাটকা। একটা তো বিশেষ ক'রে—গোল নিটোল, বেশ ভাল পাকা। আর বেশ বড়ও। দেড় কেজি পৌনে দু কেজির কম নয়। দর করলুম—সেও কম, তিন টাকা করে চাইল। আজ সকালেই আমাদের বাজারে কিনেছি চার টাকা কেজি।

মনে ধরেছিল বলেই মনে ছিল। শ্রাদ্ধবাসরে গিয়ে একটা ডালায় সাজানো ফলের মধ্যে প্রথমেই যা চোখে পড়ল—এতটুকু একটা শুকনো মতো পেঁপে, জোর ক'রে রঙ ধরানো। অন্য সব ফলও যে খুব উঁচুদরের তা নয়—তবে পেঁপেটা যেন বড়ই দৃষ্টিকটু।

কথাটা বলেও ফেললাম।

আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল যেন।

'এত কাণ্ড করলেন গোবিন্দদা, পেঁপেটা এমন দুক্‌চেটে দেখে আনলেন কেন! মাস্টারমশাই পেঁপে বড় ভালবাসতেন—। আজ আপনাদের বাজারেই কি সুন্দর একটা বড় গাছ-পাকা পেঁপে এসেছে—এমন জানলে আমি নিয়েই আসতুম—'

বলে ফেলেই বুঝলুম বলাটা আমার উচিত হয় নি। এতটা অন্তরঙ্গতা ছেলেদের সঙ্গে নেই, তাছাড়া থাকলেও এটা আমার ধৃষ্টতা হ'ত, অনধিকার চর্চা। গোবিন্দদার অপমানিত বোধ করার কথা।

ভুলটা সংশোধন করার জন্তে অল্পকথায় কি ভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করা যায় ভাবছি—কিন্তু গোবিন্দর মুখের দিকে চেয়ে থেমে যেতে হ'ল। রাগ তো দূরের কথা, ওরই যেন দেখলুম কেমন একটু অপ্রস্তুত ভাব। বললে, 'হ্যাঁ, বাবাও তাই বললেন, 'গোবিন্দ, তোর সেই ছুক্‌চেটে বিত্তিটা গেল না আর। নরানাং মাতুলক্রম, মামার বাড়ির দিষ্টিকেপ্পনতা একেবারে রক্তে ঢুকে গেছে। এই পেঁপে তুই দেখে কিনলি!—'

'বললেন'টা 'বলতেন' হবে—এটা ধরেই নিয়েছি আমি বলার সঙ্গে সঙ্গেই। মা-বাবার ক্ষেত্রে এমন সকলকারই হয়—দীর্ঘদিনের অভ্যাসটা দীর্ঘদিন ধরেই থেকে যায়—কিন্তু পেঁপে শুনে আমি যেন ধাক্কা খেলুম একটা! এটা কি গোবিন্দরই মনের কুণ্ঠা বা অপ্রতিভতা! 'বলতেন'-এর জায়গায় 'বললেন' ব্যবহার করাটা অভ্যাসই?

কিন্তু অবাক হয়ে দেখি গোবিন্দর মুখ চোখের চেহারাটা পালটে গেছে একেবারে। কথা বলছিল, মুখের হাঁ-টা সেইভাবেই থেমে আছে, কেমন এক রকমের বিস্ময়বিহ্বল ভাব চোখের, সেই সঙ্গে একটু যেন ভয়েরও—

আমিও কেমন হয়ে গেছি। এ কি ভুল না গোবিন্দর মাথার গোলমাল। ও এমন পাথর হয়ে গেল কেন নইলে!

বেশ কিছুক্ষণ পরে যেন আপনমনে বিড়বিড় ক'রে বলল, 'তাই তো, এ কি হ'ল! বাবা আসবেন কেমন ক'রে! অথচ আমি যে একেবারে স্পষ্ট দেখলুম, সেই গলা সেই চেহারা—যা চিরকাল দেখে আসছি। এতকাল ধরে এসব কথা শোনা অব্যেস, মনেও তো হয় নি একবারও—।'

আমি কথাটা চাপা দেবার জন্তেই তাড়াতাড়ি বললুম, 'সে যাক গে, আমি বরং দেখে আসি পেঁপেটা এখনও আছে কিনা—'

গোবিন্দদা বললো, 'চলো বরং আমিও যাই—'

'না না, আপনি এ অবস্থায় এখন যাবেন কি, কাজে বসার সময় হয়েছে, ঠাকুর মশাই ডাকছেন। আমিই নিয়ে আসছি। না হয় আমিই এটা দিলাম। অনেক ঋণ আমার তাঁর কাছে।'

'না, তুমি বুঝছ না। আমার যেন কেমন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আমি সুস্থির হ'তে পারব না।'

গোবিন্দ প্রায় ছুটেই বেরিয়ে এল আমার সঙ্গে।

কিন্তু সে পেঁপে আর নেই। কেউ নিয়ে চলে গেছে। অমন গাছ-পাকা ফল কি পড়ে থাকে!

গোবিন্দ বললে, 'হ্যাঁ রে, সে বড় পেঁপেটা কি হ'ল রে? কে কিনল? আমাদের পাড়ার কেউ—?'

'এই তো, এখুনি। মাস্টারমশাই-ই তো কিনে নিয়ে গেলেন। আপনার বাবা—'

বলতে বলতেই তারও মুখটা তেমনি হাঁ হয়ে থেমে গেল। মাথা কামানো, খালি পা গোবিন্দর, তাছাড়া বুঝলুম ছেলেটাও এ পাড়ার, মাস্টারমশাইয়ের মৃত্যুসংবাদটাও তার অজানা নয়।

'মানে—আমার তো তেমনিই মনে হ'ল। বললেন, ছেলেকে দিয়ে আমি কাল দাম পাঠিয়ে দেব। আমার তো মনে হ'ল পষ্ট—'

গোবিন্দ আর দাঁড়াল না। দাঁড়াতে পারল না। ছুটেই চলে গেল এবার। ওকে দাদা বললেও ও আর আমি এক বয়িসীই, ষাটের ওপর বয়েস হবে।

আমিও যথাসম্ভব দ্রুত ফিরে গেলাম।

পিছন থেকেই নজরে পড়ল সাজানো সভার সামনে গোবিন্দ পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কারণটাও সামনে গিয়ে বুঝতে বাকী রইল না।

সে শুকনো জাঁক দেওয়া পেঁপেটি অন্তর্হিত হয়েছে, ফলের ডালার মাথা আলো ক'রে আছে সেই সুগোল সুপুষ্ট সুপক্ক বড় পেঁপেটি।

কে আনল, কে রাখল ওখানে—দেখা গেল তা কেউই জানে না। কেউ রাখতে দেখে নি।

এ যুগের স্যাবত্রী

মানুষ মাত্রেরই কিছু কিছু বাতিক থাকে। সূর্যবাবুর স্ত্রীরও থাকবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে। খুব যারা দরিদ্র, অন্ন বস্ত্রের জন্যে নিত্য যুদ্ধ লড়াই করতে হয়—তাদেরও বাতিক কিছু কম দেখি না। অনিলার

তো সে সমস্যা তত তীব্র নয়, বরং তার নিজের হাতে কিছু আছে (আত্মীয়-দের বিশ্বাস বেশ কিছু), এ সবের জন্যে স্বামীকে বিরক্ত করতে হয় না। অনিলার যে বাতিকটা চট্ ক'রে চোখে পড়ে, যার জন্য সে বারবার ঠকে আর স্বামীর বিদ্রূপ সহ্য করে তা হ'ল, ছেলেমানুষ দেখে চাকর বা ঝি রাখা। আর তার মধ্যে যেটি মনের মতো হয়—মানে অনিলার মনে হয় মনের মতো—তাকে নিজের ছেলেমেয়ের মতো ক'রে সাজাবার চেষ্টা।

অবশ্য একটা কারণও তার খাড়া করা থাকে, 'আহা, ওরাও তো ছেলে-মানুষ, আমার ছেলেমেয়ে সেজেগুজে বেরুবে রাস্তায়, ওরা ঐরকম ছেঁড়া-ময়লা জামা-কাপড় পরে সঙ্গে যাবে—বড় দৃষ্টিকটু নয়? এতেই তো মনের মধ্যে শ্রেণীসংঘর্ষের বীজ জন্মায়। তাছাড়া হাইজিনির একটা প্রশ্নও তো আছে!'

ঠকেছেও অনেকবার অনিলা। গণেশ এল, দেখতে শুনতে খুব ভাল না হলেও চটপটে। কাজের ছেলে—ব্যস। অনিলার পুত্রস্নেহ উথলে উঠলো। শুরু হয়ে গেল তার জন্যে ভাল জামা, ভাল প্যাণ্ট, দামী বিলিতী গরমজামা—কিছু কিনে, কিছু বা চেয়েচিন্তে। গণশা দেখতে দেখতে তিন-চার মাসের মধ্যে গণেশবাবু বনে গেল। ছেলেটা অবশ্য খুব খারাপ ছিল না—খাটত খুব, দু-এক পয়সা চুরি ক'রে বিড়ি খেলেও পুকুর চুরি করে নি কখনও। বোধ হয় অত খাটত বলেই পাঁচজনের নজর পড়ল। পড়বে এ তো স্বাভাবিক। কুড়ি টাকা মাইনেতে এসেছিল, এক বছরেই পাঁচ টাকা বাড়িয়ে অনিলা পঁচিশ ক'রে দিলে। কিন্তু তাকে যদি কেউ একেবারে চল্লিশ টাকা দিতে চায়, সে তবু এই 'পুত্রবৎ' আচরণের টানে থেকে যাবে এতটা আশা করা যায় না। টাকার জন্যই মা-বাবাকে ছেড়ে এতদূরে খাটতে এসেছে। টাকা বেশী পেলে সেখানেই যাবে বৈকি!

এমনি ক'রে কালীপদ, চপলা, বিদ্যুৎ—একে একে অনেকগুলি গিয়ে এল এই অঞ্জনা। পাতলা ছিপছিপে গড়ন, রং কালো হ'লেও মুখে বেশ একটি শ্রী আছে, হাসিটা খুব মিষ্টি—দেখামাত্র অনিলার প্রচণ্ড মায়া পড়ে গেল। মেয়েটাও খুব, যাকে বলে 'নেটিপেটি'—সেই রকমের। এও আপন করতে চায়। ছেলেমেয়েদের দেখা; রান্নার সাহায্য করা থেকে শুরু হয়েছিল, তিন মাসের মধ্যে রান্নার ভার বেশীটা নিজের হাতে নিয়ে নিল; কাপড় কাচা,

বিছানা করা, বিছানা রোদে দেওয়া, বাজার করা—কি না করত মেয়েটা।

সেও যত লাফিয়ে লাফিয়ে এদের অন্তরের দিকে এগোয়, অনিলারও বাতিক তত লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। বয়স নাকি, অঞ্জনার মার ভাষায়—'কে জানে বাপু, ওর বাপ তো যা বলে পনেরো হবে, আমি অত জানি না' কিন্তু দেখায় তেরো-চৌদ্দ, তাও গড়ন বাড়নশা নয়। সূর্যবাবুর ভাষায়, 'ঘেঁচুটে মার্কা চেহারা'। তবে তা'হলে কি হয়, বড় মেয়ের ভাল ভাল ফ্রক তো উজোড় করে দেওয়াই হ'ল, অনিলা নিজের শাড়িও একটার পর একটা পরাতে শুরু করল। অত বড় বড়, ঝাড়া এগারো হাত শাড়ি, কোনক্রমেই অঞ্জনার হয় না, কোন রকমে জড়িয়ে পরতে গিয়ে পায়ে বেধে যায় বারবার। জবড়জং গোছের দেখায়—কিন্তু তাতে অনিলার উৎসাহ কমে না। আসলে এটা ওর নিজের পুতুল-খেলারই শখ। অঞ্জনার কি কি অসুবিধে হচ্ছে, তা ভাবতে গেলে চলে না।

ভালই ছিল অঞ্জনা। এক বছর যখন কেটে গেল—মনে হ'ল এ মেয়েটা টিকেই যাবে। খুবই মন বসেছে মনে হয়। কখনও-সখনও যদিবা মা এসে দু-তিন দিনের কথা বলে দেশে নিয়ে যায়—ও ঠিক পাঁচ-ছ দিনের মাথাতেই ফিরে আসে, বেশী দিন থাকে না। এর মধ্যে অনিলা একদিন ওর সঙ্গে গিয়ে ওদের দেশের বাড়ি-ঘরও দেখে এসেছে। অনিলাও যেমন অঞ্জনার ভাই-বোনদের জন্যে প্যাণ্ট ফ্রক নিয়ে গিছল অনেক, অঞ্জনার মা-ও ফল-সব্জি দু-থলি বোঝাই ক'রে সঙ্গে দিয়েছে। বেশ একেবারে রীতিমতো আত্মীয়-তারই ব্যাপার।

এরই মধ্যে একদিন 'তিনদিন' বলে দেশে গিয়ে আর ফিরল না অঞ্জনা। সাতদিনও যখন কেটে গেল, তখন অনিলা একটু শঙ্কিত হয়ে উঠল। আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল আলমারীর কাগজের তলা থেকে দুখানা একশো টাকার নোট উধাও হয়েছে, সেই সঙ্গে বড় মেয়ে বেবীর সরু বিছে হারটা। হারটা অবশ্য খুবই ফঙ্গবেনে, কে একজন ভাতের সময় দিয়েছে, তবু পাঁচ-ছ আনার সোনা তো আছেই। এখনকার দিনে তার দাম কত!

অনিলা এই বিশ্বাসঘাতকতাতেই বড় মুষড়ে পড়ল। এ পর্যন্ত কাউকে বিশ্বাস ক'রে আলমারীর চাবি দেয় নি। অঞ্জনাকেই দিত মধ্যে মধ্যে—

কাঁপড় জামা বার করতে, গুছিয়ে তুলে রাখতে। সে এই কাজ করল।

এতকাল এত ঝি চাকর পালিয়েছে—তাদের অকৃতজ্ঞতায় রাগই হয়েছে অনিলার, এবারের এই ব্যাপারে কেঁদেই ফেলল!

এইখানেই এ পর্বে পূর্ণচ্ছেদ পড়ার কথা, কিন্তু তা পড়ল না।

দুঃখ ও অভিমান (অকারণ) কাটতে অনিলা চটে উঠল। বলল, 'পুলিসে খবর দাও, আমরা বাড়ি চিনি। গিয়ে বমাল ধরিয়ে দেব!'

সূর্যবাবু বললেন, 'পুলিস বার বার নোটিশ দিয়েছে, কেউ ঝি চাকর রাখলে তার নামধাম বিবরণ স্থানীয় থানায় জানিয়ে রাখতে। তুমি রেখেছিলে? তাছাড়া বলছ বমাল ধরিয়ে দেবে—মাল যদি সেখানে না পাওয়া যায়? সে যে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সাজিয়ে রেখেছে, একথা তোমাকে কে বললে!'

স্বামীর কাটান-মন্তরে অনিলা মনে মনে চটে গেলেও তখনই কোন উত্তর দিতে পারল না। কিন্তু তাই বলে হালও ছাড়ল না। কদিন পরে সূর্যবাবু অফিসের কি কাজে দিল্লী গেছেন, সেই ফাঁকে ছেলেমেয়েগুলোকে নিচের তলার আরতির কাছে রেখে এক ভাগ্নেকে সঙ্গে করে অঞ্জনার দেশের দিকে রওনা হল।

দক্ষিণের মগরাহাট স্টেশন থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে ওদের গ্রাম। একবারই গিছল, তবু গ্রামের নামটা মনে আছে। স্টেশনে রিকশা পাওয়া যায়। ওদের বাড়ি অবধি যায় না রিকশা। তবু অনেকটা যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে ঘণ্টা দুই, এই কড়ারে যাওয়া-আসা ছ'টাকা কবুল ক'রে অনিলা উঠে বসল।

বাড়ি খুঁজে পাওয়া গেল। অঞ্জনার মাকেও দেখা গেল—কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াল একেবারে হিতে বিপরীত।

ওকে দেখেই ওর মা সরমা হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল। তারপরই একেবারেই ওর পা জড়িয়ে ধরে সেখানেই মেঝেতে কি মাথা খোঁড়া।

কী ব্যাপার! বলি হয়েছেটা কা? অঞ্জনার কিছু অসুখ-বিসুখ করেছে? এই ধরণের উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করা ছাড়া আর কি করার আছে এ ক্ষেত্রে। 'মরে গেছে কিনা'—এ প্রশ্নটা কিছুতেই করতে পারল না।

একটু ঠাণ্ডা হলে সরমা যা বলল, তা এই—

ওদের বংশে কেউ কখনও চুরি-চামারি করে নি। ওরা গরীব গতর খাটিয়ে খায়, কিন্তু কেউ বলতে পারবে না যে কারও এক পয়সা কোনদিন নিয়েছে সরমা হালদার। ওর মেয়েটা কিনা এই কাজ ক'রে বসল! এত ভালবাসত বৌদি, তারই ঘরে চুরি! তাও যে জন্যে করলি তাও তো পেলি না। নাকে ঝামা ঘষে দিয়ে চলে গেল। পাপের পয়সায় কি ভালো হয়েছে কারও! তাছাড়া সরমাদের যে ধর্মের ঘর, ধর্মের ঘরে পাপ সয় না।

অনেকক্ষণ পরে একটু ফাঁক পেতে অনিলা প্রশ্ন করল, 'তা সে গেলই বা কোথায়? আর কি জন্যেই বা চুরি করতে গেল! ও চাইলে কি আমি ওকে কটা টাকা দিতে পারতুম না!'

'গেরো'—যেন উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে সরমা, 'তবে আর গেরো বলেছে কেন। গেরো খারাপ না হ'লে এমন বুদ্ধি হয়! কী বলব, বৌদি, ঘেন্নার কথা, এখেনে একটা ছোঁড়া ছিল, হাড় বকাটে, রাতদিন পান বিড়ি খেয়ে ঘোরে। না করে কাজ, না কম্ম, না কম্মের চেষ্টা—বাপের খাটা কড়িতে বসে খাচ্ছে—নেশাভাঙ করতেছে। তাই চাষের কাজ একটু দ্যাখ্—তা কী সমাচার, না—ও আমার পোষাবে না। আমার ঐ পোড়ারমুখো মেয়ে তার জন্যেই মরে যায় একেবারে। বললে তার পা চাটে। ঐ তো বয়েস, রিদিকে ছোঁড়াটার খুব কম হ'লেও পঁচিশ তিরিশ হবে। তা সে নাকি ওকে বলেছিল, টাকা পেলে একখানা সাইকেল ইক্শা কিনে চালাবে। ত্যাখন বে করবে। তার আগে নয়। যদি তদ্দিন বসে থাকতে পারো তো থাকো—নইলে পারো চারশোখানি টাকা যোগাড় করে দাও। এখন কি ব্যাং না কি হয়েছে তারা টাকা দেয়, তবে সব নয়। অন্তত চারশোখানি টাকা ঘর থেকে বার করতে হবে!'

এই পর্যন্ত বলে বোধ হয় নিঃশ্বাস নেবার জন্যেই একটু থামল সরমা।

'তার পর! সেইজন্যে চুরি করলে! তা তাদের বিয়ে হয়েছে?' অনিলা প্রশ্ন করে।

'পোড়া কপাল! তবে আর বলতিছি কি! এসে তো ঐ জিনিস টাকা সব ধরে দিলে ছোঁড়াকে। ছোঁড়া ইকশা করবে কি, সেই টাকা নে এই গাঁয়েরই একটা মাগী —মাগী ছাড়া কী বলব বৌদি তারে, অন্তত দেড় কুড়ি বয়েস। একবার বে হয়েছিল, বর তাইড়ে দেছে। এসে বাপের বাড়ি উঠেছে

আর গাঁ সুদ্ধু যজাচ্ছে—সেই তাঁকে নিয়ে একেবারে নিউদ্দিশ।'

'বেশ হয়েছে। যেমনকে তেমনি। তা তিনি গেলেন কোথায়? আমাকে দেখে লুকিয়েছে বুঝি?'

'তাই তো আমার হয়েছে আরও জ্বালা, তবে আর বলতিছি কি। সে ছোঁড়া পরশুর আগের দিন, ধরোগে তরশু, ভেগেছে, সেদিন থেকে পাগলের মতো ঘুরতেছে। তারপর কাল এতের বেলা উঠে ফাঁকায় যাচ্ছি বলে যে বেরুল, আর তার দেখা নি। পাগলের কাণ্ড না, তারা কোথায় গেছে, কোথায় তাদের খুঁজবে বলো দিকি। আবার এক সব্বনেশে কাণ্ড। আমাদের কত্তা কোথা থেকে কোন্ কামারকে দিয়ে একটা বঁটি করিয়ে এনেছেল, ক্ষুরের মতো ধার—সেটাও দেখচি না। কী হবে বৌদি, যদি সত্যিই খুনখারাপ কিছু করে বসে!'

'ওমা, সে কি!' অনিলা বলে, 'তা পুলিসে খবর দিয়েছ!'

অনিলার কথা শুনে এতক্ষণ পরে সরমার মুখে হাসি দেখা দেয়। না, আনন্দ কি আশ্বাসের হাসি নয়, অনিলার বোকামি দেখে সস্নেহ প্রশ্রয়ের হাসি। বলে, 'তুমি কি পাগল হয়েছ বৌদি! এ খেত্তেরে পুলিসে খবর দেওয়া মানেই তো মেয়েটাকে যমের মুখে তুলে দেওয়া। যদি রপর কেউও তাকে খুন করে, পুলিস তো নিয্যস ধরে নেবে আমার মেয়ে করেছে এ কাজ। ওকে থানায় টেনে নে যাবে। মারধোর করবে। হয়ত বেইজ্জৎও করবে, তারপর চালান দেবে, ফাঁসিকাঠে ঝোলাবে।'

অনিলা লজ্জা পেয়ে চুপ করল।

চলেই আসছিল। সরমা জোর ক'রে বসাল। ছুটোছুটি করে মুড়ি তেলেভাজা জিলিপী আনল, চাও ক'রে দিলে। ওদের সাধ্যমতো আপ্যায়নের ত্রুটি হ'ল না।

আর দেরি করার কোন কারণ ছিল না। এতটা পথ গাড়ি ফেলে রেখে আসতে হবে তাই—নইলে রিক্সাওলা এতক্ষণ তাগাদায় অস্থির করে তুলত। উঠেই দাঁড়িয়েছে ফিরবে বলে, এমন সময় কিছুদূরে একটা শোর-গোল শোনা গেল। মনে হ'ল শব্দটা এদিকেই এগোচ্ছে।

দেখতে দেখতেই যেন হুড়মুড়িয়ে সামনে এসে পড়ল।

শ্রীমতী অঞ্জনা (সার্থকনামা, হনুমানের মারও ঐ নাম ছিল) এক হাতে একটা বঁটি আর এক হাতে একটা কালো লম্বা বকাটে গোছের ছোকরার কান ধরে যেন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হল। পিছনে মজা দেখার আর চেঁচাবার লোক ছেলে-বুড়ো মিলিয়ে প্রায় জনা-চল্লিশেক।

বিজয়িনী বিজয়গর্বে এসে ছোকরার কান ছেড়ে জামার মধ্যে থেকে সেই হারটা অনিলার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও মাইমা তোমার হার। ঐটেই যা উদ্ধার হ'ল। তুশো টাকা কি করেছে জানি না। সে আমি খেটে তোমাকে শোধ দোব। আর একটি বার তুমি ছ্যাখো, আর চুরি করব নি। খুব শিক্ষে হয়েছে। হ্যাড়া বেলতলায় আর যাবো নি।'

আশার আনন্দ, কতকটা বিজয়গর্বেও-ওর বিশ্বাস অপাত্রে ন্যস্ত হয় নি দেখে অনিলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললে, 'তা বিয়ে করবি না?'

'সে ত্যাখন দেখা যাবে। যদি ভাল পাত্তর পাই তবে। একে? থুঃ! একে ধরে এানছি তোমাদের সব্বাইকার সামনে নাকখৎ দেওয়াব বলে। নইলে ওর পানে চাইবারও আর পিরবিত্তি নেই আমার।'

অতঃপর আরও গোলমাল, একই সঙ্গে অনেকের কথা কইবার ভেতর থেকে যে তথ্য উদ্ধার করা গেল তা এই—

পাশেরই একটা গাঁয়ে একজনদের বাড়ি কিছু টাকা দিয়ে তুজনে লুকিয়ে ছিল, কিন্তু হঠাৎ এতটা টাকা হাতে পড়ায় আর মাথার ঠিক রাখতে পারে নি। মদ আনিয়ে খাচ্ছিল। তার জন্যে চেঁচামেচি—সে মেয়েটার সঙ্গে ঝগড়াঝাটিও শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাতেই অঞ্জনার খবর পাবার সুবিধে হয়েছে। একেবারে ঐ রণমূর্তিতে অতবড় বঁটি হাতে গিয়ে দাঁড়াতে দেখে নেশার মধ্যে (তুজনেরই পেটে তখন বিস্তর মাল পড়েছে) থতমত খেয়ে গেছে, ওকে বাধা দেবার কোন চেষ্টাও করতে পারে নি।

হার ছিল মেয়েটার গলায়। একটানে সেটা কেড়ে নিয়ে তার একটা কানের লতি খানিকটা কেটে নিয়েছে। সে 'বাবা রে মা রে' ক'রে ছুটে পালিয়েছে। তারপর ঐ ছোকরার কান ধরে টেনে এনেছে এতটা পথ, ভয় দেখিয়েছে—'যদি আমার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করো, এই বঁটি তোমার গলায় পড়বে, নয় তো—ওর কান কেটেছি তোমার নাক কেটে ছাড়ব। ভাল চাও

তো চলো, মার সামনে নাকখৎ দেবে তবে ছাড়বো।'

সত্যিই নাকখৎ দিতে হল ছোকরাকে।

বয়েস বা চেহারা অঞ্জনার যেমনই হোক বঁটিটা ছোট নয় বিরাট, তেমনি ধারালোও। আর এ যা রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরেছে—সত্যিই গলায় বসিয়ে দেওয়াও তো আশ্চর্য নয়।

উপসংহারপর্ব

এ বিয়েতে যতীশের আদৌ যাবার ইচ্ছে ছিল না। কোন বাধ্যবাধকতাও না। এখন আর সে আগের দিন নেই যে বড়বাবুদের ছেলেমেয়ের বিয়েতে গিয়ে ভূতের মতো খেটে না দিলে চাকরি থাকবে না। তাছাড়া যতীশ নিজের অধিকারেই বড় অফিসার। ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করে অফিসে কাজ করতে এসেছে, একেবারেই অফিসারের পদে বসেছে। তবু যে শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হ'ল তার কারণ—ভূপতিবাবু বয়স্ক লোক—এসে একেবারে দুটি হাত ধরলেন ওর, 'বাবা যতীশ, একই দিনে দুই ছেলের বিয়ে, একই দিনে দুই বৌভাত—আমার ভরসা বলতে তো ছেলেরাই, তা তারা তো ধরো বিশেষ কিছু করতে পারবে না—ভরসা করতে পারি, মানে ডিপেণ্ড করতে পারি, অথচ বয়স কম, খাটাখাটুনি করতে পারে এমন লোক সেখানে কেউ নেই। আরও দু-একজনকে বললুম, মফঃস্বল শুনে কেউ যেতে চায় না—তুমি ঘোরাঘুরি করো, তোমার অত ভয় করবে না। বলো বাবা, লক্ষ্মীটি।'

অগত্যাই রাজী হতে হয়েছিল যতীশকে। ভূপতিবাবুদের বাড়ি রাণাঘাটের কাছে—শহর থেকে মাইল কতক মাত্র দূর। সে জায়গা এখন আর গ্রাম নেই, উদ্বাস্তুদের কল্যাণে রীতিমতো জনবহুল গণ্ডগ্রামে পরিণত হয়েছে, বরং ছোট শহর বা মিনি শহর বলাই উচিত। কলকাতা থেকে এ কাজ করলে আত্মীয়-স্বজন সব দেশ থেকে এসে পড়বে—অত লোককে থাকতে দেবেন কোথায়? তাছাড়া লোকও অনেক হবে। এখানে এতদিন আছেন, এত বড় অফিসে বড় কাজ করেন—কাকে বাদ দিয়ে কাকে বলবেন?

পয়সা-কড়ি সম্বন্ধে ভূপতিবাবু হুঁশিয়ার—হিসাবী। সেই জন্যেই এত মাথা ঘামিয়ে দেশের বাড়িতে ব্যবস্থা। যতীশও তা জানত। একটু হেসেছিল ভদ্রলোকের এত হিসেব দেখে, তবু কত যে হুঁশিয়ার তা তখনও বুঝতে অনেক বাকী ছিল।

দুটি ছেলের বিয়ে—বড় আর ছোটর। বড় নিজে বিয়ে করছে, লাভ ম্যারেজ যাকে বলে, ওরা কায়স্থ, বিয়ে করছে ব্রাহ্মণের মেয়েকে। সে ক্ষোভ মিটিয়ে নিচ্ছেন ভূপতিবাবু ছোট ছেলের বিয়েতে—স্বঘরের মেয়ে, পাঁচ হাজার টাকা নগদ, খাট বিছানা ড্রেসিং টেবিল আলমারি, তেরো ভরি সোনা—আপাতত এই। পরে টি. ভি. এবং ফ্রীজ দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মেয়ের বাবা। মেয়ে বি. এ. পাস, ভূপতিবাবুর ভাষায় রঙটা একটু চাপা—তা আর অত দেখতে গেলে চলে না। ভূপতিবাবুর বড় ছেলে রাণাঘাটে এক কলেজে পড়ায়, এম.এ. পাস। তার বৌটি নাকি সুশ্রী, তবে এক পয়সাও পাবার আশা নেই, সে কথাও ওঠে নি। ছেলেই নাকি বলে দিয়েছে যে কিছু নেবে না। ছোটটি সরকারি চাকরি করে—কোনমতে ধরপাকড় ক'রে বি-কম পাস, ভূপতিবাবুই চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। সে-ই অত পাচ্ছে, বড় ছেলের অন্তত দশ হাজার টাকা পাওয়া উচিত ছিল না? তা ছেলেই যদি নিজের ভাল নিজে না বোঝে তিনি কি করবেন? নেহাৎ তিনি দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে না দিলেও ছেলে যখন করবে—তখন আর সে অপমানটা হতে যান কেন?

এ সব পথে আসতে আসতেই শুনল যতীশ।

এ পর্যন্ত গেল স্বাভাবিক।

দেশে পৌঁছে চমকে গেল, চিঠি যা ছাপা হয়েছে তাতে শুধুই ছোট ছেলের বিয়ের কথা—যেমন সাধারণ বিয়ের চিঠি হয়। বড় ছেলে নৃপতির নাম-গন্ধও তাতে কোথাও নেই।

তবে কি আলাদা চিঠি হয়েছে? তাই বা কই? তখন আর অত খোঁজের সময়ও নেই। তখনই বরযাত্রী বেরোচ্ছে। ছোট ছেলের বিয়ে হচ্ছে কল্যাণীতে। গাড়ি এসেছে, ফুলের মালা দিয়ে তা সাজানোও হয়েছে, আত্মীয়দের জন্যে বাস। বরণ, হুলুধ্বনি (জুকার), কিছুই বাদ গেল না।

কিন্তু নৃপতি কোথায়?

ভূপতিবাবু বললেন, 'সে কেমন তা তো জানো। সে বরযাত্রী নিয়ে যাবে না। তাদের বেশী খরচ হবে বলে। সে ঐখান থেকেই যাবে।'

'তাই বলে আপনাদের এখান থেকে কেউ যাবে না? সে কি কোনো কথা হয়?' যতীশ বলে।

'কে যাবে বলো। তাহ'লে এক তোমাকেই যেতে হয়। এঁরা তো সব গাড়িতে উঠে পড়েছেন। আমাদের এই সুরেশ ছোকরা সে বাড়ি চেনে, তুমি আর ও চলে যাও। এই দশটা টাকা বরং রাখো—'

'টাকা লাগবে না। আমি যাচ্ছি এমনিই।'

ততক্ষণে যতীশ বিস্মিত শুধু নয়, একটু যেন বিরক্তও হয়ে উঠেছে।

নৃপতি রাণাঘাটে মেসে থাকত, এখন একটা এক কামরা ফ্ল্যাট মতো ভাড়া করেছে। যতীশ যখন গেল তখন আর লগ্নের বেশী দেরি নেই। সুতরাং ফরসা কাপড়-জামা পরে প্রস্তুত হয়েছে, তবু বোধ হয় শেষ পর্যন্ত আশা করছিল ওখান থেকে কেউ আসবে। মালা আসে নি, চন্দনের কোন আয়োজন নেই! যেটুকু আশা ছিল যতীশ আর সুরেশকে দেখে সেটুকুও আর রইল না। কেমন এক রকম ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল, 'একজনও এলেন না আর? নাপিত-পুরোহিতও এল না। বাবার এতটা অমত আমাকে যদি আগে বলতেন, আমি রেজিস্ট্রী করার দিনই এখানে নিয়ে আসতাম। সন্ধ্যার তাতে আপত্তি হত না!'

যতীশ আর কথা বাড়াল না। তখনই সুরেশকে টাকা দিয়ে পাঠাল বাজার থেকে মালা কিনে আনার জন্য। অন্য ফ্ল্যাটের একজনকে মাসিমা পাতিয়ে একটু চন্দনও ঘষিয়ে নিল। অবস্থা শুনে সেই বাড়িরই একটি বউ এসে চন্দন পরিয়ে দিয়ে উলু দিয়ে বর রওনা করিয়ে দিলেন। নৃপতি তিন-চারটি খুব অনুগত ও প্রিয় ছাত্রকে বলেছিল—সবাই প্রাক্তন অবশ্য। এখন তারা কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, কেউ বা চাকরিতে ঢুকেছে। তাতেই তবু সব জড়িয়ে, কোনমতে বরযাত্রীর মতো একটা ব্যাপার খাড়া করা গেল।

কিন্তু পরের দিন বর-বৌ নিয়ে যখন সন্ধ্যায় ওঁদের বাড়ি পৌছল যতীশ—কেউ বৌ বরণ করতে এলেন না, কোন হুলুধ্বনি হল না, শাঁখও বাজলো না।

ভূপতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি উদাসীনভাবে বললেন, 'ঐ একটা ঘরে যেখানে হোক বসিয়ে দাও না।'

'দানের বাসন-টাসনগুলো, ট্রাঙ্ক, সঙ্গে মিষ্টি আছে, শয্যা—এসব কোথায় থাকবে ?'

'আঃ—ওগুলো আবার এখানে আনার হাঙ্গামা করল কেন নেপু! ওখানেই সংসার পাতবে, ওখানেই রেখে এলে পারত।…রাখো যেখানে হোক, আমার আর মাথার ঠিক নেই।'

ততক্ষণে ছোট ছেলে শ্রীপতি বৌ নিয়ে এসে পৌঁচেছে। চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল। বরণ হুলুধ্বনি হাস্য-পরিহাস কড়ি খেলা কিছুরই কোন ত্রুটি ঘটল না। বৌকে কাপড় ছাড়ানো, তাকে জল খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি—যা কিছু রীতি সবই পালিত হ'ল। কেবল আর একটি নববধূ যে ম্লান মুখে, মুখ হেঁট করে ও-পাশের একটা প্রায়-অন্ধকার ঘরে বসে আছে, সে কথা কারও মনে পড়ল না।

যতীশ নিজের চোখে এরকম আচরণ না দেখলে বিশ্বাস করত না। ভাবতেও পারত না। এ যেন তার নিজেরই অপমান বোধ হতে লাগল। খানিকটা ছটফট করে এক সময় গিয়ে নৃপতিকে বলল, 'এখন রাণাঘাট যাবার কোন ব্যবস্থা হতে পারে এখান থেকে ? আপনাদের যে ট্যাক্সিটা এসেছিল সেটা ছেড়ে দেওয়াই আমার খুব ভুল হয়েছে।'

নৃপতি নির্বোধ নয়। সে নিমেষে এ প্রশ্নের গূঢ়ার্থটা বুঝে নিয়ে যতীশের দুটো হাত চেপে ধরে বলল, 'প্লীজ, যতীশদা, আপনিই আমার এখন একমাত্র ভরসা। আপনি আমাকে ত্যাগ করবেন না। কালকের দিনটা কাটিয়ে দিয়ে যান। আপনি সন্ধ্যার কথা ভাববেন না, সে এর জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছে। সে ঠিকই আঁচ করেছিল—বলেছিল, 'বাবা তোমাকে কঠিন শাস্তি দেবার জন্যেই এই বিয়েতে মত দিয়েছেন। হাতে না পেলে তো অপমান করার সুযোগ মিলত না।'

অথচ কেন যে—সেটা যতীশের মাথায় গেল না। সন্ধ্যা দেখতে ছোট বউয়ের থেকে অনেক ভাল। এই কটা টাকার জন্য ? ছোট বৌয়ের গায়ে যা গহনা সন্ধ্যার গায়ে তার চেয়ে বেশী। কিছু আগে নৃপতির মামার কথায়

বেরিয়ে গেছে বৌভাতের খরচা বলে ভূপতিবাবু বড় ছেলের কাছ থেকে দু' হাজার টাকা আদায় করেছেন। ছোট দিয়েছে মাত্র এক হাজার টাকা। তার নাকি নিজের পোশাক-আশাকেই অনেক টাকা খরচা হয়ে গেছে, সে এর বেশী আর পারবে না।

যতীশ একসময় আর থাকতে না পেরে ভূপতিবাবুকে গিয়ে বলল,—বেশ একটু উচ্চকণ্ঠেই, যে ঘরে ছোট বৌকে নিয়ে যথেষ্ট আদিখ্যেতা হচ্ছে সে ঘরে কারও শুনতে না বাকী থাকে—'তা বড় বৌমা ও ঘরে একা বসে আছেন, ওঁকে একটু জল খাওয়াবার কি কাপড়-চোপড় ছাড়াবার কথা বলুন কাউকে। বড় অশোভন লাগছে না?'

'ও, কেউ কিছু করে নি বুঝি! আচ্ছা, আমি দেখছি।'

বলেই দ্রুত যেখানে ভিয়ান বসেছিল সেইখানে গিয়ে ঠাকুরদের ওপর তম্বী শুরু করলেন।

নৃপতি হাসল। বলল, 'আপনারই খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি। এক-দিক দিয়ে ভালোই হ'ল। আপনি তো একটু লেখেন-টেখেন—লেখার নতুন খোরাক হ'ল।'

'এ লিখলে কেউ বিশ্বাস করবে না।' বেশ একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলল যতীশ।

পরের দিন বৌভাতের যেসব অনুষ্ঠান হয়, তখনও যা কিছু করা হ'ল সেই একটি বৌকে উপলক্ষ্য ক'রেই। বড়কে কেউ ডাকল না, কিছু বলল না। হয়ত কেউ খেতেও ডাকত না, নিতান্ত যতীশ মেয়ে-মহলে গিয়েই চেঁচামেচি করল বলে শেষ অবধি মামীশাশুড়ী সন্ধ্যাকে ডেকে নিয়ে মেয়েদের সারির মধ্যে এক জায়গায় বসিয়ে দিলেন। সকালে সুরেশ একসময় তাকে ডেকে নিয়ে স্নানের ঘর দেখিয়ে দিয়েছিল। রাতে তাকে বা নৃপতিকেও কেউ খেতে ডাকে নি। সন্ধ্যা নিজেই ট্রাঙ্ক খুলে কাপড় বার করে বেনারসী ছেড়েছে। সকালে একসময় যতীশ গিয়ে বাজার থেকে সিঙাড়া রসগোল্লা কিনে এনে সন্ধ্যার সামনে দিয়েছিল। সুরেশ দয়া ক'রে এক কাপ চা যোগাড় ক'রে দিয়েছে। সে ছেলেমানুষ, এবং ভৃত্যস্থানীয় হ'লেও তার বোধ হয় খারাপ লাগছিল ব্যাপারটা।

রাত্রের অনুষ্ঠানটা আরও অশোভন ও দৃষ্টিকটু লাগল। যে ঘরে বৌ বসানো হবে এবং নিমন্ত্রিত মেয়েরা এসে বসবেন—সে .ঘরে একটিই মাত্র সিংহাসন, সেখানে ছোট বোকে বসানো হয়েছে। বড় বৌ পাশের ঘরে একটা আধময়লা বিছানার ওপর আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। তাকে কেউ ডাকল না, সাজাল না, একটু চন্দনও পরাল না। নিমন্ত্রিতরা এসে ছোট বৌকেই যৌতুক করলেন। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ তাঁরা যে চিঠি পেয়েছেন তাতে একটিই বিয়ের কথা আছে। নৃপতি দু-একজন ছেলেবেলাকার বন্ধু যারা দেশে থাকে—তারা এবং দু-একটি আত্মীয় খোঁজ করে পাশের ঘরে গিয়ে দেখে এল, কেউ কেউ সামান্য কিছু উপহারও দিল।

যতীশ নৃপতিকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল, 'এর মধ্যে আপনার শ্বশুরবাড়ির কেউ আসবেন নাকি?'

নৃপতি প্রশান্তকণ্ঠে বলল, 'বাবা তো তাঁদের নিমন্ত্রণ করেন নি। ফুলশয্যার কাপড় মিষ্টি পাঠাতে চেয়েছিলেন—আমি বারণ করেছি। এ অবস্থা হতে পারে আমি একটু আন্দাজ করেছিলুম—চিঠি ছাপানোর খবর পেয়ে। আমি কাল সন্ধ্যায় ওখানে একটা আয়োজন করেছি। সেইখানেই ওঁরা ফুলশয্যা পাঠাবেন, আমার যা দু-চারজন বন্ধু বা ছাত্রকে বলার আছে—তারাও আসবে। তাদের এখানে আসা-যাওয়ার অসুবিধা এই বলেই ঢেকে নিয়েছি।'

অনেক রাত্রে ভূপতিবাবু বড় ছেলের কাছে এসে প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললেন, 'খোকা, সর্বনাশ হতে বসেছে, জিনিষপত্র সব টান পড়েছে—এখনও একশোর মতো লোক বাকী। সাইকেলে ক'রে কাউকে রাণাঘাট পাঠালে কোন হোটেল থেকে রাঁধা মাংস পাওয়া যেতে পারে। মিষ্টিও আনতে হতে পারে। এদিকে আমার হাত একেবারে খালি—'

মৃদুকণ্ঠে একবার শুধু বলল নৃপতি, 'আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলাম বাবা তিনশো লোক বলেছেন, আয়োজন করেছেন দুশোর মতো।

'সবাই যে আসবে কি করে জানবো বলো। কলকাতা হ'লে অনেক লোক আসত না।' তিক্তকণ্ঠে বললেন ভূপতিবাবু।

নৃপতি পকেট থেকে আটশো টাকার মতো বার ক'রে দিয়ে বলল, 'এতেই যা পারেন চালিয়ে নিন। আমার কাছে আর নেই। আটশো টাকার মতো আছে।'

ভূপতিবাবু আর দাঁড়ালেন না—টাকা হাতে ক'রে ছুটলেন—বোধ হয় কাকে পাঠাবেন সেই সন্ধানে।

পিছন থেকে নৃপতি ডেকে বলল, 'পরেশের স্কুটার আছে, তাকে বলুন, যদি যায়।'

যতীশ বলল, 'না ভাই, আপনি রামচন্দ্রকেও ছাপিয়ে গেলেন বোধ হয়।'

নৃপতি বলল, 'বুঝছেন না কেন—এখন একটা কেলেঙ্কারি ঘটলে সমস্ত ফ্যামিলির অপমান।'

যতীশ বলল, 'আপনি কাল কখন যাবেন?'

নৃপতি বলল, 'পাঁচটায় একটা বাস ছাড়ে—সেটা ধরতে গেলে চারটেয় বেরোতে হবে। কেননা ওটায় বড় ভীড় হয়। আগে গিয়ে জায়গা নিতে হবে। হেঁটে গেলেও তো হবে প্রায় মিনিট দশেকের পথ।'

'আমিও আপনার সঙ্গী হবো। শুধু আপনার জন্যেই আটকে আছি। আমার অসহ্য লাগছে।'

নৃপতি তেমনি মিষ্টি ক'রে হাসল।

এর পরের খবরটা যতীশ পেল দিন পাঁচেক পরে—যখন ভূপতিবাবু ওকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে হাত দুটো ধরে কেঁদে ফেললেন।

'আরে, আরে, এ কি কাণ্ড! কী হ'ল কি, ব্যাপার কি।'

'আমারই পাপের শাস্তি বাবা। সতী লক্ষ্মীকে সাজা দিতে গিয়ে আমিই যে সাজা পেলুম। ছোট বৌমা ফুলশয্যার একদিন পরে ভোর রাতে উধাও হয়েছেন। কখন বেরিয়ে গেছেন কেউ জানে না। এই চিঠি লিখে রেখে গেছেন বালিশের তলায়।'—বলে, চিঠিখানা আমার হাতে দিলেন।

কাউকে বিশেষ করে সম্বোধন করা হয়নি। 'টু হুম ইট মে কনসার্ন' গোছের লেখা—

"আপনারা আপনাদের বড় বৌয়ের সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন—তারপর আর কোনমতেই আপনাদের আমি আত্মীয় বলে, বিশেষ শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী বলে ভাবতে পারব না। আপনাদের সঙ্গে জীবন কাটাতে হবে বলে মনে হ'লেই ঘৃণা বোধ হচ্ছে। আমি চললাম। আপনারা আপনাদের ছেলের

আবার বিয়ে দিন, সেপারেশনের জন্য যা করা দরকার—যা করতে বলবেন ক'রে দেব। গহনা আমি নিয়েই গেলাম, নগদ টাকা তো ফেরৎ পাওয়া যাবে না জানি। তবে ফার্নিচার আলমারী ড্রেসিং-টেবিল খাট-বিছানা আমার ফেরৎ চাই। না দিলে পুলিস নিয়ে গিয়ে বাবা নিয়ে আসবেন। আর সে ক্ষেত্রে সেপারেশনের কাগজ সই করতে বেগ দেব।

"একটা কথা বোধ হয় জানেন না—আপনাদের বড় বৌকে আমি চিনি, উনিও সরকারী কলেজে পড়ান, হাজার টাকার ওপর মাইনে পান। এটা জানলে বোধ হয় এতটা অনাদর করতেন না। তবে ভালই হয়েছে—আপনাদের আসল পরিচয় পেয়ে গেছি।"

'তারপর?' যতীশ বলল, 'ওর বাপের বাড়ি গিয়েছেন কেউ?'

গিয়েছিলুম বৈকি। আমাকে প্রায় গলাধাক্কা দিতে এল ওর বাপ। বলে, 'আপনারা কি মানুষ! কোন মানুষ এমন চশমখোর হয় শুনি নি কখনও। ...এরপর আবার এসে দাঁড়াতে লজ্জা করল না!'

তারপর চোখের জল মুছে গলাটা একটু নামিয়ে ভূপতিবাবু বললেন, 'আচ্ছা, ঐ যে বড় বৌমার মাইনের কথা লিখেছে, ওটা কি সত্যি! খোকা কি রকম চাপা, একবারও আমাকে বলে নি!'